অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা

বিংশতি বর্ষ : বার্ষিক সংকলন ১৪২২/২০১৬

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা

বিংশতি বর্ষ : বার্ষিক সংকলন ১৪২২/২০১৬

বিষয়		পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৩
অতীন বুঝি গল্পের পটুয়া	বিমল কর	৭
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তাক্ষর		১১
স্ত্রীর কথা : ওঁর কলম থেকে সোনা ঝরে	মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩
ছেলের কথা : আমার বাবা	দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪
নিজের লেখা		
খুঁজতে খুঁজতে এক জীবন	অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫
জন্মদিন	অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮
ঈশ্বরের সন্ধানে	অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩
অতীনচর্চা		
নীলকণ্ঠ পাখির সন্ধানে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	সোনালি মুখোপাধ্যায়	৪১
রাজা গোপালের আত্মচরিত : আত্মসংশয়ের বয়নশিল্প	সুমিতকুমার বড়ুয়া	৬৭
জন্ম-মৃত্যু কথন : অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প	রাজীব চৌধুরী	৭৫
অতীনের উপন্যাস : জীবনের আঙিনায় সাহিত্যের পদচারণ	ড. সোমনাথ চক্রবর্তী	৮৪
গল্পের ঘরবাড়ি, গল্পের বাগান আর বেঁচে থাকার গল্প	পম্পা মুখোপাধ্যায়	১০৪
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রামদর্শন : অন্য চোখে	শ্রাবণী পাল	১১৯
অলৌকিক জলযান—অলৌকিক যাত্রাকথা	বিশ্বজিৎ পাণ্ডা	১৩১
নিয়তি? নাকি...	স্বপ্না ঘোষাল	১৪৭
মায়া-কলম	শম্পা রায়	১৫২
ফিরে পড়া		
লেখক অতীন, মানুষ অতীন	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	১৬৩
প্রিয় অতীন	শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	১৬৫
কাছের মানুষ	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	১৬৭
অতীন	বুদ্ধদেব গুহ	১৭০
একজন স্বভাব লেখক	তপন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭২
অতীনদার 'সাদা অ্যাম্বুলেন্স'	সুব্রত মুখোপাধ্যায়	১৭৭
অতীনদার সাহিত্য মানুষের দিনলিপি	আবুল বাশার	১৮০
নীলকণ্ঠ পাখির পালক	কিন্নর রায়	১৮২

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সাদা রঙের বোট আসছে	মঞ্জুভাষ মিত্র	১৮৮
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সহজ আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত কারিগর	সোহারাব হোসেন	১৯০
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পবিশ্ব	তপোধীর ভট্টাচার্য	২০৮
মৃত্যু এবং জীবনের মহিমা : অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি গল্প	বীরেন শাসমল	২২৭
দুটি মৃত্যু : দুই শিল্পী	হীরেন চট্টোপাধ্যায়	২৩৮
অনুজের চোখে অগ্রজ		
অতীনদার সঙ্গে দ্বিরালাপ	তপন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪৫
প্রসঙ্গ : অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	সাধন চট্টোপাধ্যায়	২৪৯
সারল্যের ভাষ্যকার	সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়	২৫৩
প্রতিপক্ষ : অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	অমর মিত্র	২৬১
একজন সমুদ্র-মানুষের গল্প	নীহারুল ইসলাম	২৬৪
প্রকাশকের চোখে অতীন		
অতীন একজন সৎ লেখক	সবিতেন্দ্রনাথ রায়	২৭৩
অতীন ছাড়া আমার গতি নেই...	বামাচরণ মুখোপাধ্যায়	২৭৫
অতীন একজন মাটির মানুষ	বাদল বসু	২৭৯
এঁরা প্রকাশনা জগতের গৌরব	সুধাংশুশেখর দে	২৮১
অতীনের মুখোমুখি (সাক্ষাৎকার)		
আত্মকথা : অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	অমর দে	২৮৫
লেখার অন্দর : অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	মুকুল গুহ	৩২৭
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখোমুখি	সোমনাথ চক্রবর্তী	৩৩১
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় : এক অকথিত জীবন ও দর্শন	কল্যাণ মৈত্র	৩৩৮
বংশলতিকা		৩৫৬
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনপঞ্জি ও পুরস্কার		৩৫৭
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় : পত্রপত্রিকাপঞ্জি	সংকলক : সন্দীপ দত্ত	৩৫৯
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জি	সংকলক : অমর দে	৩৬১

সম্পাদক : অমর দে

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : সম্মোহন দে

প্রকাশক : তাপসী দে

কার্যালয় : হোলি অ্যাপার্টমেন্ট, তৃতীয় তল, ৪ যশোহর রোড, দমদম

কলকাতা-৭০০ ০২৮, দূরভাষ : ৯৪৩৪৭২২৫৯৫

e-mail : galpasarani@gmail.com

মুদ্রণ : জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১বি, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

মূল্য : ২৫০ টাকা

চেক/ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট্ "গল্পসরণি"-র (GALPASARANI) নামে পাঠাতে হবে।

নিজেকে খুঁড়তে খুঁড়তে

[সম্পাদকীয়র পরিবর্তে]

মানুষটি ঈশ্বরবিশ্বাসী। ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষ কেমন হন? এই ধারণাগুলি তো এখন, এই এলোমেলো বর্তমান সময়ে উলটে-পালটে যাচ্ছে। ঈশ্বরবিশ্বাসী আদর্শ মানুষদের যে-সব গুণাবলীর কথা আমাদের জানা আছে তার মধ্যে প্রধান কথাটি হচ্ছে প্রেম। কেমন প্রেম? জীবে প্রেম। এই উলটো সময়ে এই প্রেম-বোধটিই মানুষের মন থেকে উবে যাচ্ছে। ধারণাটি হচ্ছে—মানুষ, উদ্ভিদ, এমনকি কীট-পতঙ্গকেও ক্ষমা আর প্রেমের চোখে দেখা। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি ঘটনা মনে পড়ছে। রবীন্দ্রনাথ পায়রাদের দানা খাওয়াচ্ছিলেন। পায়রাদের সঙ্গে কয়েকটি কাকও সেখানে দানা খেতে জুটে যায়। কাকদের তাড়াতে গিয়ে হাত তুলেও রবীন্দ্রনাথ থমকে যান। ভাবেন, আমি তো পাখিদেরই দানা খাওয়াচ্ছি, তবে পায়রা ও কাকে প্রভেদ করছি কেন? বর্তমান তু-তু, ম্যায়-ম্যায়-এর বিভেদবাদী সময়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই ঘটনা খুবই প্রাসঙ্গিক।

মানুষটি ঈশ্বরবিশ্বাসী, কিন্তু কিছুটা অধার্মিকও। ধর্মগুরুরা এই মানুষটিকে ক্ষমা করেন না, বলেন—তুই নরকগামী হবি। কিন্তু মানুষটি যে-ধর্ম মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে সেটারই বিরুদ্ধাচারী, ধর্মগুরুদের স্বর্গ-নরকের ফতোয়া গ্রাহ্য করেন না। মানুষটি একধারে ঈশ্বরবিশ্বাসী আবার অধার্মিকও। এ এক জটিল কূটাভাস। প্যারাডক্স। তাহ'লে মানুষটি কী? তাঁর ঈশ্বর কেমন?

তাঁর শৈশব-কৈশোর রূপকথার মতো এক ঈশ্বরের বাগানে লালিত হয়েছে। তারপর উৎকট এক ধর্মীয় বিদ্বেষ-বিভাজনে ছিন্নমূল হয়ে খণ্ডিত দেশের এ-পারে ছিটকে এসে পড়েন। এরপর শুরু হয় অনেক অপমান ও হীনতা স্বীকারের এক গরলপর্ব। প্রায় ছয়-সাত বছর ধরে আকণ্ঠ সেই বিষ পান করতে করতে তিনি নীলকণ্ঠই হয়ে যান বুঝি। খোঁজেন এক নীলকণ্ঠ পাখিকে—যা পাওয়া যায় না, পেতে চান তাকেই। এই ছয়-সাত বছর ছিল প্রলয়পয়োধিজলে সামান্য একটি খড়কুটো আঁকড়ে ধরে কোনওরকমে তাঁর বেঁচে থাকার পর্ব। সেই ভীষণ সময়ে তিনি বেঁচে থাকতেই চেয়েছেন। মরণের কথা একবারও ভাবেননি। কারণ এই বেঁচে থাকা, জীবনকে অতিক্রম করাও এক মহৎ ব্যাপার। ওই সময় বিপর্যয়ের প্রচণ্ড ঝড়ে বারবার তিনি পর্যুদস্ত হয়েছেন, রক্তাক্ত হয়েছে তাঁর হৃদয়, কিন্তু হেরে যাননি; সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে জীবনকেই আঁকড়ে ধরেছেন। ওই ঝড় তাঁর মনে কোনও তিক্ততা সৃষ্টি করতে পারেনি। কত অপমান... কত অসম্মান... সব তিনি পরবর্তীকালে ভুলে গেছেন, কিছু মনে রাখেননি। বরং সহস্রমুখে শুষে নিয়েছেন জীবনের অভিজ্ঞান, খুঁটিনাটিসহ যাবতীয় অভিজ্ঞতা। ভাগ্যিস তিক্ত-বিরক্ত হননি, ভাগ্যিস ভুলে গেছেন—না হ'লে তাঁর জীবনের অমূল্য অধ্যায়গুলি গল্প-উপন্যাসে রূপায়িত হতে পারত না। আমরা পেতাম না 'সমুদ্র মানুষ', 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', 'অলৌকিক জলযান', 'মানুষের ঘরবাড়ি', 'ঈশ্বরের বাগান' এ-রকম অনেক গল্প-উপন্যাস।

তাহ'লে মানুষটির অন্বিষ্ট ঈশ্বর কী? এক কথায় ভাত। ভাত মানে লক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা—জীবন। এক মুঠো ভাতের জন্য জীবন বাজি রেখে মানুষ কোন না কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আর সেই মানুষগুলি—যারা একটি লণ্ঠন সম্বল করে বা পাটের শলা মশাল ক'রে জ্বেলে গভীর অন্ধকার অতিক্রম করে প্রিয়জনের কাছে পৌঁছনোর জন্য, তারাই তাঁর ঈশ্বর। ওই গভীর অন্ধকার অতিক্রম করা তো জীবনকেই অতিক্রম করা, আর প্রিয়জনের কাছে পৌঁছনো হল স্বর্গে গিয়ে উপস্থিত হওয়া। এছাড়া অন্য কোনও ঈশ্বর বা স্বর্গের কথা জানেন না মানুষটি। তিনি অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি জানেন 'সব পাখি ঘরে ফেরে', সমস্ত জাহাজই তীরে এসে ভেড়ে কোনও-না-কোনও সময়, সেটাই মরণ। জন্ম হওয়া তক একটি মানুষ জীবনসমুদ্রের তেতো ফেণায় দোল খেতে খেতে জীবন অতিক্রম ক'রে মৃত্যুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। এটাই সত্য। এর মাঝেই রচিত হয় শয়তান বা ঈশ্বর, স্বর্গ ও নরক নিয়ে নানান কিংবদন্তী ও উপাখ্যান। অতীন দপদপে সেই জীবনকেই শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরেন, স্বর্গ-নরকে তাঁর কোনও স্পৃহা নেই।

প্রকৃতিকে, জীবনকে, মানুষকে ভালোবাসাই অতীনের সৃষ্টির অবলম্বন। আর প্রেম। নারীর স্পর্শ-ঘ্রাণময় প্রেম। কত রহস্য সেই প্রেমে! সভ্যতার শুরু থেকে এই প্রেমের কত সংগীতই না রচিত হয়েছে। সেই গান কখনও থামার নয়। আজও একই ভাবে গাওয়া হয় সেই গান। একজন মানুষীর তরে, একজন মানুষের মনে আকাঙ্ক্ষার যে বীজ স্বাভাবিকভাবেই বোনা হয়ে যায়, সেখান থেকে উন্মোচিত হয় পৃথিবীর যাবতীয় সুষমা। এই সুষমাকেই অতীন বুকে ক'রে বয়ে আনেন তাঁর লেখায়। নিজেকেই খুঁড়ে খুঁড়ে গড়ে তোলেন একজন 'সমুদ্র মানুষ' বা 'ঈশ্বরের বাগান'। তাঁর সমস্ত গল্প-উপন্যাসই তাঁর নিজেকে খোঁড়ার ইতিহাস।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়ক এই সংখ্যা নির্মাণ করতে গিয়ে অসংখ্য মানুষের সহৃদয় সহযোগিতা পেয়েছি, তেমনি কিছু মধ্যমেধার অনুজ সাহিত্যিকের তাঁর প্রতি বিরূপতা দেখে স্তম্ভিত হয়েছি। তবু, সহৃদয় মানুষদের যেমন, বিরূপ মানুষদের প্রতিও, সম-ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কেননা কোনও ভাণ না করেই তাঁরা তাঁদের বিরূপতা প্রকাশ করেছেন। এছাড়া কয়েক জনের নামোল্লেখ না করলে আমি অপরাধী থেকে যাবো। তাঁদের মধ্যে 'লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্র'-এর কর্ণধার সন্দীপ দত্ত লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়ক আলোচনাপঞ্জি তৈরির পরিশ্রমসাধ্য কাজটি করে দিয়ে আমার অনেক ভার লাঘব করে দিয়েছেন। তিনি আমার একান্ত আত্মজন, ধন্যবাদ জানালে তাঁকে ছোটো করা হয়। এছাড়া এই সংখ্যা প্রস্তুতির সময় থেকে সব বিষয়ে সব সময় আমাকে সাহায্য করেছেন স্নেহাশিস ভট্টাচার্য ও শম্পা রায়। এঁদের সাহায্য ছাড়া এই সংখ্যাটি নির্মাণ করা সম্ভব হোত না। এঁদের দু'জনের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

অমর দে

অঙ্কন : সম্মোহন দে

'অতীন বুঝি গল্পের পটুয়া'*

বিমল কর

বয়সের দিক থেকে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় আজ মোটামুটি প্রবীণ। লেখক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত, খ্যাতিমান। তাঁর সম্পর্কে নতুন করে আমি কীই বা লিখতে পারি! তেমন যোগ্যতাও আমার নেই। তবু লেখকের সাধ, তাঁর এই নতুন গল্পগ্রন্থটির সূচনা হিসেবে আমি যেন কিছু লিখি। বয়েসে আমি অতীনের চেয়ে অনেকটাই বড়, আর কম করেও তাঁর লেখার সঙ্গে, মানুষটির সঙ্গে আমার পরিচয় গত তিরিশ বত্রিশ বছরের, ফলে অনুজ লেখক হিসেবে ওঁর একটা দাবিও থাকা স্বাভাবিক। মুশকিল হল, এই দাবি পূরণে আমি যে কতটা অক্ষম নিজেই জানি।

অতীন যখন তরুণ লেখক, সাহিত্যজীবনের সেই গোড়ার পর্ব থেকেই তাঁর নামের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল। মফস্বলবাসী এই নবীন লেখককে তখন চোখেও দেখিনি। মাঝেসাঝে দু'-চারটি লেখা নজরে এলে পড়ার চেষ্টা করেছি। কোনও সন্দেহ নেই, গোড়া থেকেই মনে হয়েছে, অতীনের লেখায় অন্য ধরনের একটি স্বাদ আছে। সেই সব লেখায় শহুরে স্বাদ ছিল বলে আমারে মনে পড়ে না। পরিবেশ হয়তো গ্রাম্য ছিল, তবে সেই গ্রাম্যতা মামুলি নয়, সাধারণ পল্লীকাহিনীর অনুসরণও নয়। বরং অতীনের লেখায়, বর্ণনায়, চরিত্রসৃষ্টিতে কেমন যেন এক অস্পষ্ট অথচ সরল ছবি ফুটে উঠত। মনে হত, নতুন এক ঘ্রাণ অনুভব করছি।

বছর কয়েক পরে, অতীনকে দেখলাম। ততদিনে তিনি কলকাতায় চলে এসেছেন। যতদূর মনে পড়ে, সে-সময়ে অতীনের সহিত্যিক বন্ধু বলতে ছিলেন

একমাত্র সিরাজ। দু'জনের বন্ধুত্ব বেশ কয়েক বছরের। মফস্বলে থাকার সময় থেকেই। পরে দু'জনেই কলকাতায়।

অতীনের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় না ঘটলে জানতে পারতাম না; কী প্রচুর অভিজ্ঞতা এই মানুষটির। ভিটেমাটি দেশ ছাড়া একটি নাবালক পারিবারিকভাবে এবং ব্যক্তিগত জীবনে দিনের পর দিন কত ক্লেশ, মনোবেদনা, গ্লানি, বিমুখতা সহ্য করেছেন নির্দয় সমাজ সংসারের। এসব সত্ত্বেও মানুষ হিসেবে তিনি দুর্ভাগ্যের কাছে নতমস্তক হতে পারেননি। জীবনই হোক, আর অদৃষ্টই হোক—অতীনকে কোথা থেকে কোথায় টেনে নিয়ে গেল! কত দেশ-দেশান্তরের মাটি ছুঁয়ে, সাত সাগরের জল আর লোনা বাতাসের ঝাপটা গায়ে মাথায় মাখিয়ে শেষমেশ ফিরে এলেন স্বস্থানে। জীবনের সেই রুক্ষ স্বজনহীন দিনগুলি কিন্তু সদ্য যুবককে অস্থির করতে পারল না। মনে মনে অতীনের হয়তো বিশ্বাস ছিল, জীবনের এই দিনগুলি কিন্তু একসময় ফুরিয়ে যাবে; আর তখন নিজের অভিজ্ঞতার সমষ্টি নিয়েই তিনি শুরু করবেন লেখাপড়ার কাজ। আমাদের কাছে হয়তো খানিকটা অবিশ্বাস্য মনে হয়, কিন্তু বিদেশে এমন লেখক অনেক আছেন যাঁদের কর্মজীবনের আদিপর্ব বড়ই সাধারণ, মনে হয় কত তুচ্ছ। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এঁরাই সাহিত্যিক হিসাবে সর্বার্থে সার্থক হয়ে উঠেছেন।

জীবন হল অনেকটা সাদা ব্লটিং পেপারের মতন। তার ধর্মই হল কালির দাগ শুষে নেওয়া। আমাদের ছোট বড় নানান অভিজ্ঞতাকে জীবন যে কোথায় কতটুকু শুষে নেয়, বা কী ছাঁদে তার বিচিত্র অস্পষ্ট ছাপ থেকে যায়—বলা মুশকিল। তবে এ কথা তো সত্যি মানুষের মনের গঠন, তার সচেতনতা, মানসিক ঝোঁক, স্বভাব—এই অভিজ্ঞতার কম-বেশি প্রভাব ও চাপে গড়ে ওঠে। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প পড়লে অনুভব করা যায়—তিনি না পলাতক, না উদাসীন। তাঁর চরিত্রগত গুণটিই হল মমতা, সমবেদনা, উদ্বিগ্নতা নিয়ে এই সমাজ ও সংসারকে দেখা। মানবিক বোধই যে অতীনের লেখার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ—তা অস্বীকার করা যায় না। অন্তত আমার ধারণায়।

অনেক লেখক আছেন যাঁরা গল্পের গঠনে অত্যন্ত দক্ষ, যতটা পারেন সাবেকি রীতিনীতি মেনে গল্প লেখেন, লেখার মধ্যে একটা ঝকঝকে ভাব থাকে, হয়তো খানিকটা নাটকীয়তা। অতীনের লেখার ধরনটাই আলাদা। তার কোনও নির্দিষ্ট ছক নেই, মাপজোক করে হিসেব মিলিয়ে গল্প লেখার ধাত তাঁর নয়। প্রায় সব লেখাই স্বতঃস্ফূর্ত, ভেতরের তাগিদেই নিজের মতন করে গড়ে উঠেছে। কোনও কোনও সময় মনে হয়, অতীন বুঝি গল্পের পটুয়া। নিজের মনের মতন করে আঁকেন,

নিজের মনের পছন্দসই রং ব্যবহার করেন—যার উজ্জ্বলতা প্রখর নয় অথচ স্নিগ্ধ ও লাবণ্যময়। আর বলা বাহুল্য এর একটা দেশজ রূপ ও আকর্ষণ রয়েছে।

সামান্য মনযোগ দিয়ে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা পড়লে মনে হবে, বর্তমান সময় ও সমাজসংসারের মধ্যে থেকেও মানুষটি প্রায়শই যেন ব্যথিত ক্ষুব্ধ। যে মানসিক সহনশীলতা, স্বল্পে সুখি স্বভাব, সমবেদনা, ঔদার্য তাঁর বাল্য কৈশোর যৌবনের মনকে গড়ে তুলেছেল—তার অস্তিত্ব কেমন করে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব! অথচ সেই অতীত পরিবেশ সময় আজ বিগত, এখনকার মানুষ অনেক বেশি আত্মপর, বাস্তব বিষয়ে বিচক্ষণ। কখনও কখনও দায়মুক্ত হবার জন্যে তৎপর। এসব তাঁর পছন্দ নয়, স্বীকার করে নিতেও পারেন না। ফলে যে বেদনা বোধ করেন তা প্রকাশ করাও যায় না। একমাত্র লেখাতেই অতীনের সেই দুঃখবোধ ধরা পড়ে।

অতীনের হাতে প্রকৃতি যতটা জীবন্ত হয়ে ধরা দেয়—ততটাই সৌন্দর্যময় হয়ে, স্বাভাবিক রূপ-রং নিয়ে। এক-এক সময়ে সেই প্রকৃতি শুধু চোখের মধ্যে থাকে না, ঘ্রাণময় হয়ে ওঠে। বিভূতিভূষণের লেখার সঙ্গে এখানে তাঁর লেখার একটা সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। তবে এই সাদৃশ্যকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন নেই। খানিকটা এলোমেলো ভাঙাচোরা ভাষায় কোনও একটি ছবি বা আবেগকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে অতীন কখনও কখনও প্রায় দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেন হয়তো—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কখন যেন সেই অস্পষ্টতা একটি অসাধারণ 'ইমপ্রেশান' তৈরি করে, ফেলে যায় পাঠকের মনে ছাপ। সন্দেহ নেই এসব তাঁর অন্তর থেকে অসে চাতুর্য থেকে নয়।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পঞ্চাশটি গল্প' পাঠকমহলে সমাদৃত হবে বলেই আমি মনে করি।

বানান অপরিবর্তিত।

* আনন্দ পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত ও সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পঞ্চাশটি গল্প' বইয়ের "ভূমিকা" হিসাবে বিমল কর ১০.১১.৯৮ তারিখে এই সূচনাটি লেখেন, যা অতীন-সাহিত্যকৃতি মূল্যায়নে আজও মাইল-ফলক হয়ে আছে। 'ভূমিকা'টি আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের সৌজন্যে পুনর্মুদ্রিত হল।

গল্পসরণি-র বই

ননী ভৌমিকের বই

ধুলোমাটি (উপন্যাস) ₹.৩০০

গল্পসমগ্র ₹.৪০০

অগ্রন্থিত গল্প ₹.১৫০

মরু ও মঞ্জরী ₹.১০০

ইউক্রেনের লোককথা (অনুবাদ) ₹.২০০

জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য

সআদত হসন মন্টোর বই

মূল উর্দু থেকে বঙ্গানুবাদ : পুষ্পিত মুখোপাধ্যায়

শিরোনামহীন (উপন্যাস) ₹.১০০

নির্বাচিত গল্প ₹.১৫০

অন্যান্য বই

বুড়ো লোকটা ও সমুদ্র আর্নেস্ট মিলার হেমিংওয়ে অনুবাদ : অমর দে ₹.৩০

স্বপ্নের জলছবি (গল্প) বিজলী ঘোষ ₹.৫০

ওলন ও অন্যান্য গল্প (গল্প) অমর দে ₹.৫০

মহামাস (উপন্যাস) সৈকত রক্ষিত ₹.৫০

বিলবসিয়ার রূপকথা (উপন্যাস) বিজলী ঘোষ ₹.৫০

মায়াপৃথিবী ও স্খলিত বেদনারা (কবিতা) অমর দে ₹.৩০

মধ্যবলয়ে শৈবক্ষেত্রে (ভ্রমণ) রঘুনাথ মন্ডল ₹.১০০

স্তিমিত রণতূর্য (উপন্যাস) সৈকত রক্ষিত ₹.১৫০

ঝিঙা ফুল কাঁকুড় ফুল (উপন্যাস) নলিনী বেরা ₹.১৫০

সিউড়ির ইতিবৃত্ত (আঞ্চলিক ইতিহাস) পার্থপ্রতিম দে ₹.১০০

ছাই ও অন্যান্য গল্প (গল্প সংকলন) অমর দে ₹.১০০

স্বর্গের ফুল-ফল (গল্প সংকলন) পুষ্পিত মুখোপাধ্যায় ₹.১০০

বি.দ্র.: 'গল্পসরণি' পত্রিকার 'ননী ভৌমিক', 'একরামউদ্দিন' ও 'রজনীকান্ত সেন' বিশেষ সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে।

প্রাপ্তিস্থান

দে'জ, দে বুক স্টোর (দীপু), পাতিরাম, বুক সেন্টার, অপূর্ব, ধ্যানবিন্দু, রাসবিহারী মোড় (কল্যাণদা-র বুকস্টল) ও অন্যান্য বুকস্টল।

স্ত্রীর কথা

ওঁর কলম থেকে সোনা ঝরে

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

[মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্মিনী। জন্ম : ০১-০১-১৯৩৭। পিতা প্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায়, মাতা অমিয়া চট্টোপাধ্যায়। ডাকনাম : খুকু। অল অসম ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯৫৮ সালে বিবাহের পর থেকে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপলবন্ধুর জীবনের সমস্ত রকম সুখ-দুঃখের সঙ্গে অটলভাবে জড়িয়ে আছেন। অসুস্থতা ও শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আশ্চর্য তাঁর সজীবতা ও প্রাণশক্তি। অনুরোধ করা মাত্র শারীরিক সব বাধা তুচ্ছ করে তিনি অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে বলতে রাজী হয়ে যান। রেকর্ড করা তার বলা কথাগুলোই এখানে লিখিত আকারে প্রকাশ করা হল। সম্পাদক।]

ওঁর সম্বন্ধে তো অনেক জায়গাতেই বলেছি, আর কী বলবো? নিজের কথা বলতে গেলে—আমার ছোটোবেলা খুব আনন্দে কেটেছে। আমাকে ওঁর পছন্দ হয়েছিল। উনি বিয়ের প্রস্তাব দেন। আমরা রেজিস্ট্রি বিয়ে করেছিলাম। সাটুইয়ে আমি চার বছর শিক্ষকতা করেছি, তারপর কলকাতায় আসি। বিয়ের আগেই আমি ওঁর লেখা পড়েছি। ওঁর হাতের লেখা খুব খারাপ ছিল, কেউ পড়তে পারবে না, সেই লেখাগুলি এনে আমি কপি করে দিয়েছি।

'সমুদ্র মানুষ' উপন্যাসটির জন্য উনি পুরস্কার পেয়েছিলেন। বিচারকরা সেই লেখার ঠিক মতো মূল্যায়ন করতে পারেননি। বিচারকদের মধ্যে সত্যজিৎ রায়ের পিসিমা লীলা মজুমদারও ছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন—'সমুদ্র মানুষ' কোনও বিদেশি উপন্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে। তারপর তো উনি একের পর এক প্রাইজ পেয়ে চলেছেন। সম্প্রতি ছিন্নমূল মানুষদের নিয়ে লেখা ওঁর উপন্যাস 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'-কে আন্তর্জাতিক উপন্যাস হিসাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। ওই উপন্যাসটিকে বিশ্বের অন্যতম সাহিত্য হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এখনও ওঁর লেখার মধ্যে তারুণ্য আছে। উনি যা লেখেন তা থেকে সোনা ঝরে।

আমার বাবা

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

[দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই পুত্রের মধ্যে বড়ো। জন্ম ২৬ ডিসেম্বর ১৯৬০, বহরমপুর হাসপাতালে। শিক্ষা টাকি স্কুল। পরে দুর্গাপুর রিজিওন্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর স্নাতক। দীর্ঘদিন 'মেকন' সংস্থায় চাকরি করে স্বেচ্ছাবসর নিয়েছেন। এখন লেখালেখি করেন। দুটি কবিতার বই আছে।]

আমার বাবা সম্পর্কে আমার প্রথম যেটা মনে পড়ে বাবা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডের কাশিমবাজার রাজবাড়িতে থাকতেন। মনে পড়ে, ছোটোবেলায় আমার শরীর-স্বাস্থ্য ভালো থাকতো না বলে ডাক্তার প্রেসক্রিপসন করেছিলেন আপেল-সেদ্ধ খাবার। তো, আমি পুরো আপেল-সেদ্ধটা না খেয়ে কিছুটা ফেলে দিয়েছিলাম এবং বাবাকে তা বড়ো মুখ করে বলেছিলাম। উত্তরে বাবা বলেছিলেন—বড়ো হলে বুঝতে পারবি জীবন কত ভয়ংকর। তখন আমার এগারো কি বারো বছর বয়স!

এরপর আমরা কাশিমবাজার রাজবাড়ি ছেড়ে চলে যাই বাগুইআটিতে। সেখানেও বাবার কথা মনে পড়ে। একদিন রাত বারোটা বেজে গেছে, তখনও বাবা অফিস থেকে ফিরছে না। বাবার অফিস মানে কারখানার ম্যানেজারি, কলার প্রিন্টিং অ্যান্ড হলোওয়্যার লিমিটেডে। কিন্তু কাশিমবাজার রাজবাড়ি ছাড়িয়ে, মানিকতলা ছাড়িয়ে, বি.টি. রোড ধরে সেই কারখানাটা যে কোথায় ছিল, আমি আজকাল আর খুঁজে পাই না।

এই রকম বাবার অনেক স্মৃতি মনে পড়ে। মনে পড়ে, অবশেষে, রাত বারোটার সময় গেট খোলার আওয়াজ। বাবা অফিস থেকে ফিরছে।

সেই সঙ্গে মনে পড়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা—

"গলির মোড়ে বোমাবাজি
কিসের পুজো আজ?
বাবা কেন ফিরল না মা?
তারপরে, বোমাবাজি থেমে গেছে,
ছেলে গেছে বাবার খোঁজে,
রাত হয়ে গেছে,
বাবা ফিরল, ছেলে ফিরল না।"

নিজের লেখা

খুঁজতে খুঁজতে এক জীবন

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

তখন আমি সার্কুলার রোডে কাশিমবাজার রাজবাড়িতে থাকি। সেটা, সম্ভবত, ১৯৬৬-'৬৭ সালের কথা। এক সকালে চিত্ত সিংহ আমার বাসায় হাজির। তাঁর সম্পাদনায় 'সৃজনী' পত্রিকায় তিনি আমার একটি গল্প প্রকাশ করতে চান। মাথায় কিছুই আসছে না—কী করি—গৌরকিশোর ঘোষের লেখা 'জল পড়ে পাতা নড়ে' উপন্যাসটি সবে শেষ করেছি। উপন্যাসটি আমার খুবই ভাল লাগে। কারণ, যে মানুষজন, দেশ, মাটি এবং মনুষ্যত্ব উপন্যাসটির বিষয়—সেই মানুষজন, দেশ এবং মাটি, এবং মনুষ্যত্বের আমিও শরিক। মাথায় আমার তখন থেকেই ক্রিয়া করতে থাকে ছিন্নমূল মানুষদের বৃত্তান্ত, অর্থাৎ আমার এবং আমাদের মতো ছিন্নমূল মানুষ যাঁরা, তাঁদের দেশত্যাগের কথা যদি কিছু লিখে রাখা যায়। কিছুটা চেষ্টা করার মতো—কী হবে না হবে, না-জেনেই 'সৃজনী'-র জন্য গল্পটা লিখে ফেলি। কী নাম দিই এটাই একটা ভাবনার বিষয়। সহসা বিদ্যুচ্চমকের মতো নিশ্চিন্দিপুরের এক বালকের নীলকণ্ঠ পাখির আশ্চর্য উপলব্ধির কথা মাথায় ক্রিয়া করতে থাকে। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' এই নামেই গল্পটি 'সৃজনী'-তে প্রকাশিত হয়। এবং এভাবে ফেলে আসা গ্রাম-মাঠ-বর্ষাকাল, প্রকৃতির এক অসীম অনন্ত আচ্ছন্নতা আমাকে গ্রাস করতে থাকে। এভাবে কিছু গল্প 'দেশ' পত্রিকায় লিখে ফেলি : 'কালনেমি', 'হৃদয় একমাত্র বাহক'; 'অমৃত' পত্রিকায় 'মাশুল'। 'এক্ষণ' শারদীয় সংখ্যায় লিখি 'কিংবদন্তির সূর্য'। আরও গল্প লিখতে লিখতে ১৯৬৯ সালে 'অমৃত' থেকে ধারাবাহিক লেখার আমন্ত্রণ পাই। ধারাবাহিক ছাপার আগে সম্পাদক কবি মণীন্দ্র রায়কে অনুরোধ করি, প্রকাশিত গল্পগুলো যেন একটি শব্দও না-পাল্টে, একেবারে যেভাবে লিখেছি, এবং যেভাবে অনন্ত বিচ্ছিন্নতা আমাকে গ্রাস করেছে, অর্থাৎ আমার উপলব্ধিগুলো যেন ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে দেওয়া হয়। তিনি শুধু জানালেন, তাঁর আপত্তি নেই।

তাঁর প্রশ্ন, কী নাম হবে উপন্যাসের?

প্রথম গল্পের নামেই হবে।

সেই থেকে স্থির হয়ে গেল, আমি 'অমৃত' প্রত্রিকায়, 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' নামে একটি ধারাবাহিক উপন্যাস শুরু করছি। মানুষের অস্তিত্বের এই ঐতিহাসিক

যাত্রাকে, নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে ভেবেছি।

সবই উপলব্ধির জগৎ থেকে তুলে আনা কাহিনি, আমার কোনও কৃতিত্ব নেই—বিচিত্রবর্ণের ছবির মতো এক অপরূপের সন্ধানে কেবল চিত্রগুলো সাজিয়ে গিয়েছি।

কেন যে দেখলাম এক নদী প্রবাহিত হয়, কেন যে দেখলাম তার পাশে পড়ে আছে একটি বিশাল তরমুজের জমি, জমির একপাশে একটি ছই আর ছই-এর ভিতর ঈশম শেখ বসে তামাক টানছেন?

তখন এক শিশুর জন্ম হচ্ছে। হাট-ফেরত মানুষেরা বলে যাচ্ছে আঘুনের (অঘ্রানের) শেষ বেলায় ধনকর্তার পোলা হইছে।

এই বার্তা রটে যাবে—ঈশম তাড়াতাড়ি নামাজ শেষ করে ছই থেকে নেমে যাচ্ছেন দেখতে পেলাম। তিনি ছুটছেন—ছই থেকে নেমে যাওয়ার মুখে দেখলাম—তিনি দু'হাত তুলে আসমানের কাছে দোয়া চাইছেন। বলছেন, শোভানাল্লা। এই সব দৃশ্যের ভিতর প্রথম গল্পটা শুরু হয়। তিনি বৈঠকখানায় ঢুকেই আবদার জানান। ছোটকর্তা, আমি তবে যাই, ধনকর্তারে খবর দিয়ে আসি, কমু আপনের পোলা হইছে। ইবারে আমারে একটা নতুন তফন দিবেন। তিনি খবর দিতে যাচ্ছেন, হাতে লাঠি, মাথায় ফেট্টি, হাতে হারিকেন। হেমন্তে জল নেমে গিয়েছে কোথাও, কোথাও নামেনি—সেই বিস্তীর্ণ ধানখেতের মধ্যে অন্ধকার রাতে হাঁটছেন গ্রামের পর গ্রাম—সকলকে বলতে বলতে যাচ্ছেন, ধনকর্তার পোলা হইছে।

এই এক সংবাদ—মানবশিশুর জন্ম, এবং মানুষের ঘরবাড়ি নির্মাণ—এই থেকে কত আশা-আকাঙ্ক্ষার জন্ম হয়। এবং আগামীকাল, মহাকালের উপাসনা শেষে পড়ে থাকে সেই অগ্নিভস্ম। মাথার মধ্যে এমনই কিছু উপলব্ধির সৃষ্টি হলে, পাগল জ্যাঠামশাইকে দেখা যায়। ধানখেতে তিনি একটি কাছিমের পিঠে বসে আছেন। বড়মামি তাঁকে যে বলে দিয়েছে, যাওয়ার রাস্তায় একবার খুঁজে যাবে ঈশম। দেখবে তোমার বড়মামা বনজঙ্গলের আড়ালে কোথাও বসে আছেন কি না। সকালে বের হয়েছেন, এখনও তাঁর ফেরার নাম নেই—কোনও এক দুর্জ্ঞেয় স্মৃতি কিংবা মোহ বলা যায়, তাঁকে ঘুরিয়ে মারছে। মনে হয়, কোনও সেই এক উপলব্ধি—যা আশাকুহকিনী—জীবনে মাধুর্য ফুরিয়ে গেলেও—নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে যা আজীবন তাড়িয়ে বেড়ায়—ধর্ম দেশ জাতি সে বোঝে না, সে ব্যক্তিমাত্র। ওর চাই নীলকণ্ঠ পাখি—যা লৌকিক হয়েও অলৌকিক। আর শেষে থাকে অগ্নিভস্ম, অর্থাৎ মৃত্যু। এবং এক মহাগুজব থেকে তৈরি হয় ধর্ম, ঈশ্বর। দেবতা তৈরি হয়—সে-ও এক খ্যাপা ষণ্ড—সারা মাঠে-প্রান্তরে বিচরণ করছে। সেই ষণ্ডের সঙ্গে লড়ালড়ি এক বাগি বাছুরের। মালিক ফ্যালু শেখ যার লালন-পালন করে থাকে। গোটা কাহিনীর এই সব জীবনচরিত, যেমন জালালি জোটন ফকির সাব, যার-যার বিশ্বাসমতো ধর্ম পালন করে থাকে। ধর্ম এভাবেই অতীতে মানুষকে কব্জায়

নিয়ে আসার জন্য ইহলোক-পরলোক তৈরি করে দিয়েছে। ইহলোক যা থেকে বঞ্চিত, পরলোকে তার সেই নীলকণ্ঠ পাখি ওড়াউড়ি করতে থাকলে মানবজাতির অকারণ পরাধীনতার সৃষ্টি হয়। অথচ মানবজাতির কত বড় অভিলাষ এই পরলোক-চিন্তা, যার কোনও অস্তিত্বই নেই, অথচ বিশ্বাস করতে ভালো লাগে পাপ-পুণ্য—মানুষের পরজন্ম বলেও কিছু নেই, সেও এক নীলকণ্ঠ পাখি, এখন তারে খুঁজে বেড়াও—এই সব নানা কারণেই এই উপন্যাসের ক্ষেত্রে নীলকণ্ঠ পাখি এক অবিনাশী জাদুর কাঠি। সে ছুঁলেই ভস্ম হয়ে যেতে হয়। আবার ছুঁলে সে জীবনও ফিরে পায়—এমন সব প্রতীকী কারণে এই উপন্যাসের সর্বত্র মানুষের যাত্রা, শুধু জন্ম এবং মৃত্যুর মাঝের সময়টা তার জীবন। জীবনের স্বাদ-আহ্লাদ নানাভাবে ধরা পড়েছে, মালতী, সামসুদ্দিন কিংবা ফতিমা—অথবা বড় বউ, এবং সোনা, যে বড় হয়, সে এক পার্থিব জগতের মধ্যে বড় হয়, উপনয়নে যে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়—শাস্ত্রের এই সব অমোঘ বাণী জীবনকে তুচ্ছ করতে শিখিয়েছে, কিন্তু ভালবাসা শেখায়নি—ধর্ম-অধর্ম, দ্বিজত্ব তত্ত্ব নিছক কর্মনাশা হয়ে দাঁড়ায়। দেশভাগ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই ভালবাসা থেকে মানুষ বিচ্যুত হলে পাগলঠাকুর হয়ে যেতে হয়—আরও সব আছে যেমন জালালির মৃত্যু—কেন সে অনাহারে ক্লিষ্ট হয়, সুযোগ পেলে সে বিধবা মালতীর পুরুষ হাঁসটাকে পুড়িয়ে মাংস ভক্ষণ করে—আসলে বেঁচে থাকার নামই জীবন, সে সুকোমল প্রবৃত্তির দাস হয়ে বেঁচে থাকতে চায়, সে পারে না, বিলের অভ্যন্তরে যে তার মৃত্যু অপেক্ষা করে আছে! শালুক তুলতে গিয়ে গজার মাছের সঙ্গে মানুষের লড়ালড়ি—এই দৃশ্যও দেখতে পাই এবং সারা উপন্যাসে জলালির বিলের জলে শালুক তুলতে গিয়ে মৃত্যুর দৃশ্যটিও আদিমতার কথা বলে। দেখতে পাই মৃত জালালিকে কাঁধে নিয়ে জোছনায় পাগলঠাকুরের নৈশবিহার। সবই কোনও এক স্তব্ধতা থেকে সৃষ্টি? যেখানে মানুষের সেই অলৌকিক নীলকণ্ঠ পাখিটি উড়ে বেড়ায়।

সে যাই হোক, আমি মনে করি সাহিত্য-সৃষ্টির প্রথম শর্ত হল—স্রষ্টার জীবনব্যাপী সন্ধান কীসের জন্য—মৌলিক যদি হয় এবং সেই সন্ধানে মানুষের ইতিহাস যদি লেখা থাকে তবেই সার্থক সেই সাহিত্যমালা। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' থেকে শুরু করে 'অলৌকিক জলযান', 'ঈশ্বরের বাগান', 'মানুষের ঘরবাড়ি'—উপন্যাসগুলো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা, যা লেখকের গভীর সমাজ এবং ইতিহাসমনস্কতার কথা বলে। খণ্ডিত বঙ্গের অখণ্ড বর্ণমালার চালচিত্র নির্মাণে স্রষ্টার এই সব উপন্যাসে দেশ-কাল অতিক্রম করে মানুষের বিস্তীর্ণ অধিকারের কথা আছে। কোনও জাতির ঐতিহ্য, ঈশ্বর-বিশ্বাস এবং বিচ্ছিন্নতাই শেষ কথা নয়, তার ওপরেও আছে আত্মপ্রত্যয় এবং মানবিক দায়। আবার শুধু জীবন নয়, শুধু ইতিহাস নয়—মানুষ যখন বেঁচে থাকে, তার জীবনসত্যও বেঁচে থাকে। তার 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজ'ও বেঁচে থাকে।

বানান অপরিবর্তিত

জন্মদিন

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মৃতি বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে কখনও উঠে আসে নানা ছবি। এইসব গুচ্ছ ছবিই সৃষ্টি করে গল্প উপন্যাস এবং অস্তিত্বের সংকট থেকে রচিত হয় এক ধারাবাহিক জীবনগাঁথা। একটাই জীবন, তার শুরু মাতৃগর্ভে কিংবা তারও আগে হতে পারে। অনেকদিনের বিস্ময় ঠিক করে দিয়েছে কোনো এক জন্মদিন, প্রাণসঞ্চার হয় মাতৃজঠরে, কিংবা বলা যায় অন্ধকার জলাশয়ে ভেসে বেড়ানোর দিনগুলির কথা—আমি কিছুতেই স্পর্শ করতে পারি না তাকে। আমার অনুভবের সুদূরপ্রসারী যাত্রায় সে ধরা দেয় না। তরঙ্গমালায় ডুবতে ডুবতে ভাসতে ভাসতে জরায়ুর মুখ সংকেত দেয় সে আসছে। প্রাণসৃষ্টির এই প্রক্রিয়া কোনো দণ্ড পলে ভাগ করা যায় কি না আমার জানা নেই কারণ জন্মদিন বলে তখন কিছু থাকে না। প্রাণ সঞ্চারের মুহূর্তটিই যদি হয়ে ওঠে জন্মকাল! এবং জন্মদিন বলে নির্ধারিত কোনো সত্যকে আর তখন স্বীকার করা যায় না।

বড়ো পিসিমার স্মৃতিতে ঠিক হয়ে আছে আমি জন্মেছি ১৩৩৭ সালের বাইশে কার্তিক। এক বিষণ্ণ বিকেলে গর্ভমোচনের প্রয়াস শুরু হয় এবং রাতের শেষ দিকে প্রসবীর মোচন ঘটে। সেই প্রলয়কালের সময়টাও অনুভবে কোনো দৃশ্য তৈরি করে না! প্রসবিনী এবং আমার সেই সংকটকালের বর্ণনা দেওয়াও আমার পক্ষে কঠিন—অথচ আমি জানি, জন্মলগ্নের সেই মুহূর্তগুলিই এক অবিনাশী উদ্ধার। এই বিশ্বে রাস্তা করে নেবার জন্য আমার দুই মুষ্ঠি, মাথা এবং গর্ভস্থ তরল পদার্থসমূহ প্রতিকূল জরায়ুপথকে সম্প্রসারিত করেছে। আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। জন্মের জন্য আমি মরিয়া হয়ে উঠছি। প্রলয় জলধি অতিক্রম করে এই মহাবিশ্বের শরিক হতে যাচ্ছি। কোনো নিগূঢ় ইচ্ছায়, অথবা অলৌকিক শক্তি আমাকে বের করে নিয়ে এল। আমি তখন এক মানব এই বিশ্বমাঝারে। বোধ অথবা অসহায়তার সেই মুহূর্তগুলো[illegible] স্পর্শ করতে পারিনি। এই বিশ্বের সব একাকিত্বের [illegible] জন্মলগ্নেই অস্তিত্বের এই সংকট তৈরি হয়ে আছে।

শৈশবেই [illegible] জেঠিমা দ্বারপ্রান্তে বসেছিলেন পাহারায়। ধাইমা

বলছিলেন. ভালো বুঝছি না বড়ো বউঠান।

ঘরে আগুন। কাঠের আগুন জ্বালিয়ে পরিশুদ্ধ করে নেওয়া হয়েছে। রাণাদা মাথায় বড়ো বড়ো কাষ্ঠখন্ড রেখে গেছেন। হেমন্তের শেষ বেলায় এই জন্মের প্রয়াস শুরু, পাটকাঠির বেড়ায় তৈরি কুঁড়েঘরটায় বেতপাতা গুঁজে দেওয়া হয়েছিল। আত্মীয়স্বজনেরও ভিড় কম না।

একসময় না পেরে ধাইমা টানাটানি করতে গেলে জ্যেঠিমা ধমক দিয়েছিলেন, তুই এটা কি করছিস বউ। সে তার নিজের পথ নিজেই করে নেবে। মাকে বলেছিলেন, ঠাকুরকে ডাক—ধৈর্য ধর। এই বিপদে তিনি ছাড়া আর কে আছেন!

এসব আমার শোনা কথা। বড়ো হয়ে মা-জ্যেঠির কাছেই শুনেছি। এ জীবন, এক জীবন শুধু, জন্মের আগে থেকে তার ভ্রূণ এবং ভ্রূণের সৃষ্টি এবং বড়ো হওয়া এক প্রলয়ংকর ঘটনা—সেই প্রায় বিগ ব্যাঙের মতো ধুলিধূসরিত দিকচক্রবাল, মহাসমারোহে ভাঙচুরের মধ্যে ভ্রূণের সৃষ্টি এবং প্রাণের সাড়া আসছে—জননীর রক্তপ্রবাহ থেকে কিংবা জরায়ুর সেই জলধি থেকেও হতে পারে—সেদিনই প্রকৃত জন্মের দিন। তারপর ভ্রূণ বাড়ে দিনে দিনে। এজন্য মানুষের লোক-দেখানো জন্মদিনে আমার বিশ্বাস নেই। আমার আসল জন্মসময়ের সাক্ষী কেউ নেই। একমাত্র অমোঘ নিয়তির মধ্যেই তার ব্যাখ্যা হয়তো মেলে। আমার ভিতরে সেই প্রাণসৃষ্টির সাক্ষী একমাত্র সেই হতে পারে। ১৩৩৭ সালের কার্তিক মাসর ২২ তারিখের মধ্যরাতে যে জন্মায়, সে তো আসলে সেদিন মাতৃজঠরের বন্ধন থেকে মুক্ত হয় মাত্র। সুতরাং আমার কোনো সঠিক জন্মদিনের কথা যখন জানা নেই, তাকে ঘটা করে পালনেরও হ্যাপা নেই।

মিথ্যা জন্মসময় নিয়ে এই যে আহ্লাদিপনা—কিছুটা যে নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো তাও বুঝি। এবং জন্মসময়ের কাচরা অর্থাৎ রক্তজল কিংবা নাড়ি অর্থাৎ শরীরের সেই বাড়তি এবং পরিত্যক্ত বস্তুসমূহ আমার প্রিয় কামরাঙা গাছটার নীচে প্রোথিত আছে শুনেছি। আমার ঠাকুরদা, বংশের এক-একটি জন্মের সঙ্গে এক একটি গাছের নির্বন্ধ যুক্ত করে গেছেন।

বংশের এই রীতিই যে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বাড়িতে বৃক্ষসকলের রমরমা, যেমন পুকুরপাড় ঘিরেই কত মহিরুহ, আম জাম জামরুল তেঁতুল কড়ুই গাছ এবং অর্জুন গাছ। এমনকি অসংখ্য রসুনগোটার গাছও দেখা যায়। পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহ এবং অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের আমল থেকেই এই রীতিটা কাজ করে আসছে বলে বাড়িটায় গাছপালার আধিক্য কিছুটা বেশিমাত্রায়।

গাছ রোপণের হেতুটি এই পরিবারের প্রায় বিধিলিপির মতো—এমনকি খেরোখাতায় কার জন্মের সময় কোন্ গাছ রোপণ করা হয় তারও একটি খাতা ছিল শুনেছি। তবে আমি দেখিনি। আমার চার ঠাকুরদা, মহিমচন্দ্র ভৌমিক, দীননাথ ভৌমিক এবং রামচন্দ্র ভৌমিক এবং আরও একজন যিনি আমাদের সম্মান্দির বাড়িতে উত্তরের লপ্তে বসবাস করতেন। তিনি পৃথগন্ন হয়ে যাওয়ায়, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের ছিন্নতা প্রাপ্ত হয়। তাঁর পাঁচ পুত্র এবং দুই কন্যা—যে যাই হোক—কী সম্মান্দির বাড়িতে, কী রাইনাদির বাড়িতে আমাদের বাড়ি ভুঁইয়া বাড়ি বলেই নির্দিষ্ট হয়।

আমাদের পূর্বপুরুষ মণিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় বারো ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়া নবাব ঈশাখাঁর দেওয়ান প্রাপ্ত হলে তাঁকে ভুঁইয়া উপাধিতে ভূষিত করেন। মণিরাম সেই সূত্রে মহেশ্বরদি পরগণার একাংশের জায়গির লাভ করেন। মণিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শিবরাম—তাঁর পুত্র কাশীনাথ, তস্য পুত্র শিবনাথ, তারপর দ্বারিকানাথ। দ্বারিকানাথের চার পুত্র, আমার ঠাকুরদা তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র।

রাইনাদির বাড়িতে ঠাকুরদার ঘরটিতে একটি বংশলিপি ঝুলত। দেয়ালে না বলে থামে বলা ভালো। আমাদের বাড়ির চারভিটায় চারটি আটচালা। বিশাল টিন কাঠের ঘর। আরও সব ঘর বারবাড়ির উঠোনে, ভিতরবাড়ির উঠোনে এবং অন্দরের উঠোনে, নিরামিষ আমিষ ঘর সব। টিনের চালের নীচে কাঠের পাটাতন, এবং এতই বিশাল যে বাড়ির সেই ঘরগুলির পাটাতন নানা তৈজসে ভরতি—মোয়াভরতি টিন, মুড়ির চিঁড়ার টিন, নানা প্রকারের কাচের বয়ামে সুস্বাদু সব আচার। বড়ো বড়ো ট্রাংক থেকে ছোটো একটি লোহার সিন্দুকও আছে। ডাঁই করা বিছানাপত্তর, আত্মীয়স্বজনের আগমনে সেইসব নামিয়ে দেওয়া হত। এমনকি ইজিচেয়ারও ছিল একটা। বিশাল ট্রাংকে যে যাঁর স্বর্ণালংকার থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এমনকি ঠিকুজিকুষ্ঠি, শাড়ি শায়া ব্লাউজ, চারঘরের মাথায় এইসব পাটাতনে, থরে থরে সাজানো থাকত বাড়ির অমূল্য সব সম্পদ।

দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে দেশত্যাগ, বাড়ি ঘর বিক্রি হয়ে যাওয়ায় যে যা পারল নিয়ে এল, আমাদের মা জেঠিমার প্রাণ এবং সম্মান রক্ষার্থে কোনোরকমে গয়না নৌকায় উঠে পড়াই দেশভাগের সম্মানজনক শর্ত। এভাবে এক বিতিকিচ্চিরি অবস্থায় কী পড়ে থাকল, কী নেওয়া গেল না তার কোনোই হিসাব রইল না। এভাবে মা আমার ঠিকুজিকুষ্ঠিও হারালেন—১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের পর আমার বাবা-কাকারা এবং সোনাজ্যাঠামশাই মাথায় হাত দিয়ে বসেই থাকলেন। দু-হপ্তা

পর সোনাজ্যাঠামশাই প্রবাস থেকে ফিরে এসে একদিনের নোটিশে বিক্রিবাটা শুরু করে দিলেন, জলের দামে জমি, জলের দামে ঘরবাড়ি, এবং এভাবে অর্থসংগ্রহ করে স্বাধীনতার প্রথম লপ্তে বাড়ির প্রায় সকলকেই গয়নানৌকায় তুলে দেওয়া গেল—আমার এবং বড়দার টেস্ট পরীক্ষা বাকি, ঠিক হল, টেস্ট পরীক্ষা পর্যন্ত সম্মান্দির বাড়িতেই আমরা থাকি। সেখানে এক ঠাকুমা, এক পিসি, আমি আর বড়দাও সেখানে থাকি, সম্মান্দি থেকে পানাম স্কুলে যাই—কিন্তু সব ছত্রখান হয়ে যাওয়ায় আমাদের পরীক্ষা পর্যন্ত মুড়াপাড়ায় জমিদারবাড়িতে জ্যাঠামশাই, সম্মান্দির বাড়িতে আমি, বড়দা, ধনঠাকুমা, সন্ধ্যাপিসি, আর ঈদা (ঈদা-দা বাড়ির চাষবাস দেখত), ঈদা-দার তত্ত্বাবধানে আমরা আছি। টেস্ট পরীক্ষার পর আমি একাই বহরমপুরের উদ্দেশে রওনা হই। ঈদা-দা নারানগঞ্জে আমাকে স্টিমারে তুলে দিয়ে যান। তাহলে বোঝাই যায় আমার প্রবেশিকা পরীক্ষার ফর্ম পূরণ করেন মুড়াপাড়ার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। এবং তখনই আমার জ্যাঠামশাইয়ের আদরের ভাইপোটির জন্মদিন ঠিক হয়। প্রশ্ন: আপনার ভাইপোদের জন্ম তারিখ কবে? জ্যাঠামশাই চোখ বুজে নাকি বলেছিলেন, আরে সেদিন তো হল, কত হবে। চোদ্দো, পনেরো। লিখে দেন চোদ্দো।

জন্মসাল কাগজেকলমে নির্ধারিত হয়ে গেল, ১৪ বছরের হিসাবে ১ মার্চ, ১৯৩৪। খাতাকলমে কিংবা পরিচয়পত্রে, সর্বত্র এই দিনটির উল্লেখ এখনও থাকে।

আমার বাপ জ্যাঠারা ছয় ভাই দুই বোন।

আমরা পাঁচ ভাই তিন বোন। অবশ্য এক বোন এবং এক ভাই জন্মের কিছু-কালের মধ্যেই মারা যায়। বাবা অভিমন্যু ভৌমিক তখনও ভৌমিকই আছেন। বংশের উপাধি বিসর্জন দিতে নারাজ। আমার পূর্বপুরুষ মণিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় যতটা আগ্রহে ভুঁইয়া উপাধি গ্রহণ করেছিলেন, ঠিক ততটা আগ্রহেই দেশ ভাগের সঙ্গে সঙ্গে জ্যাঠামশাই ফর্ম পূরণের সময়েই অতীন্দ্রশেখর ভৌমিকের জায়গায় অতীন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় করে দিলেন। অবশ্য আমার উদাসী বাবার এতে কিছু যায় আসে না। তিনিও মুড়াপাড়ার নবকুমারবাবুর জমিদারিতে আদায়পত্রের কাজ করতেন। ছোটো ঠাকুরদা রামচন্দ্র ভৌমিকও ছিলেন সেই জমিদারবাড়ির একান্ত আপনজন। তিনিই শুনেছি দুই ভাইপো অর্থাৎ সোনাজ্যাঠামশাই উপেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক এবং বাবাকে মুড়াপাড়ার জমিদারবাড়িতে কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

বাবার মধ্যে একটু বেশি মাত্রায় ঈশ্বর ঈশ্বর ভাব ছিল। অবসর পেলে তিনি জমিদারদের স্থাপিত আনন্দময়ী কালীবাড়িতে গিয়ে বসে থাকতেন। এবং রাতে

পূজার প্রসাদ-সহ কারণবারি পেলে তাঁর আনন্দের আর শেষ থাকত না। তাঁর আটটি সন্তানের কথা বললে বলতেন, ওরে ওরা আমার না। আমি কে? ওরা সব মা আনন্দময়ীর সন্তান। সব ঈশ্বরের কৃপা।

সেই বাবাকে একবার আমার জন্মসাল নিয়ে প্রশ্ন করলে, বললেন, সব কি মনে থাকে! তবে তোমার জন্মের বছরে খুব ধান হয়েছিল। জমিতে মা লক্ষ্মী উপুর করে দিয়েছিলেন রাশি রাশি ধান। তোমার ঠিকুজিকুষ্ঠি তো করা ছিল, সব তো দেশভাগে তছনছ।

ধান দিয়ে তো বছর গণনা করা যায় না—জন্মদিনও না। আমার জন্মদিন সোনাজ্যাঠামশাই যা লিখে গেছেন, তাই চালিয়ে যাচ্ছি। বড়ো জ্যাঠামশাই পাগল, সোনাজ্যাঠামশাই অভিভাবক। তাঁর কথা ফেলি কি করে। বাবা চরম মা-ভক্ত। এবং দায়িত্বশীল মানুষ তো ওই একজনই অর্থাৎ আমার সোনাজ্যাঠামশাই! জন্মদিন বদলে দিয়ে তাকে ছোটো করতে খারাপ লাগে।

বানান অপরিবর্তিত।

নিজের লেখা

ঈশ্বরের সন্ধানে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

এ-ভাবে বিশাল এক প্রান্তরের সামনে আমরা কখনও না কখনও দাঁড়িয়ে যাই। গাছপালা বৃক্ষের মতো বড় হই। জীবন বয়ে যায় এবং এক শীতের সকালের কথা তখন মনে পড়ে। বাবা ডাকছিলেন, ওঠ যেতে হবে। যেতে হবে, কোথায় কি-ভাবে জানি না। তবু যেতে হবে। সকালে শীতের মাঠে বাবা আমার হাত ধরে হাঁটছিলেন। আত্মীয়ের বাড়ি আমায় রেখে আসতে যাচ্ছেন। সেই শীতের সকালে সারা রাস্তায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গল্প করতে করতে যাচ্ছিলেন বাবা। কত সব কথা, কখনও সেই দামোদর নদ পার হবার কথা, কখনও ল্যাম্প-পোস্টের নিচে এক বালকের ছবি। বিদ্যাভ্যাসের একাগ্রতা সম্পর্কে কিছু কথা, তখন হয়তো একটা সাঁকো পার হয়ে যাচ্ছি। হয়তো কোথাও দরগা পড়েছে—বাবা বলেছেন, আয় একটু বসে নি। জল খাবি? দরগার ছায়ায় বসে মুড়ি পাটালি গুড় খেতে খেতে সহসা অবাক হয়ে গেছেন, কি রে খাচ্ছিস না! খা বাবা। আর বেশি দূর না। ওরা তোকে বেশ আদর-যত্ন করবে। ভালবাসবে। স্কুলটা কাছে, তাই দিয়ে আসছি। বাবা কষ্ট পাবে ভেবে আবার খেতে গেলেই গলায় আটকে যাচ্ছে। —দাঁড়া জল নিয়ে আসছি। তারপর বাবা পুঁটুলি মাথায় দিয়ে কিছুক্ষণ গাছের নিচে শুয়েছিলেন। রাস্তাটা বাবারও বুঝি এক সময় মনে হয়েছিল সত্যি দীর্ঘ। বাবা নিজেই যেন সান্ত্বনা পাবার মতো বলেছেন, ভগবতী দেবী, বীরসিংহ গ্রাম। ক্রমে সূর্য মাথার ওপরে হেলে গেছে। বলেছেন, সেই এঁড়ে বাছুরের কথা অথবা কখনও ঝড় এবং আশঙ্কার ভেতর একজন মানুষের বড় হওয়ার কথা। সেই শীতের বিকেলে বিদ্যাসাগর মশাই বাদে বাবার বুঝি আর কোনো সান্ত্বনা ছিল না। জীবনের বিড়ম্বনা কি যে গভীরে বাজে। বিকেল, শীতের মাঠ, দরগা, বাবার সঙ্গে হেঁটে যাওয়া আগে আগে, চোখ বুজলে এখনও টের পাই।

সেই থেকে কেন জানি না, সুখে দুঃখে বিদ্যাসাগর মশাই আমার ভারি প্রিয় মানুষ। যখনই ফুটপাথে দিন কেটেছে, তিনি আমার পাশে ছিলেন। হাতের কাছে বেঁচে থাকার মতো কোনো অবলম্বন পাচ্ছি না, জানি তিনি আছেন। চারপাশের প্রাচুর্য আমাকে বিদ্রুপ করছে—তিনি স্থির নিশ্চিন্ত গলায় বলছেন, হাঁটো। ভেঙ্গে

সব তছনছ করে দিতে ইচ্ছে হয়েছে, বলেছেন বাঁচো, বাঁচতে দাও। সংসারে এ-ভাবে বাঁচো, বাঁচতে দাও, বেঁচে থাকার চেয়ে বড় কি আর আছে। মরে যাওয়ার কথা আমায় ভাবায় না। নিতান্ত জৈব ঘটনা বলে মৃত্যু সম্পর্কে কোনো আমার অধীরতা নেই। কাব্য সুষমায় তাকে ভরে দিতে মন চায় না। এবং এটাই আমাকে জীবনে সামান্য অধার্মিক করে রেখেছে। জীবনের যাবতীয় অভিজ্ঞতা, ঈশ্বর এবং শয়তানের নিকট-অস্তিত্ব বার বার প্রমাণ করেছে। কখনও এরা দুই প্রতিপক্ষ, আবার কখনও সহকারী, বেশ মানুষের ওপর জাঁকিয়ে বসে আছে। এই সব ভাবনা আমাকে নিরন্তর দগ্ধায়। ঈশ্বর তাঁর সংসারে কত যে গণ্ডি এঁকে দিচ্ছেন, কত যে বিধিনিষেধ এবং ক্রমে এক খণ্ড-বলয় নির্মাণে, মানুষ নামক জীবটি ভারি অকিঞ্চিৎকর তার কাছে। মানুষের তৈরি এই ঈশ্বর যখন আমাকে নানাভাবে বিভ্রমের ভেতর ফেলে দেয়, তখনও আমার পাশে থাকেন চটি জুতো পরা আসল মানুষ। আমার কোনো দুঃখ থাকে না। অভাব থাকে না। গ্রহান্তরে মানুষের যাত্রাকে সহজেই অভিবাদন জানাতে পারি। আবার কোনো দূরবর্তী মাঠে তখন দেখি এক বালক শীতের রাতে মাঠ পার হয়ে যাচ্ছে। তাকে অতিক্রম করতে হবে একটা বড় সড়ক। এবং কারবালার মাঠ। অদূরেই আছে তার কুটীর, হাতে তার মশালের মতো জ্বলছে পাটকাঠির আগুন। সামনের সব অন্ধকার ফুঁড়ে সে চলে যাচ্ছে। কুটীরে আছে অসুস্থা জননী। সে ফিরে গেলে ওষুধ এবং পথ্য দুইই মিলবে। প্রায় মহাকাশ যাত্রার মতোই মনে হয় নিশীথের এই বালককে, কোথাও কেউ কম না বেশি না। সবাই অমৃত বহন করে নিয়ে যাচ্ছে।

আসলে সব কিছুই একজন মানুষ তার জীবনযাপনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে পেয়ে থাকে। এবং মানসিকতা নির্মাণে সেই পরিমণ্ডল তাকে নানাভাবে সাহায্য করে। যেমন আমার বাবার অতি সরলীকরণ ধার্মিক জীবন সংসারে সব সময় ছিল অবিমৃষ্যকারিতার সামিল। ধর্মের নামে এমন নিরালম্ব বলি হওয়া জীবনে আর কখনও প্রত্যক্ষ করিনি। মানুষটার জীবনে কিছু বৃক্ষরোপণ, তাদের সেবা শুশ্রূষা ছাড়া আর কিছু করণীয় আছে দেখে মনে হত না। দেশভাগের পর বাবার সহসা এই ঈশ্বরপ্রীতির কারণ মা বুঝতে পারতেন। শেকড়বাকড়হীন মানুষের সবই ভাগ্যে লেখা থাকে।

'ভাগ্যে উপোস থাকলেও লেখা থাকে বুঝি।' ঈশ্বরের প্রতি মার এমন কটাক্ষ বাবাকে ভীষণ মর্মাহত করত। কিছুক্ষণ তাকিয়ে মাকে দেখতেন। তারপর বলতেন, 'ও'র ইচ্ছেয় সব হয়। অধীর হলে চলে না। আমরা সংসারী মানুষ, তাঁর মহিমার কতটুকু বুঝি।' আসলে বাবা হাতের কাছে আর কোনো সহজ অবলম্বন পাচ্ছিলেন

না। যৎসামান্য অর্থ বিক্রিবাটা শেষে নিয়ে এসেছিলেন। বড় তাড়াতাড়ি সব শেষ। সামান্য জমি, আর আবাস নির্মাণেই ফতুর হয়ে গেল সব। তারপর বিধিলিপি। বাবার এই বিধিলিপির পরীক্ষানিরীক্ষা আমাদের রক্তমাংসে মজ্জায় অবলীলায় ঢালাঢালি চলছিল। যত ঢালাঢালি চলছিল তত আমরা ক্ষীণকায় হয়ে যেতে থাকলাম। বাবা শেকড়-বাকড় ওপড়ানো একটা গাছের মতো সংসারে বাড়তি মানুষ হয়ে যেতে থাকলেন। যত বাড়তি মানুষ হয়ে যাচ্ছিলেন, তত তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাস প্রবল হয়ে উঠেছিল। মা যখন অভাব সহ্য করতে পারতেন না, অনাহার সহ্য করতে পারতেন না, তখনই বলতেন 'কতদূর তোমার ঈশ্বর! একবার দেখে এলে হত!'

কেন জানি মার সঙ্গে আমারও ঈশ্বরের খোঁজে যাবার ইচ্ছে হয়েছিল। এবং সংসারে বাবার হাবভাব দেখে টের পেলাম, উড়ে যাওয়াই ভাল। ডানা ওড়ার পক্ষে যথেষ্ট শক্ত না হলেও দু-চার বছর বাদে ঠিক হয়ে যাবে। একটু এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে দেখা যাক। বাবার ঈশ্বরকে যদি পাওয়াই যায়, মুফতে কিছু লুটেও নেওয়া যাবে। বলা যাবে, ঈশ্বর, আপনি আর বেশি কি দেবেন, সামান্য উত্তাপ এবং আমাদের ছোট সংসারের জন্য একটা ভাঁড়-টাড় দিয়ে দিন। শুধু উপুড় করলে দু-মুঠো অন্ন যেন পড়ে।

বাবার ঈশ্বরের খোঁজে বাড়ি থেকে প্রথমবার নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার তারিখ সঠিক মনে করতে পারছি না। বোধ হয় উনপঞ্চাশ সালের মে মাস-টাস হবে। মনে পড়ছে, এলাহাবাদে তখন দারুণ গ্রীষ্মকাল। পিচ গলে ফলে ভাপ উঠছিল। আমার খালি পা, হাফ-প্যান্ট, হাফ-শার্ট গায়। দুপুরের পিচগলা রাস্তায় হাঁটতে বেশ মজা লাগছিল। না, রাস্তায় বেশি লোকজন ছিল না। দুটো একটা রিকশ, বাস-টাস তো তেমন তখন চোখে পড়েনি, মতিলাল রোড বোধ হয় রাস্তার নাম হবে—বেশ উৎফুল্ল হওয়া গেছিল। রাস্তায় প্রায় একজন ক্লাউনের মতো আমাকে দেখাচ্ছিল। বাড়িগুলোর দরজা জানালা সব বন্ধ। শুধু আনন্দ ভবনের গেট খোলা ছিল। ফোয়ারা ছিল, ফোয়ারার জল বেশ মিষ্টি, পেট ভরে খাওয়া গেল। বোধ হয় কেয়ারটেকার মানুষটি আমার কথা শুনে আঁতকে উঠেছিল। তবে দয়া করে বের করে দেয়নি এই যা রক্ষে। সে দক্ষিণের চাতালে আমাকে শুয়ে থাকতেও বলেছিল। সন্ধ্যার আগে বের হলে ভাল হবে না আমার, এমন ভয়-টয়ের কথাও বলেছে। শেষে আমাকে খুব কৃপা করে জানাল, ঈশ্বর এখানে থাকেন না। অনেক দূরে; নাগাল পাওয়া যায় না। ভক্তিমার্গের কোনো সোপান-টোপানের কথা হয়তো বলে থাকবে, এখন আর তা মনে করতে পারছি না। আসলে ওর কোনো কথাই স্পষ্ট বুঝতে পারিনি। একজন বাঙালকে হিন্দি ভাষা রপ্ত করাতে গেলে যা হয়।

কপালগুণে ঈশ্বরের খোঁজে সোজা ফের হাওড়ায় ফিরে এলাম। জীবনকে বেশ উপভোগ করা যাচ্ছিল। বরং বলা যায় মজা। বেথরের কাছে এক তাঁতি পরিবারের সামান্য ফুটফরমাস কাজের বিনিময়ে আহার। বর্ধমানের কথা মনে পড়ছে। ঘুরে ঘুরে মল্লিক ভিলার রোয়াকে রাত কাটাব ভেবে বসে আছি। নিচের নালা থেকে পঙ্গপালের মতো মশারা আক্রমণের জন্য উড়ে আসছে। মনে হচ্ছিল, দু-চার রাত এ-ভাবে থাকলে, যা সামান্য অবশিষ্ট আছে তাও উবে যাবে। তবু একটু ঘুম দরকার। সকালে উঠে হয়ত দেখব মশারা আমার সবটাই হাওয়া করে দিয়েছে, তবু ঘুমানো দরকার। পক্ষকাল বাড়ি ছাড়া, কোথায় এলাহাবাদ কোথায় বেথর কোথায় বর্ধমান—একদম দাঁড়াতে পারছিলাম না। ঈশ্বরের মতো যথার্থ একজন মানুষ তখনই সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, ছেলে, তোমার তো সাহস কম না। এখানে শুয়ে আছ!

সব শুনলেন। শুনে বললেন, এস। মল্লিক ভিলায় ঢুকতেই বাঁ দিকে গ্যারেজের মতো একটা ঘর। একটা খাটিয়া। উঠোনে পেয়ারাগাছ। ঘরে তাঁর কিছু জামাকাপড় লুঙ্গি। তিনি সামান্য সাবান দিয়ে বললেন, স্নানটান করার অভ্যাস আজকাল একদম বুঝি নেই। গন্ধ-টন্ধ কিছু পাও না। ভালোমানুষের মতো তাকিয়ে থাকলে বললেন, যাও, সামনে গুরুদুয়ারী আছে, ওখান থেকে স্নান করে এস।

তারপর পাঁড়েজির হোটেলে পেট ভরে ভাত। বললেন, খাও। কত সময় নিয়ে খেয়েছিলাম জানি না, তিনি দাঁড়িয়ে থেকে আমার হা-ভাতের মতো গলা অবধি খাওয়া দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ফিরে এসে বললেন, আমি কিন্তু ছেলে জাতে মুসলমান, অসুবিধে হলে বল।

এভাবেই এ-দেশে এসে জীবন শুরু। একজন ছন্নছাড়া তরুণ সামান্য আশ্রয়ের খোঁজে, আহার এবং উত্তাপের নিমিত্ত ঘুরে বেড়িয়েছে গাঁয়ে গঞ্জে কখনও শহরে। বিচিত্র সব মানুষের সংস্পর্শে তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ভরে যেতে থাকল। তার ঈশ্বর অনুসন্ধানের পালা তখনও চলছে। কখনও আলমবাজার জুট মিলে ফুরনে তাঁতের কাজ, কখনও বরানগর থেকে বড়বাজারের চা-স্টলে, গঙ্গার তীরে তীরে ধূপবাতি বিক্রি, কখনও বোম্বাই শহরে তিলক ব্রীজের নিচে শুয়ে রাত যাপন। কতদূর, কোথায় যে ঈশ্বর থাকেন সে বুঝতে পারছে না। বাড়ি ফিরে সে হতাশ গলায় বলছে, না বাবা আপনার ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাবা তাকে বলতেন, অধীর হলে চলে না। সময় হলেই হয়ে যাবে।

ইতিমধ্যে দুটো পাসও দিয়ে ফেলেছি। ১৯৫২ সালে আবার কিছুদিনের জন্য নিরুদ্দিষ্ট হওয়া গেল। কারণ সংসারে বাতব্যাধির মতো দুর্ভোগ লেগেই আছে।

নানা ছলছুতোয় শেষ পর্যন্ত বের করা গেল একটা আস্তানা। হালিশহরে ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার্স ফোর্সে যোগদান। ট্রেনিং শেষ করে সমুদ্রে চলে গেলাম। জাহাজে সামান্য কোলবয়ের চাকরি। এবং প্রায় পৃথিবী বলতে যা বোঝায়, প্রায় বৃত্তাকারে আছে যে পৃথিবী, যার তিন ভাগ জল এবং এক ভাগ স্থল, এক ভাঙ্গা জাহাজে উঠে ঘুরে ফিরে দেখা গেল। কখনও দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জমালায়, তাহিতি এবং সব মহাদেশের উপকূলে উপকূলে, কখনও নীল জলরাশির ভেতর সেই সব নিঃসঙ্গ পাখিদের দেখতে দেখতে সময় বয়ে যাচ্ছিল। সুদূর নিও-জিল্যান্ডের নিউ-প্লাইমাউথ বন্দরে ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে অদূরে এগমন্ট হিলের চূড়োয় দেখেছি সূর্যোদয়—কৌরি-পাইনের বনভূমিতে হেঁটে গেছি। আফ্রিকার উপকূলে কখনও নিগ্রো যুবতীর ঘরে আহার, কখনও মেলবোর্ন শহরে রাতের পর রাত মত্ত অবস্থায় দিন কেটেছে। সব মহাদেশ, জলরাশি, তিমি মাছের ঝাঁক; কোনো অ্যালবাট্রসের দীর্ঘদিন জাহাজ অনুসরণ করে আসা, অথবা সব ডলফিনের ঝাঁক অনন্ত আকাশের নিচে—জীবন বয়ে যাচ্ছে এভাবে। পৃথিবী, জীবন, ঈশ্বর পাশাপাশি আছে বুঝতে পারলাম। জীবন না থাকলে ঈশ্বর থাকে না। এবং দেশে ফেরার পথে এক রাতে স্বপ্নে মনে হল সত্যি তাঁকে হাতের মুঠোয় ধরে ফেলেছি—আহার বাসস্থান এবং উত্তাপই আমার ঈশ্বর। তাঁকে কব্জা করতে পেরে সে-রাতে তুমুল তোগলকী নাচ ফোকসালে। সহসা ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠে এভাবে নাচ, নাচছি তো নাচছিই। সহকর্মীরা ভাবছে, পাগল হয়ে গেল বুঝি ছোঁড়াটা। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি। মায় কাপ্তান পর্যন্ত পড়িমরি করে নেমে আসছেন—তখন প্রায় করজোড়ে জিভ কেটে ফেললাম। বললাম, পুলক জেগেছিল। সারেঙ ভীষণ ভালবাসত আমাকে। বললেন, জাহাজ বড় খারাপ জায়গা। যখন তখন এত পুলক ভাল না। এখন ঘুমোও। সকাল হলে যত পুলক দেখিও।

এভাবে যাচ্ছে বাবার নামে মাসোহারা। অর্থ সঞ্চিত হচ্ছে কোম্পানীর ঘরে। জাহাজ থেকে নেমে যখন এবারে বাড়ি ফিরব, মার জন্য শীতের কম্বল, ছোট ভাইবোনের জন্য উলের জামাকাপড়, বাবার জন্য কি যে নি! বাবার জন্য এক জোড়া জুতো। আমার ঈশ্বর এঁরা। অনেকদিন পর সত্যি যা হোক একটা ঈশ্বরের ঠিকানা সংগ্রহ করা গেল। পৃথিবীতে যথার্থ ঈশ্বরেরা আমার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। এই তোমার ঈশ্বর সন্ধান। এত পলকা তার ভিত। অসম্মান ভেবে ওঁরা সব মুখ গোমড়া করে ফেলল। যেন বলল, তুমি ধর্মবিমুখ, তুমি পাতক।

সংসারে এভাবে বুঝি আমি একজন পতিত মানুষ হয়ে গেলাম। জীবন ব্যতিরেকে আমার কিছু জানা থাকে না। সব পাপপুণ্যের ভার সেই বায়ুভূত নিরাশ্রয়ের

ওপর অর্পণ করে ঢাক বাজাতে পারি না। মানুষই মানুষের বিধাতা। তুমি কেউ নও। তোমার নির্মাণ আদিতে অজ্ঞতা থেকে, মৃত্যুভয় থেকে। স্বার্থপর মানুষ তোমাকে ভাঙ্গিয়ে যে যার সুখ ঘরে তুলছে। সরল মানুষেরা বিনিময়ে বিধিলিপি কপালে লিখে শুয়ে থাকে। ভেব না দিন এভাবে যাবে। সময় ঠিক তাদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেবে।

ভূতের মতো তুমি অসময়ে ভয় দেখাও, খুব সাহস! একা হয়ে যাবি, নিঃস্ব হয়ে যাবি। পচে গলে মরবি। কিছু অবলম্বন থাকল না। আশ্রয়হীন তুই। আমি বলি, তবু আমি আছি, পরগাছার মতো তোমার ওপর ভর করতে রাজি না। তুমি বায়ুভূত নিরাশ্রয়, তোমার কাছে আমার কিছু চাইবার নেই। যদি পতিত হই, আমার জন্য হব, যদি বিজয়ী হই, আমার জন্য হব।

এবং এ-সব বিশ্বাসই নিয়ত আমাকে, আমার মানসিক পরিমণ্ডলকে গ্রাস করছে। কেন জানি মনে হয়, ভূতের ভয়ের মতো এই ঈশ্বরভীতি মানুষকে সাবালক হতে দেয় না। মানুষকে পঙ্গু করে রাখে। স্বাধীন চিন্তাভাবনায় বিভেদ ঘটায়। এ-প্রসঙ্গে 'কালের যাত্রা রূপক মাত্র' গল্পটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেখানে নার্স বলছে, সতেরো নম্বর মরছে, সেখানে সূপর্ণ বলছে, মরছে নয়, কালের যাত্রা অতিক্রম করছে। মরার কথা এলেই মানুষের ঈশ্বরের সঙ্গে সহমরণের কথা মনে হয়। সহমরণে যেতে ইচ্ছে হয়।

এবং এভাবে যখন কালের যাত্রা অতিক্রম করাই জীবনের ধর্ম, সে যে কোনো গ্রহে, কোনো নক্ষত্রলোকের পরপারে এবং একটা পিঁপড়ের যখন ঈশ্বর থাকে না, তবু সে বাঁচে এবং মরে, আহার মৈথুন সব প্রক্রিয়াই যখন তার সামর্থের ভেতর তখন মানুষের ঈশ্বর, ভাগ্য বিধিলিপি অবোধ হঠকারিতা ছাড়া কেন যে ভাবতে পারি না। বার বার মনে হয় মানুষ নিজেই তার বিধাতা। অথচ ইতিহাস মানুষের স্বপক্ষে শুধু কৃতদাসের ভূমিকা পালন করে গেছে। সে সবার জন্য ভাবেনি, নিজের জন্য শুধু ভেবেছে। এবং মানুষে মানুষে এই ভেদ প্রজাতি হিস্যাবে ভারি দুর্বলতার সামিল। স্বার্থ, লোলুপতা মানুষের অদিমতম রিপু। নিয়মকানুন এবং শৃঙ্খলাবোধের সাহায্যে সে অনায়াসে এক ভালবাসার পৃথিবী তৈরী করতে পারে। সব মানুষের সমৃদ্ধি তার হাতের মুঠোয়। সে পারে সে সব পারে।

মানুষের প্রতি এই আত্মবিশ্বাসই আমাকে লেখায়। গল্প, উপন্যাসে, মানুষের প্রতি এই বিশ্বাসই আমাকে নতুন ভূমি তৈরি করতে সাহায্য করে। আর এভাবে পৃথিবীকে যদি একটা গ্রহ হিসেবে দেখি, তবে মানুষেরা কীটপতঙ্গের সামিল—অথচ তার বুদ্ধিবৃত্তি এবং মেধা সভ্যতার বিকাশ থেকে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যায় পৌঁছতে

সময় লেগেছে মাত্র কয়েক হাজার বছর। এরি মধ্যে আমরা কত সব ধর্মযুদ্ধের কথা জানি, কতসব সম্রাটের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়ে আছে এবং কতসব মহামারী দুর্ভিক্ষের সাক্ষী থেকেছে এই পৃথিবী অথবা সেই যে সভ্যতার বিস্তার, পামীর গ্রন্থি অথবা কোনো মালভূমি পার হয়ে এবং সে তার বিস্তার লাভের জন্য অন্য সভ্যতার নির্মম বিনাশ সাধনে মত্ত—নিরঙ্কুশ হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে, এত সব সত্ত্বেও দেখতে পাই মানুষের ভেতরই আছে বেঁচে থাকার টিকে থাকার এক আশ্চর্য কৌশল। তা বিনাশ করা যায় না। লুপ্ত হতে দেয় না—যা কিছু ভাল সে নিজের ভেতর গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। এতে ঈশ্বর নামক নিয়তিবাদের হাতের বিপুলতা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসে মানুষের শুভ বিবেকের কাছে। আর আমি যেহেতু তার উত্তরাধিকারের শরীক, ভালোমন্দের জটিল আবর্ত আমার ভেতরেও পাক খায়। এবং বসবাসের চারপাশটায় যখন দেখতে পাই লোভ লালসার এবং বিবেকের দ্বন্দ্বযুদ্ধ তখন যা সবার অথবা অধিকাংশের মঙ্গলসাধনের নিমিত্ত বিধান, তাকে গ্রহণ করতে মন চায়। লেখার বিষয়বস্তু নির্মাণে ভারি সহায়ক রূপে কাজ করে তারা।

কিছু ঘটনার কথা বলি। আমার কাজে যাবার পথটায় পড়ে রাজাবাজার অঞ্চলটা। শহরের সবচেয়ে নোংরা পূতি-গন্ধময় অঞ্চলটাকে ঈশ্বরের এমনই ইচ্ছা ভাবতে পারি না। রোজ দুবার যাওয়া আসার ভেতর বেয়াকুফের মতো কত সব মর্মান্তিক দৃশ্য যে দেখে ফেলি। প্রচণ্ড শীতের রাতে নগ্ন শীর্ণকায় ভিখিরী শুয়ে আছে ফুটপাথে। ভেতরটা কাঁটা দিয়ে ওঠে আমার। নিমেষে নিজেই শুয়ে থাকি যেন। শরীরে কিছু নেই, এক উলঙ্গ ভিখিরী। চারপাশে নগরীর উত্তাল নৃত্যমালার ঝুমঝুমি বাজে। কিছুই কানে আসে না। সামান্য উত্তাপের জন্য আমার দুটো হাত শক্ত হয়ে যায়। আগুন! আগুন! আগুন জ্বালাবার গল্পের হরিশ আমাকে তাড়া করে তখন। দু'লাফে নগরীর সব অট্টালিকা পার হয়ে এক শান্ত নির্জন বনভূমিতে এসে দাঁড়াই। পেছনে তাকিয়ে দেখি, সে নেই। কেমন নিঝুম নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজেকে। কষ্ট হয়। অনেক দূর থেকে কেউ যেন ডাকে, মতি, অ মতি, আছ নি! তিনদিন থেকে ভিজে ভিজে এখন একটু আগুন না হলে প্রাণ রাখা দায়। তখনই চোখের ওপর অন্ধকার সাঁকোতে লোকটাকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম—তার গায়ে তালিমারা জোব্বা। পিঠের দিকটা টুটা-ফাটা ভারতবর্ষের মানচিত্রের মতো এবং যা অন্য শীতের রাতে উত্তাপ দিতে সাহায্য করবে—সেই পরম প্রয়োজনীয় বস্তুটি—যা না হলে কাল রাতে অথবা পরশু রাতে সেও মতির মতো অস্থানে কুস্থানে মরে পড়ে থাকবে—শরীর থেকে খুলে সে মতির শরীর ঢেকে দিল। ছেঁড়া তালিমারা পাজামা খুলে মতিকে পরিয়ে

দিল—যেন সাদা থান কাপড় অথবা কফিনের মতো বস্তু; কারণ মতির কি জাত এবং কি ধর্ম সে এ-সময় আর ঠিক করতে পারছে না। কেবল তার এখন মতির চারপাশে ঘুরে ঘুরে নেত্য করতে ইচ্ছে হচ্ছে। নেত্য না করলে, ঘুরে ফিরে না নাচলে কুঁদলে হিমঠান্ডাতে তার শরীর বরফ হয়ে যাবে। সে মাথায় ডান হাত রেখে পাছায় বাঁ হাত রেখে কোমর দুলিয়ে মতির চারপাশে ঘুরে ফিরে নাচছিল আর গাইছিল—মাগো, তুই ভারতবর্ষ, টুটা-ফাটা তুর শরীর, (আমি মা) রেতের বেলা পোকামাকড় দিনের বেলা পাগলা হরিশ। (আগুন জ্বালাবার গল্প)।

অন্য এক শরৎকালে, আকাশ বেশ পরিচ্ছন্ন—কদিন একনাগাড়ে বৃষ্টিপাতের ফলে রাস্তাঘাট ভারি ঝকমকে। গাড়িগুলো ভেসে যাচ্ছে সব ইথারের ওপর দিয়ে যেন। জনগণেরা পূজো আসছে বলে কাচের ভেতর রকমারী দোকানী দেখতে পায়। মনে হয় সারা শহর সহসা স্বচ্ছলতায় উপচে পড়ছে। অথচ তখন দেবদারু গাছটার নিচে গরীব ফুটপাথবাসিনী মা বসে আছে এবং পাশে সাদা চাদরের নিচে তার সন্তান, মৃত।

কোনো দাতার দানের সাদা চাদর গায়ে সে শুয়ে আছে গাছের নিচে। দাফনের পয়সা নেই। করজোরে বসে আছে মা। জনগণেরা যে যার সাধ্যমত পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছে। অবিকল নক্ষত্রের মতো ভারি আলগা রসিকতা মনে হচ্ছে। সেই থেকে কতদিন যে আর ও-পথে হাঁটিনি। যেন গেলেই সেই ভয়াবহ হিমের মতো ঠান্ডা আমার শরীর বেয়ে হাড় ফুটো করে মজ্জায় ঢুকে যাবে। আমাকে অসাড় করে দেবে। যেন বলবে, কেন এমন হয়, এ-ভাবে আমি মরে যাই কেন। আমার কিছু থাকে না কেন! আমার ঘুম কেড়ে নেয় সে। আহারে এবং মৈথুনে অরুচি ধরে যায়।

এইসব সামাজিক কষ্টকর দৃশ্যাবলী আমাকে সারাক্ষণ ভীষণ অস্বস্তির ভেতর রাখে। গল্প উপন্যাসে ওরাই ফিরে আসে বার বার। লেখার সময় এই সব মুখ দেখতে পাই। 'যথাযথ মৃত্যু' গল্পের রিস্কাওয়ালা আলি, 'রাজা গোপালের আত্মচরিত' গল্পের গোপাল, 'কাল ভুজঙ্গ' গল্পের সোনামণি, সামান্য এক প্রাণ-পাখি শশীর মতো দানবের, যে আকালের ঘন্টা বাজাত, প্রাণ হরণ করে চলে গেল।

'এক হাত গন্ডারের ছবি', 'গ্রেট ক্যালকাটা শো', 'নরকে আগমন', 'মানুষের মামুলী কেচ্ছা', 'সাদা এম্বুলেন্স' এরা সবই এই সব অন্যায় হঠকারী সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে জীবনকে আরও সামান্য উলঙ্গ করে দেখার এক অস্বস্তিকর প্রতিক্রিয়া। মানুষের মাথার ওপরে ঈশ্বর আছে বলেই কত সহজে এই দৃশ্যাবলী, অসাম্য হজম করে আমরা বেঁচে থাকি। পচা পাঁকের উৎকট গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে গেলেও

টের পাই না হওয়া দুষিত হয়ে যাচ্ছে। তখনই আমি কোনো ধর্মবিমুখ মানুষের খোঁজে থাকি, একজন স্বাধীন মানুষের—বিবেক যে কারোর কাছে বিক্রি করে নিঃস্ব হয়ে যায় নি। গল্প উপন্যাসে এভাবে কোনো স্বাধীন মানুষের অন্বেষণই চালিয়ে যাচ্ছি, যে তার নিজের সুসময়, সময়মতো ঠিকঠাক করে নেবে। দেবদারু গাছটার নিচে দেখতে পাব কোন বালককে। সে মৃতও নয়, সাদা চাদরে তার শরীর ঢাকাও নয়। সে মাটি ফুঁড়ে উঠে এসেছে, হাসি হাসি মুখ। গাছের নিচে বসে ফুল বিক্রি করছে। বলছে, ফুল চাই ফুল। যত ফুল লাগে নিয়ে যান। ফুলের বয়স কখনও বাড়ে না।

বেঁচে থাকা টিকে থাকা মানুষের পক্ষে বড় জরুরী। সবাই মিলে বেঁচে থাকা টিকে থাকা আরও জরুরী। এই বেঁচে থাকা টিকে থাকার সমস্যাই আমাকে বেশি ভাবায়। মৃত্যুচিন্তা ভারী ভাবালুতা লাগে, বরং আমার মৃত্যুচিন্তা হিমঘরে তুলে রাখার মতো। জীবনের প্রচ্ছন্ন আলো এত বেশি উজ্জ্বল যে মৃত্যু-ভাবনা তাকে বিন্দুমাত্র গ্রাস করতে পারে না। 'শেষ দৃশ্য' উপন্যাসটির পটভূমি শ্মশান। যেখানে মৃত্যু দুহাতে বড় বড় থাবায় কেবল চিতার কাঠ সাজিয়ে যাচ্ছে—অথচ পাশেই তখন দেখি ঘাটোয়াড়িবাবু, নেলী গোমানী ডোম নিত্য জীবনের খেলায় আছে মেতে। জীবনের সুখ-দুঃখ উত্তাল তরঙ্গমালার মতো ভাসিয়ে নিচ্ছে মৃত্যুর থাবা, চিতার কাঠ, তখন বুঝি জীবন কত বড়। আসলে এই জীবনের জন্য আমরা, মৃত্যুর জন্য তার ভাবনা কম। এই বোধ আমাকে বার বার ঘর থেকে অদূরে অসীমে ঘুরিয়ে মারছে। যেখানে যখন গেছি, দেখেছি অজস্র মানুষ, তার শক্ত দু-হাত, বড় বড় সব ক্রেন, উঁচু স্কাই-স্ক্র্যাপার, অথবা কোনো নদীতটে ছোট্ট কুটীর, বুড়ো মানুষটি নিমগ্ন হয়ে আছে ফাঁতনার দিকে। কখন বঁড়শিতে মাছ আটকে যাবে—ভালো দেখতে পায় না চোখে তবু সে বসে আছে আলোয়, মাছ বঁড়শিতে ঠিক ভিড়ে যাবে একসময়। শিথিল দুহাতে শক্ত মুঠোয় ছিপের গোড়া চেপে বসে আছে। ছিপের গোড়া, না জীবন, ঠিক বোঝা যায় না। এবং এভাবে ঘুরে ফিরে দেখে সব কিছু প্রত্যয় জন্মালে বুঝি জীবনের সুচারু বিকাশই শিল্প ভাবনার ভিত্তিভূমি।

কিন্তু হায় জীবন তো ব্যাকরণ নয়। সে তো স্বেচ্ছাচারী, স্বৈরাচারী। তার তো স্বাধীনতা দু-হাতের তালুতে ব্রহ্মাণ্ডের মতো। সে তো পেলে প্রায় গোটা ব্রহ্মাণ্ড একা ভক্ষণ করতে চায়। সে সকালে ফুল ফোটাতে ভালোবাসে, বিকেলে নিজে আত্মহত্যা করতে চায়—আবার সেই কখনও শুনতে পায় সুদুর বিপুলের ডাক। এতসব সঙ্কট যখন তার জীবনে কৌতূহলী ভাঁড়ের মতো নেচে কুঁদে বেড়ায়, তখন কিছুটা ব্যাকরণ তবে কি কালের যাত্রা অতিক্রমের সময় মানতেই হয়। উপন্যাস

এবং গল্পে বার বার সেই ব্যাকরণ মেনে চলার চেষ্টা করেছি। সব ভুল ভ্রান্তির পর জীবনের সঠিক ঠিকানা খুঁজে পাওয়া দরকার। সঠিক ঠিকানা খুঁজে পেলে মানুষ দেখতে পায় সে নিজেই ঈশ্বর। তখনই সে বিবেকবান মানুষ। স্বাধীন মানুষ। যেহেতু দেশভাগ আমার ঘিলুতে করাত চালিয়েছে—টের পাই ধর্মান্ধতা কি বীভৎস। দাঙ্গার সময় সে বিপর্যয়কারী দানব, সে কখনও গলা টিপে হত্যা করতে চায় ভালবাসা। নির্মম। এবং নিরাভরণ এই জীবনে কখনও আবার সে ঈশ্বর হয়ে যেতে চায়। 'নগ্ন ঈশ্বর', 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', 'সমুদ্র মানুষ', 'অলৌকিক জলযান'-এ এমনি অনুসন্ধান এবং প্রচেষ্টার কথা আছে। 'নগ্ন ঈশ্বর' উপন্যাসে আছে এমনি তিনটি চরিত্র। তিনজন নাবিকের সমুদ্রযাত্রাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের পটভূমি বিস্তৃত। অথবা বলা যেতে পারে অবনীভূষণ, বিজন এবং সুমিত্র ভিন্ন ভিন্ন জাহাজে যাত্রা করেছিল—তারা কত বন্দর, কত অকূল সমুদ্র অতিক্রম করে কোনো দুর্বিপাকে একই জাহাজে ফের তাদের দেখা হয়ে যায়। প্রৌঢ় বয়সে সবাই এক ভয়ঙ্কর পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তুষার ঝড়ের ভেতর জাহাজটা ছিল নোঙর করা। দীর্ঘ সফরে ওরা ছিল অভুক্ত হিংস্র শ্বাপদের মতো। প্রৌঢ় বয়সের পাশবিকতার কাছে বড় ক্ষীণকায় ছিল সেই যুবতী। তারা যুবতীর শরীর ছিন্নভিন্ন করতে করতে কখন সবটাই আহার করে ফেলেছিল টের পায়নি। তুষার ঝড়ের ভেতর হিম ঠান্ডায় ফুলটি ঝরে পড়ল। তখনই যেন কে পেরেকে ঘিলুতে হাতুড়ী ঠুকে যায়—ওরা আর ঘুমোতে পারে না। বরফ ঘরে মৃত যুবতীর আস্তানা করে দেয়। সন্ধ্যায় ওরা ফুল কিনে নিয়ে আসে। গোপনে জাহাজের সেই খোলে হিম-ঠান্ডা ঘরে বসে বিগত জীবনের কিছু আলো এবং উৎসর্গের গান গায়। মৃত যুবতী শুয়ে থাকে। তখন আশ্চর্য অকপট ভালবাসা প্রাচীন নাবিকের চোখে মুখে। অকপট ভালবাসার জন্য হায় নাবিকেরা যুবতীকে কিছুতেই আর সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে পারে না।

জীবন এ-ভাবেই ঘুরে ফিরে কখনও না কখনও বিবেকবান মানুষের ঘরে ফিরে আসে। সে চায় পৃথিবী সুন্দর হোক, নির্মল হোক। কিছু কিছু বিধিনিষেধ গাছের চারপাশে বেড়ার মতো ভারি দরকার হয়ে পড়ে তখন।

আর সাহিত্যে প্রতিবন্ধকতা যদি কিছু থাকে সেও আমার এই নিরতিশয় শহরবিমুখ জীবন। আমার ত্রুটিবিচ্যুতির অক্ষমতার জন্য সেই দায়ী। এবং মনে হয় একটা বেয়াকুফের মতো কালের যাত্রা অতিক্রম করছি। মনে হয়, চরিত্রে কোথাও আমি একপেশে—প্রায় ধর্মান্ধতারই যা সামিল এবং বড় বিষয়কে ধরার অক্ষম অতি নৈতিকতা যখন চরিত্রকে চিবিয়ে খায়, তখন আক্রোশে ফেটে পড়ি। আরও সহজ হতে পারলে ভাল হয় এবং সবই কালের যাত্রা রূপক মাত্র ভাবলে

হয়। কিন্তু সংসার আমাকে ততটা সাধু হতে দেয় না। চারপাশের জীবনে অহরহ এত গোঁজামিল যে, কোথায় যে সত্য নিহিত দ্বিধায় পড়ে যাই। কোনো নির্জন প্রান্তরে খোলা আকাশের নিচে, সেই এক বাউলের গান তখন আমায় মত্ত রাখে—দে না ছেড়ে ভবপারে, শুধু ভেবে কি হবে! সেই যে ভবপার অথবা দে না ছেড়ে, ভেবে ভেবে কি হবে, যা ইচ্ছে হয়ে যাবে, তুমি আমি নিমিত্ত মাত্র এবং ঘুরে ফিরে এই সব প্রতিবন্ধকতা মনে হয় বুঝি ঈশ্বরই স্থির করে রেখেছেন সব। তখন হেরে যাই নিজের কাছে। নিজের কাছেই বিবেক বিক্রি করে বসে থাকি। তখন সাহিত্যে সুচারু বিন্যাস ভাবনা, সুন্দর গড়ার কথা মনে থাকে না। সব নৈরাশ্য আমাকে গ্রাস করে। বিশ্বাসে স্থির থাকতে পারি না। কোষে কোষে শিরা উপশিরায় কত সব ধন্দ এসে উঁকি মারে। দূরের রহস্যময় নক্ষত্রমণ্ডল জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়, প্রজ্ঞার কথা বলে, তখন আমার শিশুদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই—ঈশপ ফেবলের গল্প তারা সমস্বরে পড়ে যাচ্ছে। দু-হাত আর্তনাদের মতো আকাশে উত্থিত হয়, আমি কার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে। দূরের সেই অজ্ঞাত এক রহস্যময় যুবকের, না আগামী দিনের অনাগত জীবন প্রবাহের। আমার যা কিছু দে না ছেড়ে ভবপারে, ভেবে ভেবে কি হবে, না, জানালার যে সামান্য রংটুকুর জন্য বাড়িটা শেষ হচ্ছে না, তা শেষ করে যেতে হবে, কোনটা বেশি দরকার বুঝতে পারি না। সব লন্ডভন্ড হয়ে যায় কেমন। ভেতরে তখন এক ক্ষ্যাপা ফেরে, সে অদৃশ্য অস্পষ্টতায় ভুগছে। তার যন্ত্রণা অসীম। সে কখনও ক্রুদ্ধ, কখনও বিনয়ী, আর কখনও উদাস। মাঠের ভেতর একা যখন সে দাঁড়িয়ে থাকে, বুঝি পৃথিবীর সব মানুষের তাকে দেখে দুঃখ হয়। করুণা হয়।

আসলে এই অদৃশ্য অস্পষ্টতার অন্ধকারে আমি হেঁটে যাচ্ছি। চার পাশে কোলাহল। সংসারে দুঃখী মানুষেরা আমাকে নিয়ত তাড়া করছে। আমি তখন আর একা থাকছি না। সহস্র আমি, লক্ষ কোটি আমি নিরন্তর পাক খাচ্ছি একই কক্ষরেখায়। কখনও ফেলু সেখ, কখনও ঈশম, মণীন্দ্রনাথ, নিশি, নেলি, বনি, ছোটবাবু, স্যালি হিগিনস্ কত যে আমি রয়েছি আমারই নিজস্ব কক্ষে। এমনিভাবে অজস্র আমি যখন অদৃশ্য অস্পষ্টতার অন্ধকারে হেঁটে বেড়াচ্ছে আমার শিরা উপশিরায়, কোষে কোষে, তখন ভারি আত্মনিগ্রহে পড়ে যাই। কেউ যেন দূরবর্তী পাহাড় থেকে হাঁকছে—আহা লোকটা একা হয়ে যাচ্ছে। লোকটার জন্য কোন দৈববাণী হোক না—অদৃশ্য অস্পষ্টতার অন্ধকার ভেদ করে আলো দেখতে পাক, তখনই যেন সব ভেতরের আমিরা মোহগ্রস্ত হয়ে যায়—আর আমার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। আর তখনই দেখতে পাই, সামনের আঁধার জ্বলছে দাউ দাউ করে।

দুঃখী বালকটি শীতের রাতে মার জন্য ওষুধ এবং পথ্য নিয়ে যাচ্ছে। ভারি সাহসী হয়ে যাই ফের।

এই মানসিক সাহসটুকু আমাকে সেই অদৃশ্য অস্পষ্টতার অন্ধকার থেকে আজও রক্ষা করে আসছে। আর এই দেশভাগ আমার ঘিলুতে যত করাত চালিয়েছে, বার বার বাবার কথা তত মনে আসে। এ-সব গুহ্য ঐশ্বরিক প্রভাব না থাকলে বাবা বুঝি এমন শেকড়-বাকড় ওপড়ানো মানুষ হয়ে যেতেন না। বাবার হতাশার সুযোগে সে বেশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিল। এবং পরবর্তী জীবনে বর্ধমান শহরের সেই মানুষটির কথা মনে পড়ে যিনি আহার এবং উত্তাপের সুবন্দোবস্ত করেছিলেন, দুজন স্বাধীন মানুষ কিছুদিনের জন্য কত কাছাকাছি দুজন। 'শুধু মানুষের' মতো বেঁচেছিলাম। কখনও মনে হয়নি, পৃথিবী ভাগ হয়ে যায়, মানুষের ঈশ্বর পৃথিবী ভাগ করে দেয়। বুঝেছিলাম, পবিত্র মনুষ্যত্ব ঈশ্বরের চেয়েও প্রবল।

আমার উপন্যাস গল্প এই সব সত্যাসত্য-আবিষ্কারের সামান্য ভিত হিসেবে কাজ করে গেছে। সেখানে আমার এই সব আমিরা ফেলু, ঈশম, ফকিরসাব, সোনা, মণীন্দ্রনাথ, হিগিনস্, ডেভিড, বনি, নিশি, গোপাল, হরিশ, বড়-বৌ, ফতিমা অদৃশ্য অস্পষ্ট অন্ধকারের যাত্রী। তারা কোনো না কোনোভাবে নীল এক ভূখণ্ডে পৌঁছাতে চায়, পারে না। হয়তো আগামীকালে, কেউ এসে তাদের ঠিক পৌঁছে দিতে পারবে। আমি যা পারিনি, সূত্রপাত করেছি, কিংবা নতুন আলোতে মানুষের মুখ দেখা এবার দরকার হয়ে পড়েছে ভেবেছি। সীমিত ক্ষমতা হয়তো যেখানে নিয়ে যেতে পারে, শেষ পর্যন্ত তাও পারেনি, তবু আশা কেউ একদিন আমার দুঃখটা মানুষের জন্য কোথায় সঠিক ধরতে পারবে।

আর গদ্য ভাবনা এ-জন্য সামান্য জটিল হয়ে পড়ে। ভাষা বার বার ব্যবহারে তার ধার হারিয়ে ফেলে। ঔজ্জ্বল্য থাকে না। চাই বাক্যের নতুন ব্যবহার, শব্দের নতুন নতুন ব্যবহার, বাক্য গঠনের সামান্য ভাঙ্গাচোরা স্বভাব চরিত্রে অদৃশ্য অস্পষ্টতার মতো ভেসে ওঠে। এবং এইসব শব্দমালা অথবা বাক্যবিন্যাস স্বাভাবিকভাবেই প্রবীণদের কাছে অর্থহীন অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হতে পারে—কিন্তু মানসিকতায় যারা আমার কাছাকাছি সহজেই যারা সেই গদ্যরূপের ভেতর চরিত্রটিকে সঠিক উপলব্ধি করতে পেরে হয়তো খুশী হয়ে ওঠেন। সব ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাওয়ার ভেতর যে নতুন আবির্ভাবের কথা থাকে তা বুঝি তাঁরা টের পান।

যেমন আমি যখন ফেলু সেখ হয়ে যাই, বুক [illegible] ফেলুর আর নড়ার উপায় নেই—

"চুপচাপ শুধু চিত হয়ে পড়ে থাকা। যেই না উড়তে উড়তে কাছে চলে আসবে খপ করে ধরে ফেলা। ফ্যালা সেই আশায় ঝোপের ভিতর চিত হয়ে পড়ে আছে। শিকারী মানুষের মতো সে জোনাকি ধরার কায়দা শিখে ফেলেছে। চুপচাপ শুয়ে থেকে ফল পেল—গণ্ডা দুই জোনাকি এখন তার করতলে, কোচড়ে রেখে আবার সে মরা-মানুষের মতো পড়ে থাকল, টুপটাপ কি যেন পড়ছে ডাল বেয়ে। সে সে-সব লক্ষ্য রাখছে না—ওরা বেশ উড়ে উড়ে আসছে। কোনোটা সে ধরতে পারছে, কোনোটা পারছে না। ওর বুক জ্বালা করছে। গামছা দিয়ে ঘা ঢেকে রেখেছে... ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিপাতের মতো কিছু পড়ছে। এক ফোঁটা দু ফোঁটা পড়ছে, সে আঙুল দিয়ে দেখল আঠা। তখনই আবার দুটো জোনাকি ওর বুকের ওপর খেলা দেখাচ্ছে। সে হাতটা তুলে একটা ধরে ফেলল। অন্য জোনাকিটা দূরে সরে গেল, দলে ভিড়ে গেল...ফোঁটা পড়ছে। বুকে পিঠে আঠার মতো। সে সে-সব ভ্রূক্ষেপ করছে না। পড়ুক। উঠে গেলেই এমন রাত আর মিলবে না। কাল পক্ষ বিচার ঠিক না থাকলে—ওষুধে কাজ দেয় না। সে বলল, আন্নুরে আবার আমি ফেলু সেখ। তরে নিয়া যামু। আমার শরীরে গন্ধ থাকব না। তরে নিয়া যামু শহরে। আকালু তরে আর কি আতর আইনা দেয়। আমি দিমু তরে পারস্য দেশের আতর। আমার শরীর সবল হইলে কি দিতে না পারি তরে। খপ করে সে ফের আর একটা জোনাকি ধরে ফেলল। আকালু তর ঘরে যায় নাই ত। বিবি তুই আমার দুইডা মাস সময় দে। তরে আমি জোনাকির মত উড়াইয়া নিমু বাতাসে। খপ! সে খপ করে আরও একটা জোনাকি ধরে ফেলল। আর কি আশ্চর্য! খপ! সে দেখল বুকের ভিতর আঠায় একটা জোনাকি আটকে গেছে। খপ! সে তুলে কোঁচড়ে রেখে দিল। আঙুলে সে আঠার মতো বস্তুটি ঠোঁটে ছোঁয়াল। আরে হালার কাওয়া, এয় রে কয় মধু! বর্ষণ হইত্যাছে। ওপরে কোন্ বড় বৃক্ষ আছে। ...ডালে তোমার মধুর চাক যখন আছে, বর্ষণ কর। চান্দের রাইতে মধুতে আমার শরীর ভাইস্যা যাউক, আমি শুইয়া থাকি। মরা কাঠ ভাইবা বসলেই, খপ। সে খপ করে আরও একটা জোনাকি পায়ের পাতা থেকে তুলে আনল। ওর গোটা শরীর আঠাময়। এখন সে ওদের না ধরলেও পারে। গোটা শরীরে জোনাকি, বিন্দু বিন্দু জোনাকি এক দুই করে এসে পড়তে থাকল। ...তাকে আর মানুষ মনে হচ্ছিল না।" (নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে)

আবার যখন আমার আমি জনার্দন চক্রবর্তী হয়ে যায়—

"কিন্তু হায় কার কথা কে শোনে। শেয়াল ডাকছে না। কুকুরের আর্তনাদ নেই কোথাও। চারিদিকে বীভৎস জ্যোৎস্না। সাদা আলো মাঠময়। সেই মাঠের ভেতর এক সঙ্গে কারা যেন নিত্য কেঁদে চলেছে। জনার্দন একটু থমকে দাঁড়াল। কারা কাঁদছে! ঠিক নদী যেখানে বাঁক নিয়েছে, যেখানে ক' ঘর মুন্ডা জাতীয় আদিবাসী ছিল এবং যেখানে পেটের জ্বালায় ঘরে এক বউ ফাঁসি গিয়েছিল, সেই সব মাঠে এবং গাছের ভিতর একদল মেয়ে যেন হাজার হবে, তারও বেশি হতে পারে বসে বসে কাঁদছে। ...এমন বীভৎস দৃশ্য জনার্দন কোনোকালে যেন দেখেনি। হাজার ঘোড়া ছুটছে। ঘোড়ার পিঠে সব

নারীপুরুষের কাটা মুখ ঝুলছে। দেহ নেই, শুধু মুখ। তারপর একটা কালো ঘোড়া যেন ছুটে গেল। সেই ঘোড়ার পিঠে শুধু একটা তরবারী। তারপর মনে হল সুবচনী দেবী মাঠের ভিতর ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে। ছোট সুবচনী দেবী হাত-পা বিশাল করে স্তনে সন্তান ঝুলিয়ে ঠিক কোনো ভৈরবীর মতো দু-হাত ওপরে তুলে জনার্দনের দিকে এগিয়ে আসছে। আর মনে হল হাজার হাজার কঙ্কাল সেই সুবচনী দেবীর চারপাশে আনন্দে নৃত্য করছিল। জনার্দন এবার বলল, মা আমার আর কোনো অহংকার নেই মা। ক্ষুধার জন্য অন্ধ হয়ে যাচ্ছি মা। মা, আমার এই পিতৃপুরুষের দেশকে শ্মশান করে দিলি মা, জনার্দন হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকল।" (টুকুনের অসুখ)

সেই আমি যখন জাহাজের ছোটবাবু—

"আর তখন কি যে হয়ে যায়—সেই শব্দ তরঙ্গ, অথবা বলা যেতে পারে ঘন্টাধ্বনি ছোটবাবুর মাথার ভেতর কেউ ঢং ঢং করে বাজাচ্ছে—যেন সমুদ্রের গভীরে ঘন্টাধ্বনি হচ্ছে, যেন আকাশে বাতাসে এবং সমুদ্রের সব তরঙ্গমালায় সেই ঘন্টাধ্বনি—তাকে সতর্ক হতে বলছে। অথচ ছোটবাবু ঠিক বুঝতে পারে না, মাথার ভেতর ও-ভাবে কে ঘন্টাধ্বনি করতে থাকে, কোন্ সন্ন্যাসী—সে তখন কেবল দেখতে পায়, এক জলদস্যুর পোশাকে তার সামনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। মুখে তার মুখোস। বাঘের মুখোস পরে সেই জলদস্যু বোট-ডেকে হাঁটছে। তারপর কেন যে সেই মুখোসে দেখতে পেল আর্চির মুখে। ডোরাকাটা সব কালো দাগ—মুখে, চোখের পাশে, গোঁফের নিচে। হিংস্র মুখ আর্চির।" (অলৌকিক জলযান)

সে যখন মধ্যবিত্ত, শয়তানের চাবিকাঠি—

"ভিড়ের ভিতর ঢুকতেই রাস্তায় সব আলো আবার জ্বলে উঠেছে। টুপিটা ছিটকে পড়ে আছে দূরে। রাস্তার সঙ্গে চেপ্টে গেছে একেবারে। মাথা হাত পা একেবারে এসফল্টের সঙ্গে পর্দার মতো একটা মানুষের জ্যান্ত ফসিল। রক্ত গরম রয়েছে। হাত দিলে রক্ত এখনও গরম। লোকগুলো হাহাকার করছে। ভিড় বাড়ছে। বিজয় দেখছিল উবু হয়ে—যেন এক ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। অথবা কোনো অবিকল পাথরে খোদাই রক্তাক্ত ভূমিহীন মানুষের মুখ। হাতের মুঠিতে সামান্য রুটি-গুড় উঁচু করে ধরা। সে রুটি-গুড় চুরি করে পালাচ্ছিল। হাতের মুঠি বাসের চাকায় পিষ্ট হয়নি। অবিকল, সেই শক্ত মুঠিতে কথাবার্তা ফুটে উঠেছে—সামান্য রুটি-গুড়ের জন্য আপনারা বাবুরা এমন করেন!·...ফেরার সময় রাস্তাটা বিজয় বার বার ভুল করছিল। ঠিক চিনতে পারছিল না, তার মাথা ঘুরছিল। কেউ যেন কোথাও নিয়ে তাকে গিলোটিনে দেবে। বলবে, তুমি একটা ইতরের বাচ্চা। সব কিছুর মূলে তুমি, তোমার হারামীপনার শেষ নেই হে বাবু!" (মানুষের মামুলী কেচ্ছা)

কখনও সে হয়ে যায় খেটে খাওয়া মানুষ—

"গোপাল শুয়ে স্বপ্ন দেখছিল। সুন্দর হলঘর। কাচের দেয়াল। সাদা প্ল্যাস্টিকের ছাদ, ছাদের নিচে সাদা রঙের আলোর শিক—মানুষগুলো কেমন চেনা মনে হচ্ছে। সারি সারি

তাঁত। কাপড়ে মিহি সুতার ফুল তুলছে গোপাল। মানুষগুলো চেনা চেনা মনে হচ্ছে—সোনার মাকুতে রূপোর ববিন—মানুষগুলো চেনা চেনা মনে হচ্ছে—শানার ওপারে দু সারি 'ব', 'ব'-এর ভিতর ফুলগুলি অথবা ফুলেরা নেচে নেচে যেন শানা অতিক্রম করে দপ্তির এ-পাশে এসে গেল, সব ফুল হয়ে গেল, মুক্তোর মতো সেই ফুল কাপড়ের গায়ে গায়ে লেগে গেল। সোনার মাকু, রূপোর ববিন নড়ছে, গড়াচ্ছে, আর মুক্তোর ফুল কাপড়ের গায়ে গায়ে ফুটে উঠছে। সেই ফুলের ভিতর গোপাল মুখ রেখে দেখল চেনা চেনা মানুষগুলো তাকে বাহবা দিচ্ছে—আহা গোপাল, তুমি গোপাল নকশিপাড় শাড়ি বানালে, তুমি গোপাল উদয়াস্ত শ্রম করে নকশিকাঁথার মাঠের মতো অথবা সুন্দর নীল আকাশের মতো, কখনও নদীর মতো, পাহাড় পর্বতের ছবি আঁকার মতো শাড়ি বানালে...আহা গোপাল, তোমাকে গোপাল আমরা রাজা বানাব।" (রাজা গোপালের জীবনচরিত)

এভাবে চোখ বুজে বই খুলে যে কোনো অনুচ্ছেদ তুলে দেখা গেল, কত আমি, কতভাবে আমি আছি জীবনের মাঝে, বেঁচে আছি। অথচ সব আমিই এভাবে বাঁচে না। কত বিচিত্র এ-ভাবে জীবন, কখনও প্রজাপতির মৃত্যুদণ্ডের মতো অনুভবের দরজা খুলে যায়, জীবনলীলার অনন্ত রহস্যের ভেতর বার বার নিজের আমিকে আবিষ্কার করি—মর্মাহত হই, দুঃখ জাগে, ক্রোধে কখনও উন্মত্ত, নিজের পকেটেই পেয়ে যাই শয়তানের চাবিকাঠি, কে কখন গোপনে রেখে গেছে—এবং এ-ভাবে যে জীবন বয়ে যায় তার বিচিত্রতার ভারে দিশেহারা। অথচ এরা সবাই আমি। আমার সৃষ্ট চরিত্র। এক আমি কতভাবে এইসব চরিত্রের ভেতর ইচ্ছাপূরণের খেলা খেলছে। কখনও ফেলু কখনও জনার্দন। এভাবে গোপাল, বিজয়, জনার্দন চক্রবর্তী সবাই আলাদা আলাদা আমি, প্রত্যেকের আছে এক নিজস্ব পরিমণ্ডল এবং এই সব পরিমণ্ডল এত বেশি রহস্যময় নক্ষত্রলোকের খবর দেয়, শুধু গল্প তার বোধের অস্তিত্বে নিয়ে যেতে পারে না। কাহিনী লণ্ঠনের সলতের মতো কাজ করে। বাকি সবটাই তার আলো। সেই আলোর স্নিগ্ধতা, রহস্যময়তা ধরার জন্য চরিত্রের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়তে হয়। দেখা যাবে ভারি চমকপ্রদ আলো অন্ধকার স্তরে স্তরে জমা হয়ে আছে। বিষয়ের চেয়ে চরিত্রের অভ্যন্তর আরও বেশি রোমহর্ষক। বর্ণনায় দেখা যাবে সামান্য কটা জোনাকি ধরে ফেলতে পারলেই ফেলুর বিশ্বাস নিরাময় হওয়া যাবে সংসারে। কেউ দাঁড়িয়ে থাকে খরাপীড়িত ভূপৃষ্ঠে। সে দেখতে পায় 'ছেইলা কোলে লইয়া মায় বাড়ি বাড়ি যায়', আবার দেখতে পায় ভৈরবীর মতো গ্রাস করতে আসছে। তার সব অহঙ্কার সুবচনী দেবী চূর্ণ করে দিচ্ছে। সংসারে বেঁচে থাকার জন্য কার যে কটা জোনাকি পোকা দরকার বোঝা যায় না। যে যতটা পারছে খপ করে ধরে ফেলছে গোপনে। বিজয়ীর মতো হাসছে, জিতে গেলাম হে। তখন কেন যে দেবী বসি ক্যালের যাত্রা রথের চাকার মতো থেমে

নেই—এগিয়ে যাচ্ছে। অদৃশ্য অন্ধকার অস্পষ্টতার গভীরে সে ঢুকে যাচ্ছে। এই মিছিলের মতো সভ্যতার আগে যারা এবং পেছনে যারা সবারই দরকার হয়ে পড়ে তখন ফসল গোলাজাত করার। আমরা রেখে যাব, তারাও রেখে যাবে, সবাই কিছু না কিছু পৃথিবীর জন্য রেখে যাবে। পৃথিবী সুন্দর হবে, ভরে উঠবে। ফুলে এবং সৌন্দর্যে। এই সব বোধ এবং বুদ্ধির গভীরে যাবার জন্য আমার সৃষ্ট চরিত্রেরা বড় বেশি আঁকুপাঁকু করে। নীল ভূখণ্ড মনে হয় সবার একটি দরকার।

সমাজের সব মানুষেরা দিনে দিনে কিছু না কিছু নতুন গ্রহের খবর পেয়ে যাচ্ছে। আগের মতো চাঁদে বুড়ি সুতা কাটে না। আর্থিক পরিকল্পনা, বিজ্ঞান যত দরজা খুলে দিচ্ছে, ঈশ্বর তত পালাচ্ছেন খিড়কির দরজা দিয়ে। সময় আসবে যখন জোনাকি পোকা ধরার মতো ঈশ্বরকে কেউ আর তেমন তাড়া করবে না। ক্রমে জীবনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাকের ডগায় নরুনের মতো স্থায়ী ভিত্তি আর নাও পেতে পারে। সেই স্বাধীন মানুষের আশায় আছি। সমাজে নতুন এক পৃথিবী ক্রমে তৈরী হয়ে যাবে। সেখানে মানুষ বিধাতা। মৃত্যু যেখানে ইচ্ছে মৃত্যুর মতো। জরা বার্ধক্য মানুষের করতলগত। যেখানে ঈশ্বরের ভূমিকা হাফ-হাতা শার্ট গায়ে দেওয়া কোন ভাঁড়ের।

তবু ভয় থাকে, মৃতুভয় অথবা সেই অদৃশ্য অন্ধকার অস্পষ্টতার ভয়। স্ত্রী, সন্তানসন্ততি, মা বাবা এঁরা যখন সবাই আছেন, তখন আমার এই স্ববিরোধিতা অর্থাৎ অহরহ নিজের সঙ্গে নিজের এই সংঘর্ষ আমাকে পর্যুদস্ত করে। এই মায়াবী পৃথিবীতে আমারও হয়তো এটা এক ধরনের জোনাকি পোকার পেছনে ছোটা। হাস্যকর। তবু জানালার পাশে সে যখন এসে দাঁড়াবে, তাকে শুধু বলব, একটু দাঁড়ান। জানালায় সামান্য রং করতে বাকি আছে, ওটা সেরে যাচ্ছি।

এভাবেই সেই যে বলেছি বিশাল এক প্রান্তরের সামনে আমরা কখনও দাঁড়িয়ে যাই। গাছপালা বৃক্ষের মতো বড় হই, জীবন বয়ে যায়...। মনে হয় জীবন অতি এক কালের যাত্রা। তার শেষ নেই বিনাশ নেই। সুদূর বিপুলের ডাক শুনতে পাই। রহস্যময় সব নীহারিকামণ্ডল অপরূপ লাল নীল বেলুনের মতো উড়ে বেড়ায় চারপাশে। ছোট শিশুর মতো দু-হাতে পকেটে সব সংগোপনে ভরে রাখতে ইচ্ছে করে। এত সব ইচ্ছে এক আমি'র। এত সব আমি মিলে আমার সাহিত্য, আমারই জীবন-বিগ্রহ।

বানান অপরিবর্তিত

অতীনচর্চা
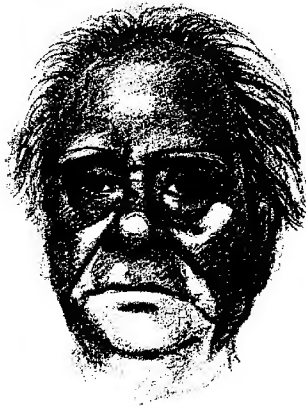
লিখেছেন

সোনালি মুখোপাধ্যায় সুমিতকুমার বড়ুয়া রাজীব চৌধুরী,
ড. সোমনাথ চক্রবর্তী পম্পা মুখোপাধ্যায়
শ্রাবণী পাল বিশ্বজিৎ পাণ্ডা
স্বপ্না ঘোষাল শম্পা রায়

নীলকণ্ঠ পাখির সন্ধানে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সোনালি মুখোপাধ্যায়

উনিশশো ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশ খ্রিস্টাব্দ জুড়ে বাংলা তথা ভারতের ভাগ্যাকাশে সঞ্চিত হয়েছিল অশান্তির মেঘ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, রক্তপাত, লুণ্ঠন, অপহরণ, ধর্ষণ কন্টকিত সেই অধ্যায়ের পরিণাম ছিল ভারত বিভাজন। ভারতের সাথে বাংলাও খণ্ডিত হয় দুইভাগে। পাকিস্তানের অন্তর্গত বাংলায় হিন্দুরা রূপান্তরিত হয়েছিল সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়ে। স্বাধীনতার পূর্বলগ্ন থেকেই হিন্দুরা অত্যাচারিত হচ্ছিল পূর্ববঙ্গে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও অব্যাহত ছিল সেই অত্যাচার। ফলত ধর্ম, প্রাণ, মান রক্ষার তাগিদে লক্ষ লক্ষ হিন্দু নর-নারী পূর্বপুরুষদের জমি ভিটে ত্যাগ করে চলে এসেছিল পরিশ্চমবঙ্গে। প্রায় সর্বহারা নিঃস্ব সেই বাস্তুহারা মানুষদের কঠোর জীবনযুদ্ধর কথা আজও বিস্মৃত হয়নি সংবেদনশীল বাঙালি। বিশেষত বাংলা কথাসাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে দেশভাগ ও দেশত্যাগের প্রেক্ষাপটে বাঙালির দুর্দশার কথা। প্রফুল্ল রায়ের লেখা তিন পর্বের 'কেয়া পাতার নৌকো', অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'গড় শ্রীখণ্ড', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব পশ্চিম', নারায়ণ সান্যালের 'বকুলতলা পি.এল. ক্যাম্প' প্রভৃতি উপন্যাস এবং অসংখ্য গল্পে বর্ণিত হয়েছে দাঙ্গা-দেশভাগ-উদ্বাসন-পুনর্বাসন-এর মর্মস্পর্শী আখ্যান। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত দুই পর্বের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসটি এই ধারারই অন্যতম উজ্জ্বল সম্পদ। ভারত বিভাগের প্রাক্-লগ্ন থেকে পূর্বপাকিস্তানের ভাষা-অন্দোলন (১৯৫২ খ্রি.) পর্যন্ত বিস্তৃত এই উপন্যাসে বিম্বিত হয়েছে বাঙালির সংকট ও সংকট মুক্তির প্রয়াস। উপন্যাসটি পাঠ করে আমরা অনুভব করি গভীর বেদনা—

> "কী ছিল বয়স কী ছিল হৃদয়, তখন
> পদ্মা আমাকে দিয়েছিলো বিদায়—
> আজ মনে জানি তুমি নও তুমি নও
> আমিই আমাকে ছেড়েছি মধ্যরাতে।
> সেই অপরাধে, নুরুল, একলা তুই
> আমাকে ফেলেই যুদ্ধে গেছিস চলে
> সেই অপরাধে আজ বসে দেখি তোর
> একার দুঃখ, একার মৃত্যু জয়।"—শঙ্খ ঘোষ
>
> *(একা/'দেশভাগের কবিতা', পৃ.-৬৩)*

* * * *

দ্বিধাবিভক্ত ভারত স্বাধীন হয়েছিল উনিশশো সাতচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে। স্বাধীনতার

যে মুহূর্তগুলি হতে পারত ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়, স্বাধীন পাকিস্তানের দাবিকে ঘিরে সেই মুহূর্তগুলি রূপান্তরিত হয়েছিল কলঙ্কময় অধ্যায়ে। পাকিস্তানের জন্য মুসলিম লিগের অনড় দাবি, কংগ্রেস নেতৃত্বের অসম্মতি, ব্রিটিশ সরকারের দ্বি-চারিতা ইত্যাদির পরিণামে অবিভক্ত ভারত জুড়ে উনিশশো ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশে শুরু হয়েছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। পূর্ববঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল হিন্দু-বিদ্বেষ ও ধর্মীয় উন্মাদনা। পূর্ববাংলায় হিন্দুরা সংখ্যায় অল্প থাকলেও ধনে-মানে-শিক্ষায় তারাই ছিল অগ্রগণ্য। ধর্মীয় নেতা ও মুসলিম লিগের কর্তারা সাধারণ মুসলিম সমাজকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, হিন্দুরা দেশত্যাগ করলে মুসলিমরা আর্থ-সামাজিকভাবে সম্পন্ন হবে। সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত এইসব প্রচারের পরিণামে পূর্ববঙ্গের একাধিক স্থানে শুরু হয়েছিল হিন্দু-বিতাড়ন অভিযান। সম্পত্তি জবরদখল করা, যুবতী নারীদের ধর্ষণ করা, ধর্মান্তরিত করা, লুঠপাট করা, হত্যা করা ইত্যাদির সূত্রে হিন্দুদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে তাদের স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ করতে উৎসাহী হয় একদল মুসলিম। বিশেষত উনিশশো ছেচল্লিশের ষোলোই আগস্টকে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিবস' ঘোষণা করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে চরম আকার দিয়েছিল মুসলিম লিগ। অশান্তির ব্যাপকতা অনুধাবন করে সাতচল্লিশে দেশভাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবর্গ। কিন্তু দেশভাগ করেও শান্ত হয়নি পরিস্থিতি। সাতচল্লিশের পর বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত চলেছে উৎপাটন ও উদ্বাসন।

বাস্তুহারা পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুরা এই দেশে প্রবেশ করেছিল প্রায় নিঃস্ব অবস্থায়। পঞ্জাবি উদ্বাস্তুদের জন্য কেন্দ্র সরকারের উদ্বেগ ও সাহায্য অব্যাহত থাকলেও বাঙালি শরণার্থীদের নিয়ে কেন্দ্রের কোনও উদ্যোগ ছিল না। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের সামান্য সাহায্য সম্বল করে শুরু হয় শরণার্থীদের জীবন সংগ্রাম। স্বভূমিতে যাঁরা এতকাল সচ্ছল ও সম্মানীয় জীবন ভোগ করেছেন, তাঁরাই এইপারে অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়-সম্মান হারিয়ে হয়েছিলেন সর্বহারা। বেঁচে থাকার তাগিদে তাঁদের জীবনে ঘটে বিবিধ বাঁকবদল। আবার মুসলিমদের স্বপ্নভূমি রূপে জন্ম হয়েছিল যে পাকিস্তানের, সেখানেও বারবার আশাভঙ্গের সম্মুখীন হয় দরিদ্র মুসলিম সমাজ। এছাড়াও ক্রমশ ঘোরালো হয়ে ওঠে উর্দু ভাষা বনাম বাংলা ভাষার দ্বন্দ্ব। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা উর্দুভাষাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে চাইলে প্রতিবাদে শুরু হয় ভাষা-আন্দোলন। বাংলাভাষা রক্ষার জন্য রাজপথে প্রাণ দেয় বাঙালি তরুণ সম্প্রদায়, বন্দুকের নলের মুখেই আসন্ন হয়ে ওঠে বাংলাদেশের জন্ম। ভারত ও বাংলাদেশের ইতিহাসের এই দীর্ঘ উত্তাল সময়কে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় নিজস্ব অভিজ্ঞতা, ইতিহাসচেতনা ও অভিনব রচনাকৌশল দিয়ে গ্রথিত করেছেন 'নীলকণ্ঠ

পাখির খোঁজে' (দুই পর্ব) উপন্যাসে; দেশ, কাল ও সমাজের বিভিন্ন বিপর্যয় চিত্রিত হয়েছে উপন্যাসে।

* * * *

ব্যক্তিগত জীবনে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম-১৯৩০) পূর্ববঙ্গের মানুষ। শৈশব ও কৈশোরকাল কেটেছে ঢাকা জেলার রাইনাদি গ্রামে। বড়ো যৌথ পরিবার ছিল তাঁদের। ঠাকুরদা ছিলেন বাড়ির কর্তা। বড়ো জ্যাঠা উন্মাদ ছিলেন, একসময় হন নিরুদ্দিষ্ট। বাবা কাজ করতেন মুড়াগ্রামের জমিদার পরিবারে। অতীন বেড়ে উঠেছিলেন পূর্ববঙ্গের উন্মুক্ত পরিবেশে। তাঁদের জীবনের সুখ সমৃদ্ধি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল দেশবিভাজনের অভিঘাতে। রাইনাদি গ্রামে সাম্প্রদায়িক হানাহানি না ঘটলেও আতঙ্কে অতীনরা দেশত্যাগ করেন স্বাধীনতার কিছু পরে। স্বয়ং লেখকের কথায়—

"আমি এসেছি দেশভাগের কিছুদিন পর। সেই সময় আমার ম্যাট্রিকের টেস্ট পরীক্ষা চলছিল। তখনও পর্যন্ত ওপারে টেস্ট পরীক্ষা দিলে এপারে ফাইনাল দেওয়া যেত। দেশভাগের খবর চাউর হতেই আমাদের বিশাল পরিবার, বাবা, জ্যাঠা, কাকা, কাকিমা, জেঠিমা, ভাইবোন ভাগ-ভাগ করে এপারে আসতে লাগল।"

(সাক্ষাৎকার, 'বইয়ের দেশ', এপ্রিল-জুন, ২০১২, পৃ. ১০১)

অতীনরা এসেছিলেন মুর্শিদাবাদে। সেখানে বেশ খানিকটা জঙ্গল-জমি কিনে বসবাসের চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। জঙ্গল কাটা ও বাসস্থান নির্মাণের সেই কঠিন জীবনযুদ্ধের কথা আছে তাঁর 'মানুষের ঘরবাড়ি' উপন্যাসে। বাসা তৈরীর সাথে প্রয়োজন ছিল নগদ অর্থ উপার্জনের। অল্প বয়সেই অর্থের তাগিদে জাহাজে কোলবয়ের চাকরি নিয়ে বিশ্ব পর্যটনে বেরিয়েছিলেন অতীন। বহু দূর দেশে পাড়ি দিয়ে খানিকটা সচ্ছলতার সংস্থান করে স্থলভূমিতে থিতু হয়েছিলেন তিনি। তারপর কখনও স্কুলে, কখনও কারখানায়, কখনও সংবাদপত্রে যোগ দিয়েছেন। কর্মক্ষেত্রে কোথাও স্থায়ী হতে পারেননি দীর্ঘদিন, কিন্তু তাঁর সৃষ্টিপ্রবাহ স্তব্ধ হয়নি। জীবনের সুবিপুল অভিজ্ঞতাকে নিরন্তর কথাসাহিত্যে বদ্ধ রেখেছেন তিনি, তবে সমস্ত অভিজ্ঞতাকে ছাপিয়ে গেছে তাঁর দেশত্যাগের যন্ত্রণার কথা। শৈশব ও কৈশোরের লীলাভূমি থেকে বিচ্যুতি হবার বেদনাকে লেখক বারংবার ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পে-উপন্যাসে। বস্তুত তাঁর সমগ্র জীবন ও সাহিত্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে তিনি নিরন্তর বিচরণ করে খুঁজতে চেয়েছেন জন্মভূমির পুকুর, নদী, খাল, বিল, চাষের জমি, গরু, কুকুর এবং আরও অনেক কিছু। হারিয়ে ফেলা এই জীবনকে অতীন যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন বিবিধ রচনায়, তবে এর সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের দুই পর্বে এবং এর পরবর্তী

খণ্ডগুলিতে। *('অলৌকিক জলযান', 'ঈশ্বরের বাগান')*

বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য উপন্যাস 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' (দুইপর্ব)। এপার বাংলায় আসার প্রায় কুড়ি বছর পর এই উপন্যাস লিখেছিলেন অতীন (উপন্যাসের প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭১, এপ্রিল এবং দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭১-এর জুলাই)। এই প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য—

"বাধ্য হয়ে দেশত্যাগের জন্য অন্যান্য উদ্বাস্তুদের মতো আমিও মুসলিমদের দায়ী করতাম। বেশি-বেশি করে বিশ্বাস করতাম গ্রাম-লুণ্ঠন, নারী অপহরণ, আরও সব নানান খারাপ ঘটনার কথা।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫)*

ক্রমশ সময়ের সাথে লেখকের চিন্তা পরিবর্তিত হয়েছে। তাঁদের গ্রামে এই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটেনি। তাঁরা গ্রাম ছেড়েছিলেন আতঙ্কের ও অবিশ্বাসের আবহে। পরবর্তীকালে লেখকের চিন্তায় উদিত হয়েছে সহৃদয় প্রতিবাসী মুসলিমদের কথা। অনুভব করেছেন তাঁদের স্নেহ-শ্রদ্ধার গভীরতার কথা। মানসিকভাবে তিনি যখন নিরপেক্ষ তখনই লিখিত হয়েছে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'। উপন্যাসটি একরকম লেখকের আত্মকথন ও আত্মদর্শন। তিনি বলেছেন—

"ওখানে যেসব চরিত্র আছে তাঁরা কেউ কেউ রক্তের সম্পর্কের, বাকিরা পাশের বাড়ির অথবা আমার গ্রামের, পাশের গ্রামের লোক, প্রকৃতি আমার আশেপাশের গ্রামের। এখনও চোখ বুজলে গোটা অঞ্চলটা আমি দেখতে পাই। তরমুজ খেত, সোনালি বালির চর, পুকুরপাড়ে নিমগাছ, নোনা-ধরা ইটের প্রাচীন মসজিদ...। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, যে কোনও লেখকের কাছে নিজের কৈশোর কালটা ভীষণ জরুরী।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬)*

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের খণ্ডিত অথচ চিরন্তন এক অধ্যায়কে ধারণ করে আছে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'। এর সমান্তরালে উপন্যাসে উদ্ভাসিত হয়েছে দেশ ও কালের নানাবিধ সংকট। সমগ্র আখ্যান একই সঙ্গে হয়ে উঠেছে উপন্যাস ও ইতিহাস।

*   *   *   *

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'র আখ্যান শুরু হয়েছে দরিদ্র মুসলিম ঈশম শেখকে নিয়ে আর আখ্যান শেষও হয়েছে তাকে দিয়ে। ভূমিহীন কর্মহীন ঈশমের করুণ মৃত্যুদৃশ্য দিয়ে উপন্যাস শেষ করে লেখক যেন স্মরণ করিয়েছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র-র 'পালঙ্ক' গল্পের কটু সত্য বাক্য—"গরীবের হিন্দুস্থানও নাই, পাকিস্তানও নাই, কেবল এক গোরস্থান আছে ফতি, গোরস্থান আছে।" *(গল্পমালা-১, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, পৃ. ২৪৫)*

পরাধীন ভারতে ঠাকুরবাড়ির কর্মচারী হয়ে যে ঈশমের পায়ের তলায় জমি ছিল, পেটে অন্ন ছিল, মনিববাড়ির ভালোবাসা ছিল, স্বাধীন পাকিস্তানে সেই ঈশম

হয়েছিল সর্বহারা। তার তরমুজ খেত, জমি কেড়ে নিয়েছিল স্বজাতীয়রাই। প্রাণাধিক প্রিয় তরমুজ খেতেই দু-দিন মৃত অবস্থায় পড়েছিল ঈশম। অবশেষে সামসুদ্দিন সেখানেই তার কবর স্থাপন করে চিরশান্তি দেয় অতৃপ্ত ঈশম শেখকে। আবার তুচ্ছ এই মানুষকেই সামসুদ্দিন করে তোলে বাংলাদেশের প্রতিবিম্ব।

শুধু ঈশম নয়, দেশবিভাজনের সেই উত্তাল অধ্যায়ে নানাভাবে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল অসংখ্য নারী-পুরুষের। সবাই খোঁজ করছিল কোনও না কোনও নীলকণ্ঠ পাখির, আর ব্যর্থ হচ্ছিল বারংবার। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সাধারণ জনসমাজের যে আশাভঙ্গ ঘটেছিল দেশবিভাজনের অভিঘাতে তারই নিরপেক্ষ মূল্যায়ন রয়েছে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে। এর সঙ্গে রয়েছে তৎকালীন রাজনৈতিক ইতিহাস।

* * * *

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' (প্রথম খণ্ড)-র ঘটনা শুরু হয়েছে সোনার জন্মকথা দিয়ে। নিজের প্রাণপ্রিয় সোনালি নদীর চরে তরমুজ খেতে ঈশম যখন প্রকৃতি আর ঈশ্বরের ধ্যানে আবিষ্ট তখন সংবাদ পায় 'ধনকর্তা' চন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্রসন্তান হয়েছে। চন্দ্রনাথ আর মেজকর্তা ভূপেন্দ্রনাথ মুড়াপাড়ার জমিদার সেরাস্তার কর্মচারী। নতুন শিশুর আগমনবার্তা সেখানে পৌঁছবার জন্য রাত্রে রওনা দেয় ঈশম। কিন্তু আশ্চর্যভাবে গোলকধাঁধায় হারিয়ে পৌঁছতে অক্ষম হয় সে। ভয়ে আতঙ্কে গ্রামের কাছেই অচেতন হয়ে পড়ে ঈশম—

"মনে হচ্ছে সারা বিলে মানুষের পায়ের শব্দ ভেসে বেড়াচ্ছে। একদল অবয়বহীন শয়তান ওর সঙ্গে হাঁটছে অথচ কথা বলছে না। অন্ধকারে সে কেবল উপরে ওঠার পরিবর্তে নিচে নেমে যাচ্ছে। এবারে সে চিৎকার করে উঠল, খুদা এইটা কি হইল! ধনকর্তা গ, আমারে কানাওলায় ধরেছে।" *('নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩)*

এই প্রাকৃত-অপ্রাকৃত অনুভবের মধ্যে যেন প্রতিবিম্বিত হয়েছে ভবিষ্যতের বিপর্যয়, সেখান থেকে আজও মুক্তি ঘটেনি আমাদের। এখনও ঘটে সাম্প্রদায়িক সংঘাত।

সেকালের বাঙালি যৌথ পরিবারগুলিতে প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে সন্তানরা জন্মগ্রহণ করত। সুতরাং একটি নবজাতকের জন্ম এমন কিছু অভিনব ঘটনা ছিল না সেকালে। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির এই নতুন পুত্র সন্তানের আগমন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে পরিবারে ও উপন্যাসে। ঠাকুরবাড়ির চারপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সন্তান মণীন্দ্রনাথ ছিলেন উন্মাদ। তাঁর আর বড়বৌয়ের অসম্পূর্ণ দাম্পত্যজীবনের ফসল ছিল একটি মাত্র পুত্রসন্তান পলটু। আর সম্ভাবনা ছিল না। বাড়ির মেজ ছেলে ভূপেন্দ্রনাথ, মুড়াপাড়া থাকতেন ও অবিবাহিত ছিলেন। তিনিই বাড়ির প্রধান কর্তাব্যক্তি ছিলেন।

বাড়ির ছোটো কর্তা শচীন্দ্রনাথও ছিলেন অবিবাহিত। সেই অর্থে ধনকর্তা চন্দ্রনাথ আর ধনবৌর দাম্পত্যজীবনটি ছিল বাড়ির একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত। দ্বিতীয় সন্তান হয়েও সোনা ছিল সবার আদরের সম্পদ। আর তার চেহারায় বিচ্ছুরিত হত মণীন্দ্রনাথের রূপ। শুধু রূপগত মিল নয়, উন্মাদ মণীন্দ্রনাথ আর অবোধ সোনা শীঘ্রই হয়ে উঠেছিল একে অপরের ঘনিষ্ঠ সহচর। বাংলার অপরূপ প্রকৃতির বুকে খেলে বেড়াত দুই নিষ্পাপ শিশু—

"সে (সোনা), জ্যাঠামশাইর সঙ্গে বাড়ি থেকে চুপি চুপি বের হয়ে পড়ল। পাগল বলে তিনি শুধু হেসেছিলেন। পাগল বলে তিনি তাকে এই যাত্রার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন।...

আহা, ওরা কত গ্রাম মাঠ ফেলে চলে যাচ্ছে। যত এরা এগুচ্ছিল তত আকাশটা ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। সোনা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সে ক্ষুধায় অবসন্ন হয়ে পড়েছে। এতটা হেঁটেও সে আকাশ ছুঁতে পারছে না কিছুতে।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১০৮)*

সোনা মাঝে মাঝে স্তব্ধ হলেও মণীন্দ্রনাথের যাত্রা ব্যাহত হত না কোনও দিন। মাথার মধ্যে এক গভীর যন্ত্রণা নিয়ে তিনি শুধু খুঁজতেন প্রেমিকা পলিনকে। বিদেশিনী বিধর্মী পলিনকে পুত্রবধূ করবেন না বলেই একদিন মিথ্যা সংবাদ দিয়ে ছেলেকে বাড়ি আনিয়েছিলেন মহেন্দ্রনাথ। বিয়ে দিয়েছিলেন বড়বৌ-এর সঙ্গে। কিন্তু সুখী হননি মণীন্দ্রনাথ। প্রেমিকাকে হারিয়ে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কখনও অশ্লীল ভাষায় কথা বলেন, কখনও কিট্‌সের কবিতা আবৃত্তি করেন, কখনও নীরব থাকেন। আবার কখনও নীলনয়না পলিনকে খুঁজতে ছুটে চলেন মাঠে-ঘাটে-পথে। খুঁজে ফেরেন হারিয়ে যাওয়া নীলকণ্ঠ পাখি—

"মণীন্দ্রনাথের বড় ইচ্ছা, জীবনের হারানো সব নীলকণ্ঠ পাখিরা ফিরে এসে রাতের নির্জনতায় মিশে থাক—কিন্তু তারা নামছে না—বড় কষ্টদায়ক এই ভাবটুকু।" *(প্রাগুক্ত, পৃ.১৬)*।

অবুঝ মণীন্দ্রনাথ জানতেন না তাঁর নীলকণ্ঠ পাখি অর্থাৎ পলিন কিন্তু আর সাগরপাড়ে নেই। মুড়াপাড়ার জমিদারবাড়ির মেজবৌ হয়ে সে বাস করে কলকাতায়। অমলা, কমলা নামের দুটি মেয়ে আছে তার। তবে তার মনেও সেই একই দুর্বোধ্য যন্ত্রণা। কিট্‌সের কবিতা আর হারানো স্বপ্ন নিয়ে জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকে পলিন। কিছু না জেনে মুড়াপাড়ার দুর্গোৎসবে মণীন্দ্রনাথ বিস্মিত হয়েছিলেন পলিনের আত্মজাদের দেখে—

"মণীন্দ্রনাথ কমলাকে দেখল। চোখ নীল কেন এ মেয়ের! সে হাঁটু গেড়ে বসল। যেন কোন দৈত্য এখন হাঁটু গেড়ে বসে পুতুলের মতো ছোট এক মেয়েকে দু'হাতে তুলে চোখের কাছে নিয়ে এল। বলতে চাইল, তুমি কে মেয়ে! তোমাকে যেন চিনি।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯)*।

সমগ্র জীবনে পলিনকে আর ফিরে পাননি মণীন্দ্রনাথ। কাটেনি উন্মাদ দশাও। কিন্তু উন্মত্ত অবস্থায় নষ্ট করে দিয়েছিলেন ফেলুর একটি হাত। দুর্বৃত্ত ফেলু নিজের এক বিপর্যয়ের মুহূর্তে এই ঘটনার প্রতিশোধ নিয়েছিল নৃশংসভাবে। কোরবানির ধারালো চাকু দিয়ে সে গোপনে হত্যা করেছিল ঠাকুরবাড়ির উজ্জ্বলতম রত্নকে, তারপর ষাঁড়ের আক্রমণে নিহত হয়েছিল ফেলু। পরিবার ও গ্রামে কেউ জানতে পারল না পাগলঠাকুরের পরিণতির কথা। অনন্তকাল ধরে বড়বৌ বসে রইল স্বামীর প্রতীক্ষায়। ওপার থেকে এপারে এসেও স্তব্ধ হয়নি প্রতীক্ষার অভ্যাস—

"বড় জেঠিমা যেদিন সবাই উপবাস থাকে... সেদিন রাতে ভাঙা বাক্স থেকে যত চিঠি আছে বের করে পড়েন। রাত জেগে কুপি জ্বালিয়ে জেঠিমা সারারাত বুঝি চিঠি পড়েন। জ্যাঠামশাইয়ের চিঠি। বিয়ের পরই যেবার তিনি কলকাতায় শেষবারের মতো কাজ করতে গিয়ে ছ'মাস ছিলেন তখনকার কিছু চিঠি। জেঠিমা সকালেই স্নান করে একটা ভাঙা আয়নার সামনে হাঁটু গেড়ে বসেন। কপালে সিঁদুর পরেন বড় বড় ফোঁটায়,... জেঠিমার এই মুখ দেখলে সোনা চোখের জল রাখতে পারে না।" *('নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে', ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩১)*।

পলিনকে খুঁজতে গিয়ে একদিন নিজেই নীলকণ্ঠ পাখি হয়ে গিয়েছিলেন মণীন্দ্রনাথ। সে উত্তাল সময়ে তিনি হারিয়ে গিয়েছিলেন প্রিয় মানুষদের থেকে, সেই সময়ে বিপর্যয়ের সংকেত ঘনীভূত হয়েছিল সোনাদের গ্রামে। ঢাকার এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সদ্য বিয়ে হওয়া স্বামীকে হারিয়ে, গ্রামে ফিরেছিলেন নরেন দাসের বোন সুন্দরী মালতী। গ্রামে এসে জানল তার এক বাল্যসঙ্গী রঞ্জিত নিরুদ্দিষ্ট আর অপর সঙ্গী সামু বা সামসুদ্দিন মুসলিম লিগের কর্তা হয়ে উঠেছে। চিরকালের চেনা সামসুদ্দিন আজ পরিণত ও রূপান্তরিত। ঢাকা থেকে ইস্তাহার আনিয়ে গাছে গাছে টাঙিয়ে দেয়। ইস্তাহারগুলিতে বলা হয়—'ইসলাম বিপন্ন। ...পাকিস্তান জিন্দাবাদ'। *('নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', ১ম খণ্ড, পৃ. ১১১)*

মালতী এই সব সহ্য করতে পারে না। বারবার ছিঁড়ে দেয় বাল্যবন্ধুর ইস্তাহার। ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হলেও নিজেকে সামলে নেয় সামু—

"মালতীর শস্য দানার মত রঙ শরীরের—তাছাড়া শৈশবের কিছু কিছু প্রীতিপূর্ণ ঘটনা, স্বামীর সাম্প্রদায়িক মৃত্যু এবং বৈধব্য বেশ, সব মিলে মনে অপার বেদনা সঞ্চার করছে সামুর। এই উগ্র জাতীয়তাবোধ ওর ভাল লাগল না। সে ছুটতে লাগল।" *(প্রাগুক্ত, পৃ.৪২)*

মালতীর ক্ষেত্রে সহনশীল ও সহানুভূতিপ্রবণ হলেও সামসুদ্দিন অসাম্প্রদায়িক হতে পারেনি। ঐ প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করেও লিগের নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হয়ে উঠেছিল সে। হিন্দুদের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে খানিকটা সমর্থ হয়েছিল সামু।

স্থানীয় ইউনিয়ন নির্বাচনে লিগের প্রার্থী ছিল সে। গ্রামের হিন্দু ও মুসলিমদের ভোট পেয়ে সেবার অবশ্য জিতে গিয়েছিলেন সোনার ছোটোকাকা শচীন্দ্রনাথ। ভোটে পরাস্ত হয়েও সক্রিয়তা কমেনি সামসুদ্দিনের। ঢাকা এবং অন্যান্য অঞ্চলে যাতায়াত বেড়ে যায় তার। একসময় স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বাস শুরু করে সে। আর মাঝে মাঝে গ্রামে এসে ধর্মীয় তথা রাজনৈতিক মঞ্চে উঠে জনমোহিনী বক্তব্য রাখে সামু। যেমন—১৯৩৭ সালে হক সাহেব (ফজলুল হক)-এর পরিণতির কথা তুলে বলে—

"হকসাহেবের কৃষক প্রজা দল যেহেতু মুসলিম প্রধান দল, তাকে নিয়ে কংগ্রেস যৌথ সরকার গঠন করলেন না। ...হিন্দুদের এমন মুসলিম বিদ্বেষ যে, তারা কিছুতেই যৌথ সরকার গঠন করলেন না। ...কি প্রকট এই মুসলিম বিদ্বেষ! কি অমানুষিক অত্যাচার! ...আপনার আমার খুনে ওরা গোসল করছে। সে এসব বলে, আবার জল খাবার সময় কি যেন এক ছবি, ছবিতে মালতীর মুখ... সঙ্গে সঙ্গে তার কেমন গলা শুকিয়ে গেল। কোনরকমে তারপর বলল, আপনাদের ভিন্ন দেশ বাদে গতি নাই। সে নিজেকে বলল, হে আল্লা, এ ছাড়া এ-জাতির উদ্ধার নাই।" *('নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩)*

সামসুদ্দিনের প্রচার অর্ধ-সত্য, অর্ধ-মিথ্যা। পূর্ববঙ্গের মুসলিমরা আর্থিক ও সামাজিকভাবে অত্যন্ত অনুন্নত ছিল। সোনাদের গ্রামেই জমি-সম্পদ-শিক্ষায় শ্রেষ্ঠ ছিল সংখ্যালঘু হিন্দুরা। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ছিল হিন্দুদের শ্রমিক, চাষী বা কামাল। অর্ধাহার, অনাহার ও সর্ববিধ অনটনে জর্জরিত ছিল মুসলিমরা। জোটন ও তার ভাইয়ের পরিবার অর্থাৎ আবেদালি, জালালি প্রায়শই অভ্যস্ত ছিল উপবাসে। উদরের জ্বালায় মালতীর হাঁস চুরি করে ভোজন করে জালালি। আবার দুটি খাদ্যের আশায় শালুক ফুল তুলতে গিয়ে ডুবে মরতে হয় তাকেই—

"লতাপাতার ভিতর একটা মানুষ আটকা পড়ল। আজব জীব মনে হচ্ছে এখন জালালিকে। ঘাড় গলায় লতাপাতা পেঁচিয়ে আছে, পায়ের নিচে এবং বুকের চারপাশে অজস্র কদম ফুলের মতো জলজ দাম লেপ্টে আছে। জালালি উপুড় হয়ে আছে। পা-দুটো উপরের দিকে মাথাটা নিচের দিকে হেলানো।" *('নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৭)*

গ্রামের গরিবরা নিয়মিত বিল থেকে শালুক শাপলা তোলে। জালালিও ক্ষুধার্ত ছিল—

"পেটের ভেতর জ্বালা থাকলে কি খেতে না সখ যায়। লাল আলুর মতো সেদ্ধ করে খেতে হয় শালুকের ভেতরটা। একটু নুন দিয়ে, কোন কোন সময় তেঁতুলের অল্প গোলা ফেলে দিলে প্রায় অমৃতের মতো স্বাদ।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯)*

লোভে বিলের গভীরে চলে গিয়েছিল জালালি আর পরিণামে ঘটে মৃত্যু। দারিদ্রের আরেক রূপ দেখা যায় জোটনের মধ্যে। ফকির সাবকে বিয়ে করার পর

দারিদ্র থেকে খানিকটা মুক্তি পেয়েছিল জোটন, নয়তো বছরের পর বছর মাঝে মাঝেই অনটনে জর্জরিত হয়েছে সে। কোনওক্রমে একজন স্বামী জোগাড় করে চলে যেত সে, তারপর 'আল্লার মাশুল' দিয়ে অর্থাৎ সন্তানের জন্ম দিয়ে আবারও চলে আসত গ্রামে। ভাই আবেদালির তাকে খেতে দেবার সামর্থ ছিল না। তাই পৃথগন্ন হয়ে অন্যের বাড়ি শ্রমদান করে রসদ জোগাড় করত জোটন। তবুও সবদিন জুটত না আহার। মাঝে মাঝে আসত উপবাস, তখনই স্বভাব নষ্ট হত তার—

"দুদিন পেটে ভাত নাই—আফসোস। দুদিন হাইজাদির বিলে গ্রামের অন্য অনেক দুঃখী ইমানদারদের সঙ্গে শালুক তুলেছে, দুঃখী হলেই ইমানদার হবে, খোদাকে স্মরণ করবে—এমনও একটা বিশ্বাস আছে জোটনের। এই যে এখন জোটন শামুকের ধারাল মুখটা দিয়ে কট করে আর একটা ধানের ছড়া কাটল এবং কোঁচড়ে লুকিয়ে ফেলল—যেন পেটের খিদে ভয়ানক দুঃসহ, খোদার কাছে নিজের গোনাগারের জন্য জোটন মোনাজাত করল—হায় খোদা, পেটের জ্বালায় গতরের জ্বালায় সব হয়।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০)*।

দারিদ্র্যের এই চেহারার সঙ্গে মুসলিম সমাজে ছিল ব্যভিচার। একাধিক পত্নী ছিল হাজিসাহেবের। অন্যের পত্নী ভোগ বা অপহরণে কোনও প্রকার অনুশোচনা ছিল না ফেলু শেখ বা আকালুদ্দিনের। বিবি আন্নুকে গায়ের জোরে দখল করেছিল ফেলু—

"পাড়াময় রসিকতা কত—বিবিটা আলতাফ সাহেবের। কি করে, কে কখন আলতাফ সাহেবের লাশ পাট খেতে আবিষ্কার করেছিল কেউ জানে না। তারপর বছর পার হয়নি, ফেলু আলতাফ সাহেবের খুবসুরত বিবিকে ঘরে এনে তুলেছে। কেউ রা-টি করেনি।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১)*

একাধিকবার জেলে যাওয়া ফেলুর অধিক সম্পর্ক ছিল হাজিসাহেবের 'মাইজলা বিবি'র সঙ্গেও। তার অনাচারের অবশ্য এখানেই শেষ নয়। গ্রামের মেয়ে বৌদের ভোগ করার জন্য তার লালসা বাড়তেই থাকে। আর বাড়তে থাকে হিন্দুদের প্রতি আক্রোশ। হিন্দুদের বৈভব তাকে উন্মত্ত করে ফেলত। বড়োঠাকুর আর হাতির দৌরাত্ম্যে একটি হাত পঙ্গু হয়ে গেলেও শান্ত হয় না ফেলু। স্ত্রীর উচ্ছৃঙ্খলতা তাকে আরও ভয়ংকর করে তোলে। সামসুদ্দিন তার মেয়ে ফতিমাকে লেখাপড়া করায়, এই ঘটনাও অশান্ত করে ফেলে ফেলু শেখকে। যা কিছু সুন্দর তার উপরই রুষ্ট থাকে দুর্বত্ত ফেলু।

সামসুদ্দিনের অনুচর হাজিসাহেবের ছেলে আকালুদ্দিনও ব্যভিচারের মূর্তিমান প্রতীক। সে নির্দ্বিধায় ফেলুর বিবি আন্নুকে ভোগ করেছে এবং একদিন তাকে নিয়ে নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে।

ফেলুর স্ত্রীকে ভোগ করতে ছাড়েনি জব্বরও। আবেদালির ছেলে দরিদ্র জব্বর তাঁত চালাত নরেন দাসের বাড়ি। তার মা জালালি মারা গিয়েছিল জলে ডুবে। জব্বর অল্প বয়স থেকেই দক্ষ হয়ে উঠল নারীসঙ্গে। ফেলুর অসহায়তার সুযোগ নিয়ে আন্নুকে সময়ে অসময়ে যৌনখেলার সঙ্গিনী করেছিল জব্বর।

গ্রামের দরিদ্র মুসলিম সমাজের আর্থিক ও নৈতিক দুরবস্থার কথা বুঝেই সামসুদ্দিনরা অনুভব করত স্বাধীন পাকিস্তান ব্যতীত এই জাতির মুক্তি নেই। নতুন একটি দেশ, নতুন অধিকার, নতুন সুযোগ অর্জন করলেই উন্নত হবে পূর্ববঙ্গের মুসলিমরা। আর তার জন্য চাই প্রবল উন্মাদনা। সামুর বক্তৃতার মধ্যে মিশে যেত মিথ্যা প্রচার। হিন্দুরা মুসলিমদের রক্তপিপাসু এই ধরনের বক্তব্য ছড়িয়ে দরিদ্র মুসলিমদের উত্তেজিত করত লিগ নেতারা। সামু তাদেরই প্রতিনিধি ছিল। মিথ্যাভাষণের সময় তার অনুশোচনা হলেও স্বজাতির সুখের জন্য সে মিথ্যা বলত। তার ভাবনায় বিশেষ অন্যায় কিছু ছিল না, কিন্তু নিজেদের কৃতকর্মের পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল সামসুদ্দিনরা। সামু ব্যক্তিগত জীবনে স্বচ্ছ মানুষ ছিল। সৎ ছিল। মালতীকে ভালোবাসলেও অসঙ্গত কিছু করেনি। মেয়ে ফতিমাকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ দিতে তাকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার মধ্যে যথেষ্ট অভিনবত্ব ছিল। ভোটে হেরেও শচীন্দ্রনাথদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেনি সামু। এমনকি আকালুদ্দিন যখন গর্বিত ভঙ্গিতে জানায় বড়বৌর বিপ্লবী ভাই রঞ্জিতকে সে ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল, তখন বিরক্ত হয় সামু—

"তর কি দরকার ছিল আকালু। তুই এমন করতে গেলি ক্যান।

—কাকেরা যত বিনষ্ট হয় তত ভাল না?

—না।

এমন চোখমুখ দেখবে সামসুদ্দিনের, সে আশাই করতে পারে নি।" *('নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', ২ খণ্ড, পৃ. ২১৫)*

সামসুদ্দিন একজন পরিপূর্ণ মানুষ ছিল। তার ন্যায় অন্যায় বোধ স্পষ্ট। দুর্ভাগ্যবশত তার গ্রাম্য অনুচরদের কোনও মূল্যবোধ ছিল না। ফেলু শেখ নিজেকে ধর্মপ্রাণ মানুষ ভাবত, অথচ সব রকম অধর্মে সে পটু ছিল। দুই হাত থাকতে হত্যা, অপহরণ, জবরদখলে অভ্যস্ত ছিল। একটি হাত নষ্ট হলেও, তার দুষ্কর্মে ভাটা পড়েনি। বিবি আন্নু আর আকালুদ্দিনের যুগ্ম পলায়নের পর ক্রোধে সে বড়োঠাকুরকে হত্যা করে এবং নিজেও নিহত হয় ষাঁড়ের প্রত্যাঘাতে।

হাজিসাহেবের ছেলে আকালুদ্দিন ছিল মুসলিম লিগের নেতা। সেও সামসুদ্দিনের মতো সম্মান অর্জন করতে চেয়েছিল—

"...এইসব নামী মানুষের সঙ্গে আকালুদ্দিন আজ মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রথম বক্তৃতা করবে। ...সে এইসব নামী মানুষের সামনে কি আর বলবে! ভাবল, কি আর বলা যায়, শুধু প্রথমে বলা ইনসান আল্লা, তারপর কিছু হিন্দু বিদ্বেষের কথা বলে মঞ্চ থেকে নেমে পড়া।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ১২)*

আকালুদ্দিনের কোনও নীতিবোধ ছিল না। ফেলুর বিবিকে সে নির্লজ্জের মতো ভোগ ও হরণ করেছে। 'নেতা' হবার সুযোগকে অধর্মের কাজে ব্যবহার করেছে। একদিন আন্নুকে জবরদখল করেছিল ফেলু, আবার ফেলুকে সরিয়ে আন্নুকে দখল করেছে আকালুদ্দিন। এছাড়া চারপাশের গ্রামের দাঙ্গাতেও নিয়মিত যোগদান করত আকালু।

সামসুদ্দিনের অপর অনুচর ছিল জব্বর। দরিদ্র আবেদালি যা পারেনি, জব্বর তাই করেছে। নরেন দাসের তাঁত শ্রমিক জব্বর পরিবর্তিত হয়েছিল ভয়ংকর মানুষে। লিগে নাম লিখিয়ে সে বাবাকে বলেছে—

"হিন্দুরা আমাগ দ্যাখলে ছ্যাপ (থুতু) ফালায়, আমরা-অ ছ্যাপ ফ্যালামু।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ২১)*

ছেলের উগ্রতায় আতঙ্কিত হয়েছিল স্বয়ং আবেদালি—

"...কি ভেবে সে বলল, আল্লা দ্যাশে এটা কি শুরু হইল!

আবেদালির কাঁচা-পাকা দাড়ি বেয়ে কিছু জল গড়িয়ে পড়ল। কুপির আলোতে আবেদালির মুখ ভয়ানক উদ্বিগ্ন। ঢাকায় রায়ট লেগেছে—এসব কথা কেন জানি বারবার মনে পড়ছে।" *(প্রাগুক্ত)*

জব্বরের মধ্যে কোনও প্রকার উৎকণ্ঠা ছিল না। হিন্দুবিদ্বেষ, দুটো তাঁত কেনার লোভ এবং নারীর প্রতি লালসা, তাকে মানসিকভাবে অপরাধী করে তুলেছিল।

মেলায় যে ভয়ংকর হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয়েছিল তার নেপথ্যে জব্বরের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট। একটি হিন্দু মেয়ের শ্লীলতাহানির জন্য যখন মুসলিম যুবককে বন্দি করা হয়, তখন জব্বর প্রস্তুত হয়েছিল প্রতিআক্রমণে—

"সে প্রায় যেন যোজন দূরে লাফ মেরে যেতে পারে, তেমনি লাফ দিয়ে ছুটে গেল এবং ভিড়ের ভিতর পড়ে হুংকার দিয়ে উঠল, কই লইয়া যান অরে।

কে একজন বলল কাছারি বাড়ি।

—হ্যায় কি করছে!

—স্তন টিপা দিছে।

—দিছে ত কি হইছে।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২)*

এরপরই মেলা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। একদিকে হিন্দুরা, অপর দিকে মুসলিমরা। দু-পক্ষের সংঘর্ষে রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল মেলার মতো মিলনস্থল।

ঠিক সামুকে নকল করে ভাষণ দিয়ে মুসলিমদের উত্তেজিত করেছিল জব্বর—

"সে সকলকে বলছিল, আপনেগো ইজ্জত নাই। আপনেরা গরু ঘোড়া আর কতদিন হইয়া থাকবেন। ঠিক সামুর গলার স্বরে সে চিৎকার করছিল। এত মানুষজন দেখে ওর কেমন জুস এসে গেছিল ভিতরে।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩)*

মেলার বিশৃঙ্খলায় সেদিনই মালতীর সর্বনাশ হতে যাচ্ছিল। জব্বরের সঙ্গী করিম শেখ মেলাতে কিছুক্ষণ আগেই মালতীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। এলোমেলো অবস্থার মধ্যে মালতীকে সেদিনই করিম শেখ অপহরণ করতে চেয়েছিল, পারেনি। রঞ্জিত আর ঈশম শেখের কৌশলে মেলা থেকে নিরাপদে পালাতে পেরেছিল মালতী ও ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা। করিম শেখ কিন্তু আশা ছাড়েনি। জব্বরও সুযোগ বুঝে তার মালতী-লিপ্সাকে আরও প্রলুব্ধ করে এবং পাঁচশো টাকায় রফা হয় তাদের। করিমের নৌকো এবং লোকজনের সাহায্যে এক রাতে মালতীকে অপহরণ করে জব্বর। কোনওক্রমে একবার নৌকো থেকে পালাতে সক্ষম হলেও মালতীকে ধরে ফেলে জব্বররা এবং সারা রাত ধরে চলে গণধর্ষণ—

"...সারারাত সংজ্ঞাহীন মালতীর কোমল শরীরে পাশবিকতার সাক্ষ্য রেখে মৃত ভেবে কবরভূমিতে ফেলে অন্ধকারে ওরা সরে পড়ল সকাল হতে না হতেই। শেয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খাবে যুবতীকে কেউ টের পাবে না, বনের ভিতর এক যুবতী মাইয়া মইরা পইড়া আছে।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫)*

প্রায় মৃত মালতীকে শুশ্রূষা দিয়ে খানিকটা সুস্থ করেছিল জোটন ও ফকিরসাব। নরেন দাসের বাড়িতে তাকে পৌঁছিয়েও দিয়েছিল তারা। কিন্তু সমাজের যে বৃত্ত থেকে মালতী চ্যুত হয়েছিল, সেখানে আর প্রতিস্থাপিত হয়নি কোনওদিন।

জব্বরের অপরাধের কোনও সীমা ছিল না। সে শুধু মালতীকে হরণ ও নষ্ট করেনি, যুগ-যুগান্তের বিশ্বস্ততাকে বিনষ্ট করেছিল। অন্য ধর্মের নারীকে লুণ্ঠন করার ঘটনা পূর্ববঙ্গে দীর্ঘকাল ঘটেনি, কিন্তু দেশভাগকালীন সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার স্রোতে চরিত্রহীন করিম শেখ বা জব্বর সাহস পেয়েছিল নারীহরণের। বস্তুত দেশ ও কালকে এই বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেবার দায় সামুদেরও কম ছিল না। 'নারায়ে তকদির', 'আল্লা হু আকবর', 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান', 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'—ইত্যাদি উত্তেজক কথা প্রচারের সময় সামুরা বিস্মৃত হয়েছিল জব্বর, আকালু, ফেলু-র কাছে স্বাধীন দেশ-এর অর্থ ছিল ধর্মীয় বিদ্বেষ। হিন্দুদের আর্থ-সামাজিক প্রতিপত্তি দীর্ঘদিন ক্ষুব্ধ রেখেছিল মুসলিমদের। তার সঙ্গে ছিল ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার। সোনাদের ভৌমিকবাড়ির ছোটোরাও এই বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিল। ফতিমাকে ছোঁয়ার জন্য একাধিকবার হেনস্থা হয়েছিল সোনার। একবার মায়ের কাছে চরম

তিরস্কার ও প্রহার জুটেছিল তার—

"ধনবৌ ভীত হয়ে পড়েছে। কারণ, এখন এই ভোরে শাশুড়িঠাকরুন জাতনান নিয়ে অনর্থ বাধাবেন। বাছ-বিচারের কথা বলবেন। অশুচির কথা, অমঙ্গল ডেকে আনছে—আরও কত রকমের কথা হবে কে জানে। সুতরাং ধনবৌ ভাতের থালা রেখে বলল, সোনা বাইরে যাও। তুমি স্নান কর আগে।... সোনা বলল, 'না আমি সান করমু না। আমার ক্ষুধা লাগছে। আমারে খাইতে দ্যাও।... বাইরে শাশুড়িঠাকরুনের গজগজ করা ক্রমে বাড়ছে। সোনা কিছুতেই উঠছে না। এইসব হেনস্থার জন্য একমাত্র সোনাকে দায়ী ভেবে, সোনার পিঠে ধনবৌ অমানুষিকভাবে আঘাত করতে থাকল।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬-৯৭)*

এই অসঙ্গত শুচিগ্রস্ততার সঙ্গে ছিল ধর্মপালনের আড়ম্বর। মোষ বলির চিত্র এঁকেছেন ঔপন্যাসিক। সরকারবাড়ির বাস্তুপূজার বলির দৃশ্য রীতিমতো নির্মম—

"পেটে মাথা নিয়ে মোষ চলেছে, মাঠের ওপর, ঘাসের ওপর বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়ছে—ধর্ম আমাদের সনাতন, এত কচি মোষ তল্লাটে বলি হয় না। ...বিলের গরীব দুঃখী মানুষগুলি যারা শালুক তুলতে এসে জলের ভিতর সাদা হয়ে যাচ্ছে... তারা পাড়ের ওপর দেখল বিন্দু বিন্দু এক ঝাঁক পাখির মতো মানুষগুলি কাঁধে মোষ নিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার কাটা মোষের পেটে মাথাটা হড়কে নিচে পড়ে গেল! এত খাড়া ছিল বিলের পাড় যে পড়বি তো পড়বি একেবারে সেই গরীব দুঃখীদের পায়ের কাছে। সহসা এমন কাণ্ড! ধড়বিহীন মুণ্ড ওদের পায়ের কাছে পড়ে আছে।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫)*

মুড়াপাড়ার জমিদারবাড়ির পুজোতেও এই নৃশংস দৃশ্যর সাক্ষী হয়েছিল সোনা। মোষ বলির পর তার রক্ত নিয়ে বীভৎস লীলা শুরু করেছিল লোকজন—

"যারা রক্ত কাড়াকাড়ি করে নিয়ে যাচ্ছে কচুপাতায় অথবা কলাপাতায়, যারা খুরি আনতে ভুলে গেছে তাদের থেকে সোনা সরে দাঁড়াল। ওরা কেমন পাগলের মতো হাতে পায়ে রক্ত লাগিয়ে ছুটোছুটি করছে।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫)*

ঠাকুর পূজার নামে এই নৃশংসতায় কোনও পাপবোধ ছিল না হিন্দুসমাজের। তবে ধর্মোন্মাদনার নির্মম চিত্র যেমন সুলভ ছিল পূর্ববঙ্গে, তেমন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিরও অভাব ছিল না। ছোঁয়াছুঁয়ির অধ্যায়টুকু বাদ দিলে দেখা যায় একে অপরের শোকে-আনন্দে-অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছে হিন্দু-মুসলিমরা। ভৌমিকবাড়ির সবথেকে কাছের মানুষ ছিল ঈশম শেখ। ক্ষুধার্ত জোটনকে মাছ, ভাত খাইয়ে তৃপ্তি দিয়েছে ঠাকুরবাড়ির গিন্নিরা। মন্দিরের সঙ্গে একাধিক মসজিদেরও রক্ষণাবেক্ষণ করতেন মুড়াপাড়ার জমিদাররা। আস্ত একটি হাতি তারা তুলে দিয়েছিল জসিমের হাতে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সংহতির এই সুস্থ চেহারা বিনষ্ট হতে থাকে কতিপয় মৌলবী ও কয়েকজন দুর্বৃত্ত মানুষের সৌজন্যে। সঙ্গে অবশ্যই ছিল নেতাদের উস্কানি।

সোনাদের গ্রামে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ না ঘটলেও চারপাশে দানা বাঁধছিল অশান্তির আবহ। মেলায় বন্দি হওয়া যুবকটির নাম আনোয়ার, ধর্মে মুসলমান। তাই মেলায় তাকে ঘিরে উত্তেজনার সৃষ্টি করে মুসলিমরা, চলে সংঘাত, অগ্নিসংযোগ, নারী লুণ্ঠন। ঈশম বিভ্রান্ত হয়েছিল এইসব দেখে—

"গোটা মেলাটা ক্ষেপে গেছে। চারপাশে আগুন। এই আগুন যেন কতকাল থেকে মাটির ভিতর এতদিন আত্মগোপন করেছিল। কতদিনের অপমান এইসব মানুষ হজম করে এখন বদলা নিচ্ছে। সে কি করবে ভেবে পেল না। আগুনের ভিতর দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে থাকল, "সোনাবাবু কি গ্যালেন গ। লালটুবাবু। আমি গাঁয়ে ফিরব কি কইরা। মুখ দ্যাখামু কি কইর‍্যা।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪)*

ধর্মীয় উন্মাদনার অপর এক ঘটনা ঘটেছিল মুড়াপাড়ায়। মৌলবীর দল উত্তেজনা তৈরি করেছিল একটি ভাঙা মসজিদকে কেন্দ্র করে। তারপর সেই মসজিদে নামাজ পড়তে শীতলক্ষ্যার চরে জড়ো হয় কয়েক হাজার মুসলিম। আর নদীর ওপারে অর্থাৎ মুড়াপাড়ার দিকে জড়ো হয়েছিল হিন্দুরা। ভূপেন্দ্রনাথ কাছারিবাড়ির সর্বপ্রধান মান্য ব্যক্তি। নামাজ পড়া উপলক্ষ্যে জমিদারবাড়ি লুঠপাট সহ অন্য অনেক দুরভিসন্ধি রয়েছে বুঝে উচ্চপদস্থ পুলিশকর্তা ও সশস্ত্রবাহিনী আনিয়েছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ। তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন এই উন্মাদনা দেখে—

"এতবড় একটা ধর্মযুদ্ধের মোকাবিলা প্রায় বলতে গেলে তাকেই সবটা করতে হয়েছে। সাধারণ মনুষ্য তোমরা। তোমাদের ধর্মের নামে ক্ষেপিয়ে দিয়ে পিছনে মাতব্বর মানুষেরা তামাশা দেখছে। আমাদের রক্ত সনাতন। মা করুণাময়ী মায়ের আশ্রয়ে আমরা আমাদের আবার ভয় কি!" *('নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৬)*

ভূপেন্দ্রনাথ আরও বিস্মিত হন ফেলুকে দেখে। যে গরুর জন্য সে প্রাণপাত করে ঘাস সংগ্রহ করে, সেই গরুকেই ফেলু এতদূর নিয়ে এসেছে কোরবানি দেবার জন্য—

"ফেলু এসেছে এই চরে। আর তার হাতের কাছে ওর সেই বাগি গরুটা। গরুটাকে সে এত দূর টেনে নিয়ে এসেছে। এই গরুর জন্য ফেলুর প্রাণপাত। সে এই গরুটাকে শেষে কোরবানী দিতে নিয়ে এসেছে!" *(প্রাগুক্ত)*

ধর্মোন্মাদ মুসলিম মানুষগুলি যখন মরিয়া হয়ে নদীর অন্যপারে যাত্রা শুরু করেছে তখনই শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা করে পুলিশবাহিনী। কোথা থেকে একটি বর্শা এসে আঘাত করে ইসমাইল দারোগাকে। তারপরই দারোগা রক্তাক্ত মুখ ঢেকে বলেন 'ফায়ার!'—

"শিলাবৃষ্টির মতো সেই উচ্ছৃঙ্খল জনতা চরে ছড়িয়েছিটিয়ে পড়ল। নিমেষে চর

ফাঁকা। সূর্যাস্তের লাল রঙ, আর কত মানুষের তাজা রক্তে মাটি ভেসে যাচ্ছে। আর সেই কোরবানীর পশুগুলি পড়ি-মড়ি করে ছুটছে। ফেলু ছুটছে।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮)*

জমিদারবাড়ির ক্ষতি না হলেও পরিবেশ যে প্রতিকূল হয়ে উঠেছে ভূপেন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন। তাঁদের গ্রামে কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি, তবে বহুদিনই চারপাশে ঘটছিল অঘটন। হাজিসাহেবের ছোটো ছেলে আকালুদ্দিনের নেতৃত্বে চলেছিল এইসব ঘটনা—

"সে দশ-বিশ ক্রোশ দূরে-দূরে কোন কোন হিন্দু গ্রামে আগুন দিয়ে ফিরছে। তাকে ধরা যাচ্ছে না। সে আছে বেশ তার মতো। কারণ ওরা দল ভারি। শহর থেকে মানুষ আসে। কেউ বলছে ওরা ঢাকা শহরের মানুষ না, ওরা এসেছে কলকাতা থেকে। কেউ কেউ বলছে আকালুর এতে হাত নেই। আরও বড় গোছের নেতা এসব করাচ্ছে।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২)*

দেশভাগ পর্যন্ত এইসব ঘটনাবলি নিয়ে ভৌমিকরা চিন্তা করেননি। কিন্তু দেশভাগের পর আর স্বাধীন পাকিস্তানে থাকতে চাইলেন না ভূপেন্দ্রনাথ—

"শচী এলে বলল, তোমারে একটা কথা কই। বাবুগ লগে পরামর্শ করলাম। তারা বলল, যত তাড়াতাড়ি পার দেশ ছাইড়া পালাও। তোমার কি মনে হয়?

শচী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। সে জানে তার মানসম্ভ্রম, পারিবারিক মানসম্ভ্রম আর থাকছে না। তবু এই দেশ এবং মাটির জন্য সবার মতো ভিতরে একটা ভীষণ হাহাকার আছে। ছেড়ে যেতে যে কি কষ্ট! ভূপেন্দ্রনাথ শচীর মুখ দেখে সব টের পাচ্ছে। সে বলল, তোমার কষ্ট হইব জানি, বিদেশ বিভুঁইয়ে কি কইরা আহার সংগ্রহ করবা সেটাই বড় চিন্তা। তবে কি জান, গঙ্গার পারে অনাহারে মরলেও শান্তি।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪)*

অতঃপর দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয় ঠাকুরবাড়ি। তাদের দেখে আরও কয়েকটি হিন্দু পরিবারও দেশ ছাড়ার পরিকল্পনা নিয়ে ফেলল। দীনবন্ধু নামে তাদের প্রতিবাসী বললেন—

"আমরা-অ তবে যামু। ...এখানে থাকলে অভক্ষ্য ভক্ষণ করতে হইব। জাত-মান থাকব না।" *(প্রাগুক্ত)*

সোনারা অতি দ্রুত দেশত্যাগ করল। জমিগুলি বিক্রি হল হাজিসাহেবের ছেলেদের কাছে আর বসতবাড়ি বিক্রি হল প্রতাপ চন্দের ছেলেদের কাছে। যৎসামান্য আর্থিক সঙ্গতি নিয়ে পূর্বপাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে এল সোনারা। শুরু হল জীবনের কঠিনতম অধ্যায়।

* * * *

দেশভাগ তথা রাষ্ট্রবিভাজন শুধু একটি রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক প্রক্রিয়া

নয়। রাষ্ট্রভাগ ও পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কতিপয় ব্যক্তিত্ব। আর এর পরিণাম ভোগ করে লক্ষ লক্ষ মানুষ। ভারত বিভাজনের মতো গুরুতর ঘটনায় যথোপযোগী ব্যবস্থা নেয়নি ভারত পাকিস্তান দুই রাষ্ট্রই। স্বাধীন পাকিস্তান হিন্দু নাগরিকদের সুরক্ষায় বিশেষ উদ্যোগী হয়নি, আর স্বাধীন ভারত উদ্বাস্তু বাঙালি হিন্দুদের জন্য রাখেনি পুনর্বাসন ব্যবস্থা। ফলে সোনার পরিবার যখন পশ্চিমবঙ্গে এল তখন তাদের পরিচয় হল রিফিউজি। আশ্রয় মিলল রিফিউজি ক্যাম্পে। তারপর জঙ্গল জমি কেটে চলল বাসস্থান নির্মাণের প্রচেষ্টা। সোনার পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হল এই পারে। সম্পূর্ণ শ্রীহীন হয়ে গেল একটি সমৃদ্ধ পরিবার।

বড়ো জ্যাঠামশাই দেশভাগের আগেই নিখোঁজ হয়েছিলেন সোনাদের সংসার থেকে। মেজজ্যাঠামশাই ছিলেন সংসারের অলিখিত কর্তা। কিন্তু কর্মপ্রাণ ও ধর্মপ্রাণ এই মানুষটি গঙ্গার কাছে এসে কর্মপ্রাণতা হারিয়ে, হলেন শুধু ধর্মপ্রাণ। সংসারের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে কেবল গঙ্গাস্নানের পুণ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকলেন রাত দিন। ছোটো কর্তা শচী, বিয়ে করে সরে গেলেন যৌথ পরিবার থেকে। সংসারে যে সামান্য আহারটুকু জুটত তা উপার্জন করতেন ধনকর্তা চন্দ্রনাথ। আয় নেই, উপার্জন নেই, অথচ যৌন মিলনের ফসলে সন্তান বেড়েছে সংসারে, এমতাবস্থায় অধিকাংশ দিন অনাহারে থাকত সোনারা। একসময় যাদের সংসারে ছিল অতিথির স্রোত, সেখানে এলে উদর পুরে খেত দরিদ্ররা, সেই সংসারই আজ অনাহারে অচল—

"বাবা দু'মাস পর পর ফেরেন, এখানে আসার পর সে আর বাবাকে হাসতে দেখেনি। মা রাতে কাঁথার ভিতর শুয়ে কষ্ট পান। শিয়রে একটা কুপি জ্বালতে থাকলে সোনা টের পায় মার চোখমুখ কতটা বিবর্ণ হয়ে গেছে। ...জঙ্গল সাফ করতে করতে বড়দার হাঁটু শক্ত হয়ে গেছে। ...রাত জেগে কুপি জ্বালিয়ে জেঠিমা সারারাত বুঝি চিঠি পড়েন। ...জেঠিমার এই মুখ দেখলে সোনা চোখের জল রাখতে পারে না। মা না খেয়ে শীতের কাঁথায় শুয়ে থাকলে তার পড়াশুনা করতে ভাল লাগে না।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১)*

দরিদ্র উদ্বাস্তু সংসারের সাক্ষী থাকে সোনা। অথচ তার অতীত ছিল কত গৌরবের, জন্মের সময় থেকেই সবার আদরের ছিল সোনা। ঈশমের সঙ্গে, জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বড়ো হয়েছে পূর্ববঙ্গের উন্মুক্ত প্রকৃতিতে। লেখক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শৈশবে দেখা প্রকৃতি বর্ণিত হয়েছে সোনার চোখ দিয়ে—

"সে ছুটছে ছুটছে। কিন্তু বেশি দূর ছুটতে পারল না। যব গম খেতের আলে পথ হারিয়ে ফেলল। ওর ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল।...

সে ভয়ে চোখ বুজে যখন পথ খুঁজছিল, যখন যথার্থই অন্ধকার নেমে গেছে মাঠে

এবং আশেপাশে শেয়ালেরা ডাকতে আরম্ভ করেছে, তখন ঈশম সোনাকে বুকের কোমল উষ্ণতায় ভরে দিল। বলল, কর্তা, আপনে আমারে ফালাইয়া যাইবেন কই?

এবার চোখ খুলল সোনা। দেখল সেই পরিচিত জায়গা, সেই প্রিয় বকুল গাছ... গাছের ছায়ায় অজস্র বকুল ফুলের গন্ধ। সোনা এবার নির্ভয়ে বলল, আমি কোনখানে যামু না ঈশম দাদা। আপনেরে রাইখা কোনখানে যামু না।" *('নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৫)*

বলা বাহুল্য বাল্যের প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেনি সোনা। ঈশমকে নিঃসঙ্গ করে দিয়ে এপারে চলে আসতে হয়েছিল সোনাকে। একটি রাজনৈতিক দুর্বিপাকে দিশা হারায় সব প্রতিশ্রুতি।

প্রকৃতি রাজ্যে সোনার অপর সঙ্গী ছিল সামসুদ্দিনের মেয়ে ফতিমা। মুড়াপাড়ার জমিদার বাড়িতে পুজোর সময় সোনার সঙ্গী হয়েছিল মেজকর্তা ও পলিনের দুই পরী সদৃশ অমলা কমলা। তাদের সঙ্গে অনেক আনন্দ করেও একটুকরো পাপবোধ তৈরি হয়েছিল সোনার মনে। অমলা তাকে শরীরী বাসনার প্রথম পাঠ দিয়েছিল সবার অলক্ষ্যে। বাড়ি এসেও সেই অন্যায় বোধ তাড়িত করত সোনাকে। কিন্তু ফতিমা ছিল ভিন্ন। সেখানে আকর্ষণ ছিল, প্রেম ছিল, কিন্তু গ্লানি ছিল না। গোপনে প্রকাশ্যে দুই অবোধ বালক বালিকা ঘুরে বেড়াত মাঠে ঘাটে জঙ্গলে—

"ফতিমা ফুলের ভিতর দিয়ে হামাগুড়ি দিল। সে লেবুর ঝোপে ঢুকে.সোনার পাশে একটা পোষা পাখির মতো মুখ করে ফুলের মরা ডালে সেই সব প্রজাপতি দেখল। আর অবাক ফতিমা— সে লক্ষ্যই করেনি, ঠিক পায়ের কাছে, একটা গন্ধরাজ ফুলের গাছ, গাছটা ফুলে ফুলে সাদা হয়ে আছে, নিচে সেই আশ্বিনের কুকুর শুয়ে শুয়ে লেজ নাড়ছে।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪)*

ফতিমা একটি নিষ্পাপ মেয়ে ছিল। গ্রামের অন্য মুসলিম বালিকারা যখন অশিক্ষিত ছিল, তখন সামসুদ্দিন ঢাকায় নিয়ে গিয়ে মেয়েকে লেখাপড়া শেখাত। কিন্তু এতেও বিনষ্ট হয়নি, ফতিমার সারল্য। প্রকৃতির বুকে সোনাবাবুর কাছে সে চেয়েছিল গভীর প্রতিশ্রুতি—

"আমি মরে যাব সোনাবাবু। আমি কাছে না থাকলে আমি মরে যাব। বলে শিশুর মতো দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকল ফতিমা।" *('নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', ২য় খণ্ড। পৃ.১৯০)*

ফতিমার আবেদনও রাখতে পারেনি সোনা। গ্রামে তার যে প্রিয় তিনজন মানুষ ছিল জ্যাঠামশাই, ঈশম, ফতিমা—তিনজনকেই পূর্ব পাকিস্তানে ত্যাগ করে এসেছিল সোনা। এ পারের তিন বছরের জীবনে অনটনের মধ্যে সে হয়ে উঠছিল পূর্ণবয়স্ক মানুষ। কর্তাবাবা সোনাবাবু নয় শ্রী অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক হয়েই কাজের

সন্ধানে ছুটতে হয়েছিল সোনাকে। সংসারের অভাব তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। ওপারে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল স্কুল পর্যন্ত। উচ্চস্তরের কোনও কর্মসংস্থান তার পক্ষে এপারে সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। সামনে ছিল জাহাজের খালাসির চাকরি। ব্রাহ্মণ পরিবারে বেড়ে ওঠা সোনা, খাদ্যাখাদ্য ছোঁয়াছুঁয়ির বিচারে অভ্যস্ত থাকা সোনা সমস্ত সংস্কার ত্যাগ করে দাঁড়িয়ে পড়ে খালাসি হবার প্রতিযোগিতায়। অসম্ভব অপমান, শারীরিক অত্যাচার সহ্য করেও চাকরি পেতে বদ্ধ পরিকর সে—

"শীতের সূর্য ওকে উত্তাপ দিচ্ছে। সে বাঁচতে পারবে এই উত্তাপে। সে এখানে হাতখরচ পাবে সাত টাকা। দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাবে। এটা যে ওর কাছে কি মহার্ঘ ব্যাপার, ক্ষুধায় সে কাতর এবং দুপুর হলেই বোট ডেকে বড় বড় কলাইকরা থালাতে ভেড়ার মাংস আর ভাত।...সে আজ খেতে না পেলে মরে যাবে। খাবারের জন্য সে আর যাই হোক অজ্ঞান কিছুতেই হবে না।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪)*

জাহাজের ডেকেই অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক শুরু করে হারানো নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজ। দেশবিভাজনের পরিণামে এক সম্ভাবনাময় তরুণকে জীবনের সব স্বপ্ন ছুঁড়ে দিয়ে ডুব দিতে হল জাহাজের ক্লেদাক্ত জীবনে—

"সোনার এত খিদে যে বিফ মটন সব এক হয়ে যাচ্ছে। তবু এক আজন্ম সংস্কার, তীব্র ঘৃণাবোধ সারা শরীরে দগদগে ঘা হয়ে ফুটে উঠল। তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় শরীর নীল হয়ে যাচ্ছে।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭)*

দেশবিভাজনের এই গ্লানি সহ্য করেছিল অপর এক চরিত্র। সে মালতী। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় স্বামী নিহত হওয়ার পর গ্রামে ফিরে এসেছিল বিধবা মালতী। তরুণী বিধবার দিন-রাত জুড়ে থাকত বিষণ্ণতা। তবুও বাল্যসঙ্গী সামসুদ্দিনের সঙ্গে বিবাদ করে বা বড়বৌর ভাই রঞ্জিতের সাহচর্যে ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠছিল মালতী। মাঝে মাঝে দাদার শ্রমিক অমূল্য বা জব্বরকে দেখে আশঙ্কিত হত সে। একরাতে আশঙ্কাকে কাজে পরিণত করেছিল জব্বর ও তার সঙ্গীরা। কবরভূমিতে ফকিরসাব ও জোটন যখন মালতীকে উদ্ধার করেছিল তখন সে প্রায় মৃত—

"জোটন কাঁপতে কাঁপতে দু'হাতে হোগলার বন ফাঁক করে দিতেই দেখল নদীর জলে প্রতিমা বিসর্জন দিলে, দশ হাত দুগ্‌গাঠাকুর যেমন চিৎ হয়ে থাকে, তেমনি মালতী হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। যেন অসুরনাশিনী।...বুকে মুখে এবং শরীরের যেখানে যা কিছু পুষ্ট সব হাতড়ে দেখল, না প্রাণ আছে। শুধু হুঁশ নেই। নাভির দিকটা কারা সারারাত খুবলে খুবলে খেয়ে গেছে। মৃতপ্রায় ভেবে মালতীকে কারা ফেলে চলে গেছে। শরীরের কোথাও কোথাও দাঁতের চিহ্ন। রক্তের দাগ।" *('নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৪)*

নৃশংস নির্যাতন ভোগ করে কোনওক্রমে বেঁচে থাকা মালতীকে সুস্থ করে

দাদার বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল জোটন ও ফকিরসাব। কিন্তু এরপর আর সুস্থ জীবনে ফিরতে পারেনি সে। এতদিন বোনকে স্নেহ করলেও মুসলিমদের ভোগ করা বোনকে পৃথক করে দিয়েছিল নরেন দাস—

"লক্ষ্মীর পট আছে, ধর্মাধর্ম আছে। ...তাকে আর ভিতর বাড়িতে নেওয়া যাবে না। জীবনে তার আর খোলা বাতাস, মুক্ত মাঠ, বর্ষার বৃষ্টিতে উদোম গায়ে ভেজা হবে না। সব তার হারিয়ে গেল।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭)*

মুসলিম দুর্বত্তরা তাকে ধর্ষণ করেছিল আর হিন্দু স্বজনরা তাকে ত্যাগ করেছিল। বিনা দোষেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল মালতীর জীবন। তার উপর ধর্ষণের পরিণামে সন্তানসম্ভবা হয়েছিল সে। জীবনের এই চরম দুঃসময়ে রঞ্জিত মালতীকে নিয়ে পলায়ন করেছিল গ্রাম ছেড়ে। উগ্র রাজনীতির সমর্থক রঞ্জিতকে প্রায় সব সময় আত্মগোপন করতে হত নানা বেশে, নানা আশ্রয়ে। আকালুদ্দিনের চরবৃত্তির সূত্র ধরে পুলিশ যখন ঠাকুরবাড়িতে উঠল, তখন রঞ্জিত মালতীকে নিয়ে গোপনে পলায়ন করল। অজানার উদ্দেশ্যে।

মালতী আর রঞ্জিত দুই নর-নারী মিলিতভাবে গড়ে তুলতে পারত নিটোল সংসার। কিন্তু রঞ্জিতের মহান আদর্শ, দেশাত্মবোধ, সক্রিয় উগ্রপন্থা এবং মালতীর বিবাহ-বৈধব্য তাদের মিলনের সুযোগ দেয়নি। এখন যখন তারা মিলিত হল তখনও সুখ দানা বাঁধল না তাদের মধ্যে। প্রথমে জোটনের কাছে গিয়ে মালতীকে গর্ভমুক্ত করল তারা। তারপর এল এপারে। কিন্তু রঞ্জিত বাঁচল না এপারে—

"...এদেশে এসেই কি অসুখে ভুগে ভুগে মরে গেল। মরে গেল না কেউ মেরে ফেলল ওকে, সে বোঝে না। মানুষটা তার আদর্শ ছেড়ে দিতেই আর বড়মানুষ থাকল না। ক্ষীণকায় হয়ে গেল। বাঁচার সব উৎসাহ নিভে গেল। তবু সে মানুষটাকে সারাক্ষণ স্বামীর মতো আদরযত্ন করেছে। রঞ্জিত কেমন নিরুপায় মানুষের মতো তাকাতো তখন। তুমি আমাকে মুক্তি দাও মালতী। ...রঞ্জিত নিজেই এপারে এসে ডঙ্কা বাজিয়ে চলে গেল।" *('নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', ২য় খণ্ড, পৃ. ২১১)*

রঞ্জিতের মৃত্যু হল, আর মালতী নেমে গেল চাল চোরাচালানের ব্যবসায়। দেশে থাকতে ঘুরে বেড়িয়ে, দাদা-বৌদির যত্নে যে মালতী ব্যস্ত থাকত হাঁসের খেলায়, এখন সে দরিদ্র চাল পাচারকারী। তার দলকে যখন ধরতে আসে এক বাবু তখন নিজের লজ্জা ত্যাগ করতে বাধ্য হয় মালতী—

"এই মাঠে বাবুটি মালতীর নগ্ন দেহ দেখে এতটুকু নড়তে পারল না। মালতী এই শস্যবিহীন মাঠে পাথরের মতো শুয়ে থেকে বলছে,

হুজুরের ইসছা

—হয়!

সেই হবার মুখে মালতী জীবনের সব অত্যাচারের গ্লানি দূর করার জন্য শক্ত দাঁত দিয়ে বাবুটির কণ্ঠনালী কামড়ে ধরল।...ওর দাঁতের মুখে রক্তের স্বাদ লেগে ছিল।...নোনা রক্তের স্বাদ চেটে চেটে চুষে নিচ্ছিল মালতী।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২)*

তৎকালীন রাজনৈতিক উথাল-পাতালের মধ্যে অদ্ভুতভাবে ভেসে গিয়েছিল মালতী। বৈধব্যের সঙ্গে যে নীলকণ্ঠ পাখি হারিয়েছিল তার জীবনে তা আর খুঁজে পায়নি মালতী। হিন্দু, মুসলিম দুই সমাজের চাপেই বিপর্যস্ত হয়েছিল তার ছোট্ট জীবন।

এই উপন্যাসের অপর দুঃখী মানুষ ঈশম শেখ। একসময়ে নৌকার মাঝি থাকা ঈশম, বয়সকালে নেমে এসেছিল স্থলভূমিতে। পঙ্গুবিবি, তরমুজ খেত আর ঠাকুরবাড়ির কাজকর্ম নিয়ে দিন কাটত ঈশমের। তবে কাজের ফাঁকে তার প্রাণ মন জুড়ে থাকত নদীর চরের তরমুজ। মণীন্দ্রনাথ যেবার উন্মাদ হয়ে আসেন কলকাতা থেকে সেবার সঙ্গে এনেছিল কয়েকটি গাছ গাছড়া। যেখান থেকে একটি লতা নিয়ে নদীর অনুর্বর চরে তরমুজ চাষ শুরু করেছিল ঈশম। দিনের পর দিন প্রাণান্তকর শ্রম করে চরের জমিকে উর্বর করে ফলন্ত তরমুজে ভরিয়ে দিয়েছিল ঈশম। বস্তুত সমগ্র উপন্যাসে ঈশম আর তরমুজ খেত হয়ে উঠেছিল অভিন্ন। দরিদ্র মানুষটির দিন রাত্রি সবই অতিবাহিত হত নদীর চরে—

"ঈশম লণ্ঠন হাতে তরমুজ ক্ষেতে নেমে গেল। সোনালী বালির নদীর চরে তরমুজ ক্ষেতে ছইয়ের ভিতর সারা রাত সে বসে থাকবে। খরগোশ অথবা ইঁদুর কচি তরমুজের লতা কেটে দেয়। রাতে সে বসে টিনের ভিতর ডংকা বাজাবে। অনেক দূর থেকে কেউ প্রহরে জেগে গেলে সেই ডংকা শুনতে পায়, শুনতে পেলেই ধরতে পারে— ঈশম, ঠাকুরবাড়ির বান্দা লোক, ঈশম এখন তরমুজ ক্ষেতে ডংকা বাজাচ্ছে। ডংকা বাজিয়ে ইঁদুর বাদুড় সব তাড়িয়ে দিচ্ছে।" *('নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭)*

'ঠাকুরবাড়ির বান্দা' ঈশম নিজেকে ভাবত 'আল্লার বান্দা'। সে কোরান শরিফ পাঠ করতে জানত না, ধর্মতত্ত্ব বুঝত না কিন্তু একনিষ্ঠ মুসলিম ছিল। যত্ন করে নামাজ পড়ত। প্রকৃতির সৃষ্টিতে মুগ্ধ হত, কিন্তু কোনওরকম ধর্মীয় উন্মাদনা ছিল না তার মধ্যে। তারই স্বজাতীয় মানুষগুলি যখন, স্বাধীন পাকিস্তানের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে, নামাজের নামে মিথ্যা উদ্যম ক্ষয় করছে তখন ঈশম ভাবে ঈশ্বরের করুণার কথা—

"নির্জন মাঠে, তার তখন কেবল মনে হয়, আল্লা এক, তার কোন শরিক নেই।" *('নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', ২য় খণ্ড, পৃ. [illegible])*

ঈশম পাকিস্তান চায়নি, দেশভাগ চায়নি, বরং উন্মত্ত ধর্মবিদ্বেষীদের সে তীব্র ঘৃণা করেছিল—

"কি যে হয়ে গেল দেশটাতে!

ঈশম নদীর চরে বসে তামাক খায় আর আবোলতাবোল বকে। মিঞারা খুব যে খোয়াব দ্যখতাছ। অগ খোদাইবা কোন দ্যাশে, নিজের দেশ ছাইড়া কবে কেডা কোনখানে যায়। ...কার দ্যাশ, কে বা দিবে, কে বা নিবে!" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩)*

এই ঈশমকেই চরম শাস্তি দিয়েছিল দেশবিভাজনের সিদ্ধান্ত। ঠাকুরবাড়ির কর্তারা যখন জমি-বাড়ি বিক্রয় করে চলে গেল, তখন নিঃসঙ্গ হয়ে গেল সে। বিদায়ের মুহূর্তে করুণভাবে নদীর চরে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে গিয়েছিল ঈশম। তারপর শুরু হয়েছিল সর্বনাশ। তরমুজের ক্ষেত কিনেই ঈশমের ছইটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল হাজিসাহেবের ছেলেরা। তার নিজস্ব দুকাঠা জমিও দখল করে নিয়েছিল স্বজাতীয় হাজির ছেলেরা। সোনাদের যাত্রার পর সেদিনই মারা গিয়েছিল ঈশমের বিবি। ঈশমকে একশো টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন ভৌমিক কর্তারা। কথা ছিল সে আবারও কাজ খুঁজে নেবে। কিন্তু তরমুজের ক্ষেত হারিয়ে, সোনাবাবুদের বিদায় দিয়ে ঈশম অসম্ভব নির্লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। স্বাধীন পাকিস্তানে সে স্বধর্মীয়দের কাছে ব্রাত্য ছিল—

"এতদিনে ঈশমের মনে হল তার সত্যি বয়েস হয়েছে। একটা কাজকামের দরকার—কিন্তু কোথায় করে! তেমন সে বাড়ি পাবে কোথায়! সে ঠাকুরবাড়ির বাঁধা লোক ছিল বলে তার অঞ্চলের জাতি ভাইরা ওকে বিধর্মী ভাবত। তা ছাড়া সে তো আর যেখানে সেখানে কাজ করে নিজের মান খোয়াতে পারে না। এভাবে যে ক'দিন চলে যায়।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩)*

নতুন কোনও কাজে ঈশমের আগ্রহও ছিল না। অভিমানে সে গ্রাম ছেড়ে চলে যায় অন্যত্র। কিন্তু থাকতে পারে না বেশিদিন। মনের ভ্রমে নিজের তরমুজ ক্ষেতে আবার চলে আসে এবং ভ্রম ভেঙে যায়—

"কুকুরটা ওর পায়ে ঘুরছে। জমির পাশে এসেই মনে হল, এ-জমি তার নয়। জমিটা যে হাজিসাহেবের বেটাদের দিয়ে গেছেন ছোটঠাকুর, এতদিন পর কথাটা ফের মনে হতেই ওর ভারি হাসি পেল।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩)*

তবুও জমি ছেড়ে নড়তে পারল না ঈশম—

"কুকুরটা বুঝতে পারছে না কেন তার মানুষ এমনভাবে পাতার নিচে লুকিয়ে পড়ছে। মাটিতে হাত-পা ছড়িয়ে উবু হয়ে আছে। নড়ছে না। মানুষটা যে মরে যাচ্ছে কুকুরটা তা বুঝতে পারছে না।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪)*

ঈশমের সঙ্গীহীন জীবনে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজের কর্তব্য পালন করেছিল কুকুরটি। অথচ অমানবিক ধর্ম পালন করে হাজিসাহেবের ছেলেরা। তারা চিনতে চায় না ঈশমকে। কারণ স্বাধীন পাকিস্তানে এই দরিদ্র মুসলিমকে উচ্ছিন্ন করেছিল হাজিসাহেবের বেটারা—

"ওর কাঠা দুই ভূঁই ছিল বাড়ির পাশে। সেটাও তারা কাঁচা বাঁশের বেড়ায় নিজের করে নিয়েছে। চিনে ফেললেই ভয়। যদি ওটা আবার সে ফিরে চায়। তবু ঈশম এ-পোড়া বাংলাদেশে আবার ফিরে আসতে চায়। আবার জন্ম নিয়ে চায়।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫)*

জীবদ্দশায় ঈশম কোনও সম্মান পেল না বাংলাদেশে। দুদিন মৃত অবস্থায় তরমুজ ক্ষেতে পড়ে থাকার পর তার দেহ ও আত্মাকে উদ্ধার করল সামসুদ্দিন। এই উপন্যাসেরই অপর এক ট্র্যাজিক চরিত্র ছিল সামসুদ্দিন। সেও পায়নি নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজ—

"ঈশম দেখতে পায় তখন তার নীলকণ্ঠ পাখিরা সব উড়ে গেছে কোথাও। হাতের তালিতে আর ওরা ফিরে আসছে না। ...সামসুদ্দিনের মনে হয়েছিল, তার পাখি আকাশে ওড়ে না, নদীর পাড়ে বসে থাকে। দেশভাগের পর পরই সে ভেবেছিল, তবে বুঝি আবার সব মিলে গেল— ...পাখি মিলে গেছে, দুদিন যেতে না যেতেই মনে হয় পাখিটা আর নীলরঙের নয়, কেমন অন্য রঙ হয়ে গেছে।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯-২৪০)*

এই চিত্রকল্পের আড়ালে আছে দেশভাগের ব্যর্থতা। স্বাধীন পাকিস্তানের লক্ষ্যে দিনের পর দিন মুসলিম লিগের হয়ে কাজ করেছিল সামসুদ্দিন। যদিও নিজের গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচনে হেরে গিয়েছিল সে, গ্রামে জব্বর বা আকালুদ্দিনের মতো দুশ্চরিত্র দুর্বৃত্তদের পরোক্ষ প্রশ্রয় দিয়েছিল, তবুও সামসুদ্দিনের সততার অভাব ছিল না। মালতীর প্রতি তার অভিমান ও অনুরাগ থাকলেও তার সর্বনাশের কথা ভাবেনি সে। জব্বরের পাশবিক আচরণে মর্মাহত ছিল সামসুদ্দিন। চরম সংঘাতের দিনেও ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। এই ব্যক্তিগত স্বচ্ছতার জোরে গ্রাম ছাড়িয়ে ঢাকার উচ্চশ্রেণির সমাজে উত্তীর্ণ হয়েছিল সামসুদ্দিন। মেয়ে ফতিমাকে ইংরেজি ও সংস্কৃত-র পাঠ দিয়ে বাংলাদেশের ভাবী প্রজন্মকে যথার্থ মানুষরূপে গড়ার স্বপ্ন দেখেছিল সামসুদ্দিন। কিন্তু স্বাধীন পাকিস্তানের জন্মমুহূর্তেই স্বপ্নভঙ্গ ঘটল সামসুদ্দিনের। পাকিস্তান অর্জন করেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দুভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল শাসকদল। সামসুদ্দিনের মতো বাংলাভাষী মানুষরা এর প্রতিবাদ করতে থাকে প্রবলভাবে—

"...সামু জানে চুপচাপ বসে থাকার সময় আর হাতে নেই। দেশের স্বাধীনতার পর আর এক সংগ্রাম গ্রামে মাঠে আরম্ভ হয়ে গেছে। সে দেখল জিন্নাসাহেব যখন বের হয়ে

যাচ্ছেন, তখন চারপাশ থেকে অযুতকণ্ঠে গলা মিলিয়ে কারা যেন বলছে, না না না। উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে না।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭)*

স্বাধীনতার কয়েকবছর পরই পূর্ব পাকিস্তানে জন্ম নেয় ভাষা আন্দোলন। বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেবার উদ্দেশ্যে বাংলাভাষী মুসলমানদের এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত পরিণত হয়েছিল রক্তক্ষয়ী সংঘাতে এবং পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে গড়ে উঠেছিল আবারও দুটি নতুন দেশ পাকিস্তান, বাংলাদেশ। সামসুদ্দিনকে ভাষা আন্দোলনের পুরোভাগে স্থান দিয়েছেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু সে নয়, এই আন্দোলনে জড়িয়ে গিয়েছিল ফতিমাও।

গ্রামে থাকতে ফতিমা ছিল সরল গ্রাম্যবালিকা। 'সোনাবাবু'র সঙ্গে প্রকৃতির বুকে খেলা করত ফতিমা। চন্দনের গন্ধ আসত সোনার শরীর থেকে, তাতেই মুগ্ধ হত ফতিমা—

"নাকে নথ দুলছে ফতিমার। কানে পেতলের মাকড়ি। নাকের বাঁশিতে সোনার নাকছাবি। ছাবির মুখটা চ্যাপ্টা চাঁদের মতো। কথা নেই বার্তা নেই সোনা ফতিমার নাকটা চ্যাপ্টা করে ধরে নাকের ভিতর সেই চ্যাপ্টা চাঁদ কি করে বাঁশিতে আটকে আছে দেখল। ফতিমার খুব লাগছিল নাকে। কিন্তু সোনাবাবু, ছোট্ট সোনাবাবু... শরীরে যার চন্দনের গন্ধ লেগে থাকে আর মাথায় কি সমধুর গন্ধ!" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭)*

ঢাকায় বাবার সঙ্গে প্রবাসী হবার পরও গ্রামে বারবার ফিরে আসত ফতিমা এবং জীবনের গল্প শোনাত সোনাকে—

"সোনা বলল, ফতিমা, তুই বড় হয়ে গেছিস।

—যান। ফতিমা ফিক করে হেসে ফেলল।

—হাঁরে দিদিকে বলে দেখ। সোনা সামসুদ্দিনের মাকে সাক্ষী মানল।...

সোনা বলল, আরবিতে কত পেয়েছিস?

আমি সংস্কৃত নিয়ে পড়ছি সোনাবাবু।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০)*

ছোঁয়াছুঁয়ির ভয় থাকলেও দুই গ্রাম্য বালক-বালিকা একত্রে ছুটে বেড়াত গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। ফতিমার হৃদয় মন জুড়ে থাকত সোনা। এমনকি ঢাকায় সফিকুরকেও সে শুনিয়েছিল সোনার কথা। সোনা পূর্বপাকিস্তান থেকে গিয়েছিল ভারতে, আর সফিকুর ভারত থেকে এসেছিল পূর্বপাকিস্তানে। তাই সফিকুর বলত—

"অ, তোমার সেই সোনাবাবু, যে আমার মতো নিজের দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮)*

প্রেমের সঙ্গে সোনার প্রতি অভিমানও ছিল ফতিমার। যেমন ছিল মালতীর

প্রতি সামুর। দেশভাগের পর সোনা চলে গিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। সেই বেদনায় সোনাকে আর স্মরণ করত না ফতিমা, উপেক্ষা করত দেশের হাতছানিকে। সফিকুরের সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়ছিল ভাষা আন্দোলনে। অবশেষে এল সেই ভয়ঙ্কর দিন। উনিশশো বাহান্ন খ্রিস্টাব্দের একুশে ফেব্রুয়ারি। আগের রাতে পোস্টার লেখে ফতিমারা। তারপর একুশ তারিখে রাজপথে নামল তরুণ তরুণীর দল। ফতিমার পাশে সফিকুর। রাস্তায় গর্জে উঠল শাসকের বন্দুক, নিহত হল সফিকুর, ফতিমার সামনে। বড় নির্মম সেই দৃশ্য—

"তাজা রক্তে তখন বাংলার ঘাস মাটি ফুল ভেসে যাচ্ছে। যা কিছু রঙ নীল অথবা সবুজ সবই কেমন লালে লাল হয়ে গেল। ...সফিকুর হাইকোর্টের সামনে তার জানপ্রাণ দিয়ে মায়ের সম্মান রক্ষা করেছে। ওর দু'হাতে শক্ত করে ধরা পোস্টার। ...সফিকুরের রক্তে পোস্টার ডুবে আছে। ...সফিকুরের চোখ বোজা, যেন সে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে আছে।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১-২৪২)*

সফিকুরের মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন হবে ফতিমা, এমনই ভাবনা ছিল সামসুদ্দিনের মনে। কিন্তু কার্যত তা ঘটেনি। সফিকুরের স্মৃতিতে বিনিদ্র রজনী যাপন করেছে ফতিমা, অথচ কাঁদেনি। বাধ্য হয়ে চিকিৎসক বন্ধুর পরামর্শে গ্রামেই মেয়েকে নিয়ে এসেছিল সামু। মেয়ের সঙ্গে সেও ফিরতে চেয়েছিল অতীতের সুখ দুঃখের দিনে—

"সে তার বন্ধুর পরামর্শ মতো এসেছে এই দেশে, বাংলাদেশে। নদীর চরে, তরমুজ ক্ষেতে, অর্জুন গাছের ছায়ায়, হাসান পীরের দরগায় সে যাবে। মেয়েকে বলবে, মা, এই আমার দেশ, সবার দেশ। এখানে তুই জন্মেছিস, আমি, মালতী, সোনা, ঈশমচাচা, ফেলু সবাই জন্মেছি। মা, এই দেশ, বাংলাদেশ। আমরা সবাই বাংলাদেশের মানুষ। তুই একজনের জন্য পাষাণ হয়ে থাকবি সে ঠিক না।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬)*

হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে যাদের নিয়ে বাংলাদেশের মূর্তি গড়তে চেয়েছে সামু, তারা সবাই পূর্ববঙ্গের মানচিত্র থেকে বিচ্যুত। সেই সোনার দিন আজ বিগত। তবু সামু ভুলতে পারে না মালতীকে। জীবন্ত হয়ে ওঠে ইস্তাহার ছেঁড়া নিয়ে তাদের কলহ। মালতীর জন্য শূন্যতায় যখন সামু আচ্ছন্ন, তখন অর্জুন গাছের নিচে 'হাউমাউ' করে কাঁদতে থাকে ফতিমা। দেশত্যাগের পূর্বমুহূর্তে বহু শ্রম দিয়ে ছুরির সাহায্যে বাড়ির অর্জুন গাছে কিছু লিখে গিয়েছিল সোনা। ঠাকুরবাড়ির শূন্য বাসভূমিতে সেই অর্জুনগাছের তলায় কাঁদতে বসে ফতিমা। তার সঙ্গিনী আনজু বিস্মিত হয়ে লেখাগুলি পড়ে—

"সে অক্ষরগুলো পড়ছে। গাছ বড় হয়ে যাওয়ায় অক্ষরগুলো আরও বড় হয়ে গেছে। যেন দেশের মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর জন্যই অক্ষরগুলো যতদিন

যাবে তত বড় হয়ে যাবে। বাংলাদেশের মানুষ বড় বড় হরফে পড়বে, জ্যাঠামশাই, আমরা হিন্দুস্থানে চলিয়া গিয়াছি—ইতি সোনা।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭)*

ক্রন্দনরত মেয়েকে এই দৃশ্য উপলক্ষে কোনও সান্ত্বনা দিতে পারল না সামু, এরপর তার দায়িত্ব পড়ল মৃত ঈশম চাচার মৃতদেহ উদ্ধার ও তার শেষকৃত্য সমাপনের। যেখানে ফেলু শেখের মতো ভয়ানক মানুষের সমাধিতে ভালোবাসার সাক্ষর রেখে যায় হাজিসাহেবের মাইজলা বিবি, সেখানে ঈশমের দাবি আরও অধিক ছিল। সামু এখন মান্য গণ্য মানুষ। তাই তার ইচ্ছামতো তরমুজ খেতের খানিকটা জমি বরাদ্দ হল ঈশমের জন্য। ঈশমকে বাংলাদেশের প্রতীক করার জন্য ইস্তাহার লিখল সামু, বলা বাহুল্য এই ইস্তাহারে পাকিস্তান নয়, উঠে এল বাংলাদেশের কথা—

"ঈশমের কবরে সামু এবার নতুন একটা ইস্তাহার লিখে রেখে দিল। ইস্তাহারটার নাম বাংলাদেশ। ...ভূমিহীন অন্নহীন ঈশমের কানে কানে মাটি দেবার আগে বলার ইচ্ছা হল, কিছুই করতে পারিনি এতদিন। স্বাধীনতার মানে বুঝিনি। আপনাকে দেখে মানেটা আমার পরিষ্কার হয়ে গেল।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮)*

কবর দেবার সূত্রেই বাংলাদেশের অপর এক সন্তান সোনাকে মনে পড়ে সামুর। একদা সামসুদ্দিনের স্বাধীন পাকিস্তানের আঘাতে দেশ ছেড়েছিল সোনার মতো ভূমিপুত্র। এখন নিজের ভুল বুঝে গভীর অভিমান ও অনুশোচনার মধ্যে ঈশমও সোনাকে একবিন্দুতে নিয়ে আসতে চাইল সামসুদ্দিন। দুঃখের বিষয়, মহানগর পেরিয়ে জাহাজে কাজ নেওয়া ছিন্নমূল সোনা জানতেও পারল না তার ঈশমচাচা মৃত। আরও জানতে পারল না, পুরাতন দেশ ধীরে ধীরে নতুন হয়ে উঠেছে, সেখানে তৈরি হচ্ছে তার জন্য নতুন আবাহন সঙ্গীত। ভারত বা পাকিস্তান নয়, সেই নতুন দেশের নাম বাংলাদেশ। সামসুদ্দিনরা এই দেশের রূপকার। ঈশমকে মাটি দিতে দিতে সোনাকে ফিরে পেতে চাইল সে—

"যার মাটি পেলে আপনি সবচেয়ে খুশি হতেন চাচা, সে নেই। সে থাকলে তাকে বলতাম, তুমি এসে একটু মাটি দিয়ে যাও বাবু। ওঁর আত্মা বড় শান্তি পাবে। সে, বেইমান চাচা। আপনাকে ফেলে সে চলে গেছে। লিখে গেছে, জ্যাঠামশাই, আমরা হিন্দুস্থানে চলে গেছি। যেন জ্যাঠামশাই ছাড়া তার বাংলাদেশে আর কেউ নেই।" *(প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮)*

পুরাতন ভুল সংশোধন করে নতুন এক স্বপ্ন নির্মিত হল সামসুদ্দিনদের হৃদয়ে। শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের জন্ম প্রক্রিয়া বা নতুন নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজ। সোনা বা মালতী হয়তো সেই দেশে আর ফেরেনি, কিন্তু সেখানে রক্ষিত হয়েছে বাংলা মায়ের সম্মান। অক্ষত থেকেছে বাংলার সংস্কৃতি ও ভাষা। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে

ভারত তথা বাংলার বিভাজন, নির্মাণ, পুনর্নির্মাণের এই বাস্তব আখ্যানকে গভীর সহমর্মিতা, অভিজ্ঞতা ও উৎকৃষ্ট সৃষ্টি প্রতিভা দিয়ে উপন্যাসে যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, তা বাংলা সাহিত্যের এক চূড়ান্ত বিস্ময়।

তথ্যসূত্র :

১. 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' (২য় খণ্ড), অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ। প্রকাশকাল—প্রথম খণ্ড, ১৯৯১, ষষ্ঠ সংস্করণ। দ্বিতীয় খণ্ড, জুলাই ১৯৯৪, এপ্রিল।
২. 'মানুষের ঘরবাড়ি'—অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, অখণ্ড, ২০০৯।
৩. বইয়ের দেশ—এপ্রিল-জুন, ২০১২।
৪. গল্পমালা-১—নরেন্দ্রনাথ মিত্র, আনন্দ, ২০০৩।
৫. দেশভাগের কবিতা—সংকলন ও সম্পাদনা : শঙ্করপ্রসাদ চক্রবর্তী, একুশ শতক, ২০১০।

সোনালি মুখোপাধ্যায়

জন্ম : ১৯৭১ সাল। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলা ঘুরে বেড়ে ওঠা। পেশা অধ্যাপনা। ছোটোগল্প নিয়ে ২০০৩ সালে পি.এইচ.ডি.। প্রকাশিত গ্রন্থ : 'বাংলা গল্পে অপ্রধানের প্রাধান্য' ও 'আলোকময়ীদের কথা : মহিলা সম্পাদিত সাময়িক পত্র : 'প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্ব'।

রাজা গোপালের আত্মচরিত : আত্মসংশয়ের বয়নশিল্প

সুমিতকুমার বড়ুয়া

কবি সন্ধ্যাকর নন্দী প্রস্তাবিত 'মাৎস্যন্যায়' শব্দটি বহুল প্রচলিত এবং সর্বজনমান্য। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে বাংলায় মাৎসন্যায়ের সংকটকালে জনসাধারণের সম্মতিতে একজন রাজা হলেন, তার নাম গোপাল। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন—

"রাজলক্ষ্মী কাহার ভুজ অবলম্বন করিবেন? রাজকুলকে প্রত্যাখ্যান করিয়া এবার তিনি বিশিষ্ট এবং যোগ্য ভুজাশ্রয় করিতে উদ্যত হইলেন; সম্মিলিত প্রজারা অরাজকতা নিবারণের উপায় উদ্ভব করিলেন। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য প্রজারা উহারই ললাটে রাজচিহ্ন-লাঞ্ছন লিখিয়া দিল এবং কণ্ঠে বিজয়মাল্য দোলাইয়া দিল। এই ভাগ্যবান ব্যক্তি গোপাল।"

বাঙলা দেশকে অত্যাচার থেকে বিমুক্ত করতে গোপালকে বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ করতে হয়েছিল—তিব্বতী তারানাথ তা লিখেছেন। Cuningham's Survey Report, Vol. XV অনুযায়ী— "After seven years Gopal who had been elected king managed to free himself and obtained the kingdom." নারায়ণদেবের তাম্রশাসনেও গোপাল কর্তৃক কামাচারগণের দৌরাত্ম্য নিবারণের কথা উল্লিখিত হয়েছে। সম্ভবত গৌড়দেশে শাসন-শৃঙ্খলা আনাই গোপালের প্রধান প্রচেষ্টার বিষয় হয়েছিল। তিনি গৌড়ে সম্যক্ অধিকার স্থাপন করেছিলেন, দীর্ঘকাল নানা যুদ্ধবিগ্রহে পারদর্শিতা দেখিয়ে তিনি রাজারূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আচার্য সেনের মন্তব্য—

"গৌড়মণ্ডলের রাজারা যুগে যুগে যে সমাজ-সংস্কার করিয়াছিলেন, গোপালই তাহারই অন্যতম আদি পথ-প্রদর্শক।"

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাজা গোপালের আত্মচরিত' গল্পে যে গোপালের সাক্ষাৎ পাব, সে রাজা নয়, রাজা হওয়ার ক্ষেত্রে স্বপ্ন দেখে। গোপাল কারখানার শাড়ি বয়নের দক্ষ শিল্পী, শ্রমিকদের নেতৃত্বের দায় তার কাঁধে। সে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখে। সারি সারি তাঁতে কাপড়ে মিহি সুতোর ফুল তুলছে তার পাশের মানুষগুলো। সোনার মাকুতে রুপোর ববিন যেন চেনা চেনা লাগছে। এক সময়কার বিচিত্র পেশার সঙ্গে যুক্ত অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় কারখানার পরিচালকও ছিলেন। কারখানার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তাঁর কলম অব্যর্থ। তাঁর কলমে গোপালের স্বপ্নের বয়ন অসামান্য রূপ পায়—

"...শানার ওপাশে দু'সারি 'ব'; 'ব'-এর ভিতরে ফুলগুলি অথবা ফুলেরা নেচে নেচে যেন শানা অতিক্রম করে দপ্তির এপাশে এসে গেল, সব ফুল হয়ে গেল, মুক্তোর মতো সেই ফুল কাপড়ের গায়ে গায়ে লেগে গেল। সোনার মাকু রুপোর ববিন নড়ছে, গড়াচ্ছে, আর মুক্তোর ফুল কাপড়ের গায়ে ফুটে উঠছে।"

শিল্পী চায় ধন নয়, মান—স্রষ্টারূপে স্বীকৃতি—বরমাল্য। শিল্পীর আত্মপ্রশংসা আত্মরতি কখনো বা তাকে ঘিরে রাখে, ঘিরে রাখে স্বপ্ন, যেখানে সে একচ্ছত্র অধিপতি—

"সেই ফুলের ভিতর গোপাল মুখ রেখে দেখল চেনা চেনা মানুষগুলো ওকে বাহবা দিচ্ছে—আহা গোপাল, তুমি গোপাল, নক্শিপাড় শাড়ি বানালে, তুমি গোপাল ঘন্টায় ঘন্টায় কত নক্শিপাড় শাড়ি বানালে, তুমি গোপাল উদয়াস্ত শ্রম করে নক্শি কাঁথার মাঠের মতো অথবা সুন্দর নীল আকাশের মতো, কখনো নদীর মতো, পাহাড় পর্বতে ছবি আঁকার মতো শাড়ি বানালে... আহা গোপাল, তোমাকে রাজা বানাব।"

জনগণের সম্মতি—পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালরাজ, অন্যদিকে তাঁতি গোপাল—দুজনের ক্ষেত্রেই জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। সব কিছুই পরিবর্তমান, কার্যকারণের অধীন। কালের নিয়মেই বন অপসৃয়মান, পথ আর একেবারে জনহীন নয়, কাঁচা পথ কংক্রীটের পথে, বনের বদলে ছোট ছোট মাটির ঘর, শনের চাল। রাজা অথবা নবাব সবারই অবস্থার ক্ষমতার পটপরিবর্তন ঘটে, আবার 'চালের নিচে গোপালের মতো কত ছোট মানুষ রাজা হবার স্বপ্ন দেখছে।' খুব নির্মমভাবেই অতীন গোপালকে 'ছোট মানুষ' রূপে চিনিয়ে দেন।

গোপাল সহসা স্বপ্নে চিৎকার করে উঠলে স্ত্রী নীহারকণা শীতের অন্ধকারে উঠে দেখে কোথাও আগুন লেগেছে কি না। কোথাও আগুন নেই বলে সে স্বামীকে আশ্বস্ত করতে চাইলেও গোপাল বলে ওঠে—'বৌ আমি রাজা হতে চাই না, লোকগুলো আমাকে রাজা করে দিতে চাইছে।' গোপাল অন্ধকারে কী যেন হাতড়ে খুঁজতে থাকে। তীক্ষ্ণ শীতেও তার কপালে ঘাম, ঘাড় গলায় ঘাম। স্ত্রী নীহারকণার কাছে গোপাল যেন অন্যভাবে রূপ পায়, ভয়ংকর অন্নাভাব গোপালকে কেমন ভীতু করে তুলেছে। দীর্ঘ রোগভোগের পর সে প্রচণ্ড শীতের ভেতর সামান্য জল এবং চাদরের আশায় নীহারকণার উদ্দেশে অপেক্ষমান। স্বপ্নের ভিতরে গোপাল ডুবে যেতে থাকে। স্বপ্নের ভিতরে উঠে আসে মালিক ধীরাপদবাবুর মুখ। তার বড় প্লাইমাউথ গাড়ি, বড় হলঘরে হাজার হাজার সোনার তাঁত, রুপোর ববিন, নানা রঙের আলো। আর গোপাল, 'সামান্য গোপাল' 'অমূল্য আভরণ' তৈরির ভিতর স্বপ্ন দেখত রাজা হবার। গোপাল কাজ পেতে মিলের সিটি শোনার জন্য অপেক্ষমান, কিন্তু তা আর বাজেনি। দাপুটে গোপাল আজ অসুস্থ, সম্বলহীন, বৌকে সাহসভরে

একটু তেষ্টা নিবারণের জল, শীতের কাঁথা দেবার কথা পর্যন্ত বলতে পারে না। তার বিশ্বস্ত কুকুর পর্যন্ত রাতে আর বাড়ি পাহারা দিচ্ছে না। নিঃস্ব সহায়সম্বলহীন গোপালের অভাব তাকে 'বড় বেশি ভীতু' করে তুলেছে। দীর্ঘদিনের শ্রমিক-মালিক বিরোধের কারণেই শ্রমিকরা নিঃস্ব হয়ে গেছে। অতীনের লেখার ধরনে একধরনের সংশয়, ব্যষ্টি সমষ্টির বিপর্যাস কাজ করে যায়। যেমন—গোপালের জন্য অথবা এই সব মানুষেরা যারা সুতোর জালে নক্ষত্র বানায় তাদের জন্য কিছুই রইল না।

মেরুপ্রদেশে পেঙ্গুইনদের বাস। তাদের শিকার ধরার কৌশলটি অভিনব। তীব্র ঠান্ডায় সমুদ্রের জলের উপর বরফের আস্তরণ পড়ে যায়। পেঙ্গুইনরা খাবার মাছ পায় না। কোনো কোনো স্থানে বরফ গলে ছোটো ছোটো গর্ত তৈরি হয়। সেইখানে পেঙ্গুইনরা সবাই গোল করে ঘিরে থাকে। সমস্যা হল জলে প্রচুর মাছ থাকলেও নামার অর্থ মৃত্যু। জলের তলায় ওৎ পেতে থাকে পেঙ্গুইন শিকারী সীল। গর্তের চারধারে পেঙ্গুইনরা পরস্পরকে ঠেলতে থাকে। কোনো এক সময়ে একটা পেঙ্গুইন গর্তের মধ্যে পড়ে যায়। আর সব পেঙ্গুইন লক্ষ রাখে গর্তের দিকে। যদি কিছুক্ষণ পরে জল লাল হয়ে যায় বুঝতে হবে ওখানে সীল রয়েছে, কাজেই গন্তব্য অন্যত্র। যদি না লাল হয়, তবে সব পেঙ্গুইন ওই গর্ত দিয়ে নেমে মাছশিকার করবে। পেঙ্গুইনদের ক্ষেত্রে যাই হোক না, মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, যে অগ্রগামী হয়ে মুক্তিসন্ধানী, তার দায় সবচেয়ে বেশি, নিরাপত্তা সবচেয়ে কম। গোপালের শ্রমিক-মালিক সম্পর্ককেন্দ্রিক স্বপ্নে শ্রমিক নেতা গোপালের নিয়তি ইঙ্গিতবহ—

"...যারা তাকে রাজা বানাতে এসেছিল, যারা গোপালের গৌরবে কোলাহল করছিল, জয় কি, অথবা গোপাল জিন্দাবাদ করছিল তারা গোপালের জন্য এবং নিজেদের জন্য বড় এক আগুনের কুণ্ড করে বসে আছে। সেখানে প্রথম গোপাল নিক্ষিপ্ত হবে, পরে ওরা নিজেরা।"

আর মালিক ধীরাপদ? অসৎ, লোভী, অমানুষ। হৃদয়হীন ধীরাপদ বাস্তব আর অবাস্তবের মায়ায় বিভ্রান্ত করে তোলে গোপালের স্বপ্নলোককে যা কিনা তীব্র বাস্তবেরই কুহক। অতীনের লেখাতেও তার রূপ বাস্তব অবাস্তবে মেশাে শি, মানবিক সংবেদন হারিয়ে সে অ-মানুষ, অন্যলোকের—

"ধীরাপদ এইসব নিঃস্ব মানুষের কথা ভাবল না, সে রাজার মতো রুমাল উড়িয়ে ঘোড়ায় চেপে অথবা কলকাতাগামী এক ট্রেন আছে যার নিচে-উপরে ধীরাপদ, লোভী ধীরাপদ ইচ্ছা করলে গোটা মিল তুলে নিয়ে ট্রেনের নিচে-উপরে বেঁধে হাওয়ায় ভেসে চলে যেতে পারে—তার কাছে সামান্য গোপাল আর গোপালের কুকুর! হায় ধীরাপদ—সেই যে কলকাতা গিয়ে বসে থাকল আর ফিরল না।"

এই হৃদয়হীনতার বিপ্রতীপে অতীন মানবিক ওম সঞ্চার করেন গোপাল আর নীহারকণার আচরণে। এত অভাব-অনটন, হা-অন্নের সংসারে তাদের দুই সন্তানকে বাঁচাবার তাগিদ, গর্ভবতী কুকুর শশীর জন্য উৎকণ্ঠা, সামান্য আবেগ আমাদের আশ্বস্ত করে।

২

অতীন সহজ উচ্চারণে সমাজতত্ত্বের অনেক নিগূঢ় সমস্যাকে কলমের আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। অর্থনীতির প্রেক্ষিতে ভোগ্যবস্তু বা কমোডিটি বাজারজাত বস্তু যা মানুষের প্রয়োজন মেটাতে উপস্থাপিত করা হয়। সুনির্দিষ্ট অর্থে ভোগ্যবস্তু হল অর্থনীতি সম্পর্কিত বস্তু বা সেবা যা প্রয়োজনানুযায়ী বাজার থেকে পাওয়া যায় এবং এর কোনো গুণগত তারতম্য থাকে না। অর্থাৎ তা একই রকমের ও বিশেষত্বহীন, তা একই রকম ও প্রতিস্থাপনযোগ্য। অতীন মানুষের ভোগ্যবস্তুতে পরিণত হবার করুণ ইতিহাসের কাহিনিকে এই গল্পেও উপস্থাপিত করেছেন। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান—জীবনযাপনের ন্যূনতম চাহিদার জন্য ধীরাপদর কাছে গোপাল বা তার মত হাজার মানুষ ধীরাপদর কাছে নিজেদের গচ্ছিত রেখেছে। ধীরাপদর ওদের জন্য কোনো আবেগ নেই। ধীরাপদর গাড়ি-বাড়ি-মহল্লার পিছনে গোপালরা রয়েছে। অথচ গোপালরা কারা? 'সবই ভোগের নিমিত্ত মাত্র'। গোপালদের দৃষ্টিতে ধীরাপদ 'দুষ্ট নিশাচর প্রাণির মতো অপরের অন্নে লোভী'। তার লোলুপ ইচ্ছা—"তোমরা হাজার মানুষ আমার ভোগের নিমিত্ত—পেলে শুধু ধরে ধরে খাই।" নীহারকণা গোপালের পাশে শুয়ে তাকে কামোত্তজিত করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। গোপালের কানে কেবল এক শব্দের অনুরণন—'পেলে শুধু ধরে ধরে খাই'। অতীনের বাক্যগঠন স্পষ্ট, সোজা তীরের মত, কাটা কাটা, অব্যর্থ। বাক্য গঠনের মধ্যে কোনো করিকুরি নেই, আপাত সরল বাক্যগুলি নিজেদেরই অমোঘ পরিণতিতে বহুব্যাপ্ত ভাবের ভাবক হয়ে ওঠে। বাক্যগুলি পাঠকের সঙ্গেও কেমন যেন মশকরায় মেতে ওঠে, লেখক বা পাঠকের প্রাজ্ঞতা ও অজ্ঞতার পেন্ডুলামের বিন্দু অস্থির হয়ে ওঠে—

"কারা যেন অন্ধকার রাতে নিশাচর প্রাণীর মতো হল্লা করছে আর বলছে—পেলে শুধু ধরে ধরে খাই। কি পেলে ধরে খাই? গোপালকে পেলে ধরে ধরে খাই। নীহারকণাকে পেলে ধরে ধরে খাই। নীহারকণা গোপালকে পেলে ধরে ধরে খায়। গোপাল ছাগল পেলে ধরে ধরে খায়। ধীরাপদ গোপালের মত মানুষ পেলে ধরে ধরে খায়।"

অলক্ষে খাদ্য-খাদক, শক্তিহীন-শক্তিমান, শোষিত-শাসকের যাপনের নির্মম উলঙ্গ সত্যের মুখোমুখি হই আমরা। তলায় থাকে ক্ষমতায়নের চোরা চিরকালীন

ইতিহাসের স্রোত।

অতীনের লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য—বক্তব্যসর্বস্বতায় তা কখনো বাঁধা পড়ে না। নিচু স্বরে তিনি ভাবনা-সংশয়-সংকল্পকে ছড়িয়ে দিতে পারেন। আর থাকে চাপা বিদ্রূপ। সমাজের নির্মম হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে কখনোই প্রতিবাদ, প্রতিরোধের উচ্চগ্রামে অতীন বাঁধা পড়েন না; একটা মেদুরতা, বিষাদময়তা, চাপা শ্লেষ আর নির্মোহ দৃষ্টি অতীনের লেখাকে নিঃসঙ্গ করে তোলে। অতীনের সৃষ্ট চরিত্র সেরা তাঁতি গোপালও 'নিজের স্বভাবদোষে' কেবল একাকী হয়ে উঠেছে। সারাদিন শ্রমের পর সে ঘরে না ফিরে ইউনিয়ন অফিসে বসে বড় বড় ইস্তেহার লিখত। শ্রমজীবীদের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সে সচেতন। ওদের দাবী সামান্য—মিল চালিয়ে যেতে হবে, অন্যায়ভাবে চার্জশিটপ্রাপ্ত শ্রমিকদের জন্য নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দীর্ঘদিনের এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা জমা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এইসব দাবিদাওয়া না থাকলেও মিল বন্ধ হয়ে যায়। মালিকশ্রেণির মিল বন্ধ করার কৌশল একদা কারখানার পরিচালক অতীনের জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে উঠে এসেছে। ধীরাপদর মত অসৎ মালিকরা জানে—সাধারণের টাকা থেকে নিজের নামে টাকা করতে গেলে কোম্পানিকে নানা পন্থায় লোকসান দিতে হয়। তখন মিল বন্ধ, চাকা বন্ধ হয়ে যায়। ধীরাপদও মিল বন্ধ করে কলকাতায় গিয়ে আর ফিরল না। সকালবেলা উঠে হা-অন্ন গোপাল অভ্যাসমতই ইউনিয়ন অফিসে চলে যায়। নীহারকণার কোনোক্রমে দুই সন্তানসহ সংসার টিকিয়ে রাখার প্রাণান্তকর কৌশলের সঙ্গে পরিচিত থেকেও গোপাল নিরুপায়। সকালবেলা উঠে নির্বাচনী ইস্তেহারের গালভরা প্রতিশ্রুতির ফোয়ারাকে দেয়াল থেকে তুলে আগুনের মধ্যে ফেলে শীতের উত্তাপ নেবার চেষ্টা করে। গন্তব্য ইউনিয়ন অফিস, অফিসে সভ্য সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে। গোপালের মুখে খবর পেতে সকলেই উন্মুখ। চারিদিকের নৈরাশ্যে কর্মীরা কেউ কেউ কলকাতার আশেপাশে কাজের খোঁজে, কেউ কেউ গ্রামে ভাজাভুজির ফেরিওয়ালা হয়েছে। নেতা গোপাল এইসব অভুক্ত মানুষগুলোকে আশার আলো আর যেন দেখাতে পারছে না। গোপাল প্রাণপণে নিজের গত রাতের স্বপ্নের কথা বলতে চায়। ইউনিয়ন অফিসে অন্যান্য দিন উত্তেজক কথা বলে টেবিল চাপড়ায়, মিল মালিকের জুলুমের কথা বলে সবাইকে উত্তেজিত করে। কিন্তু তার স্বপ্নের কথা শুনতে কারো আগ্রহ নেই, সকলেই প্রায় অফিস থেকে নেমে যাচ্ছে। গোপালের নাটক দিয়ে আরম্ভ করা কথার টানে ওরা ফিরে দাঁড়ায়। সে শক্ত মানুষের মতো টেবিল চাপড়ে কথা বলার চেষ্টা করে—

"আমরা কি হেরে গেলাম! আমরা কি ফের সোনার সুতোর পাহাড়-পর্বতের ছবি আঁকতে পারি না!"

সমবেত ইচ্ছায় 'রাজার এক রাজ্য' তারা বানাতে পারে, কিন্তু বেইমানি তারা করতে পারে না। গোপাল তবুও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মুষ্টি নিয়ে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। অতীনের অসামান্য বক্রোক্তি—

"পেটে অন্ন নেই। অন্ন ধীরাপদ গাড়িতে করে তুলে নিয়ে গেছে।"

৩

'The German Ideolagy'-তে মার্কস-এঙ্গেলস ভাবতত্ত্ব বা 'Ideology'-র ইতিহাসকে দুটি দিক থেকে দেখতে চেয়েছেন—প্রকৃতির ইতিহাস এবং মানুষের ইতিহাস। এই দুটি দিকই অবিচ্ছেদ্য। যতদিন মানুষের অস্তিত্ব থাকবে—এরা পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল থাকবে। সমাজের ভাবতত্ত্ব একটি মিশ্র সত্তা। তার পরিব্যাপ্ত আয়তনে রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থা, আইনের সংস্থান, নৈতিকতার প্রশ্ন, শিল্প ও নান্দনিকতা, দার্শনিক মীমাংসা, ধর্মবোধ ইত্যাদি বিষয় সংযুক্ত। সেই সঙ্গে প্রচলিত রিক্‌থ ও মতামতও যুক্ত থাকে। Raymond Williams-এর 'Marxism and Literature' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

i) 'a system of beliefs characteristic of a particular class or groups.'

ii) 'a system of illusory beliefs–false ideas or false consciousness–which can be contrusted with true or scientific knowledge.'

তাঁতশিল্পী নেতা গোপালের মনে গড়ে ওঠা এক বিশ্বাসতন্ত্র তাকে বিভ্রান্তকর বিশ্বাসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। সে মিথ্যা ধারণা ও চেতনায় কি স্ববিরোধিতায় আক্রান্ত নয়? রাজার মুকুট পরা শক্ত, ত্যাগ করা আরোও শক্ত! শিল্পী গোপাল, শ্রমিক নেতা গোপাল তার আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ। ইউনিয়নের পাণ্ডা গোপাল অন্য কাজে হাত দিলে পাছে 'বেইমানি' হয়, পাছে লোক অবিশ্বাস করে, অথবা গোপালের মতো মানুষ এ তল্লাটে নেই—নির্দোষ, আপন-পর ভেদাভেদশূন্য, যে কিনা সকলের 'রক্তের নিশান' নিয়ে অগ্রবর্তী—এই ভাবনাই গোপালকে তাড়িয়ে বেড়ায়। সংশয়ে-সংকটে-আত্মম্ভরিতায় বিভ্রান্ত গোপালের আত্মসংঘাতময় ভাবতত্ত্বের বিষয়টি তার সঙ্গে নির্মলের সংলাপে ফুটে উঠেছে। আমরা প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করছি—

"...সব সহসা বড় অন্ধকার হয়ে গেল। দিনেরবেলাতে সূর্য কে চুরি করে নির্মল? ...তোরা কি শালা উত্তাপের জন্যে সূর্য পকেটে পুরে রেখেছিস, বেইমানি করার জায়গা তোমরা আর পেলে না!

নির্মল বলল, আমরা বেইমানি করিনি দাদা।

—শালা তোমরা সূর্য আকাশে রেখেছ বলছ!

—হ্যাঁ। সূর্য আমরা আকাশে রেখেছি।

—তবে মিল চলবে না কেন? মিল আমরা চালাব। মিল কি ধীরাপদ চালায়।

—না।

—তবে বসে আছিস কেন? সকলকে ডাক। চাকাটা ঘুরিয়ে দি। আবার মিলের বাঁশি বেজে উঠুক। আবার গলগল করে চিমনি থেকে ধোঁয়া বের হোক। আমরা আবার ছুটতে ছুটতে আসি।"

গোপালের আপাত অসংলগ্ন প্রলাপকে একেবারে মিথ্যা বলে যেমন উড়িয়ে দেওয়া যায় না, আবার ফলিত সত্যের প্রেক্ষিতেও রাখা সমস্যাজনক। এই অস্থিরতা, নিরুপায়তা কাহিনির চরিত্র এবং পাঠক উভয়ের ক্ষেত্রেই সত্য। অতীন সহজ ভাবভঙ্গিতে এভাবেই লেখনীর সংবেদন জাগাতে পারেন, এখানেই তাঁর সিদ্ধি।

গোপালের চোখে অন্ধকার দেখা প্রসঙ্গটা এখানে বহুস্তরীয় অর্থকে ধারণ করে। গোপাল অনেক দিন থেকেই ক্ষীণদৃষ্টি। কারণ তার চোখ সূক্ষ্ম কাজে ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছিল। আর দীর্ঘদিনের অভাব গোপালকে পুরোপুরি অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দেয়। আশাহীন আলোহীন কবন্ধ সময়ের যথার্থ অবস্থাই তো অন্ধত্ব। গোপালের মনে অনেক অসংলগ্নতা গুঁড়ি মেরে বসে থাকে। মনে হয় সামনেই কোনো এক মাঠ আছে, সেখানে ধীরাপদ সূর্য বগলে নিয়ে ছুটছে। গোপালের মতো হাজার হাজার মানুষের আলো চুরি করে ধীরাপদ চলে যাচ্ছে। অতীন ধুয়োর তালে ব্যর্থতার গুমরানিকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন—

"ওরা ধীরাপদকে ধরার জন্য ছুটছে। কিন্তু চতুর ধীরাপদ হা হা করে হাসছিল আর ছুটছিল। পেছনের মানুষগুলো হা হা কাঁদছিল আর ছুটছিল।"

গোপাল অন্যসময় হলে বলত "ছোটো ছোটো। যতক্ষণ সূর্যকে কেড়ে নিতে না পারছ ততক্ষণ ছোটো।" তার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কণ্ঠে উৎসাহ কিন্তু অতীন দেননি। তার বলা বন্ধ, কেবল দেখল—ছাদের নিচে সাদা আলোর স্টিক, সোনার মাকুতে রুপোর ববিন, কাপড়ের জমিনে সাদা রঙের মুক্তোর নক্ষত্র ফুটে রয়েছে।

কাপড়ের জমিনে সাদা রঙের মুক্তোর নক্ষত্রপুঞ্জ। গোপালের নিরানন্দময় হতাশ্বাস জীবনের আশার আলোকবিন্দু। গোপাল খুঁটে খুঁটে সেই নক্ষত্রগুলোকে কোথাও ফেলতে চায়নি—'সে তার নক্ষত্র'। নক্ষত্র তো পেল না, কিন্তু সামান্য টেবিলটাকেও আঁচড়ে কামড়ে ভেঙে ফেলতে পারল না। তার বিলাপ আর আর্তনাদেই অতীন গল্প শেষ করেছেন। সব হারানোর বেদনায়, রিক্ততায় তা ধ্রুবপদের মাত্রা পায়—"আমার সূর্য দেখ ধীরাপদ চুরি করে নিয়ে যায়।"

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পটিকে কেন নেতিবাচকভাবে দেখছেন—এ নিয়ে পাঠকের মনে খেদ থাকতেই পারে। 'রাজা গোপালের আত্মচরিত' আমাদের স্বভাবতই

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিল্পী' গল্পটির কথা মনে করিয়ে দেয়। মানিকের গল্পের প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের শক্তি অতীনের গল্পে নেই। মানিকের গল্পে 'উৎসাহ' ভাব প্রধান, তাই বীররসে গল্পটির উত্তরণ ঘটেছে। অন্যদিকে অতীনের গল্পে উৎসাহে ভাঁটা পড়ে এসেছে 'শোক' ভাব, যা করুণ রসের দিকে গল্পটিকে ঠেলে দিয়েছে। রিক্ততা ও গ্লানির দুর্বহ ভারের কথা অতীন লিখলেও তাঁর লেখায় সংবেদনশীলতা আর মানবিক বোধের ওম জাগরুক থাকে। গল্পের নাম 'রাজা গোপালের আত্মচরিত'। পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের অনুষঙ্গ না এসে উপায় নেই। যিনি কিনা জনগণের সম্মতিতে রাজা হয়েছেন, স্বেচ্ছায় নয়। গোপালের ইচ্ছা কি সেখানে কোথাও স্থান পেয়েছে? রাজার দায়িত্ব কি তিনি সত্যিই চেয়েছিলেন? শ্রমিক নেতা গোপালের কার্যকলাপ কি স্বতোৎসারিত? নাকি শ্রমিকদের চাপানো দায়িত্ব বহন করতে হয়েছে? শিল্পী গোপাল, শ্রমিক নেতৃত্বদানকারী গোপাল, ভালোমানুষ গোপালের মধ্যে ঘটতে থাকা দ্বন্দ্বমুখরতা অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। স্বপ্নের রাজার ভাবমূর্তিকে বাস্তবে লালন করার মধ্যেও স্ববিরোধ, অসুস্থ আকাঙ্ক্ষার বীজ লক্ষ করা যায়। গল্পের কোথাও গোপালের রাজত্বের প্রসঙ্গমাত্র নেই, অথচ নামকরণের উল্লেখে কী তীব্র শ্লেষ লুকিয়ে নেই? অতীন 'কেন লিখি?' গ্রন্থে জানিয়েছিলেন—

"কেন লিখি এ-প্রশ্ন বড়ই অবান্তর। না লিখে আমার উপায় ছিল না। অস্তিত্বের সংকট থেকে লিখি। ...কিছুটা প্রতিবাদের মতো আমি আমার অনুভূতিমালা সমূহ লেখায় ধরে রাখার চেষ্টা করি।"

তাঁত শিল্পী বা শ্রমিক-নেতা গোপালের শেষ আতর্তিময় আর্তি—"আমার সূর্য দেখ ধীরাপদ চুরি করে নিয়ে যায়।"—এই অনুভূতিমালায় কী অতীনের নিজের কণ্ঠস্বর শোনা যায়?

সুমিতকুমার বড়ুয়া

জন্ম : ১৯৮৫ সাল, কলকাতা। প্রাবন্ধিক। পেশা : অধ্যাপনা।

জন্ম-মৃত্যু কথন : অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প

রাজীব চৌধুরী

কার্লোস ফুয়েন্তেস সম্পাদিত লাতিন আমেরিকার গল্প সংকলনের মুখবন্ধ স্বরূপ লেখায় ফুয়েন্তেস জানিয়েছিলেন ছোটগল্প-কথকের অবস্থানের কথা। 'The Storyteller' অর্থাৎ লেখক নয়, গল্প কথক। এই ছিল লেখার শিরোনাম। শুরু হয়েছিল উপন্যাস আর ছোটগল্পের তুলনাসূত্রে—

The novel is an ocean liner. The short-story, a sailboat hugging the coast. An Olympic team is required to write a novel. Singular as he or she may seen, the novelist is a team of painters, city planners, gossip columnists, fashion experts, architecets and set designers; a justice of the peace, a real estate agent, midwife, undertaker; a witch and a high priest, all in one.

The short-story writer the contrary is a lonely navigator. Why this fidelity to solitude? Why this need to be in sight of the coast? Perhaps because the storytellers know that if they do not tell the tale this very night, near the shore, with no time to cross the ocean, there might be no tomorrow. Every storyteller is a child of scheherazade, in a hurry to tell the tale so that death may be postponed one more time.

বাংলা কথাসাহিত্যে ঔপন্যাসিক এবং ছোটোগল্পকার—এই দুধারারই রচনাকারী লেখকের সংখ্যাই বেশি। শুধু উপন্যাস বা কেবল ছোটগল্প রচয়িতা—বিশেষত বিশ-একুশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে একেবারে হাতে গোনা। ফলত ছোটগল্প অনেক সময়ই হয়ে ওঠে সেই ঔপন্যাসিকের কলমে তৈরি একটি অধ্যায় বা উপন্যাসের প্রস্তুতি খসড়া কিংবা কোনো উপন্যাসেরই উত্তরভাষ্য জাতীয়। এবং এর উল্টোটাও। ছোটোগল্পকারের কলমে লেখা উপন্যাস। তবে এই বর্গের কথাসাহিত্যিকরা প্রত্যেকেই কিছু ভাল উপন্যাস এবং কিছু ভাল ছোটগল্প লিখেছেন। ফুয়েন্তেস-এর মতো করেই যেখানে দুয়ের প্রভেদ করা যায়। আসলে উপন্যাস- পরিচালক বা উপন্যাস-ব্যবস্থাপক যে অর্থে একজন ম্যানেজারের মতো, ছোটগল্পকথকটি ততটাই একা একটা ছিপনৌকো, যা নিয়ে সমুদ্রে যাওয়া অসম্ভব! তবু শেষ একটা কিছু বলার জন্যে; অল্প সময়ে তড়িঘড়ি বলার জন্যে মরীয়া সেই আরব্য রজনীর শেহরজাদীর সন্তানটি। কারণ মৃত্যু যদি আর একটি রাতের স্থগিতাদেশ পায়!

সুতরাং এই দুই ঘরানায় সাফল্য মানেই হ[illegible] দুরকম ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। যে ফারাক স্বভাবিকভাবেই একজন লেখকের দুই সত্তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

অলৌকিক জলযান নিয়ে ঈশ্বরের বাগানের উদ্দেশ্যে কোনো জার্নি-র কারিগর তিনুকাকার মাছ শিকার নিয়ে কতটা মনযোগী হতে পারেন? 'আগুন জ্বালাবার গল্প', 'এক বর্ষার গল্প' থেকে 'অবাস্তব গল্প' যিনি লিখেছেন; 'ইহলোক', 'জীবন সত্য', 'জীবন নিয়ে খেলা', 'বেঁচে থাকা' নিয়ে লিখতে লিখতে তিনিই বয়ান করেন 'যথাযথ মৃত্যু'-রও গল্প। ছোটগল্পকার অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় পরীক্ষামূলক গল্পের কারিগর নন। ছোটগল্প রচনার মূলরীতিনীতি কেন্দ্রিক ঘরানারই তিনি তার সমকালীন এক রচয়িতা। কাহিনি বা ঘটনামুখ্য ছোটগল্পের প্রথম-পুরুষ কথনরীতি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে উত্তমপুরুষের আত্মকথনমূলক রীতিতেই ছোটগল্প লিখেছেন। কিন্তু এরই মধ্যে কখনো কখনো উপস্থাপনা এবং বয়ানে তিনি সৃজন করেছেন গল্পকে বলার কিছু অন্যরকম পদ্ধতিও।

পরিকথা-ব্রতকথার জগতে বিচরণকারী এক কিশোর সুবলের একটি দুপুরে তার বাবার জন্য চাষের জমিতে ভাত দিয়ে আসার যাত্রায় দ্বিস্তরীয় এক বয়ান তৈরি হয় 'নীলবসনা সুন্দরী' গল্পটিতে। দাবদাহ আর খরা-র পরিবেশে তৃষ্ণা—জলের অভাব—পানীয় জলের ব্যবস্থা এগুলি এই গল্পে পুনরাবৃত্তিময় ধ্রুবপদ। ফিরে ফিরে এসেছে মহাভারতীয় পুরাণের খাণ্ডবদাহনের অনুষঙ্গ। "সুবলার মনে হয়, খাণ্ডবদাহনে সব পুড়ছে। ঘাস পাতা সব পুড়ছে। মাটিতে রস নাই।" কিংবা "ক্ষেত্রমণি তাড়াতাড়ি উনুন থেকে খড়কুটো তুলে পা মাড়িয়ে নিভিয়ে দিল। খড়ের চাল, শনের বেড়া—একটু বেহুঁশ হলেই দাবানল। যারে কয় খাণ্ডবদাহন।" এই খাণ্ডবদাহনের পটভূমিতে বোনা গল্পে সুবল বা সুব্‌লা খর রৌদ্রে শুকনো মাঠবরাবর উলঙ্গ হাঁটে। তার মনে হয় "এমন যখন একখানা খাণ্ডবদাহন চলছে তখন কি না প্রকৃতির লীলা-খেলাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বাপ তার পাতাল থেকে জল তুলে আনছে।" এই খরায় চাষ জমিতে শ্যালো পাম্প দিয়ে মাটির গর্ভ থেকে জল তুলে আনে তার বাপ। সেই জলে চাষ হয়। এই বাস্তব তার কাছে এক পরিকথাই বটে! খরা আর তৃষ্ণাকে প্রায়-অলভ্য জল দিয়ে প্রতিহত করার এই কয়েকটা ঘন্টা পরিসরের ছোটগল্পটির পটভূমি এক স্থান ও কালের বিস্তীর্ণ পরিসরকে ইঙ্গিত করে! খাণ্ডবদাহনে যে কুয়ে নদীর মরণ হয় বালির চর বেরিয়ে, ভাদরেই সেই নদী হয় সমুদ্দুর। সেই জলে ভেসে গেছিল ঘাট কুড়ানির মা। ভেসে এসেছিল কালাচাঁদ সিন্দুক। ভেতরে এক রাজকন্যার নীলবসন। যেবার খুব ফসল ফলেছিল সেবার কুয়ে নদীর গর্ভ ফুঁড়ে উঠে এসেছিল নীলবসনা রাজকন্যা যাকে নিশুতি রাতে দেখেছিল মাঠচরা মানুষ। সে-ই গাঁয়ে খবর দেয়। সেই থেকে জ্যোৎস্নায় নাকি মাঠচরারা দেখতে পায় দুজনকে। মায়ের মুখের এসব পরিকথা সুব্লার মতো মাঠচরার কাছে বাস্তব। মাঠের পাশাপাশি

তালগাছদুটো হল তার রাতচরা মানুষ আর নীলবসনা রাজকন্যা। শুধু তাই নয়, করালীকাকার কন্যা রুইদাসীকেই তার সেই রাজকন্যা বলে মনে হয়। যে তাকে একবার অভিশাপ দিয়েছিল : তুই মাঠে পাথর হয়ে পড়ে থাকবি, জল পাবি না, তেষ্টায় পাষাণ হবি! তারপরেই সেই কন্যা পাথর-সুব্‌লার জন্যে বিমনা হয়ে কেঁদে কেঁদে ফেরে! কন্যের জল ঝরবে দু-নয়নে—সঙ্গে সঙ্গে সুব্‌লা উদ্ধার! সুব্‌লা দুপুর রোদে মাথায় গামছা বাঁধা ভাতের থালা আর জলের ঘটি নিয়ে উলঙ্গ হাঁটে তার বাপের চাষজমির উদ্দেশ্যে আর গল্পকথক তার মনের ভাবনার প্রতিবেদন লিখতে থাকেন সঙ্গে সঙ্গে। এবং এইভাবেই গল্পের দুই স্তরের ভেদরেখা মুছে গিয়ে সুব্‌লার চলার স্থানগত ও কালগত পরিসরের স্বরূপ বদলে বদলে যায়! কাদাজলে মোষের মতো গা ডোবানো সুব্‌লা খর রৌদ্রে সুমার মাঠ পেরোতে গিয়ে বোঝে জলকাদা শুকিয়ে তার সারা শরীরে এখন শুকনো মেটেরঙের প্রলেপ—যেন সে শিবের সং! অনেক দূরে দেখা যায় শুখা মাঠে তার বাপের আবাদ—যেন একখণ্ড সবুজ বসন। মায়ের ত্যানাকানির মতো। মাথার ওপর ভাতের থালার সঙ্গে উড়ছে পাখপাখালি, তারা টের পেয়ে যায়। আপন মনে তাদের সঙ্গে বকবক করতে করতে চলা সুব্‌লাও টের পায় "সে একা যাচ্ছে না, এই লীলাখেলায় সব কীটপতঙ্গরাও সুব্‌লার সঙ্গে বাপের ভাতের লোভে গুটিসুটি গাছপাতার ফাঁকে ফাঁকে হাঁটছে। সে বলে, সবাই খেয়ে পরে বেঁচে বর্তে থাক। গামছার পুঁটুলি থেকে দু-এক কণা ভাত তুলে প্রকৃতির জীবগণের প্রতি সে ছুঁড়ে দেয়—খা! খেয়ে পুণ্য ঢেলে দে।" লুকিয়ে লুকিয়ে সে জল দেয় গাছের নীচের পাথরে, বুড়ি ঠাকমাকে। কুয়ে নদীর বালি খুঁড়ে জল তোলার সময়ও মনে মনে ক্ষমা চেয়ে নেয় নদীর কাছে! আর তারপরেই তার চোখে পড়ে মৃতপ্রায় তৃষ্ণাকাতর গাভীটিকে। জল সংগ্রহ করে 'ভগবতী'র মুখে সেই জল দিয়ে গরুটিকে বাঁচাবার মরীয়া চেষ্টায় থালার ভাত কাক-পাখিতে ছড়িয়ে খেয়ে যায়! একদিকে বাপের মারের ভয় কিন্তু অন্যদিকে বিশ্বাস এই ভগবতীকে বাঁচালেই ইচ্ছাপূরণ! এ তার জীবনের দুর্লভ মুহূর্ত, যখন এই প্রাণরক্ষার সুবাদে ভগবতীর বরে শুধু তার নয় গোটা প্রকৃতির এই খরার দারিদ্র্য দূর হবে। গল্পের শেষ পর্বে গরুটিকে বাঁচাবার জন্যে বাবাকে ডাকতে গিয়ে সে মার খায় ভাতগুলো কাকে খেয়ে গেছে বলে। এর আগে বাপের হাতে মার খেলে তার পেচ্ছাপ হয়ে যেত, যেমন ভাবে পেচ্ছাপ হয়ে যায় পুকুরে নামলে। কিন্তু এবার বাপের হাত এড়িয়ে পালিয়ে কুয়ের গর্ভে মরা গরুটার আড়ালে সে লুকোয়। আবিষ্কার করে যে এই প্রথম বাপের মারে তার পেচ্ছাপ হল না! এই প্রথম সে দুহাতে তলপেট আড়াল করে লজ্জা নিবারণ করতে চায়! এই প্রথম তার মনে হল আলো থাকতে

ঘরে ফেরা যাবে না—যদি রুইদাসীর সঙ্গে পথে দেখা হয়ে যায়!

প্রত্যক্ষ সংলাপকে ন্যূনতম ব্যবহার করে এই গল্পে প্রকৃতিলগ্ন এক বালকের বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হবার প্রথম অনুভবকে পরোক্ষ প্রতিবেদনেই কথক জানিয়ে গেছেন। খরা আর জল মিলে প্রকৃতির আরেকটি ভাষা এই গল্পটির কথনের একটি তল। যেমনভাবে পরিকথাগুলি পুরাকথার সঙ্গে মিশে গল্পে স্বতন্ত্র অপর একটি স্বর হিসাবে চেনা যায়। নানা রঙের এই স্লাইডগুলি পরস্পরের সঙ্গে অন্বিত হয়ে গল্প বয়ানের এই মিশ্র-রঙটির সর্বশেষ বর্ণিমা তুলে ধরে। আর শেষে যে লজ্জার অনিবার্য জাগরণে সুব্‌লা বড় হয়ে ওঠা অনুভব করে, তার আগে পর্যন্ত গল্পকথনের মুন্সিয়ানায় সে-ও যেন এক গ্রামীণ ব্রতকথা, পরিকথারই চরিত্র হয়ে যায়।

আরেক সুবলের পরিকথা রয়েছে 'সাদা অ্যাম্বুলেন্স' গল্পটিতে। এই সুবল পরিণত বয়স্ক, পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য। বাড়ির তিন প্রজন্মেরই কাজ করে সে। আর তার কোনোদিন অসুখ হয় না। মনিব গিন্নী তাই প্রকাশ্যে জানিয়েই দেন, চাকরকে নাকি তিনি হিংসে করেন! এ হেন সুবলের কাহিনি শুরু হল গায়ে জ্বর ও ব্যথা নিয়ে প্রথম ফুসকুড়িটা ফুটে ওঠার দৃশ্য দিয়ে। আগে তার একটাই অসুখ ছিল—বাইরে বের হলে ফিরে আসতে ইচ্ছে না হওয়া! কারণ তখনই সে হাঁটতে থাকত নিজের স্মৃতিপথ বেয়ে। ভাবত কতকাল আগে তার বউয়ের পালিয়ে যাবার কথা। ছেলে কার না কার কাছে গচ্ছিত রেখে এভাবে শহরে পালিয়ে আসার কথা। এ অসুখ ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু চিকেন পক্স তা বলে! সুবল নিজেকে শত লুকোতে গিয়েও ধরা পড়ে। বাড়ির লোকের চোখে; এমনকি বাজার বা বার হাঁটার পথে পথচলতি মানুষের চোখেও। চব্বিশটা ঘন্টার মধ্যে আমূল পাল্টে যায় ঘরে বাইরে সব। সব জেনেও এক অবুঝ নাছোড় প্রস্তাব—সুবলকে মনিব বাড়ি ছেড়ে অসুখ না সারা পর্যন্ত যেতে হবে অন্যত্র।

এই পর্যন্ত এক গল্প। বরং বলা চলে গল্পের ভিত্তি নির্মাণ। এবার সুবল খুঁজছে একটা নিমগাছতলা। বাবুদের বাড়ির বাইরে রাস্তার ধারেরটিকে সে ছেড়ে এসেছে পাছে পাড়ার লোকেরা চিনতে পেরে পক্সের রোগির এই ব্যবস্থার জন্যে বাবুকে বিব্রত করে! "সুবল একটা ছায়ামতো জায়গা খুঁজছে। তার আত্মীয়স্বজন বলতে ছায়ামতো জায়গাটা এবং নীচে সে শুয়ে থাকলে গাছের পাতা মুখের উপরে ঝরে পড়তে পারে—নিমগাছ হলে ভাল হয়, মারী-মড়কের দেবী নিমগাছের হাওয়া সহ্য করতে পারে না।" অনেকটা গিয়ে শেষে কিছুটা নিরিবিলিতে সে তার গাছটিকে পায়, পাশে একটা টিপকলও আছে। এখানেই সাক্ষাৎ দুটি বাচ্চা ছেলের সঙ্গে। তাদেরই একবেলা

থাকার গাছতলা সে দখল করেছে। এই নিয়ে কোনো অভিযোগ নেই। ছোঁয়াচে রোগের ভয় দেখালেও তারা গায়েপড়া। সুবলকে জল এনে দেয়, এনে দেয় নিজেদের ভিক্ষে করে যোগাড় করা খাবার। "ওদের কেন জানি এই মানুষটাকে নিজের লোক বলে মনে হয়।" এই অংশ থেকেই কাহিনি কখন বাস্তব থেকে উড়াল দিতে শুরু করে এরই মধ্যে থাকা অথচ ভিন্ন এক প্রতীতির জগতে। কারণ এবার দেখা যাবে ভিখিরি বাচ্চাদুটো কলকাতা জুড়ে নেচে, আনন্দে ছুটে বেড়ায়। আর তাদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা চলে—কে কতগুলো পোস্টার পড়েছে, তার।

"ছোট নাবালকটি বড় বড় চোখে একটা পোস্টার পড়তে গিয়ে থমকে গেল। বড় মাঠে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হচ্ছে। যে যার মতো এখন চাষ করতে লেগে যাও। সবুজ চারায় ছেয়ে যাবে, ফুল ফুটবে, ফল হবে। দিনমানে পৃথিবীর জায়গা বদল করে নাও।"

এই কথাগুলোর ঠিক মানে কী? দেয়ালে এসব আশার কথা—কিন্তু কবে থেকে শুরু হবে? নাকি শুরু হয়ে গেছে এই কাজ। ওরা ফিরে এসে সুবলকে জিজ্ঞাসা করে জানবে বলে ভাবে। কিন্তু এসে দেখে গাছতলা খালি! সাদা অ্যাম্বুলেন্স এসে তাকে তুলে নিয়ে গেছে। রাতের চাঁদ ওঠা কলকাতার মায়াবী বর্ণনার মধ্যে মনমরা বাচ্চাদুটো অভুক্ত, নিমগাছের নীচে ঘুমিয়ে পড়ে। হাসপাতালে সংক্রামক রোগের ওয়ার্ড নেই বলে রাত দশটা নাগাদ সাদা অ্যাম্বুলেন্স সুবলকে আবার ফিরিয়ে রেখে যায় গাছের নীচে! ছেলেগুলোর মনে হয় এ ম্যাজিক! সুবলকে একটু থিতু করে তারা জানতে চায় ঐ পোস্টারের কথাগুলোর অর্থ। কোথাও এমন কথাও লেখা হচ্ছে আজকাল—জেনে সুবলের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়। ঠিক হয় সে সেরে উঠলে সকলে ঐ পোস্টার দেখতে যাবে। কিন্তু পরদিনই আবার অ্যাম্বুলেন্স তুলে নিয়ে যায় সুবলকে! আবারও ফেরৎ রেখে যায়। এবার আর ভুল নয়। সুবল আর দুজন ওদের সেই পোস্টারওয়ালা দেওয়ালের বাড়ির দিকে চলে। সুবল হঠাৎ বোঝে এ তার চেনা রাস্তা! ছেলেদুটো তাকে নিয়ে যাচ্ছে তার রোজকার বাজার যাবার চেনা পথ দিয়েই। যার শেষে তার এতগুলি বছরের সাধের-অপমানের-অভ্যেসের মনিব বাড়ি। এই একটু অসুখের জন্য এতদিনের সব মিথ্যে হয়ে গেল। পোস্টারে লেখা, দিনমানে পৃথিবীর জায়গা বদল করে নাও। অথচ গরীবের "অসুখ হতে নেই। অসুখ হলে হাসপালে জায়গা থাকে না। বার বার একটা অ্যাম্বুলেন্স ওকে নিয়ে কপট আরোগ্য কামনায় ছোটাছুটি করে।"

এই গল্পেও একটি ধুয়ো বারবার আছে। দুই শিশুর পড়া ঐ পোস্টারের বয়ান। এবং সুবল আর দুই ভিখিরি বালক সারারাত দেওয়ালে দেওয়ালে লিখে বেড়ালো বৃষ্টিপাত, চাষবাস, ফুল ফল আর জায়গা বদলের কথা। তিনটে মানবাধিকার না

পাওয়া মানুষ অলৌকিক শিল্পীর মতো কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে ভরিয়ে দিল কথাগুলো। গল্প থেকে বের হয়ে এই কথাগুলো সেঁটে গেল রাতের কলকাতার সব দেওয়ালে। এবং এর ফলে

"ওরা দেখল চারপাশের সব জানলা-দরজা ভয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যা কিছু ঐশ্বর্য, সুখ এবং প্রেম-ভালোবাসা মানুষের কাছ থেকে চুরি করে শুকনো বাঘ অথবা হরিণের মাথার ভিতর ওরা পুরে রেখেছিল, দেয়ালে দেয়ালে এখন সেইসব বাঘের মুখ আস্ত বাঘ হয়ে লাফিয়ে পড়ছে। হরিণেরা দ্রুত দৌড়ায়। কিন্তু বাঘের থাবাতে হরিণের মাংস এবং কলিজা এবার খসে খসে পড়বে।"

এই দেওয়াল লিখন যে প্রথমে সুবলের ভাষা এবং শত চেষ্টাতেও তার সংক্রমণ রোখা গেল না বলে তা শিশুদুটিরও ভাষা হয়ে উঠল—একথা বুঝতে অসুবিধে হয় না। তাই গল্পের শেষ অনুচ্ছেদে দেখা যায় চিকেন পক্সেরই মতো ঐ লিখনের শব্দগুলো সুবলের গায়ের গোটাগুলোর মতোই টসটসে হয়ে উঠে জৈবযুদ্ধের সংক্রমণ দ্রুতহারে ছড়িয়ে দিচ্ছে সবহারাদের রক্তে রক্তে। আর ভয় দেখানো জানলা দরজাগুলি এবার ভয়ে ভয়ে বন্ধ হচ্ছে। মনে পড়ে যে, গল্পটা শুরু হয়েছিল সুবলের শরীরের প্রথম ফুসকুড়িটির গোপনে দেখার মধ্য দিয়ে। সেটা ছিল গল্পের প্রথম বাক্য। আর গল্পের শেষে শিকার এবার শিকারী হয়ে উঠেছে। তাদের রক্তের ভিতর খেলা করে চলেছে এক অলৌকিক রং। গোটা শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে সেই রং। এরকম একটা মড়কেই তো নবজন্ম হতে পারে।

জন্ম মৃত্যুর এহেন বিচিত্র সংজ্ঞার খোঁজে আরো গল্প লিখেছেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। 'কাফের'-এর মতো গল্পে দাঙ্গার পটভূমিতে পরাণ আর হাসিমের গল্প। পরাণকে বাঁচিয়ে ক্যাম্পে পৌঁছে দিতে ব্যস্ত হাসিম আর জুবেদা। মোত্রা ঘাসের জঙ্গল থেকে অচৈতন্য দশমাসের পোয়াতি জুবেদাকে পরাণই একদিন তুলে এনে হাসিমকে তার অপদার্থতার জন্যে গালমন্দ করেছিল। আজ এই ভয়ংকর দাঙ্গায় মৃত্যুর আগুন জ্বালানো উৎসবে পোড়া মানুষের মাংসের গন্ধের পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে পরাণ খোঁজে কিরণীকে। নদীর জলে পাতল ভাসিয়ে ডুব সাঁতার দিয়ে পরাণকে আড়াল করে নিরাপদ কোনো ক্যাম্পে নিয়ে যাচ্ছে হাসিম। অনেক কৌশলে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলার পর শেষে পড়ে যেতে হয় দুজনের হাতে। পাতিল লক্ষ করে ছোঁড়া শলা বিঁধে যায় ব্রহ্মতালুতে। এবার কাফের হাসিমের পালা। পাড়ের ভাঙনের ফাঁদে ফেলে হাসিম তাদের দোজখের পথে পাঠায়। তারপরেই লণ্ঠন নিয়ে তার হদিস পাওয়া কয়েকজন জানায় পরাণের বউকে তারা নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিয়ে এসেছে।

এভাবেই লেখা হয় 'যথাযথ মৃত্যু', 'ফুলের টব'-এর মতো জন্ম-মৃত্যুর বিচিত্র

সংজ্ঞার আরো গল্প। এরই মধ্যে অভিনব এক দ্বিস্তরীয় কথনকে লক্ষ করি 'অবাস্তব গল্প' শীর্ষক গল্পটিতে। বয়োজ্যেষ্ঠ প্রিয়নাথের দৈনন্দিন জীবনচিত্রের কথোপকথনে এ গল্পে বাজার করা, ইলিশ মাছের ঝোল বিষয়ে পরিচারিকার জিজ্ঞাসা, অপর কাজের মেয়ের টানা কামাই, মাসমাইনে কাটা বিষয়ে অনুযোগ থেকে টুকিটাকি বহির্বাস্তবের চিত্রগুলির সঙ্গে গল্পে একই সূত্রে এগোয় প্রিয়নাথের মগ্নচিন্তাপ্রবাহ। যা সকালের খবরের কাগজটির সূত্রে পারি দেয় অতিচৈতন্যলোকে। এই পৃথিবীর বাইরে কোথায় প্রাণ আছে? মৃত্যুর পর মানুষ যায় কোথায়? পার্থিব ইলিশ মাছ কিংবা মাইনে কাটার তুচ্ছতাময় ছেদগুলি ছেড়ে দিলে প্রিয়নাথের এই চিন্তাস্রোত আবিরাম হতে চায়।

"অসীম অনন্ত সূর্যের আলোকিত ভূমণ্ডলে সহসা তিনি দেখেন ভ্রূণের মতো এক অগ্নিকণা। কোটি কোটি বছর আগেকার সেই প্রাণের রহস্য তাঁকে মাঝে মাঝে বড়ই বিহ্বল করে রাখে। অগ্নিকণাটি ছুটছে। অনন্ত পার হয়ে ক্ষুদ্র একটি আধারে পরিবৃত হয়ে গেল। তারপর জলের মধ্যে শ্যাওলা হয়ে গেল এমন তিনি আজকাল দেখতে পান।"

এর সঙ্গে জুড়ে যায় কাগজে এই বিষয়ক লেখারই একটি নীরব পাঠ। কথনের এই দুই তল প্রিয়নাথের চিন্তা ও নীরব পাঠের যৌথ সমাপতিত এক অভিনব প্রতিবেদন আকারে পাঠকের কাছে বয়ান হতে থাকে। জন্ম মৃত্যুর মহাজাগতিক রহস্য। সেই প্রেক্ষণী থেকে প্রিয়নাথ আশপাশের সবকিছুর মধ্যেই জন্ম আর মৃত্যুর লীলাই চলেছে। তা সে বিড়াল এবং তার ছানাই হোক বা রাস্তার ও প্রান্তের গ্রিলের যুবতীর সঙ্গে পাশের বাড়ির ছাদে ফুলের টবে জল দেওয়া যুবকটির দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্যেই হোক। কখনো মনে হয়, পৃথিবী নামক এই গ্রহও যদি কক্ষপথ বদলায় বা মহাজাগতিক বিস্ফোরণে উধাও হয়ে যায়, তখন কোথায় থাকবে কোলাঘাটের ইলিশ অথবা শুলোঙ্গরী যাবার রাস্তা—যেখান থেকে কয়েক কিলোমিটার হেঁটে বাড়িতে কাজ করতে আসে সবিতা! তার বরের খোঁজ নেই, বড় ছেলেটির ধুম জ্বর।

বিকেলে সংসারেরই তাড়নায় অথচ এক ঘোরেরই মধ্যে প্রিয়নাথ বর্ষার পচা খালের ধার ধরে খুঁজতে যান শুলোঙ্গরী, কাজের মেয়ে সবিতাকে। নোংরা, গুয়ে মুতে মাখামাখি খালপাড়ে বস্তিগুলোকে, বস্তির মানুষজনকে তার মনে হয় ভিন্ গ্রহের! প্রিয়নাথ কি তবে পৃথিবী ছেড়ে ভিন্ গ্রহে প্রাণের সন্ধানে হাঁটছেন! এটা বালিগুঁড়ি, এটা জবরদখল, এটা পুলিশক্যাম্প, এটা যাত্রাগাছি—কিন্তু শুলোঙ্গরী কোথায়? রাত নামে। লম্প হাতে দুএকজন ভিন্ গ্রহের মানুষ পথভোলা প্রিয়নাথকে এগিয়ে দিতে চায় তার বাড়ি ফেরার পথে! "কিন্তু এতগুলো গ্রহ ঘুরে বেড়ালেন কোথাও গাণিতিক হিসাব ভুল থাকায় শুলোঙ্গরী যাওয়া হল না, অন্য কোনও গ্রহের আড়ালে সবিতার

ঝুপড়িটা পড়ে থাকল—তাঁর মাথা ঘুরছে, তিনি কি ক্রমে এবার বিন্দুবৎ হয়ে যেতে থাকবেন, তাঁর হাত পা সব শরীরে গুটিয়ে যাবে, এবং কোনও এক অবিমৃশ্যকারিতায় তিনি যে এখন শরীরবিহীন বোধ এবং বুদ্ধিতে পরিণত হচ্ছেন না তারই বা ঠিক কী।" মহাজাগতিক গ্রহ উপগ্রহের জন্ম মৃত্যুর সঙ্গে পার্থিব জন্ম মৃত্যুর প্রভেদ নেই তাহলে। সবিতার ঝুপড়ি শেষে খুঁজে পান প্রিয়নাথ। দাওয়ায় বসে তাকে ওক তুলতে দেখে বুঝতে পারেন "গর্ভে ভ্রূণ ধারণ করার পর এমন হয়।" মৃত্যুর প্রাকপর্বে দাঁড়িয়ে প্রিয়নাথ অবিষ্কার করেন ভিন্ গ্রহেও প্রাণের লীলা চলছে।

এ রকমই দ্বিস্তরীয় গল্পকথন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক প্রিয় শিল্পরীতি, বোঝা যায়। কথক এক রকম ক্রমে গল্পে কাহিনিখণ্ডগুলিকে সাজান। এগুলিকে রুশ ফর্মালিস্টদের অনুসরণে কথনপ্রযুক্তির একটি ধরন বলে চিহ্নিত করা হয়, যার পোশাকি নাম 'সুজেট' (Sjuzet)। আর এরই পরিপূরক কথনসজ্জার ভিন্নক্রমটির নাম 'ফ্যাবুলা' (Fabula) যেখানে এই কাহিনিখণ্ডগুলিকে কালানুক্রমে বা সংঘটনের ধারাবাহিকতায় সাজিয়ে ফেলা যায়। এই তুলনামূলক সম্পর্কের মধ্যে থেকেই উঠে আসে একটি গল্পের প্রকৃত চেহারা। না বলা উপাদানের উহ্যতার তির্যক গুরুত্বও প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায় এরই মধ্যে থেকে। অর্থাৎ গল্পের প্রত্যাশিত কাহিনিনির্ভর সোজাসাপটা গড়নের শৃঙ্খলাবদ্ধতা থেকে ছোটগল্পকে মুক্তি দেয় এহেন কৌশল। ফুয়েন্তেস-এর ছোট্ট ছিপনৌকোটির মধ্যে এভাবেই ধরা পড়ে মহাসমুদ্রের না বলা বিস্তারও। একটি কাহিনিতে এই দ্বন্দ্ব চিহ্নতাত্ত্বিকদের মতে 'চিহ্নায়িত বর্গক্ষেত্র' (semiotic square) তৈরি করে থাকে। ১৯৭০-এ এ.জে.গ্রিমাস তার 'Du sens: Essais sémiotiques' বইতে এই 'Greimassian model'-টির উল্লেখ করেন। জন্ম-মৃত্যু চেতনার নিরিখে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বালোচিত ছোটগল্পগুলির বৈচিত্র্যের মধ্যে কিছুটা সমতাপূর্ণ মূলচিহ্নগত সাদৃশ্য এবং বিস্তারের রাস্তাটিকে আমরা এর মধ্যে চিনে নিতে পারি—
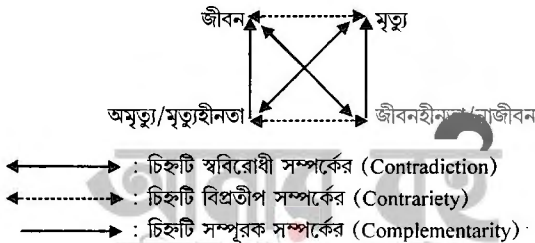
গল্পগুলির মধ্যে এই বর্গক্ষেত্রেরই নানা দ্বন্দ্ব একাধিক তীরচিহ্নিত সম্পর্কের জটিলতার মধ্যে দিয়ে আভাসিত হয়। ছোটগল্পকার তার কথনকৌশলের সূত্র ধরেই আমাদের মনে প্রেরণ করেন এই ভাবনাগুলিকে। একমুখী গল্পের পাশাপাশি এই জাতীয় ছোটগল্পগুলিতেই আমরা অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফল্যের একটি মাত্রাকে চিনে নিতে পারি। প্রিয়নাথ, দুই সুবল বা হাসিম পরাণদের নানা জীবন-মৃত্যুর সমীকরণ নিয়ে লেখকের উপনিবেশটির এই চেহারা তিনি না জানিয়ে পারতেন কি? কারণ একটা গল্পই তো বাঁচিয়ে রাখবে আরেকটা গল্পকে, আর গল্পকথককে। নাহলে পরের গল্পটা তিনি শোনাবেন কিভাবে?

বইপত্র :

১. পঞ্চাশটি গল্প; অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়; ২০১৪; আনন্দ পাবলিশার্স।
২. The Picador Book of Latin American Stories; Ed : Carlos Fuentes & Julio Ortega; 1999; Picador.
৩. Dictionary of Narratology; Gerald Prince; 1987; University of Nebraska Press.

রাজীব চৌধুরী

পেশা : অধ্যাপনা। কবিতার বই : অক্ষরের ঘরবাড়ি। সম্পাদনা করেছেন : জগদীশ গুপ্তের দুষ্প্রাপ্য রচনাবলী—দুই খণ্ড; নবারুণ ভট্টাচার্যের 'শ্রেষ্ঠগল্প', 'উপন্যাস সমগ্র', 'অগ্রন্থিত কবিতা', এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা' ও তার উত্তরপাঠ দামোদর মুখোপাধ্যায়ের 'মৃন্ময়ী' একত্রে।

অতীনের উপন্যাস : জীবনের আঙিনায় সাহিত্যের পদচারণ

ড. সোমনাথ চক্রবর্তী

জীবনটাই উপন্যাস। বিস্তৃতভাবে ধরলে, মানুষের জীবন অভিজ্ঞতার কোলাজ। সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে একখানি উপন্যাস রচনা করা যেতেই পারে। কথাটাকে যদি নির্ভুল ধরে নিই, তাহলে একটা প্রশ্ন চলে আসে, অভিজ্ঞতা তো কম-বেশি সকলেরই থাকে। কেবল অভিজ্ঞতা দিয়েই কি উপন্যাস রচনা সম্ভব? উত্তর—অবশ্যই না। উপন্যাস রচনার জন্য অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে আরও অতিরিক্ত কিছুর দরকার, যা রচনাকে রসোত্তীর্ণ করে তোলে।

ইতিহাস যেমন উপন্যাসের উপাদান অর্থাৎ ইতিহাসের ঘটনা অবলম্বনে যেমন উপন্যাস রচিত হয়, ঠিক তেমনি অভিজ্ঞতা। লেখক তাঁর ব্যক্তি অভিজ্ঞতার নিরিখে উপন্যাসের কায়া নির্মাণ করেন। এ গোত্রের উপন্যাসগুলিকে সাধারণভাবে আত্মজৈবনিক উপন্যাস বলা হয়। চরিত্র নিজের কথা বলে এবং বক্তার দ্বারা কাহিনি নিয়ন্ত্রিত হয়। বিচ্ছিন্ন ঘটনার যোগসূত্র লেখক বা কথকের দ্বারা গ্রথিত হয়। এখানে থাকে লেখকের নিরাসক্ত আত্মসমীক্ষার প্রতিফলন।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন—জীবনী আর উপন্যাস কখনই এক পঙ্‌ক্তিতে বসতে পারে না। তারা পৃথক জগতের বস্তু। যথার্থ জীবনী যেমন উপন্যাস নয়, ঠিক সেরকমভাবে যথার্থ উপন্যাসে কখনই জীবনী থাকে না। উপন্যাসে বস্তুর সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণ ঘটে, জীবনীতে ঘটনার ঘনঘটা। তবে এটা ঠিক যে, উপন্যাসে জীবনের একটা বিশ্বস্ত চেহারা ধরা পড়ে। আত্মজীবনের ঘটনা সেখানে প্রতিভাত হলেও শিল্পের দাবিটাই মুখ্য, অর্থাৎ উপাদান যাই হোক না কেন, সৃষ্টি কাল্পনিক। এ ধারার রচনায় এক বিচিত্র আত্মতার সঞ্চার ঘটে।

প্রথমেই যে বিষয়টা উঠে আসে—এই আত্মতা কার? এই যে আত্মতা তা সহজ আত্মতা? উত্তরে বলা যায়—এ আত্মতা লেখকেরই ঠিকই, তবে তা তার কল্পিত সত্তার। আর এই আত্মতা সহজ নয়, এতে আছে গোপনীয়তা, মেঘ-আলোর লুকোচুরি খেলা। লেখকের অন্য এক সত্তার রামধনু-ছটায় পাঠক আবিষ্ট হয়ে যায়।

উপন্যাস রচনার উপাদান বহু বিচিত্র পথ ধরে আসে। আত্মজীবন সেই পথের যাত্রী। এটা অনস্বীকার্য যে, লেখকের আত্মতার ছাপ অবশ্যই তাঁর রচনায় পড়বে। একে এড়ানো লেখকের পক্ষে অসম্ভব। 'কবিকে পাবে না তার জীবন চরিতে'—কবিগুরুর এই চরণের মধ্যেই নিহিত আছে আলোচ্য মন্তব্যের সারবত্তা। রবীন্দ্র-শরৎ-বিভূতিভূষণ-

তারাশঙ্কর-বনফুল প্রমুখদের রচনায় কম-বেশি এ সত্য ধরা পড়েছে।

উত্তর-স্বাধীনতা বাংলা কথাসাহিত্যে মূলত উঠে এসেছে স্বাধীনতা, দেশভাগ, ছিন্নমূল মানুষের স্রোত, অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম আর কালের হাওয়ায় বদলে যাওয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের অবক্ষয়িত মূল্যবোধের চিত্র। ছিন্নমূল মানুষের কথা আর তাদের দাবিকে প্রতিষ্ঠা দেবার প্রয়াস লক্ষ করা যায় অমিয়ভূষণ মজুমদার, অসীম রায়, প্রফুল্ল রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের রচনায়। এরই পাশাপাশি অনেক কথাসাহিত্যিক বঙ্কিম-অনুসৃত ইতিহাস ও ইতিহাস-রসের অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন। শরদিন্দুর 'গৌড়মল্লার', মহাশ্বেতার 'অরণ্যের অধিকার', সুনীলের 'সেইসময়' যেন সেই দাবির ফসল। যদিও এ ধারার প্রবাহ ছিল একেবারেই ক্ষীণ।

ইতিহাসাশ্রিত রোমান্সের পরিবর্তে জীবনের বাস্তব দিকটাই এ সময়ের রচয়িতাদের অনেক বেশি করে আকৃষ্ট করে। বাস্তবের পটভূমিতে সমকালের জীবনকথাকে ভাষা দেবার প্রয়াসটাই অনেক বেশি করে ধরা পড়েছে। সেখানে বঙ্কিম-কথিত আদর্শবাদ ও নীতিবাদ গৌণ। জীবনের দাবীটাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। এক সহজাত স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বস্তুতান্ত্রিক উপায়ে সাহিত্যে জীবনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন। অতীন এই ভাবনার শরিক। জীবনের দাবিকে সাহিত্যের পাতায় তুলে ধরার সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন।

অনুকরণ বা অনুসরণ নয়, হৃদয়ের সত্যিকারের আনন্দ-বেদনার অনুভূতির বর্ণালীতে রঙিন হয়ে ওঠা রামধনুর ছবি এঁকেছেন। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে তার ব্যক্তিজীবনের নানান অভিজ্ঞতার কথা রঙে-রেখায় ভাষা পেয়েছে। স্মৃতির রেখায় ভেসে ওঠা ছবিগুলো সমাজ-দেশ-কালের এক বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে উদ্ভাসিত হয়েছে মায়াময় কবিত্বের বন্ধন ছিন্ন করে। সমাজজীবন আশ্রিত ইতিহাসচর্চায় তাঁর বিশ্বাস নেই। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের পাতায় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন বলে তাঁর ঘোষণা—

"আমার জীবনটা ঘটনাবহুল। বলতে পারো আমার জীবনটাই একটা উপন্যাস। যার প্রতিটি ক্ষেত্রে ছড়িয়ে আছে নানা ঘটনা। ঘটনাবহুল এই জীবনের কথাগুলোকে খানিকটা কল্পনার রঙে মিশিয়ে ব্যক্ত করেছি নানা রচনায়। সেখানে ইতিহাসের পাতা থেকে আমাকে উপাদান সংগ্রহ করতে হয়নি। আর সত্যি কথা বলতে কী, আমি বানিয়ে লিখতেও পারি না। তাই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় হাত দিইনি।"

দেশ-কাল আর লেখক অতীনের শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যের রূপকল্পের জীবনবীক্ষা মূর্ত হয়ে উঠেছে—'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', 'মানুষের ঘরবাড়ি', 'অলৌকিক জলযান', 'ঈশ্বরের বাগান' ও 'দুঃস্বপ্ন' উপন্যাসের পাতায় পাতায়।

কখনও সোনাবাবু, বিল্ব, কখনো অতীশ দীপঙ্কর, মিহির সান্যাল নামে হাজির হয়েছেন। বাস্তব জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার সঙ্গে রয়েছে সমকালীন জীবনের বিপর্যস্ত পরিস্থিতির ব্যাখ্যা ও তার শিল্পসম্মত উপস্থাপন। 'চিতাভস্ম' (২০১৩) উপন্যাসে এ বক্তব্যের সমর্থন মেলে—

"এত বড় বইখানা লিখলেন, হাজার প্রশ্নেও তার সামাল দিতে পারলে হয়।

প্রশ্ন কার?

কার মানে? প্রশ্ন সবার। এ বইয়ের আগাগোড়া পড়লে হাজার রকমের কৌতূহল তৈরি হয় বোঝেন। বইটা কি সম্পূর্ণ?

আজ্ঞে না। কবে শেষ করতে পারব জানি না। খণ্ডে খণ্ডে লিখছি। পরের খণ্ডে সোনাবাবু কিন্তু বিল্ব হয়ে থাকবে। তার পরের খণ্ডে সোনাবাবু ছোটবাবু জাহাজের।

বাণী বলল, তার পরের খণ্ডে সোনাবাবুর কী নাম দেবেন?

আপনে জাহাজে একসময় কাজ করতেন, জানি।

পরের খণ্ডে সোনাবাবু অতীশ দীপঙ্কর।...

আপনের এই খণ্ডে সোনাবাবুর নাম তা হইলে মিহির সান্যাল।"[২]

সময়ের উত্থান-পতন, ভাঙা-গড়ার এক মায়াবী আলেখ্য বর্ণময় ভাষায় রূপলাভ করেছে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' (১৯৭১) উপন্যাসে। মণীন্দ্র রায়ের আগ্রহে ১৯৬৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে 'অমৃত পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। যদিও এর আগে থেকেই বিভিন্ন নামে গল্পাকারে এই উপন্যাসের বিভিন্ন অংশগুলো নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। চিত্ত সিংহের 'সৃজনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' নামের একখানা গল্প। আর 'এক্ষণ'-এ 'কিংবদন্তীর সূর্য', 'দেশ'-এ 'কালনেমি', 'হৃদয় একমাত্র বাহক', 'অমৃত'-এ 'মাশুল'—সব মিলিয়ে প্রায় বারো-তেরো খানা গল্প। পরে এগুলো উপন্যাসের বিভিন্ন অংশে জুড়ে গেছে। উপন্যাসের সময়কাল ১৯৩০-৫২ সাল পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে ঘটে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা, দেশবিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতি মর্মস্পর্শী ঘটনাগুলি। বাস্তবের কঠোরতায় জীবন থেকে সরে গেছে মাধুর্য। মূল্যবোধহীন সমাজে মানুষ হয়ে উঠেছে খেলার সামগ্রী। সময়ের নিষ্ঠুর আঘাতে দিশেহারা মানুষ অসহায় আর্তনাদ করে আর অন্বেষণ করে নীলকণ্ঠ পাখির। প্রাপ্তি শুধুই ব্যর্থতা। না পাওয়ার সেই বিরহ-বেদনায় ঝংকৃত হয়েছে মায়াময় জীবনের মিশ্র রাগিণী। নবজাতকের জন্মে যে উপন্যাসের সূচনা, সেই জাতকের বার্তাবাহকের মৃত্যুতে উপন্যাসের সমাপ্তি। একটা সম্ভাবনাময় আনন্দের মধ্য দিয়ে সূচনা ঘটলেও

পরিসমাপ্তি ঘটেছে বেদনাদায়ক পরিণতিতে। এই বোধ পাঠককে আবিষ্ট করে।

ঢাকা জেলার আড়াই হাজার থানার রাইনাদি গ্রামের মহেন্দ্রনাথ ও শশীবালার বড় ছেলে মণীন্দ্রনাথ, মেজ ছেলে ভূপেন্দ্রনাথ, সেজ ছেলে চন্দ্রনাথ ওরফে ধনকর্তা, ছোট ছেলে শচীন্দ্রনাথ-দের মিলিত একান্নবর্তী পরিবার এলাকায় ঠাকুরবাড়ি নামে পরিচিত। উপন্যাসের দ্রষ্টা সোনা লেখকের 'স্বপ্নের মানুষ'।

ব্যক্তি অতীন তাঁর জীবন ও সমকালীন দেশ-কাল-কে বিধৃত করেছেন সোনার মধ্য দিয়ে। উপন্যাসের সূচনা হেমন্তের কোনো এক বিকালে যখন উষাপতি সোনালি বালির চরে অবগাহনে ব্যস্ত। এ ব্যক্তি-অতীনের জন্মসময়কালের বর্ণনার হুবহু প্রতিলিপি, যা তিনি মা-জেঠিমার কাছ থেকে শুনেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা এসে যায়—অতীনের অধিকাংশ রচনাসম্ভারের মলাটে লেখকের জন্ম সাল হিসাবে ১৯৩৪ খ্রিঃ উল্লেখ আছে কিন্তু তা অভিভাবকদের ত্রুটি। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় লেখক সে কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর প্রকৃত জন্মতারিখ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ২২ কার্তিক, ইংরেজি ১৯৩০-এর নভেম্বর। স্বাভাবিকভাবেই দেখা যায়, উপন্যাসটিতে আত্মজীবনের সঙ্গে মিশে রয়েছে লেখকের খেয়ালি মনের কল্পনাময় জীবনবীক্ষা।

উপন্যাসের নায়ক সোনা ব্যক্তি-অতীনের ছায়ামূর্তি। ঠিক যেমন শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের শ্রীকান্ত, বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের অপু, তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের শিবু। লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা আর পরিবার পরিমণ্ডলের নানা বাস্তব ঘটনা উপন্যাসের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ সমস্ত কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার সঙ্গে সমকালের বিপর্যস্ত জীবনের এক শিল্প-সার্থক উপস্থাপন ধরা পড়েছে শিল্পীর ইজেলে। ১৯৩০-৫২ খ্রিঃ সময়কালের একদিকে রয়েছে কথাকারের আত্মচরিত আর অন্যদিকে আছে সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁর আত্মসমীক্ষা এবং সমালোচনা।

লেখক অতীনের নিজ গ্রাম রাইনাদি ও তার পার্শ্ববর্তী টোডারবাগ, মুড়াপাড়া, লাঙলবন্দ, দামোদরদি, সম্মানদি প্রভৃতি এলাকার কথা এখানে সরাসরি উঠে এসেছে। উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি চরিত্রই বাস্তব জীবন থেকে উঠে আসা। দাদু মহিমচন্দ্রের আদলে মহেন্দ্রনাথ চরিত্রটি কল্পিত। তাঁর চার পুত্র মণীন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ ও শচীন্দ্রনাথ বাস্তবে লেখকের বাবা, কাকা, জ্যাঠামশাইয়ের আদলে গড়ে উঠেছে। পাগল মণীন্দ্রনাথ লেখকের বড় জ্যাঠামশাই ক্ষীরোদচন্দ্রের আদলে চিত্রিত। তাঁর প্রতি লেখকের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ অকৃত্রিম। পিতা মহিমচন্দ্রের মৃত্যুর রাত্রে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। বাস্তুচ্যুত লেখকেরা যখন এপারে চলে আসেন তখনও তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি। এ সমস্ত কথাই ধরা পড়েছে তাঁর উপন্যাসে। এখানে একটা কথা বলা দরকার যে, উপন্যাসে মণীন্দ্রনাথের মৃত্যু দেখানো হয়েছে। যদিও

বাস্তবে সে ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি। চরিত্রটির প্রতি সহানুভূতি আর বেদনাবোধ অনেক বেশি করে দেখানোর জন্যই লেখকের খেয়ালি কলমের এহেন আঁচড়। লেখকের মেজ জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রনাথ বাস্তবে অকৃতদার ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু সংসারের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য-নিষ্ঠা আর ত্যাগ খুব সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয়েছে। পিতা অভিমন্যু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদলে চিত্রিত হয়েছে চন্দ্রনাথ চরিত্রটি। পারিবারিক জীবনে তিনি ধনকর্তা নামে পরিচিত ছিলেন। ব্যক্তিজীবনে ছিলেন সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ, পরোপকারী এক ধার্মিক ব্রাহ্মণ। মেজদার সঙ্গে তিনি মুড়াপাড়ার জমিদার বাড়িতে কাজ করতেন। জীবনের সমস্ত কিছুর মধ্যে খুঁজে বেড়িয়েছেন বেঁচে থাকার রসদ। উপন্যাসে তিনি ধনকর্তা নামে পরিচিত। শুধুমাত্র আলোচ্যমান উপন্যাসেই নয়, লেখকের প্রায় অধিকাংশ রচনায় এ মানুষটি বারবার ঘুরে-ফিরে এসেছেন। বড় কাকা অনুকূলচন্দ্রের আদলে চিত্রিত হয়েছে শচীন্দ্রনাথ চরিত্রটি। যিনি পশ্চিমবঙ্গে আসা ইস্তক বিয়ে করে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। পরিবারের সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ রাখেননি। উপন্যাসে সে কথাই বিবৃত।

শুধু নিজের পরিমণ্ডলের মানুষজনদের কথাই নয়, সামু, ফতিমা, মালতী, জোটন, জালালি, ফকিরসাব, রঞ্জিত, আকুলু, ঈশম, হাজিসাহেব, আবেদালি, অমলা, কমলা, শশীবালা প্রায় সকলেই বাস্তব জীবন থেকে উঠে এসেছে। জব্বার, ফেলু এরা স্বনামেই উপন্যাসে জায়গা করে নিয়েছে। বাস্তবে ফেলু ছিল একজন বড় হা-ডু-ডু খেলোয়াড়। সে লেখকের জ্যাঠামশাইকে খুনও করেনি এবং তার মৃত্যুও সেভাবে ঘটেনি। জব্বার একজন সাহসী প্রতিবাদী মানুষ। উপন্যাসে তার দ্বারা মালতী হরণ ও ধর্ষণের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, বাস্তবে এর সঙ্গে কোনো মিল নেই। সামসুদ্দিন ও তার লিগ সংক্রান্ত কার্যাবলী লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিশ্বস্ত ছাপ। তবে ঢাকা লিগ নয়, কলকাতা লিগের সঙ্গে তার ওঠা-বসা ছিল। তার মেয়ে ফতিমা ব্যক্তি-অতীনের শৈশবের খেলার সাথী, তার ভালোলাগার মানুষ। পরিবার পরিমণ্ডলের জাতপাতের চক্রব্যূহে ব্যথিত অতীন সোনার মধ্য দিয়ে চোখের জল ফেলেছেন। ঈশম চরিত্রটি লেখকের বাড়ির কাজের লোক রনার আদলে চিত্রিত। ঠাকুরবাড়ির সাংসারিক কাজে সে নিয়োজিত ছিল আর সোনালি বালির চরে তরমুজের ক্ষেতে সে সোনা ফলাত। এমনকি দেশভাগের পর সে মনিবদের খোঁজে এপারে একবার চলেও এসেছিল।

সোনালি বালির চর, শীতলক্ষ্যা নদী, টোডারবাগ, গোপাট, আস্তানা ঘাবের দরগা, সমস্ত কিছুই বাস্তবের ছায়ামূর্তি হিসাবে উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে। যজ্ঞেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণের [illegible] দাঙ্গার যে মনোগ্রাহী বর্ণনা উপন্যাসে পাওয়া

যায় বাস্তবে লেখক সে ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন। বাড়ির কাজের লোক রনার সঙ্গে তিনি মেলাতে গিয়েছিলেন। মুড়াপাড়ার শীতলক্ষ্যার তীরবর্তী স্থানে ভাঙা মসজিদে নামাজ পড়াকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিমে যে বিরোধের কথা উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে, বাস্তবেও সে ঘটনা ঘটেছিল। এছাড়াও মালতী অপহরণ, আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুদের রাত জেগে বসে থাকা, লাঠি, ছুরি খেলার প্রশিক্ষণ প্রভৃতি ঘটনাগুলির সঙ্গে লেখকের সরাসরি যোগাযোগ না ঘটলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলায় (বিশেষত পূর্ব অংশে) এগুলি ছিল অপরিচিত।

লেখক জি. আর. ইনস্টিটিউশনে পড়াশোনা করেন। যার পরিচিত নাম সোনারগাঁ পানাম স্কুল। উপন্যাসে সেই স্কুল ও স্কুলের শশী মাস্টারের যে বিবরণ আছে তা জীবনের ফেলে আসা অধ্যায়ের বিচ্ছুরণ।

এপারের উদ্বাস্তু জীবনের ছবি হিসাবে বহরমপুরের কাশিমবাজারের মণীন্দ্র কলোনির কথা এক জ্বলন্ত বাস্তব চিত্র। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স কর্পস-এ যোগদান, জাহাজে কাজ পাওয়ার চেষ্টা—এ সমস্ত কিছুতেই তো লেখকের ব্যক্তিগত জীবন সংগ্রামের কথা উপন্যাসের পাতায় বিধৃত হয়েছে।

বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে আরেকটা দিকের প্রতি আলোকপাত না করলেই নয়। উপন্যাসে যে সমস্ত চরিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন শুধু তারাই নয়, তাদের মুখে ব্যবহৃত ভাষাও ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ এলাকার কথ্য ভাষা, যা একান্তভাবেই নিজস্ব উপলব্ধিজাত। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় এ প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন—

"বাঙাল ভাষার একটা আলাদা ঘ্রাণ আছে। এ ভাষা আমার রক্তের মধ্যে প্রবহমান। বড় হয়েও এ ভাষাতেই কথা বলেছি। আমার ব্যক্তিজীবনের ছাপ পড়েছে সেই ধরনের রচনাগুলোতে ইচ্ছাকৃতভাবেই এ ভাষার ব্যবহার করেছি, যাতে বিষয়টা অনেক বেশি করে বাস্তবসম্মত হয়ে ওঠে।"[৩]

শুধুমাত্র আত্মজৈবনিক উপন্যাস হিসাবে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের বিচার করলে এর প্রতি অবিচার করা হয়। এখানে লেখকের আঁকা চরিত্র আর প্রকৃতি যেন একে অপরের সঙ্গে গভীর আশ্লেষে আবদ্ধ। সোনালি বালির চর, ফাওসার বিল, আস্তানা সাহেবের দরগা মানুষের সত্তার গভীরে ডুবে রয়েছে। হেমন্তের গোধূলি, অস্তায়মান সূর্যের রঙিন আভা, ধানক্ষেতের আলে কচ্ছপের ঘাপটি মেরে বসে থাকা, রাত্রের অন্ধকারে টোডারবাগের মাঠে শেয়ালের ডাক, জোনাকির দপ করে জ্বলে ওঠা প্রভৃতি চিত্রকল্পগুলি যেমন দৃষ্টিনন্দন, তেমনি অনুভববেদ্য। ট্যাবার পুকুরের বটগাছ, বামন্দিচকের বুড়ো শিমুল গাছের ভৌতিক বৃত্তান্ত, গোলাকান্দালের ভুতুড়ে পুল, বুলতার দিঘি, পুরী পূজার মাঠ প্রভৃতির সঙ্গে মানুষের আবহমান কালের পরিচিতি। এক

নিস্তরঙ্গ গ্রাম্য জীবনের কথা মায়াবী আলেখ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে; হয়তো সে কারণেই বাস্তব জীবন হয়ে উঠেছে ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর কল্পলোকের জগৎ—

"মাছটা এত বড় আর কপালে মনে হয় সিঁদুর দেওয়া—মাছটা কত প্রাচীনকালের কে জানে! মাছটার গায়ে কত মানুষের আজন্মকাল থেকে কোঁচ অথবা এক হলার শিকার চিহ্ন। মাছটার ডান ঠোঁটে দুটো বোয়ালের বঁড়শি নোলকের মতো দুলছে। মাছটার গায়ে কোঁচের ছোট ছোট কালি, খুঁজলে একটা দুটো নয়, অনেক কটা যেন মাংসের ভিতর থেকে বের করা যাবে। সেই মাছটা এবার আনন্দে এবং উত্তেজনায় বিলের ভিতর জল ফুঁড়ে আকাশের দিকে লাফিয়ে উঠল। তারপর সেই পাড়ের লোক, যারা পাতিল একা ভেসে যায় বলে হায় হায় করছিল, তারা দেখল বিলের জলে একটা মাছ নয়, যেন হাজার লক্ষ মাছ সেই প্রাচীন বিলের জল ফুঁড়ে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে, নেমে আসছে। ভয়ে এবং বিস্ময়ে মানুষগুলি দেখল অনন্ত জলরাশির ভিতর বড় বড় রাক্ষুসে সব গজার মাছ কুমুরের মতো জলের ওপর ভেসে উঠেছে। ওরা যেন সন্তর্পণে সকলকে সাবধান করে দিল—বাপুরা দ্যাখো আমাদের তামাশা দ্যাখো। আমরা জলের জীব, তাবৎ সুখ আমাদের জলে। ...এখন জ্যোৎস্না নামবে বিলের ওপর। সমস্ত বিলটা জ্যোৎস্নায় সারারাত ডুবে থাকবে, পাতিলটা ভেসে যেতে যেতে একসময় অদৃশ্য হয়ে যাবে। হাওয়া উঠলে সেই পাহাড়ের মতো কালো বস্তুটা বিলের ভিতর থেকে ফের ভেসে উঠতে পারে। কি বস্তু, কোন জীব, কোথায় এর নিবাস— দৈত্য-দানো অথবা অন্য কিছু বোঝা ভার। কেউ কেউ জীবটাকে দেখেছে, এমন একটা প্রচলিত ধারণা আছে অঞ্চলের মানুষদের। বিলের পাড় ধরে হাঁটলে কথাটা মনে হয়। এত বড় বিল এবং কালো জল দেখে অবিশ্বাস করা যায় না যেন। প্রাচীন বিল—কথিত আছে, নবাব ঈশা খাঁ এই বিলে সোনাইবিবিকে নিয়ে ময়ূরপঙ্খী নৌকায় কত রাতের পর রাত কলগাছিয়া দুর্গের দিকে মুখ করে তাকিয়ে থাকতেন। চাঁদ রায়, প্রতাপ রায় কলগাছিয়া দুর্গ তছনছ করে দিয়েছে। জলে জলে সপ্ত ডিঙ্গা যায়—সোনাইকে উদ্ধারের জন্য সাতশ ময়ূরপঙ্খী জাহাজ পাল তুলে দিয়েছে। জলে... বৃদ্ধ ঈশা খাঁর মুখে লম্বা সাদা দাড়ি ফকির দরবেশের মতো। মাথায় তার সোনার ঝালর, কোমরে অসি আর পিছনে কালো রঙের বোরখার ভিতর প্রতিমার মতো সোনাই, সোনাইবিবির স্থির অপলক দৃষ্টি সামনে। ওরা বিলের ভিতর আত্মগোপন করেছিল। এই আত্মগোপনের ছবি কিংবদন্তীর পাঁচালির মতো বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে।"[৪]

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে গ্রাম্য জীবন, গ্রাম্য মানুষ আর প্রকৃতি গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধিত। সৈয়দ মুজতবা সিরাজের ভাষায় এ মন্তব্যের সত্যতা ধরা পড়ে—*"পথের পাঁচালির পর এই হচ্ছে দ্বিতীয় উপন্যাস যা বাংলা সাহিত্যের মূল সুরকে অনুসরণ করেছে।"*[৫] গ্রাম্য জীবনের আচার-আচরণ, লোকবিশ্বাস তথা সমগ্র জীবনচর্যা এক স্বপ্নিল ভাষায় মূর্ত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা, সহানুভূতি আর সৌহার্দ্যের নিটোল লেখচিত্র অনুভূতিপ্রবণ লেখকের কলমের ডগায় মূর্ত হয়েছে। সেইসঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে হিন্দু-মুসলিম সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের চালচিত্র। হিন্দু সমাজের দুর্গাপূজা, বাস্তুপূজা, অষ্টমী

স্নান, মাঘমণ্ডলের ব্রত, লক্ষ্মী পূজা, কার্তিক পূজা, দশহরা উৎসব, রাবণবধের পালাগান, রামায়ণ যাত্রা, কৃষ্ণ যাত্রা, সোনার উপনয়ন, বুড়ো কর্তা মহেন্দ্রনাথের মৃত্যু ও পারলৌকিক ক্রিয়া প্রভৃতির পাশে পাই জালালির অন্ত্যেষ্টি, ফকির সাহেবের মহাপ্রয়াণ, ফেলুর কবরে হাজি সাবের 'মাইজলা বিবি'র মোমবাতি জ্বালানো।

"...যখন এই অঞ্চল নিশুতি রাতে ঘুমিয়ে পড়ে, কোনো কাকপক্ষী ডাকে না কেবল মাঝে মাঝে সে ঝোপে জঙ্গলে কীটপতঙ্গের আওয়াজ পায় তখন ধড়ফড় করে উঠে বসে শিয়র থেকে ম্যাচ বাতিটা তুলে নেয় হাতে। একটা মোমবাতি তুলে নেয়। নিশীথে কালো বোরখা পরে হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে সে এই কবরে নেমে আসে। কবরের মাজারে সে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। সে ডাকে মিঞা আমি আইছি। মোমবাতি জ্বালতে আইছি। সে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। ফেলুর হয়ে সে শোক করে। কেউ জেগে নেই বলে সে মাথা নুইয়ে রাখে কবরের পাশে। এবং নামাজের ভঙ্গিতে বসে থাকে। যেন সে নামাজই পড়ছে। সারা রাত্রি ধরে কেউ কেউ খবর পায় এক বোরখা পরা বিবি এই কবরে হাঁটাহাঁটি করে। হাতে তার মোমবাতি। সবাই আবার কোনো অশরীরীর গন্ধ পায় চারপাশে। এটাই রক্ষা করেছে মাইজলা বিবিকে।"[৬]

পূর্ববঙ্গের নিস্তরঙ্গ গ্রামজীবনে লেগেছে কালের হাওয়া। দেশভাগের অভিঘাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুস্থির বন্ধনের গ্রন্থি আলগা হয়ে উঠেছে। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' মন্ত্রের দীক্ষা হিদু-মুসলমানের মিলন ক্ষেত্রের মধ্যে নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা আর বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রাচীরকে বড় করে তুলেছে। দেশভাগের জাতাকলে পড়ে মানুষ হয়েছে দিশেহারা, বাস্তুহারা। স্বদেশ-স্বজন হারানোর বেদনায় নির্বাক। অথচ এই দেশভাগের কারণ উপলব্ধি করার মতো মন সাধারণ মানুষের ছিল না। একদিন যারা হিন্দু পাড়ায় যাত্রার আসরে ভিড় জমিয়েছে, শীতের মেলায় বাজি জেতার জন্য ঘোড়াদৌড়ের মহড়া দিয়েছে তারা 'সকলেই সকলকে আড়চোখে দেখে'। তাই মাটি কার? প্রশ্নটা শুধু জোটনের মনেই গুমড়ে মরে না, হয়ে যায় আপামর বঙ্গবাসীর।—

"ঈশম বসে বসে কেবল শুনছে। সে ঠিক যেন বুঝতে পারছে না। সে এইটুকু বোঝে, দেশভাগ হলে এদেশটার নাম পাল্টে যাবে। পাকিস্তান হবে। বাংলাদেশের নাম পাকিস্তান—ঈশমের কষ্ট হয় ভাবতে। আর একটা অংশ হিন্দুস্থানে চলে যাবে। এটাও ওর মনে কেমন একটা দুঃখের ছাপ বহন করেছে। এত বড় বাংলাদেশে নিজস্ব বলতে কিছু থাকবে না। এটা সামু করেছে। ওর সঙ্গে দেখা হয় না। দেখা হলে যেন সে বলত, কী লাভ তর, দেশটারে ভাগ করে দুই দেশের কাছে ইজারা দিলি।"[৭]

আলোচ্যমান উপন্যাসের একটা বিশেষত্ব হল, পূর্ববঙ্গের দরিদ্র মুসলিম সমাজের অন্তরঙ্গ জীবনবীক্ষার চিত্রায়ন। ঈশম, ফেলু, সামু, হাজিসাহেব, আবেদালি, আন্নু,

জালালি, জোটন, ফকিরসাব, মনজুর, ফতিমা—এরা সকলেই যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এদের দারিদ্র্য-পীড়িত জীবন সংগ্রামের পাশাপাশি হিন্দুসমাজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা একটা বৈপরীত্যের জন্ম দিয়েছে।—

"...যারা আছে প্রায় সকলেই আল্লার বান্দা। অধিকাংশ জমি ভাগে চাষ করে ঈশম ত শালা! ...ঠাকুরবাড়ির বান্দা ঈশম তরমুজ বিক্তি করবে, আর সব টাকা তুলে দেবে ছোটঠাকুরের হাতে। ওর গর্ব সে জমি থেকে ছোটঠাকুরের হাতে কত টাকা তুলে দিতে পারল।

গ্রামের পর গ্রাম। বিস্তীর্ণ মাঠ। মুসলমানদের গ্রামগুলিতে হাহাকার যেন বেশি... আর হিন্দু গ্রামগুলির দিকে তাকাও—পুবের বাড়ি যেন নরেন দাস—তার জমি আছে, তাঁতের ব্যবসা আছে। দীনবন্ধুর দুই তাঁত দুই বউ। সুখে আছে লোকটা। আর ঠাকুরবাড়ির মানুষেরা শোনা যায় তল্লাটের বিদ্বান বুদ্ধিমান মানুষ... ওদের সচ্ছল সংসার। তারপর পাল বাড়ি—জমি আছে ওদের, মিলের কাজ আছে।"[৮]

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি চরিত্রেরই অপ্রাপ্তিটা বড় হয়ে উঠেছে। মণীন্দ্রনাথ পায়নি ভালোবাসার মানুষ পলিনকে, ফিরে পায়নি হারানো নীলকণ্ঠ পাখিগুলোকে। বড় বউ সংসারে ধরে রাখতে পারে না স্বামী মণীন্দ্রনাথকে। জালালি পায় না ক্ষুধার অন্ন। ফেলু ধরে রাখতে পারে না সোহাগের আন্নুকে। হাজি সাহেবের মাইজলা বিবি পায় না মনের মানুষ ফেলুকে। জোটন পায় না স্বামী-পুত্রের সংসার। অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা বুকে নিয়ে সকলে সারা জীবন ধরে ছুটে চলেছে নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে। এক অসীম অনন্তের প্রতি যাত্রা জীবনের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ধাবিত হয়েছে।

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'র জগৎ অতীনের মানসিক জগৎ ও তার সাহিত্যের জগৎকে উদ্ভাসিত করেছে। এ জগৎ সকলের অতি সুপরিচিত অথচ তা একক ও অনন্য। লেখকের প্রকাশ ক্ষমতা আর দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষত্বে এর দ্বিতীয় কোনো দোসর নেই। জীবনবোধের ক্ষেত্র থেকে উঠে আসা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁকে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক তরঙ্গবিক্ষেপের বাইরে দাঁড় করিয়েছে। সাহিত্যজীবনের সূচনালগ্নে কপালে জুটেছে প্রতিষ্ঠার জয়টিকা।

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের অন্বেষণ আরও গভীরতর ব্যাপ্তিলাভ করেছে 'মানুষের ঘরবাড়ি' (১৯৭৮) উপন্যাসে। ছিন্নমূল মানুষের নিরাপদ আশ্রয় সন্ধান আর ঘরবাড়ি বানানোর প্রয়াসকে কেন্দ্র করে এ উপন্যাসের কাব্যকায়া নির্মিত হয়েছে। প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮। তিন পর্বের এই উপন্যাস—'মানুষের ঘরবাড়ি', 'মৃন্ময়ী' এবং 'অন্নভোগ' একত্রে 'মানুষের ঘরবাড়ি' নামে অখণ্ড সংস্করণ হিসাবে ২০০১ সালে বের হয়। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', 'অলৌকিক জলযান' এবং 'ঈশ্বরের বাগান' উপন্যাসত্রয়ীর মধ্যে কাহিনিগত ও চরিত্রগত দিক দিয়ে একটা সাযুজ্য আছে

ঠিকই, তবে 'মানুষের ঘরবাড়ি' উপন্যাসখানি ভিন্ন নামধারী কেন্দ্রীয় চরিত্র থাকা সত্ত্বেও 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের পরবর্তী অংশ হিসাবে যুক্ত হয়ে যায় খুব সহজেই। উপন্যাসের ঘটনাকাল ও কাহিনি এই দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করে। যদিও লেখক আলোচ্যমান উপন্যাসখানি রচনা করেছেন 'ঈশ্বরের বাগান' উপন্যাস রচনার পরে। *ছিন্নমূল মানুষের আহার ও আশ্রয় খোঁজের এক জীবন্ত উপাখ্যান এ রচনা। ঘটনাকাল ১৯৪৮-৫৩ খ্রিঃ। এই নাতিদীর্ঘ সময়ের মধ্যে সমাজ ও রাষ্ট্রে এসেছে বিপর্যয়। উদ্বাস্তু স্রোত, আহার ও আশ্রয়ের জন্য নিরন্তর সংগ্রামের ডিটেলস ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন এখানে।*

উপন্যাসের পটভূমি বহরমপুর থেকে বারো ক্রোশ দূরে এক নির্জন বনভূমি। পাণ্ডববর্জিত সেই প্রদেশে ছিন্নমূল ধনকর্তা স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে জীবনে স্থিরতা খুঁজেছেন। তিনি মনে করেন, জীবনে বেঁচে থাকার জন্য আহার আর উত্তাপের প্রয়োজন। এরই মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান মেলে। এই ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানুষটি লেখকের বাবা অভিমন্যু বন্দ্যোপাধ্যায় আর বিলু লেখক নিজে। প্রায় সমস্ত উপন্যাস জুড়ে অতীন জীবনের সন্ধানে রত হয়েছেন, 'মানুষের ঘরবাড়ি' যেন সেই সন্ধানের একটি অধ্যায়।—

"আসলে আমি ব্যক্তিগতভাবে কুঁড়ে এবং অলস মানুষ। খুব চাপ সৃষ্টি না হলে লেখা হয় না। আর যা হয় যে বিষয় নিয়ে লিখতে শুরু করি তার রেশ মাথা থেকে কিছুতেই সরে যায় না। পর পর 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', 'অলৌকিক জলযান' এবং 'ঈশ্বরের বাগান'ও প্রায় একই ধরনের রেশ থেকে লেখা। জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে এইসব উপন্যাসের সৃষ্টি। এইসব উপন্যাস সৃষ্টির পরই বোধ হয় 'মানুষের ঘরবাড়ি' বিষয়টি মাথায় ক্রিয়া করে। কিংবা বলা যায় 'ঈশ্বরের বাগান'-এর খণ্ড খণ্ড অংশগুলি লেখার সঙ্গে সঙ্গে 'মানুষের ঘরবাড়ি' মাথায় চেপে বসে। আমার কৈশোর জীবনের অভিজ্ঞতা এবং তার মানুষজন এবং একজন ছিন্নমূল মানুষের ঘরবাড়ি বানানোর আন্তরিকতা আমায় তাড়া করতে থাকলে উপন্যাসটি লিখতে শুরু করি। আর আমি বিশ্বাস করি, সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম শর্ত হল—স্রষ্টার জীবনব্যাপী সন্ধান কিসের জন্য এবং সেই সন্ধানে মানুষের ইতিহাস যদি লেখা থাকে, তবেই সার্থক সেই উপন্যাস। দেশভাগে বিপন্ন মানুষগুলির আহার, আবাস এবং উত্তাপের দিনগুলির সংঘাত সনাতন ভারতবর্ষকে মনে করিয়ে দেয়। সেই কোন অতীত থেকে এই ভূখণ্ডে যুদ্ধবিগ্রহ, ধর্ষণ, গৃহদাহ, ধর্মান্ধতা যে শুরু হয়েছিল, দেশভাগ তার আর একটি পরিণতি মাত্র। কিছুই থেমে থাকে না—জীবনকালের রূপক মাত্র এমনও মনে হয়।

এবং এমন সব ভাবনা মাথায় কাজ করে বলেই জীবনের কথা লিখতে আগ্রহ বোধ করি। 'মানুষের ঘরবাড়ি'র দ্বিতীয় খণ্ড 'মৃন্ময়ী' এবং তৃতীয় খণ্ড 'অন্নভোগ' উপন্যাসেরও সৃষ্টি এইভাবে। পূজা সংখ্যার চাপ, অথচ চরিত্রগুলি আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। একান্ত নিরুপায়, যেন জীবন শেষ হয়েও যায় না। যা লিখি, মনে হয় তারপরও লেখা বাকি থেকে যায়। সেই কবে বাবা-কাকা-জ্যাঠার সঙ্গে 'বঙ্গ আমার জননী আমার' কথা ভুলে এদেশে পদার্পণ। ছিন্নমূল

জীবনে দেখেছিলাম একখণ্ড জমি, একটুখানি বাড়ি, একটুখানি আশ্রয়, একটুখানি আহারের জন্য জীবনের সর্বস্ব বাজি রেখে দুর্গম এলাকায় লক্ষ লক্ষ মানুষ অভিযানে বের হয়ে পড়েছেন। যাঁরা অতীতে ছিলেন, এখনও যাঁরা আছেন—কঠিন সংগ্রামের ভেতর থিতু হয়েছিলেন কিংবা হয়েছেন, মহাকাল তাদের সেই সংগ্রামের ইতিহাস গ্রাস করবেই—আর এইসব উপন্যাস রচনার হেতু সেই জীবনকে যতকাল যতটুকু পারা যায় দর্পণে উদ্ভাসিত রাখা।'[১]

উপন্যাসের 'ভূমিকা' অংশে লেখকের এই স্বীকারোক্তিই উপন্যাসটিকে আত্মজৈবনিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে সবচেয়ে জোরালো দাবি। উপন্যাসের কাহিনির গভীরে ডুব দিলে আরও অনেক দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

উপন্যাসের ঘটনাকাল লেখকদের বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ের ঘটনা। ১৯৪৮ সালে লেখক তাঁর বাবা-জ্যাঠামশাইদের সঙ্গে এপারে চলে আসেন। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে যে স্থায়ী আবাসের কথা পাই, এখানে তার পরিচয় আরও ব্যাপকতর। মণীন্দ্র কলোনিতে লেখকদের আবাসের কথা, এমনকি তার খোঁজ মিলে যাবার কথা উপন্যাসে যেভাবে বিধৃত হয়েছে ব্যক্তিজীবনে লেখকদের ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। লেখকদের দূর সম্পর্কের কাকা যিনি এপারে দর্জির কাজ করতেন, তাঁর প্রচেষ্টাতেই বহরমপুরের কাশিমবাজার রাজাদের এই বনভূমির খোঁজ পেয়েছিলেন তাঁর বাবা-কাকারা। তাঁদের আহার আর আশ্রয় সন্ধানের যে জীবন-কাহিনি, সেই কঠোর বাস্তবতার চিত্র মায়াবী ভাষার জাদুকাঠির স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসের প্রথম অংশে বিলুর লেখাপড়ার কথা, দূর সম্পর্কের কাকার সহযোগিতা, প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, মোটর গ্যারেজে কাজ, বাড়ি থেকে পালিয়ে রহমানদার সঙ্গে ট্রাকের খালাসির কাজ—এ সমস্ত ঘটনাগুলি লেখকের জীবনে ঘটেছিল।

উপন্যাসের কাহিনি কথন ও ভাষার মধ্যে বদল ঘটেছে। অন্যান্য উপন্যাসগুলির কাহিনি যেখানে প্রথম পুরুষে এগিয়ে গেছে, এখানে লেখক উত্তমপুরুষে কাহিনি বর্ণনা দিয়েছেন। *আত্মকথন রীতির যথাযথ ব্যবহারে লেখকের এ উপন্যাস শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের উত্তরসূরী হিসাবে বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে।* কাহিনিবৃত্তে বিলু চরিত্র এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এবং তাকে ঘিরে যেসব কাহিনি দানা বেঁধেছে তা যে ব্যক্তি-অতীনের জীবনের প্রতিফলন, সেটা অতীন সম্পর্কে আগ্রহী পাঠকদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না।

উপন্যাসের 'পুনশ্চ' অংশে বিলুর সাংসারিক বেড়াজালে আবদ্ধ জীবন, যৌবনের সেই বাসভূমি ছেড়ে কলকাতায় বাস, দু'দণ্ডের সময়ের অভাবে সেখানে

দীর্ঘকালের অনুপস্থিতি, বাবার মৃত্যু, মায়ের দুঃখ-যন্ত্রণা, ভাইদের-ভাইবউদের ঈর্ষা, বাবার লাগানো গাছ কেটে ফেলা, সব মিলিয়ে এক বাস্তব জীবনালেখ্যের বর্ণনা। উপন্যাসে বর্ণিত যে পারিবারিক কাহিনি সেই বৃত্তের একটা পূর্ণতা এসেছে। এ ঘটনাও লেখকের ব্যক্তিজীবনের স্পষ্ট প্রতিফলন। তাই এক দার্শনিক-চেতনায় উপন্যাসের সমাপ্তি পাঠককে আবিষ্ট করে—

"...মা তুমি বড় বৃক্ষ। দাঁড়িয়ে আছ ডালাপালা মেলে। ফুল ফোটে। ফল ধরে। হাওয়ায় কে কোথায় সব বীজ উড়িয়ে নিয়ে যায়। জল পড়ে। শস্য দানার মতো আরও মাটির নিচে শেকড় চালিয়ে দেয়। বড় দূরের হয়ে যায় সব কিছু। সারা পৃথিবী জুড়ে কত গাছপালা, ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে আরও ফুল ধরে ফল হয়। আবার ঝড়ো হাওয়ায় বীজ উড়িয়ে কোন এক সুদূরে নিয়ে যায়। আমরা তোমার সেই বীজ উড়ে গেছি।"[১০]

অতীতের ফেলে আসা বর্ণময় দিনগুলির স্মৃতি আর দেশভাগের একরাশ যন্ত্রণা বুকে নিয়ে সাগর থেকে মহাসাগরে, এক বন্দর থেকে আরেক বন্দরে ঘুরে বেড়িয়েছেন 'সমুদ্র মানুষ' অতীন তাঁর 'অলৌকিক জলযান'-এ চড়ে। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে যে জীবনের সূচনার ইঙ্গিত তারই পল্লবিত রূপ 'অলৌকিক জলযান'। 'অমৃত' সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে ১৩৮৪, মাঘ।

অতীনের অধিকাংশ উপন্যাসের বীজ রয়ে গেছে তাঁর কোনো-না-কোনো ছোটগল্পে। এক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। বহরমপুর থেকে প্রকাশিত 'উত্তরকাল' পত্রিকার 'ফ্রেন্ডশিপ' গল্পে এর বীজ রয়ে গেছে। আলোচ্যমান উপন্যাসের কাহিনির সূচনা ১৭ মে ১৯৫৩ খ্রিঃ। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'র কাহিনির সমাপ্তি ঘটেছে ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারিতে। মাঝখানের প্রায় এক বছরেরও বেশি সময়কালের মধ্যে ঘটে গেছে উদ্বাস্তু পরিবারের আহার, উত্তাপ, আশ্রয় সন্ধানের এক সংগ্রামী কাহিনি। 'মানুষের ঘরবাড়ি' উপন্যাসে যার স্বাক্ষর সযত্নে রক্ষিত। সেই হা-অন্ন পরিবারটিকে বাঁচিয়ে তোলার তাগিদে সোনা বেছে নিয়েছে নাবিক জীবন। কলকাতার শিপিং অফিস থেকে লজঝরে জাহাজ এস.এস. সিউল ব্যাঙ্ক-এ কোলবয় হিসাবে সমুদ্রযাত্রায় পাড়ি জমিয়েছেন। দীর্ঘ বাইশ মাস ধরে এস.এস. সিউল ব্যাঙ্ক প্রায় ষাট-সত্তর জন জাহাজি নিয়ে ভেসে চলেছে বঙ্গোপসাগর থেকে কলম্বো, তারপর লরেঞ্জো মারকুইস, ডারবান, কেপটাউন হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার সেন্টিসে, কখনো বুয়েন আয়ার্স তো কখনও নিউ প্লাইমাউথের বন্দরে। এই বিচিত্র গতিপথে বিচিত্র সব মানুষের লৌকিক-অলৌকিক জীবনযাত্রার বিস্ময়কর উপলব্ধি ব্যক্ত হয়েছে ব্যক্তি-অতীনের অবিস্মরণীয় জীবন অভিজ্ঞতার নিরিখে—

"...যেহেতু 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' সিরিজ লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল—অনন্ত অসীম সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালায় লজঝরে জাহাজের নাবিক হয়ে যেহেতু পৃথিবীর প্রায় সব সমুদ্রেই বিচরণ করেছেন তিনি, যেহেতু নাবিক জীবনের সেই লৌকিক-অলৌকিক উপলব্ধি জগৎবিস্ময় তাঁর জীবনেরই এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা, তাই এই বিস্তীর্ণ উপন্যাসে সেই দুঃসাহসিক সমুদ্রযাত্রার কথাই উঠে এসেছে।"[১১]

উপন্যাসের নায়ক ছোটবাবু। পূর্ববঙ্গের সোনা এপার বাংলায় উদ্বাস্তু পরিবারটিকে হা-অন্নের জীবন থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য খিদিরপুরের শিপিং অফিসে চলে আসে জাহাজে চাকরির আশায়। সোনার উত্তরণ ঘটে কোলবয় ছোটবাবুতে। এ ব্যক্তি-অতীনের জীবনের ২২-২৩ বছর বয়সের ঘটনা। কোনো এক বুড়ো সারেং-এর প্রচেষ্টায় তাঁর এ কাজ জুটে গিয়েছিল। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় পৃথিবীর নানা বন্দরে বিভিন্ন মানুষ, জাহাজী জীবনের রীতি-সংস্কার, বিশ্বাস প্রভৃতি বিষয়গুলি খেয়ালি কল্পনা আর অভিজ্ঞতার মিশেলে বর্ণময় হয়ে উঠেছে উপন্যাসের পাতায়। উপন্যাসের ঘটনা আর ব্যক্তি-অতীনের জীবনে সমকালীন সময়ে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা মিলিয়ে নিলে এ উপন্যাসেও যে আত্মজৈবনিকতার ছাপ রয়েছে সে-সম্বন্ধে একটা দাবী রাখা যেতে পারে।—

"ইতিমধ্যে দুটো পাসও দিয়ে ফেলেছি। ১৯৫২ সাল আবার কিছুদিনের জন্য নিরুদ্দিষ্ট হওয়া গেল। কারণ সংসারে বাত ব্যাধির মতো দুর্ভোগ লেগেই আছে। নানা ছলছুতোয় শেষ পর্যন্ত বের করা গেল একটা আস্তানা। হালিশহরে ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার্স কোর্সে যোগদান। ট্রেনিং শেষ করে সমুদ্রে চলে গেলাম। জাহাজে সামান্য কোলবয়ের চাকরি। এবং প্রায় পৃথিবী বলতে যা বোঝায়, প্রায় বৃত্তাকারে আছে যে পৃথিবী, যার তিন ভাগ জল এবং এক ভাগ স্থাল, এক ভাগ জাহাজে ঘুরে ফিরে দেখা গেল। কখনও দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জমালায়, তাহিতি এবং সব মহাদেশের উপকূলে উপকূলে, কখনও নীল জলরাশির ভেতর, সেইসব নিঃসঙ্গ পাখিদের দেখতে দেখতে সময় বয়ে যাচ্ছিল। সুদূর নিও-জিল্যান্ডের নিউ-প্লাইমাইমাউথ বন্দরে ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে অদূরে এগমন্ট হিলের চূড়োয় দেখেছি সূর্যোদয়, কৌরিপাইনের বনভূমিতে হেঁটে গেছি। আফ্রিকার উপকূলে কখনও নিগ্রো যুবতীদের ঘরে আহার, কখনও মেলবোর্ন শহরে রাতের পর রাত মত্ত অবস্থায় দিন কেটেছে। সব মহাদেশে জলরাশি, তিমি মাছের ঝাঁক, অনন্ত আকাশের নীচে—জীবন বয়ে যাচ্ছে এভাবে। পৃথিবী, জীবন, ঈশ্বরের পাশাপাশি আছে বুঝতে পারলাম। জীবন না থাকলে ঈশ্বর থাকে না। এবং দেশে ফেরার পথে এক রাতে স্বপ্নে মনে হল সত্যি তাঁকে হাতের মুঠোয় ধরে ফেলেছি—আহার, বাসস্থান এবং উত্তাপই আমার ঈশ্বর। ...এভাবে যাচ্ছে বাবার নামে মাসোহারা। অর্থ সঞ্চিত হচ্ছে কোম্পানির ঘরে। জাহাজ থেকে নেমে যখন এবারে বাড়ি ফিরব, মার জন্য শীতের কম্বল, ছোট ভাইবোনের জন্য উলের জামাকাপড়, বাবার জন্য কি যে নি! বাবার জন্য একজোড়া জুতো...।"[১২]

উপন্যাসের কাহিনি-বিন্যাস, পরিণতিতে এর সঙ্গে পার্থক্যটা প্রতীয়মান হয়ে উঠলেও ছোটবাবু যে ব্যক্তি-অতীনের আন্তরাত্মা, সে বিষয়ে কোনো দ্বিধা নেই। এ প্রসঙ্গে বনি চরিত্রটির প্রতি আলোকপাত করা প্রয়োজন। বাস্তবে এ ধরনের চরিত্রের সঙ্গে লেখকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরিচিতি না থাকলেও এ চরিত্র সৃষ্টির পিছনে লেখকের জীবনঋদ্ধ অভিজ্ঞতা অনেক বেশি ক্রিয়াশীল ছিল—

"বনি সম্পর্কে সকলেই জানতে চায়। কিন্তু আমি সে সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলতে চাই না। তুমি একে আমার মানসকন্যাও বলতে পার। আসলে আমাদের জাহাজে আয়ারল্যান্ড বা ওয়েলস-এর একজন ছেলে ছিল। সে আমারই বয়সী। তার সঙ্গে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠতাও ছিল। তার শারীরিক গঠন, কমনীয়তা, তাকে নারীচরিত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে।"[১৩]

এ উপন্যাস যতটা না আত্মজৈবনিক উপাদানে ঠাসা, তার চেয়ে অনেক বেশি করে কল্পনার বর্ণালীতে রঙিন হয়ে ওঠা রামধনু। যার দ্যুতি জীবনের চলমান ইতিহাসকে এক খাত থেকে অন্য খাতে নিয়ে চলে—

"সৌরলোকে আর একটা নতুন পৃথিবী তৈরি হয়ে গেছে। দু'জনেই সমুদ্রে দাঁড়িয়ে লম্ফর আলোতে নতুন ডাঙার অনুসন্ধানে আছে। তিনিও ছিলেন—আজীবন সেই ডাঙা খুঁজে বেরিয়েছেন। সামান্য আশ্রয় প্রেম। বিশ্বাসহীনতায় বেঁচে থাকতে কখনও চাননি। অথচ সংশয়, সন্দেহ এবং এক অশুদ্ধ প্রভাব যেন কি করে এই মহাজীবনে এসে যায়—মনে হয় তিনি, তাঁর অস্তিত্ব এক মহাময়, শেষ নেই যার, কোনো অলৌকিক জলযানের মতো নিরুদ্দিষ্ট যাত্রা। অথচ পাশেই আছে জীবনপ্রবাহ—কি তাজা আর খাঁটি! এত জেনেও তাঁর কেন এখন চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। ধরা পড়ে যাবেন ভেবে তিনি ওপরে উঠে যাচ্ছেন। আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে হাউমাউ করে এভাবে তিনি কার জন্য কাঁদছেন! বুক থেকে কেন সেই অমোঘ বাণী জোরে উঠে আসছে না—কেন জোর জোর গাইতে পারছেন না, গ্লোরি হ্যালে লুজা—আই অ্যাম অন মাই ওয়ে।"[১৪]

নগর সভ্যতায় মূল্যবোধহীন জীবনচর্যার অসহিষ্ণু চেহারার রেখাচিত্র ফুটে উঠেছে 'ঈশ্বরের বাগান' (১৯৮১) উপন্যাসে। বৃহদায়তন এক রচনা 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের শেষ পর্ব। নগরজীবনের এক নীরস ইঁট-কাঠের গদ্যময় জগতে সোনা এখানে অতীশ দীপঙ্কর—এক পরিণত মানুষ। উপন্যাসের সময়কাল ১৯৬৩-৭১। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মলগ্ন পর্যন্ত। এই নাতিদীর্ঘ সময়কাল ঘটনার ঘনঘটা আর চরিত্রের মিছিলে বৃহৎ কলেবরে আত্মপ্রকাশ করেছে। জীবনের বিচিত্র উপাদান আর সময়ের ত্রিধারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে নগর কলকাতার যান্ত্রিক জীবনের যন্ত্রণা বা সদ্য অতীত সমুদ্র জীবনের স্মৃতিকথা বা মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ এবং সোনার স্বদেশযাত্রা। ঈশ্বরের পৃথিবীর বিরাট বিস্তৃতি এখানে নেই। এ বাগানে

কোনো সুন্দর ফুল প্রস্ফুটিত হয় না। এখানে নেই প্রাণ খোলা হাসি। ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে সকলেই সদা উন্মুখ। ব্যক্তিস্বার্থ সমষ্টির স্বার্থকে পরাভূত করে এগিয়ে চলেছে ঈপ্সিত কামনাকে চরিতার্থ করার লক্ষ্যে।

উপন্যাসের নায়ক অতীশ শুভ-অশুভর দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত। নগর কলকাতার জীবনে সে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে ব্যাপৃত। তার জীবনের একদিকে আছে আর্চির প্রেতাত্মা যার হাত থেকে মুক্তি পাবার আশায় বনি নামক ঈশ্বরের কাছে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে বসে থাকা আর অন্য দিকে দাম্পত্য জীবনে স্ত্রী নির্মলার প্রতি অগাধ ভালোবাসা, সন্তান-সন্ততি টুটুল-মিন্টুর প্রতি দায়িত্ব-সচেতন পিতার কর্তব্য। সমকালীন যুগ-মানসের প্রতিনিধি হিসাবে অতীশ চরিত্রের উপস্থাপন। 'অলৌকিক জলযান'-এর ছোটবাবুর সংগ্রাম অতীশের মধ্যে সঞ্চারিত। অতীশকে প্রতিনিয়ত লড়তে হয়েছে নগর কলকাতার লজঝরে রঙের কোম্পানির সঙ্গে। প্রচণ্ড প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেও অতীশ তার আদর্শবোধ ও সততাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। যদিও কারখানার মালিক রাজেনবাবুর দুর্নীতি আর কৌশলী চালে সে পরাভূত। এক বিশৃঙ্খল সমাজ পরিস্থিতিতে মূল্যবোধহীন দেশকালের জাঁতাকলে অতীশের জীবনাদর্শ সঙ্কটাপন্ন। মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, পাপ-পুণ্যের মতো রঙের কারখানাতেও লুকিয়ে রয়েছে শুভ-অশুভের দ্বন্দ্ব। মূল্যবোধসম্পন্ন মানসদা যেন নষ্ট সময়ের এক জাগ্রত বিবেক। তার বক্তব্যের মধ্যে আছে নগর জীবনের বাস্তব সত্যের উপস্থাপন—

"এটা রাজার বাড়ি। নবীন যুবক, তোমার নাম অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক। স্কুলে মাস্টার ছিলে, পোষাল না, ছেড়ে দিলে। এখানে সব চাউর হয়ে যায়। এখানে কিছু গোপন থাকে না। কত পাপ এ বাড়িতে, সবাই মনে করে বড়ই গোপন— কাকপক্ষীতেও টের পায় না। তারপর থেমে থেমে বললেন, নবীন যুবক, ঈশ্বরের বাগানের চেহারাটাই এই। এত ভাব কেন?"[১৫]

'ঈশ্বরের বাগান" উপন্যাসে বাস্তব জীবন-অভিজ্ঞতার বহুমাত্রিক শিল্পবিন্যাসের বিচ্ছুরণ লক্ষ করা যায়। নিজস্ব জীবন-অভিজ্ঞতার নিরিখে লেখক কারখানার জীবন—নগর-সভ্যতার আপাত চাকচিক্যময় অথচ বিবর্ণ রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। ঘটনাবহুল জীবনের নানা স্মৃতি তাঁকে বারবার তাড়িত করে বলেই রচনাগুলিতে আত্মতার ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'ঈশ্বরের বাগান' রচনাতেও সেই বিশ্বস্ততার চিহ্ন মেলে। কাহিনির গভীরে ডুব দিয়ে সেই আত্মতার সন্ধান করা যেতে পারে।

১৯৬৩ খ্রিঃ-এ শিক্ষকতার পদে ইস্তফা দিয়ে লেখক কলকাতায় চলে আসেন। শিয়ালদহের কাশিমবাজারের সৌমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর 'কালার প্রিন্টিং এন্ড হলোওয়্যার্স লিমিটেড'-এ চাকরি গ্রহণ করেন। সৌমেন্দ্র নন্দী লেখকের গুণগ্রাহী ছিলেন।

উপন্যাসের কাহিনিতেও তার পরিচয় মেলে। প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা ও লেখালেখির কাজ সমান তালে চলত। যা তাঁকে কিছু বাড়তি উপার্জন দিত আর দিত একটা বৃহৎ সংসারের গ্রাসাচ্ছাদনের নিশ্চিত নিরাপত্তা—

"অতীশ সমুদ্র থেকে ফিরে আসার পর পত্র-পত্রিকায় ছোট্ট একটা খবর বের হয়েছিল। সেই খবর থেকেই অতীশ কোনও খবরের কাগজের সম্পাদকের নজরে পড়ে গেছিল। একটা লেখা লিখেছিল, সুনাম পেয়েছে। দুটো লেখা লিখলে সযত্নে ছাপা হয়ে যায় বলে বাড়তি কিছু পয়সা আসে, ফলে চর্চা করে লেখার।"[১৬]

লেখক সত্তা তার মধ্যে সর্বদাই ক্রিয়াশীল ছিল। এমনকি কারখানার ম্যানেজার থাকাকালীনও তাঁর কলম সজাগ ছিল। কলকাতায় আসার অনেক আগেই তিনি বিয়ে করেছিলেন মমতাদেবীকে। উপন্যাসে তিনি নির্মলা নামে উপস্থিত হয়েছেন। তিনিও প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। সপ্তাহান্তে বাড়ি ফিরে আসতেন। এ সমস্ত বাস্তব তথ্যগুলোকে তিনি উপন্যাসের পাতায় তুলে ধরেছেন। কিছুটা খেয়ালি রঙের আঁচড় দিয়ে।

মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশের যে চিত্র আলোচ্যমান উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে তার সঙ্গে লেখকের সরাসরি যোগাযোগ না ঘটলেও একটা মানসিক যোগাযোগ লক্ষ করা যায়। 'সোনার স্বদেশযাত্রা' অংশে লেখক তাঁর আবাল্যের বাসভূমিতে ফিরে গেছেন বাল্যবান্ধবী মঞ্জুর চিঠি পেয়ে। কিন্তু বাস্তবে এর কোনো মিল নেই। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে স্বাধীন বাংলাদেশে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে লেখকও গিয়েছিলেন। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য নিজেদের বাস্তুভিটা দেখতে যাবার সুযোগ তাঁদের ঘটেনি। সে ঘটনাকেই লেখক কল্পনার জারক রসে জারিত করে পরিবেশন করেছেন।

উপন্যাসের অতীশ আর বাস্তবের লেখক অতীনের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই বললেই চলে। শৈশবের সোনা, কৈশোরের বিলু ও ছোটবাবু আর যৌবনের অতীশ লেখক অতীনের ব্যক্তিসত্তার পর্যায়ক্রমিক আবর্তন।

৮৪টি পরিচ্ছেদের বৃহৎ ক্যানভাসে জীবনের নানা ঘটনার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে অতীশ চরিত্রের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি-অতীনের অভিজ্ঞতার রঙে রঞ্জিত হয়ে। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়—'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে যে পরিমাণ আত্মতা তথা আত্মজৈবনিক উপাদানের সমাবেশ লক্ষ করা যায় এখানে তা অনুপস্থিত। জীবনের বহুমাত্রিক উপাদানের সংমিশ্রণে এ উপন্যাস আত্মচরিতের পথ থেকে সরে এসেছে। তাই বাঁধা-ধরা ছকের নিরিখে একে বিচার না করে বিশুদ্ধ উপন্যাস হিসাবে গ্রহণ করাটাই হবে এই মহৎ সাহিত্যকর্মের প্রতি সুবিচার করা।

অতীনের সারা জীবনটাই যেন একটা উপন্যাস। তাঁর সমগ্র কথাসাহিত্য জুড়ে রয়েছে জীবনঋদ্ধ অভিজ্ঞতার বর্ণময় ছটা। জীবনের নানা পর্বের ঘটনাগুলিকে থরে-বিথরে সাজিয়ে দিয়েছেন উপন্যাসের পাতায়। তাই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদের বাস্তবের মাটিতে নড়েচড়ে বেড়াতে দেখা যায়। আসলে সারা জীবন ধরে তিনি যেন একটা উপন্যাসই লিখতে চেয়েছেন, সময়ের পরিবর্তনে শুধু চরিত্রের নাম পরিবর্তন ঘটে গেছে মাত্র। 'জনগণ' সেই ধারার উপন্যাস। যেখানে অতীত আর বর্তমান সময়ের মধ্যে ঘটে যাওয়া চলমান জীবনের উত্থান-পতনের কাহিনি বিধৃত হয়েছে।

নব্বই-এর দশকের পটভূমিতে কাহিনির ভিত্তি নির্মিত হলেও লেখক ফিরে গেছেন পঞ্চাশের দশকে। পরিবর্তিত সময়ধারায় উঠে এসেছে ফেলে আসা জীবনের নানা রঙের দিনগুলির কথা। সোনা-বিলু-ছোটবাবু-অতীশ দীপঙ্করের আজকে মিহির সান্যাল-এ উত্তরণ ঘটেছে। সবাই একই সরণির পথিক। শৈশবের সোনা আজ বার্ধক্যের মিহিরে পৌঁছেছে। অতীত পরিক্রমায় উঠে এসেছে সেই জীবনকথা, তারই পাশাপাশি আছে সমকালীন সময়ের আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থসর্বস্বতা, খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ, দারিদ্র্য, অশিক্ষা প্রভৃতির মতো মর্মস্পর্শী বিষয়গুলি।

'জনগণ' জীবন-আশ্রয়ী এক জীবনবেদ। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বাঙালি জীবনের রূপান্তরের কাহিনি—

"অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় আলাদা গোত্রের লেখক। তাঁর বড় মাপের উপন্যাসগুলিতে বাঙালির আর্থ-সামাজিক দিকগুলিই বিশেষ প্রাধান্য পায়। স্বাধীনতার পর থেকে ক্রমান্বয়ে বাঙালি জীবনে যে রূপবদল ঘটে যাচ্ছে, 'জনগণ' উপন্যাসে তারই বিশ্বস্ত চিত্রায়ণে এক রহস্যময় জগতের সন্ধানে ব্যাপৃত। উপন্যাসের নায়ক মিহির সান্যাল প্রৌঢ়। স্বাধীনতার পর পঞ্চাশটি বছরও পার হয়ে গেছে তাঁর এই গ্রহে। তিনি জানেন বিজ্ঞান এবং জৈব প্রযুক্তি মানুষের করায়ত্ত। সভ্যতারও সঙ্কট। মানুষের বিকাশ এবং বিনাশ দুই-ই সরলরেখায় যেতে যেতে কখনও ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয় এবং গোলোকধাঁধায় তিনি বিচলিত বোধ করেন। চারপাশে ধর্ষণ, গৃহদাহ, রাহাজানি, খুন, ধর্ম-অধর্ম, জাতপাত থেকে মানুষের যেন নিস্তার নেই। অথচ মানুষ কেন যে বোঝে না। এ সৌর পরিবারের শুধু তারাই জন্ম-মৃত্যুর অধিকারী আর কোনো গ্রহে নেই প্রাণের স্পন্দন। তাঁর মাঝে মাঝে এও মনে হয়, সৌরবিশ্বে মানুষের কী অসীম একাকীত্ব, প্রাণের লক্ষণ পর্যন্ত নেই কোথাও। একমাত্র পৃথিবীতেই আছে প্রাণ, প্রাণের অন্তিম নির্যাস মৃত্যু। সারা বিশ্বে একমাত্র পৃথিবীতেই আছে গাছপালা, পাখি, নদী, মেঘ, বৃষ্টি, পাহাড় কিংবা কোলাঘাটের ইলিশ। তবু মানুষ পৃথিবীর সেই আদি গুজব ঈশ্বর এবং শয়তান তাড়িত। অলীক অস্তিত্বের বিরোধ থেকে মানবসভ্যতা এখন যে কোনো মুহূর্তে বিনাশের মুখে।

এই উপন্যাসে অসংখ্য চরিত্র। স্বাধীনতার পর এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের জীবনকে ফিরে দেখা এই উপন্যাসের আখ্যান। মানুষ আজগুবি সত্যের দাস। কোনো চরিত্রই যেন এই গ্রহটি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সচিন্তিত নয়। পর্বে পর্বে এই উপন্যাসটি কাল-মহাকাল অতিক্রম করে

মানুষের কোনো প্রকৃত দিব্যজীবনের অপেক্ষায়। প্রতিটি পর্বই স্বয়ংসম্পূর্ণ।"[১৭]

'জনগণ' যথার্থ অর্থে গণজীবনাশ্রয়ী উপন্যাস নয়। বিপর্যস্ত সমাজ পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক চক্রান্ত, কায়েমী স্বার্থ, মানুষের সংগ্রামের কথা প্রৌঢ় মিহির সান্যালের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে ঠিকই, তবে অতীতের স্মৃতিচারণ আর নিজস্ব পরিবার পরিমণ্ডলের মধ্যে কাহিনি গুমরে মরেছে। স্বাধীনতা-উত্তর পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ধর্ষণ, লুটপাটের ঘূর্ণাবর্তে সুহাসিনী হয়েছে লাঞ্ছিতা স্বজনহারা। ধর্মপ্রাণ ওদুদ মিঞার বিপন্ন সুহাসিনীকে বাঁচিয়ে তোলার নিরলস প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। 'মানুষের ঘরবাড়ি' উপন্যাসের বিলুর মতোই 'জনগণ'-এর মিহির সান্যালের জীবনের আনন্দ-বেদনা, ঘাত-প্রতিঘাত, বাস্তুহারা জীবনের যন্ত্রণা, আত্মপ্রতিষ্ঠার নিদারুণ সংগ্রামের কথা আলোচ্যমান উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। অতীনের জীবনচর্যা এখানে মিলেমিশে একাকার। *'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', 'মানুষের ঘরবাড়ি' প্রভৃতি উপন্যাসে যে জীবনচর্যার কথা অনালোচিত রয়ে গেছে সে-কথা বলার তাগিদেই যেন অতীনের এই উপন্যাস রচনা। ফেলে আসা অতীত আর বর্তমান সময়ের গ্রন্থিবন্ধনে এ উপন্যাস হয়ে উঠেছে লেখক অতীনের আত্মতার পরিচয়বাহী।*

বর্তমান সময়ের ধারাবিবরণীতে আমরা খুঁজে পাই উত্তর-ঘাটের অতীনকে। মিহিরের দৃষ্টিতে লেখক নিজের সত্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন—

"...মিহির নামের চরিত্রটির কপালে কি আছে আমি কিছুই জানি না, তবে মিহির একটি চরিত্র—যাকে আমি আমার উত্তর-ঘাটেও ঠিক বুঝতে পারি না—অথচ তাকে হাড়ে হাড়ে চিনি। মাঝে মাঝে মিহিরকে বড়ই নির্বোধ মনে হয়। মাথায় হাত বুলিয়ে যে যে ভাবে পারছে তাকে ঠকিয়ে যাচ্ছে।"[১৮]

আত্মভোলা অতীন মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ—এ মন্ত্রে দীক্ষিত। অথচ কি পারিবারিক জীবনে, কি প্রাতিষ্ঠানিক জীবনে তিনি বারে বারে প্রতারিত হয়েছেন। সরলতার সুযোগ নিয়ে মানুষ তার সঙ্গে ছলনা করেছে। মেজ ভাইয়ের মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে দেশের বাড়িতে যাওয়া, ভাইদের সাহায্য করা, আবার ভাই ও তাদের বউদের মাত্রাতিরিক্ত ঈর্ষা প্রায় সমস্ত কিছুই ব্যক্তি-অতীনের জীবনে ঘটে যাওয়া বাস্তব ঘটনা। গ্রামের পথঘাট, পুরনো মানুষজন, সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি—সমস্ত কিছুর মধ্যেই রয়েছে ব্যক্তি-অতীনের জীবনের বাস্তবতার বিশ্বস্ত ছাপ।

অতীত স্মৃতিচারণায় উঠে এসেছে উদ্বাস্তু জীবনে পরিবারটিকে বাঁচিয়ে রাখার নিষ্ঠাবান প্রচেষ্টার কথা। 'মানুষের ঘরবাড়ি'র বিলু আর 'জনগণ'-এর মিহির একই পঙ্‌ক্তিতে বসেছে। কৈশোর-যৌবনের সেই দিনগুলোতে 'গণরাজ' পত্রিকার প্রেসবয়, প্রুফ দেখে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনার প্রচেষ্টা, কখনো দূর সম্পর্কের পিসির বাড়িতে

থেকে পড়াশোনা চালানো প্রভৃতির মধ্য দিয়ে আমরা উপন্যাসের ব্যক্তি অতীনকে খুব সহজেই চিনে নিতে পারি—

"শহর থেকে তিন-চার কিলোমিটার দূরে বন-জঙ্গলের মধ্যে বাবা-জ্যাঠারা এদেশে এসে থিতু হয়েছেন। জঙ্গল সাফ করে বাছারি ঘর তুলেছেন—সে যেন কত কাল হয়ে গেল।

তার কংগ্রেসের সেই জেলা অফিসটির কথাও মনে হল। জেলা কংগ্রেসের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'গণরাজ' পত্রিকার সে প্রেসবয়, প্রুফ রিডার, কাগজ বের হলে ডাকটিকিট মেরে গ্রাহকদের কাছে পাঠানো থেকে শহরের গ্রাহকদের বাড়ি বাড়ি সাইকেলে কাগজ দিয়ে আসা—কত কাজ; আর কাগজে ফাঁকা জায়গা থাকলে সে নিজেই কখনও রিপোর্টধর্মী, কখনও কবিতা পাঠিয়েও দিত। রিপোর্টারদের লেখা কদর্য, বানান ভুল, বাক্য এলোমেলো, মাঝে মাঝে স্থানীয় গ্রাম্য ভাষা পর্যন্ত ব্যবহার করত মফস্বলের সাংবাদিকরা। সেই সব সাংবাদিকদের অশিক্ষিত পটুত্ব তাকে সেই কাগজে নাজেহাল করে ছেড়েছে। ভুল বানান দেখতে দেখতে সে এক সময় হাবুডুবু খেত যেন। নিজের ওপর বানান সম্পর্কে আস্থা হারিয়ে ফেলত।

তবে রক্ষা কাগজটার যুগ্ম-সম্পাদক করিম সাহেব আর যতীন সেনগুপ্ত মশাই। মিহির তটস্থ থাকত কোথাও না কোথাও কাগজের ত্রুটি থেকে যায়। কিন্তু তাঁরা তার নিখুঁত কাজের জন্য যথেষ্ট বাহবা দিতেন। খবরের কাগজ ভরাট না হলে কবিতা গল্প ফিচার যে কিছু নামে ছেপে দিলে কাগজের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হতো, সন্দেহ নেই।"[১৫]

তথ্যসূত্র :

১. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।
২. তদেব।
৩. তদেব।
৪. নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে, অ. স., অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫. তদেব, মলাট।
৬. তদেব, পৃ. ৩৫৯।
৭. তদেব, পৃ. ৩৭৩-৩৭৭।
৮. তদেব, পৃ. ১০১।
৯. মানুষের ঘরবাড়ি, ভূমিকা, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়।
১০. তদেব, পৃ. ৪৩২
১১. অলৌকিক জলযান, মলাট, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়।
১২. আশি বিরাশির বিনোদন, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৩. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।
১৪. অলৌকিক জলযান, পৃ. ৪৫৯।
১৫. ঈশ্বরের বাগান, অ. স., অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২০।

১৬. তদেব, পৃ. ১৬।
১৭. জনগণ, মলাট, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৮. জনগণ (১ম খণ্ড), পৃ. ১০।
১৯. জনগণ (২য় খণ্ড), পৃ. ২৪।

ড. সোমনাথ চক্রবর্তী

জন্ম : ১৯৮৩ সাল। বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী। পেশায় শিক্ষকতা। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস বিষয়ে গবেষণা করে ২০১৩ সালে ডক্টরেট উপাধি পেয়েছেন। গবেষণাপত্রটি 'বাংলা উপন্যাসে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়—সামগ্রিক মূল্যায়ন' শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হতে চলেছে।

গল্পের ঘরবাড়ি, গল্পের বাগান আর বেঁচে থাকার গল্প

পম্পা মুখোপাধ্যায়

পাঁচের দশকের কথাকার অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম-১৯৩৪*)। তাঁর প্রথম গল্প 'কার্ডিফের রাজপথ' (*দেশ পূজাবার্ষিকী গল্প সংকলনের লেখক পরিচয়ে 'কার্তিকের রাজপথ' বলা হয়েছে*) ১৯৫৬ সালে বহরমপুরের অবসর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তারপর প্রায় ষাট বছর ধরে অসংখ্য গল্প-উপন্যাস লিখেছেন তিনি। লেখক হিসেবে অসংখ্য পুরস্কারের মধ্যে গল্পকার হিসেবেই পেয়েছেন সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (২০০১)। লিখেছেন 'দেশ', 'এক্ষণ', 'অমৃত', 'চতুরঙ্গ', 'আনন্দমেলা', 'আনন্দবাজার', 'যুগান্তর', 'আজকাল', 'প্রতিক্ষণ', 'পরিচয়', 'শিলাদিত্য', 'সানন্দা', 'কলকাতা' সহ অসংখ্য ছোট-বড় পত্রিকায়। প্রায় ছয় দশক জুড়ে লেখার জগতে থাকা মানুষটির সৃষ্টিসম্ভার কম নয়—বলাই বাহুল্য। দুশোরও বেশি গল্পের জনক তিনি। তাঁর গল্পের পাঠমগ্নতা আমাদের কোথায় নিয়ে যায়! তিনি কী কোনও সরল জীবনযাপনের অন্তর্গত জটিল প্যাটার্নকে খুঁজে বার করতে চান তাঁর গল্পে! তিনি নিজে বলেছেন—'*গল্পগুলির মধ্যে যেমন মানবিক সম্পর্ক এবং সংকটের কথা আছে, তেমনি আছে দয়াহীন দিশাহীন সমাজের কথা।*' তার গল্পের নিবিড় পাঠ-ই একমাত্র আমাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।

ঢাকা জেলার আড়াইহাজার থানার রাইনাদি গ্রামের জাতক অতীন দেশভাগের পর ছিন্নমূল হয়ে পড়েন। পূর্ববাংলার প্রকৃতিলগ্ন জীবন, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের স্তরান্তর আর তার বেড়ে ওঠা—অনেকটাই ধরা আছে তাঁর সোনা ট্রিলজি—'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', 'অলৌকিক জলযান' আর 'ঈশ্বরের বাগান' উপন্যাস-ত্রয়ীতে। জাহাজের নাবিক, ট্রাকের ক্লিনার, প্রাথমিক শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, কারখানার ম্যানেজার, প্রকাশনা সংস্থার উপদেষ্টা, সাংবাদিকতা—যাযাবরের মত বিভিন্ন বৃত্তিতে দেশ-বিদেশ পরিক্রমা ঋদ্ধ করেছে তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি। এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে জন্ম হয়েছে তাঁর কথাবৃত্তের—গল্প বা উপন্যাস।

অতীনের গল্পে জীবনের বয়ে চলা, মানুষের হয়ে ওঠা এবং অবশ্যই বেঁচে থাকা অন্য মাত্রা পায়। সেখানে যেমন উপেক্ষিত নয় শৈশব-কৈশোর তেমন অতীন পরম যত্নে আঁকেন বার্ধক্যের অসহায়তার ছবি। গল্পে স্থান পায় জীবনবোধের সঙ্গে মৃত্যুচেতনার [illegible] হয়ে ওঠার ছবি যেমন আছে 'নীলকণ্ঠ পাখির

খোঁজে', 'বিন্নির খই লাল বাতাসা', 'হীরের চেয়েও দামি' প্রভৃতি উপন্যাসে তেমন অনেক ছোটগল্পেও আছে এই সোনালি শৈশবের ছবি। যেমন, শারদীয়ার মুহূর্তে মায়ের ছুটির জন্য অপেক্ষা করে থাকা, বাবার কাছে বড় হয়ে ওঠা দুই শিশু নিয়ে সহজ ভালোবাসার গল্প (*মা আসছেন*), সরল বদন আর দুই কিশোরী লিচু ও ঝিনুককে নিয়ে নিষ্পাপ কৈশোরের গল্প (*বদনের অমৃতফল*) বা ঢাইন শিকারে গিয়ে নদীমাতৃক পুববাংলার তিনুকাকার সঙ্গে চার কিশোরের জীবনকে বাজি রেখে অ্যাডভেঞ্চার (*তিনুকাকার মাছশিকার*)। প্রসঙ্গত বাবুদের বাড়ির এই চার ভাইকে নিয়ে অনেকগুলি গল্প-উপন্যাস লিখেছেন অতীন। পাঠকদের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে তথাকথিত শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা সব গল্পই কি শেষ পর্যন্ত শুধু শিশু-কিশোরদের থাকে, না কি ভীষণভাবে বড়দের গল্প হয়ে ওঠে। এরকম একটি গল্প—'তায়েবকাকার নসিব'। দেশভাগের পর যখন হিন্দুকর্তারা একে একে বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে তখন পুরাতন ভৃত্য তায়েবকাকা জীবনে প্রথম মাথাগরম করে ফেলে কর্তা জ্যাঠামশায়ের কাছে, 'বাপ-ঠাউর্দার ভিটামাটি কি আপনাদের কামড়ায়! সব বিক্রিবাটা হয়ে যাচ্ছে। খালি হয়ে যাচ্ছে বাড়িটা। মন মানে?' এ কেমন স্বাধীন দেশ সে বুঝতে পারে না। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'-র ঈশমকে মনে পড়বে পাঠকের। অসহায় তায়েবকাকারাও সংখ্যালঘু। দেশভাগের যন্ত্রণার এই গল্প তখন আর শুধুই ছোটদের গল্প থাকে না। যেমন 'ডাকাতের বউ' গল্পটি। পরিচারিকা কুন্তিদির প্রতি বালিকা রিয়ার ভালোবাসা—এই গল্পের প্রাণ। নিজেকে ডাকাতের বউ বলে তাকে ডাকাতের ভয় দেখায় কুন্তি (ছোটছেলেকে বশে আনতে যেমন ভয় দেখানো হয়)। আনন্দমেলাতে প্রকাশিত এই গল্পটি শেষপর্যন্ত অবশ্য শুধু কিশোর-গল্প থাকে না, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ক্ষমতাচাপের কাছে মেয়েদের ভবিতব্য স্পষ্ট হয় কুন্তির কথায়, 'মেয়েদের অদৃষ্ট রিয়াদি। সবাই যে যার মতো একজন ডাকাত খুঁজে বেড়ায়। ডাকাতের খপ্পরে পড়ে যেতে হয়। তারপর হয় কুন্তিদি, না হয় তোমার মা।'

কোনও গল্পে প্রকৃতি-সংলগ্ন শৈশবের সঙ্গে পরিচয় ঘটে যায় 'হা-অন্ন' মানুষের, যেমন—বেলকুঁড়ির বাবা মদন দাসের কুষ্ঠ রোগ, গ্রামের প্রান্তে নির্জনে তাই তাকে একা থাকতে হয়। বেলকুঁড়ি ভাত দিয়ে আসে। তবে তাদের খাবার-ই রোজ জোটে না, বাবাকে খেতে দেওয়ার ভাত কোথায় পাবে প্রতিদিন। সম্পন্ন গৃহস্থের সংস্কার চৈত্র সংক্রান্তিতে কাকভোজন করতে হয়। গ্রামে কাক নেই। সব কাকপক্ষী মদন দাসকে ঘিরে থাকে। মানবসমাজ-পরিত্যক্ত মানুষটি কাকপক্ষীর সঙ্গে মিতালি করে বেঁচে থাকে। তাকে খেতে দিলেই সব কাক খেতে আসে। (*বেলকুঁড়ি*)

এই সব লেখায় সেই অর্থে শহুরে স্বাদ নেই। অগ্রজপ্রতিম কথাকার বিমল

করের কথায়, *'অতীনের লেখায় অন্য ধরনের একটি স্বাদ আছে। সেই সব লেখায় শহুরে স্বাদ ছিল বলে আমার মনে পড়ে না। পরিবেশ হয়তো গ্রাম্য ছিল, তবে সেই গ্রাম্যতা মামুলি নয়, সাধারণ পল্লীকাহিনীর অনুসরণও নয়। বরং অতীনের লেখায়, বর্ণনায়, চরিত্রসৃষ্টিতে কেমন যেন এক অস্পষ্ট অথচ সরল ছবি ফুটে উঠত। মনে হত, নতুন এক ঘ্রাণ অনুভব করছি।'*[২]

নাগরিক জীবন নিয়ে অতীনের গল্প নেই তা নয়, তবে গ্রামের পটে লেখা গল্পই বেশি। এই নাগরিক জীবনের বিপ্রতীপে গ্রাম্যপট বেছে নেওয়া প্রসঙ্গে অতীনের গল্পকেই বেছে নিই। 'গ্রেট ক্যালকাটা শো' গল্প। নাগরিক জীবনের ভয়াবহতা থেকে পালাতে চায় সরল শৈশব। *'দ্রুত এই শহর থেকে পালাবার জন্য ছুটতে থাকল।'* সেই গ্রাম্য ছবি, ফেলে আসা জীবনে ফিরতে চায়। আপাত কৃতি তাদের বড়লোক আত্মীয় সুদেব যদিও জানে তা আর তার পক্ষে সম্ভব নয়। এই নাগরিক জীবনের আড়ালে চাপা পড়ে যায় শৈশব, তা হয়তো আত্মপ্রকাশে উন্মুখ হয়ে ওঠে, নিষ্ঠুরতা থেকে ভালোবাসায়। তেমন এক গল্প 'রাস্তার ছেলে'। রোয়াক দখল করে থাকা রাস্তার ছেলেকে ঢিল মেরে কপাল ফাটিয়ে দিয়ে সমবয়সী কিশোরের গভীর অনুশোচনা। তার জন্য খাবার নিয়ে গেলে দেখে ছেলেটি চলে গেছে। অতীনের গল্পে এই প্রকৃতি, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রাম্যপ্রকৃতি, আরও নির্দিষ্ট করে বললে পূর্ববঙ্গের তাঁর শৈশবস্মৃতি-জাত প্রকৃতি, নানা ভূমিকায় কাজ করে। *'অতীনের হাতে প্রকৃতি যতটা জীবন্তভাবে ধরা দেয়—ততটাই সৌন্দর্যময় হয়ে, স্বাভাবিক রূপ-রং নিয়ে। এক-এক সময়ে সেই প্রকৃতি শুধু চোখের মধ্যে থাকে না, ঘ্রাণময় হয়ে ওঠে। বিভূতিভূষণের লেখার সঙ্গে এখানে তাঁর লেখার একটা সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। তবে এই সাদৃশ্যকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন নেই।'*[৩]

ঠিক। প্রকৃতির স্বাভাবিক-রূপ। যেখানে ভয়ঙ্কর-সুন্দরের পাশাপাশি অবস্থান। তাই এই প্রকৃতি-লগ্ন জীবনে জীবনের পাশাপাশি থেকে যায় মৃত্যু। তার অনেক গল্পে রুদ্রময়ী প্রকৃতির পট উপস্থিত। কখনও বর্ষণ, অনেক গল্পেই খরা। না হলে তো বাস্তব প্রকৃতি-পাঠ অসম্পূর্ণ থেকে যায়, জীবনের পাশাপাশি সে যদি মৃত্যুর ঘ্রাণ না নিয়ে আসে। এর স্বরূপ-সন্ধানে গল্পপাঠে ফিরে যাই, প্রকৃতি-সংলগ্ন দুই বালক-বালিকা, বড় হয়ে ওঠার অস্পষ্ট বোধ, প্রকৃতি পাঠ এবং অতল জলে শ্যাওলার জঙ্গলে দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু। *'এবং যখন বর্ষার জল নেমে গেল, যখন জলজ ঘাসেরা পচতে পচতে মাটির সঙ্গে মিশে গেল এবং শালুক লতারা শুকিয়ে শুকনো হয়ে গেল তখন গাঁয়ের সকলে এই জমির আলে দাঁড়িয়ে দেখল যেন দুটো নরকঙ্কাল একে অপরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হচ্ছে।'* (*এক বর্ষার গল্প*) প্রেম-প্রকৃতি-কৈশোর- আদিমতা-জীবন-মৃত্যু এভাবেই একাকার হয়ে যায় অতীনের গল্পে

তবু এই প্রকৃতির রুদ্ররূপের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে যায় মানুষ। আকালের (*খরা*) ভয়াবহতায় অসহায় মানুষের কাছ থেকে সুযোগ বুঝে সবকিছু কেড়ে নিতে চায় বেচু পাইকার। ঘরের নারীর প্রতিও তার লোভী হাত। সেই প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে নাতি পালানকে নিয়ে দাদুর আবাদের আশায় বেঁচে থাকার অসম লড়াই। (*আবাদ*) অর্থাৎ এ লড়াই শুধু প্রকৃতির সঙ্গে থাকে না, শোষক-বিত্তবান বড়মানুষের সঙ্গেও থাকে। প্রয়োজনে চুরির রাস্তাও বেছে নেয়, ছিনিয়ে খায় নি কেন—এ প্রতিবাদ তো ভুখা পেট থেকেই উঠে আসে। সে কথা মনে করিয়ে দেন অতীন 'ভুখা মানুষের কোনও পাপ নাই' গল্পে, যেখানে পেটের ক্ষুধা, গ্রাম্য রাজনীতি, শরীরের কামনা—সব কিছু মিলেমিশে গেছে। কখনও এই নিরন্ন মানুষেরা হেরে যায়, 'পোকা মাকড়েও খায়, বাঁচে' গল্পে যেমন, পেটের তাগিদে নিজেদের শেষ সম্বল বেচে দেওয়া জমি থেকে ধান চুরি করতে যায় পুত্র, পুত্রবধূ আর অশক্ত বৃদ্ধা মা। শেষে ধানের বোঝা আনতে গিয়ে পাহারাদারের চরম আঘাতে প্রাণ হারায় মা। তবু জীবন থেমে থাকে না, নতুন জীবনের খোঁজে মিলিত হয় নয়না আর আকাল। সকালে পায় না-ফেরা মায়ের মৃত্যুসংবাদ। (*এই গল্পের বীজ থেকেই দুই ভারতবর্ষ উপন্যাসের উপকাহিনী*)। এ লড়াই ছড়িয়ে থাকে গ্রাম থেকে শহরে। শ্রমিক নেতা অনাহারে অন্ধ হয়ে যায়। মিলমালিক ধীরাপদরা সব সূর্য-ই চুরি করে নিয়ে যায়, তাদের জীবনে শুধুই অন্ধকার। (*রাজা গোপালের আত্মচরিত*) আবার মরিয়া হয়ে জিততে এই 'হা-অন্ন' মানুষগুলিই মরণ-কামড় দেয়। স্মর্তব্য 'কাল-ভুজঙ্গ' গল্প। আকাল। খাবার জোটে না। ধান চুরি করতে যায় স্বামী নিশি আর স্ত্রী সোনামনি। সদ্য বড়লোক হয়ে ওঠা শশীর লোভ সোনামনির উপর। মধ্যরাতে ধান চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে সোনামনি গলা কামড়ে শশীকে মেরে ফেলে। ধান চুরির প্রসঙ্গ যেমন একাধিকবার তাঁর লেখায় আছে তেমন অত্যাচারীর গলা কামড়ে কেটে ফেলা অতীন অনেকবার লেখায় এনেছেন, তা আমরা পরে দেখবো। প্রকৃতির এই রুদ্ররূপ অবশ্য কোথাও কোথাও প্রতীক হয়ে যায়, অভাবী মানুষের জীবনে পোয়েটিক জাস্টিস নিয়ে আসে। যেমন, 'বৃষ্টির পরে' গল্পে। খরার পট। দেবীবাবুরা শোষণ করে, রিলিফের টাকা মেরে গুছিয়ে নেয় আর মানুষ অনাহারে থাকে। বৃষ্টি নামলে বজ্রাঘাতে দেবীবাবু মারা যায়। শোষণমুক্তির এই বৃষ্টি তো তাদের অনাবাদি, অনাহারি মানবজমিনে কামনা করে সাধারণ মানুষ।

প্রকৃতির কথাকার হিসেবে পূর্বসূরি হিসেবেই অনেকে বিভূতিভূষণের সঙ্গে তুলনা করেন অতীনের। যদিও দুজনের প্রকৃতিচেতনা দুইরকম। প্রকৃতি আর কথকের অন্তর্লীন সম্পর্ক বড় মায়ায় বাঁধা পড়ে যান বিভূতিভূষণ। বিভূতিভূষণেরও প্রকৃতির

রুদ্ররূপ নেই তা নয় তবে রোমান্টিক প্রকৃতি-নায়িকার বিপ্রতীপে সে ছবি তুলনায় অনেক কম। অথবা প্রকৃতির মায়াময় আবরণে সত্যচরণেরা এতটাই মুগ্ধ যে নির্মোহ হতেও ভুলে যায়। বিভূতিভূষণে প্রেমিকাবিনাশে শর্তাবদ্ধ সত্যচরণের এ প্রেম তীব্র বলেই বেদনাও বেশি। অন্যত্রও প্রকৃতির পাঁচালিকার বিভূতিভূষণে বাংলার অপরূপ-রূপের ছবিই বেশি। বিপরীতে অতীনে জীবনানন্দের মতো সংকটের প্রকাশ দেখা যায়। আরেকটা কথা, অতীনের রচনায় প্রকৃতি নিজেই চরিত্র বা কথার অংশ সবসময় হয়ে ওঠে না বরং হয়ে ওঠে চরিত্রগুলির উত্থান-পতন, বাইরের-ভিতরের প্রকাশের দ্যোতক। 'গাছ ও তার প্রতিপক্ষ' গল্পটির কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি। রাস্তা আটকে বেড়ে ওঠা গাছ, প্রেম-ঈর্ষা-যন্ত্রণা-বিকার প্রকাশের মাধ্যম হয়ে ওঠে। গাছটিকে কেন্দ্র করে মানুষের ভিতরের নগ্নতা প্রকাশ পায়। হয়ে ওঠে প্রতীকও। নারীর প্রতীক, হারানো প্রেমের প্রতীক।

২

মানুষ কতভাবেই না বেঁচে থাকতে চায়। অতীনের কথাশিল্পে এই বেঁচে থাকার আকুতি আর বেঁচে থাকার জন্যে জীবনসংগ্রামের বিচিত্র বিভঙ্গ—প্রিয় অবলম্বন। জীবনের বিচিত্র স্বাদ উপভোগ করতেই মানুষ বেঁচে থাকে। মৃত্যুভয়ে ভীত মানুষ জীবনের উষ্ণতায়, প্রিয়-সান্নিধ্যে বাঁচার মানে খুঁজে পায়। (*আরোগ্য*)

বেকার হয়ে পড়া প্রিয়নাথ আর ভিক্ষাজীবী ফকির আসাদের অসম বন্ধুত্বের মধ্যেই বেঁচে থাকার স্বাদ পায় তারা। (*সাম্প্রদায়িক*)

পরিবার ও কর্মক্ষেত্রের চাপে তাপে বিপর্যস্ত, সংসারের ক্রীতদাস পিতা মুক্তি খুঁজে নিতে চায় আহত বাৎসল্যের মধ্যে। (*রাজার টুপি*)

অন্ন-সন্ধানে পলাতক বাবা যেমন বারবার ফিরে আসতেন সংসারের টানে, তেমন পরিজনদের জন্যেই মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। মৃত মানুষের স্বপ্ন তো সেই বাঁচার উত্তরাধিকারের স্বপ্ন। (*ইহলোক*)

সংসারে অশান্তি থাকে। রূঢ় বাস্তবতায় বিষয়-সম্পত্তি আত্মজনকেও পর করে দেয়। এটাও জীবনের সত্য। যেমন 'জীবন-সত্য' গল্পে সম্পত্তির ভাগ নিয়ে মা বা ভাই-বোনেদের রূঢ়, কদর্য, বাস্তব ছবি বের হয়ে আসে। তবু ছেলে-বৌমাদের নিয়ে সংসারে নানা অশান্তি থাকা সত্ত্বেও একসঙ্গে থাকার সুখটুকুও কম নয়—এটাই পিতা বিলাস অনুভব করেন। (*জলছাদ*)

অভাবের সঙ্গে প্রতিদিনের লড়াই করে বেঁচে থাকতে চায় নিম্নবিত্তরা। অকর্মণ্য, ঠকবাজ, জেলখাটা স্বামী নারান (যাকে আমরা পাই লেখকের *'নদীর সঙ্গে দেখা'*

উপন্যাসে, কাঞ্চন চরিত্রের লেখাতেও সে উঠে আসে)। স্ত্রী ফুল্লরা, শ্যামাদের সঙ্গে ট্রেনে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করে, হাঁড়ি-পাতিল বেচে সংসার চালায়। বেঁচে থাকার প্রবল বাসনায় বেঁচে থাকে নারান, ফুল্লরা, শ্যামারা। (*বেঁচে থাকা*)

বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই সাধারণ মানুষ, কীট-পতঙ্গের মত বেঁচে থাকা মানুষ, হয়ে ওঠে হন্তারক। যেমন, 'আউড়ি বাউড়ি' গল্পের বিষয় ওপার থেকে আসা জননীর বেঁচে থাকার সংগ্রাম। এ দেশে সব পাবার চাবিকাঠি ভাবা রেশনকার্ড বাঁচাতে নারীলোলুপ গুপিকে টোপ দিতে বাধ্য হয় জননী, তারপর ইজ্জত বাঁচাতে জঙ্গলে গলা কামড়ে হত্যা করে। আগেই এই ধরন দেখেছি 'কাল ভুজঙ্গ' গল্পে। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে মালতী এভাবেই পুলিশের চর বাবুটিকে হত্যা করে।

আবার বাঁচার সুখ পেয়ে গেলে নিশ্চিত চেনাপথ ছাড়তে চায় না মানুষ। নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া স্বামী সাধুচরণকে দাঙ্গায় মৃত ভেবে নিরাশ্রয় বাতাসী ছেলেমেয়েকে নিয়ে ভিক্ষাবৃত্তিতে নামে। দুঃখ-কথন গেয়ে সংসারে স্বচ্ছলতা আনে। তারপর একদিন সত্যিই স্বামী ফিরে এসে কলে কাজ নিয়ে তাকে ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়তে বললেও সে তা ছাড়তে পরে না। (*বাতাসী*)

অথবা অনিশ্চিত জীবনকে নিশ্চিন্ত করতে ছেড়ে দিতে চায় উচ্চবর্ণের তকমা—উচ্চবর্ণের গরীব ভাইয়ের তথাকথিত কৃতি দাদার কাছে আবেদন—*'টাকা দিলে সব হয় দাদা। তুই শুধু মন্ত্রীকে ধরে, এম.এল.এ.-কে ধরে কাজটা আমায় করে দে। আমি সিডিউল কাস্ট হয়ে যাই। আর সহ্য হয় না।'* আজকের সামজবাস্তবতায় চণ্ডালিকার বিপরীত-পাঠ। (*আজ আমার সংবর্ধনা*)

তবে বাস্তবতার খাতিরেই গল্পগুলিতে দেখি মৃত্যুকে অতিক্রম করে জীবনে বেঁচে থাকার গল্প। সরল-সাধারণ জীবনের প্রাত্যহিকী, তাই বিদ্বজনেরা বলতেই পারেন টিকে থাকার গল্প। তবে দেশের অধিকাংশ মানুষ এভাবেই বেঁচে থাকে। এই বেঁচে থাকাতেই এসে যায়। বড় হয়ে ওঠার ধারাবাহিক পাঠ। শিশু থেকে বৃদ্ধ হয়ে ওঠার অমোঘ পদাবলি। সেখানে যেমন জীবনের স্বাদ আছে তেমন আছে মৃত্যুর অনিবার্যতা। একইভাবে অনিবার্য হয়ে ওঠে শরীর। মনের চেয়ে শরীরের গুরুত্ব এইসব মানুষের জীবনে কম নয়, স্বাভাবিকভাবে জীবনসত্যের প্রকাশেই।

এক বর্ষার রাতে ঝর্না আর কপিল নামে দুই অপরিচিত যুবক-যুবতী একসঙ্গে এক ঘরে রাত কাটাতে বাধ্য হয়। বাসে যার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনেছিল তাকেই শরীর নিবেদনের ইচ্ছেয় ব্যর্থ অচরিতার্থ কামনায় নিজেকে অপমানিত ভাবে ঝর্না। জটিল মনস্তত্ত্ব না কি শুধুই শরীর? (*শ্লীল অশ্লীল*)

আবার শরীর থেকেই জীবনের ব্যর্থতা ভুলে অন্যরকম প্রেমে পৌছে যায়। এক মাতাল সাংবাদিক কলগার্ল হৈমন্তীকে নিয়ে রাত কাটাতে আসে। গভীর দুঃখ লুকিয়ে দুজনেই যেন দুই সমব্যথীর মত মিলিত হয়। (*মানুষের ব্যাভিচার*)

জীবনের অনিবার্যতাতেই তাই কিশোর-কিশোরী বড় হয়ে ওঠার নিষিদ্ধ স্বাদ পায়। যেমন, 'স্বপ্নবৎ' গল্পে। পুববাংলার প্রাকৃতিক পটটি জীবন্ত হয়ে ওঠে অতীনের কলমে। গল্পটি উত্তম পুরুষের বাচনভঙ্গিতে লেখা। কুট্টিমাসির পিতার একাধিকবার সন্তানের জন্ম দেওয়ার কারণে পুরুষ সম্পর্কেই ঘৃণা। যৌনভয় হয়তো। তা থেকে পাগলামি। পাগল বলে বিয়ে না হওয়া। কথক কিশোরের সঙ্গে প্রায় সমবয়সী কুট্টিমাসির শরীরী ভালোবাসার প্রথম পাঠ। (*সুনীলের কবিতা মনে পড়িয়ে দেয়*) *'সেবারেই মাসি আরোগ্য লাভ করলেন এবং তাঁর বিবাহ পাকা হয়ে গেল।'*

অতীনের গল্পে সবুজ, নবীন ধান্য আর যৌবন-বিকাশ বহুবার একাকার হয়ে যায়, পাঠকের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'-র ফতিমার সংলাপ মনে পড়তে পারে—*'সে যে সবুজ ধান্য অবুঝ হয়ে আছে, তা ধরে ফেলবে সোনাবাবু।'* প্রকৃতি আর প্রেমের আদিরূপ কীভাবে কিশোরের অবচেতনে সংরাগ গড়ে তোলে তার একটি অসামান্য গল্প 'নীলবসনা সুন্দরী'। খরার সময় স্যালোর গুণে বাবুদের সবুজ জমিতে কাজ করা সুবলার বাবা—সুবলার রূপকথার জগত আর নীলবসনা সুন্দরী রুইদাসীকে নিয়ে তার কিশোর মনের কল্পনা—রূপকথার গল্প বুনে দেন অতীন।

শরীর এলেও তা তো জীবনপ্রেমের অনুষঙ্গ মাত্র। প্রেম হয়ে ওঠে জীবনকে ফিরে দেখার অবলম্বন, হয়তো ফিরে পাবারও। আর কে না জানে জীবনের আরেক নাম মরণও। অতীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প 'দেবী নিধন পালা' গল্পটি দেখা যাক। অতীতচারিতায় বলা গল্প। যখন গ্রামে-গঞ্জে গুটি বসন্ত থেকে মড়ক লাগত তখন মানুষের ভরসা ছিল মা শীতলার দয়া রুখতে অলৌকিক শক্তি। কথকের ঠাকুরদা সেরকম অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলে বিশ-বাইশ ক্রোশের মানুষ মনে করত। হা-অন্ন মানুষের কাছে বিশ-বাইশ ক্রোশের মধ্যে একমাত্র ব্রাহ্মণ পরিবারের মাথাটির কার্যকলাপ একাধারে ভয়ের ও ভরসার। তাঁর এই অলৌকিক মিথের প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে কথক-নাতির ক্রীড়াসঙ্গিনী কিশোরী আবু। সে বালিকা আবার শূদ্রবংশীয়া। কাজেই ঠাকুরদার কাছে অসহনীয়া। কিন্তু তাঁর সমস্ত অহংকার চূর্ণ করে ঠাকুরদার বাড়িতে ঢেকে রোগ। তার সঙ্গেই মড়কাক্রান্ত গ্রামে গিয়ে রোগাক্রান্ত হয় প্রিয় নাতি—এই গল্পের কথক। ঠাকুরদা যখন তার মৃত্যু আসন্ন বলে ঘোষণা করছেন তখন জোর করে সে-বাড়িতে ঢোকে আবু। আসলে তার প্রবল ভালোবাসা দিয়েই রোগমুক্তি ঘটায় কথকের। তারপরেই নিজে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। বালিকার

কাছে পরাজয়ের পর গৃহত্যাগী ঠাকুরের লাশ পাওয়া যায় কয়েকদিন পর। রুক্ষ প্রকৃতি—অলৌকিক বিশ্বাস আর ভালোবাসার অমোঘ টান, যার আরেক নাম নিবেদন—সব একসঙ্গে কাজ করে গল্পটিতে।

শরীর অতিক্রম করে ভালোবাসার কথাও অতীনের গল্পের অবলম্বন হয়েছে। যেমন, 'ছেঁড়া পাজামা' একটি অসাধারণ ছোটগল্প। এ গল্প একদিকে সংসারে অবহেলিত বৃদ্ধের গল্প। স্ত্রী নার্সিংহোমে, ছেঁড়া পাজামা সূচের অভাবে রিপুকর্ম হল না। এ গল্প রূঢ় বাস্তবের গল্প—আজকাল দোকানেও সূচ পেলেন না। যে ছোটমেয়ে মাকে না ছেড়ে একদণ্ড থাকতে পারত না সেই অসুস্থ মাকে দেখতে যাওয়ার সময় করতে পারে না। বাড়িতে কাজের লোক না টিকলে বৃদ্ধের দিকেই আঙুল উঠবে। কিন্তু তারপরও এ গল্প প্রেমের গল্পও, যে ভালোবাসা আছে বলেই জীবন এত মধুর। হাসপাতালে শয্যাশায়ী স্ত্রী ঠিক বুঝতে পারে—

'ছেঁড়া পাজামাটা পরে এলে! আর কি পাজামা ছিল না!

তিনি হতভম্ব! ছেঁড়া পাজামা সুরমা বুঝল কী করে! পাজামার তো আলাদা রং থাকে না!'

শরীর অতিক্রম করে প্রেমে উত্তরণের আরেকটি চমৎকার গল্প 'আগুন জ্বালাবার গল্প'। পাগলা হরিশ আর পাগলি হরিমতীর ফুটপাতে জীবনযাপন। মতি আর তার সম্পর্কের ওম তাদের জীবনের আগুন জ্বালিয়ে রাখে। হরিমতীর মৃত্যুতে তার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিন্ন শীতবস্ত্র দিয়ে মতির শরীর ঢেকে দেয়। ছেঁড়া তালিমারা পাজামা খুলে মতিকে পরিয়ে দেয়। তারপর নিজেকে শীতের রাতে উষ্ণ রাখতে নাচতে থাকে, *'মাগো, তুই ভারতবর্ষ, টুটা-ফাটা তুর শরীর, (আমি মা) রেতের বেলা পোকামাকড়, দিনের বেলা পাগলা হরিশ।'* গল্পের শ্লেষ-সমাপনটুকুও অসাধারণ।

শরীরসর্বস্ব প্রতারক প্রেমিককে অস্বীকার করতে পারে জীবন-প্রেম। 'চোরাবালি' গল্প আত্মহননেচ্ছু এক অবিবাহিত অন্তর্বর্তী নারী আর মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে ইচ্ছুক এক যুবকের চোরাবালির হাতছানি উপেক্ষা করে জীবনকে নতুন করে ফিরে পাওয়ার গল্প। আবার নারীর পরিবর্তে পরিপূরক হয়ে উঠতে পারে প্রকৃতি-সম্ভার, তেমনি এক গল্প 'নীল চোখ'। জাহাজিদের নারীহীন জীবন—তিন মাসের বেশি ডাঙা ছোঁয়নি জাহাজ—প্রথমে মেয়ে চড়ুই তারপর লেডি অ্যালব্রাটসের সঙ্গে একাত্মতায় মরমী ভালোবাসার গল্প। বালজাকের 'প্যাশন অফ ডেজার্ট' বা তারাশঙ্করের 'নারী ও নাগিনী'-র আবেগটুকু আছে, গল্পে কিন্তু রুক্ষতার বদলে আশ্চর্য স্নিগ্ধতা খেলা করে! প্রসঙ্গত, জাহাজিদের জীবন, যা তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা-পুষ্ট, 'অলৌকিক জলযান' উপন্যাসে যে অভিজ্ঞতার কথা পাই, এই গল্পেও তা অবলম্বন। এ প্রসঙ্গে পাঠকের

'তৃষ্ণা' গল্পের কথা মনে পড়তে পারে। অঞ্জনের এই তৃষ্ণা কি মাওরি উপজাতির চুবির জন্যে তৃষ্ণা। রহস্যময় চিরায়ত তৃষ্ণা।

আবার প্রেমের পাশাপাশি প্রেম-ছুটের গল্পও তো জীবনের সত্যকেই প্রকাশ করে। সেই ব্যর্থ-ভালোবাসাকে বহন করে যেতে হয় সারাজীবন। 'সময়োচিত নিবেদন' গল্পে মানব আর শোভনা সম্পর্কিত জ্ঞাতি বোন। প্রথম ভালোবাসা, যার ফলে শোভনা হয়ে পড়ে অন্তঃসত্তা। মানবকে দায় মুক্তি দিয়ে বয়স্ক গৃহশিক্ষকের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে। মানবও অবিবাহিত থেকে যায়। বহুদিন পর অনুমানে সেই গৃহশিক্ষকের শ্রাদ্ধের বিলম্বিত চিঠি পেয়ে পাগলের মত ছুটে যায় মানব। রাতে দেখা করবেন না গিন্নিমা। মানব রাতেই পালাতে চায়, নিজের কাছ থেকে যেমন সে সারাজীবন পালিয়ে এসেছে। সময়োচিত নিবেদন যে ব্যর্থ হয়েছে বারবার। আরেকটি গল্পে দেখি, চিরন্তন বিরহে ভোগা মানুষের নিয়তির গল্প। একরাতের জন্যে পুরোনো প্রেমিকা পাশাপাশি শয্যায় এলেও প্রেমের বধ্যভূমিতে আর মিলন সম্ভব হয় না। (*বধ্যভূমি*)

৩

জীবনের বাস্তবতায় সময়ের চলন অতীনের গল্পের অন্যতম দিক। যে কোনও সময়-সচেতন লেখকের মতোই চলমান সময়কে অস্বীকার করেননি অতীন। এবং এই সময়ই শুধু সময়ের বাস্তব নয়, বরং বলা চলে চিরসময়ের অনিবার্য প্রকাশ; যে সময়ের চলনে পথের শেষে থাকে মৃত্যু। 'শেষ দেখা' গল্পে এই অনুভব খুব স্পষ্ট। সুরথ বাবার মৃত্যুসংবাদ শুনে বাড়ি এসে শায়িত বাবার মৃতদেহে দেখে অতীতে চলে যায়, ঠাকুরদার মৃতদেহ উঠোনে শায়িত। পাশে বাবার পাশে শিশু সুরথ। ভবিষ্যতে সেও এভাবে শুয়ে থাকবে—তার ছবি দেখে সুরথ। অন্য একটি গল্প দেখে নেওয়া যাক। গল্পের নান 'যথাযথ মৃত্যু'। গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র মির্জা বখের আলি—রাজরক্ত শরীরে কিন্তু এখন রিকশা টানে। দুর্বল, অশক্ত শরীর আর ভাঙা রিকশা বলে প্যাসেঞ্জার চাপতে চায় না। শেষে রিকশা টানতে টানতেই মৃত্যু। মহাজন সওয়ারী লোভী, কৃপণ আর প্রতারক। মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজের মৃত্যু আর মানবিকতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় বখেরের মৃত্যু সমাপতিত হয়ে যায়।

এই জীবন[illegible] আতঙ্ক আমরা আগেই দেখেছি। 'চোরাবালি' গল্পের মতো আত্মহত্যার [illegible] [illegible] যেমন ফিরে আসে মানুষ তেমন আবার কখনও কখনও

মানুষের কাছে মৃত্যু বড় ঈপ্সিত মনে হয়। যেমন 'মানিকলালের জীবনচরিত' গল্পের মানিকলাল ভেবেছিল। ড্রাইভার মানিকলালের স্ত্রী শোভা তার অনাদরের কারণেই পলাতক। এক অনাথা বালিকা, যে ছিল তার ক্ষণিক আলাপনের সঙ্গী, তাকে গাড়ি চাপা দিয়ে অনিচ্ছাকৃত হত্যা করে থানায় আত্মসমর্পণ করে। পাশেই রাখা আছে নিহত বালিকার লাশ। নিঃসঙ্গ, অপরাধবোধে ভোগা, উন্মত্তপ্রায় মানিকলাল ভয়াবহ রাতের চেয়ে মৃত্যুকে বেশি কাম্য মনে করে।

সময়ের চলন মানেই তো বয়সের চলনও। অতীনের একটি গল্পের নামও 'বয়স'। মানসিক অবসাদে ভোগা ছেলেকে খুঁজতে গিয়ে যামিনীবাবু রাতে বাড়ি ফেরেননি। নির্মলবাবু স্ত্রীর বাৎসরিকের দিন নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। তার লাশ রাস্তায় পাওয়া যায়—মধ্যরাতে যামিনীবাবুর ছেলেদের কাছে খবর আসে—*'নির্মলবাবুকে খুঁজে পাওয়া গেছে। বাবাকে খবরটা দিতে বলল'*—শেষ পঙক্তি। যে শৈশব থেকে কিশোর বয়স যেমন জীবনের স্বাদ পায়, মোহময় শরীর জেগে ওঠে, সম্পর্কের ডালাপালা নিয়ে জড়িয়ে ধরে সংসার, তেমনি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কও মরে যেতে থাকে। অবহেলিত বার্ধক্যের ছবি অতীনের বহু গল্পের আশ্রয়। এমন এক গল্প 'ফুলের টব'। বার্ধক্যে সংসারে অবহেলিত মানুষের মৃত্যু। ভদ্রতার আবরণে অন্য ধরনের অবহেলা। পুত্ররাও পর হয়ে যায়, একমাত্র প্রিয়জন স্ত্রী। ফুলের টব প্রতীক হয়ে যায়। তবু মানুষ সম্পর্কের সুতো ধরেই বেঁচে থাকতে চায়। আগেও 'জলছাদ', 'আরোগ্য', 'ইহলোক'-এর মতো অনেক গল্পেই এই বিষয়টি দেখেছি। যৌবন তার স্বাভাবিক সৌন্দর্যেই বার্ধক্যকে ভুলে যেতে চায়, যদিও জীবন-মৃত্যুর মতোই যৌবনের অপরদিকেই বার্ধক্য অপেক্ষা করে। 'অন্নপূর্ণা' গল্পটি উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারলাম না। নববধূ সুন্দরী নাতবউ বৃদ্ধা, অস্থিচর্মসার, কুৎসিত দিদিশাশুড়িকে দেখলেই ঘৃণা-বোধ করে। সর্বাঙ্গে ঘা তাই তার ঘরে যেতে হলেই আতঙ্কিত হয়ে যায়। বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার পরিস্থিতি আসে। দিদিশাশুড়ির মৃত্যুর পর নাতবউ দিদিশাশুড়ির যৌবনের ফটো খুঁজে পায়। যৌবনে সবাই তাকে অন্নপূর্ণা বলত। শ্বশুরের সংলাপ দিয়ে গল্প শেষ হয়—*'মা বোধহয় সেদিন সিঁড়ির চাতালের নীচে ছবিটা খুঁজতে গেছিলেন। নিজের ছবির সঙ্গে মানুষের শেষ ছবির তফাত কত খুঁজে দেখছিলেন বোধ হয়।'* সহজ-সরল গল্প কোন দার্শনিকতায় নিয়ে চলে যায়।

উত্তরাধিকারের হাত ধরে মানুষ জীবনের বেঁচে থাকার স্বাদকেই বাড়িয়ে নিতে চায়। হয়তো নিজেকে দেখার মাধ্যমও তারা। সুখ তার দিনের অবলম্বন। 'জীবন নিয়ে খেলা' গল্পটির উল্লেখ করি। *'আমার বড়দি বোধহয় দুখপ্রকাশের ভাষা জানত না।'* গল্পের প্রথম পঙক্তি। বড়দি শৈশবে দৃষ্টিশক্তি হারায়। সেও এক খেলার

কারণেই। ঠাকুরদার পয়সা আর নিজের রূপের জোরে ভাল বিয়ে হয়। তারপর দীর্ঘ জীবনে কত আসা-যাওয়া। বড়দি সহজভাবেই খবর দিত। একমাত্র নাতনি আত্মহত্যা করে, ঠাকুমাকে চিঠিতে লিখে যায় তাদের আশাপূরণ না করতে পারার অক্ষমতাতেই এই আত্মহনন। *'এই প্রথম বড়দি না-দেখা জীবনের জন্য কাঁদছে। বড়দির জীবনে এটাই বোধহয় শেষ বাজি ছিল।'*

কখনও কখনও প্রিয়জনও দূর হয়ে গেলে মানুষ আবার নিজেকে অবিষ্কার করে নতুন করে। তেমন এক গল্প 'পাপা আজ ফিরবে না'। মুখরা, আত্মসর্বস্ব সুধার কাছ থেকে দূরে চলে যায় স্বামী মণিমোহন। সে সহ্য করতে পারেনি তার শাশুড়িকে, আশ্রিতা ললিতাকে। তারপর তাদের ছেলে পাপা তার নিজস্ব ধরনে বড় হয়ে ওঠে, নিষিদ্ধ বই, বান্ধবীদের সঙ্গে রাতে বাড়ি না ফেরা সুধাকে উতলা করে। এই দুশ্চিন্তা থেকেই সে তার মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা নারীকে আবার খুঁজে পায়। আরেকটি গল্প 'একান্ত ব্যক্তিগত'। সন্তান বড় হয়ে গেছে। চাকুরির ছুটি পেয়ে কথা দিয়েও আসে না। বাবা-মার উৎকণ্ঠা, অন্যকে ঠিক রাখতে পারস্পরিক ছলনা আর ছেলের দূরে সরে যাওয়াতে স্বামী-স্ত্রীর নিজেদেরকে আবিষ্কার—সব নিয়ে সুন্দর একটি ছোট গল্প। নয়তো প্রিয়জন দূর হয়ে গেলে শৈশবে ফিরে যায়। নিজের একান্ত জগৎ। তবু বেঁচে থাকতে চায়। 'বয়স সাতাশি' গল্পের কথা ধরা যাক। সাতাশি বছর বয়স। গল্পের সূচনা-পঙক্তি এটাই। মা চারুবালা দীর্ঘদিন বেঁচে আছেন। কানে শুনতে পান না। ছেলে, বৌ, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি কারও সঙ্গে বনিবনা হয় না। শুধু ছোটছেলেকে অভিযোগ জানান কাউকে ধরে চিঠি লিখে। শেষে ছোটছেলে কানে শুনতে পাবে না জেনেও সান্ত্বনা দিতেই হিয়ারিং এড কিনে দেন। সেই হিয়ারিং এড পরে তিনি গাছ, পাখপাখালি, প্রজাপতি, কীটপতঙ্গ এমনকি মৃত আত্মার সঙ্গেও কথা বলায় মেতে ওঠেন। একেবারেই নিজস্ব জগতে মগ্ন হয়ে যান। *'একমাত্র মানুষের সঙ্গেই কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছেন।'* একদিকে জীবনের প্রতি চরম আকুতি—'এতসব ফেলে আমি যাই কী করে'। 'যে জীবন ফড়িঙের দোয়েলের'—দৈনন্দিন জটিল জীবনাবর্ত থেকে সে জীবন অনেক বেশি কাম্য হতে পারে। বিশেষ করে সেই মানুষের সংসার যাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, গেলেই বাঁচি মানসিকতায় যাকে সবাই সরিয়ে দিতে চায়, সে বেঁচে থাকে প্রকৃত-সংলগ্নতায়—*'পাখি প্রজাপতি আকাশ দেখতে দেখতে অবোধ বালিকার মতো মাঝে মাঝে কেমন মুগ্ধ হয়ে যান।'*

৪

আগে দেখেছি একই গল্পে অনেক দিক একসঙ্গে কাজ করে। আসলে মানুষের

গল্প, যে মানুষের বিচরণ প্রকৃতিসংলগ্নতায়, যেখানে নারী আর প্রকৃতি, ভালোবাসা, জীবন-মরণ সব নিয়েই তৈরি হয় গল্পের ঘরবাড়ি আর গল্পের বাগান। বিপ্রতীপতার আততিতে মানুষ খুঁজে নেয় বেঁচে থাকার স্বাদ। বাঁচার নিয়ত প্রচেষ্টাতেই মানুষ জীবন্ত হয়ে ওঠে অতীন-কথায়। তবুও আলাদা করে মানুষ হয়ে ওঠার (অথবা না হতে পারার) গল্প থাকে বৈকি।

'কাফের' গল্পের পটভূমি দাঙ্গায় উন্মত্ত পুববাংলা। প্রাণের বন্ধু পরাণকে শত চেষ্টা করেও বাঁচাতে ব্যর্থ হয় হাসিম। হিংস্র পাশবিকতার কাছে অসহায় মানবিকতার হননের গল্প। হাসেমরা জিততে পারে না, তাদের ব্যর্থতাও তবু আশা জাগিয়ে রাখে। এমনই এক গল্প 'বোকালোক'। কলকাতার বর্ষায় সবাই যখন বাড়িতে একরকম ছুটির সুখ উপভোগ করছে তখন একজন 'বোকালোক' কর্তব্যের ডাকে কাজে বেরিয়ে জলে ডুবে প্রাণ দেয়। এভাবেই মধ্যবিত্ত তাদের বিবেককে চাপা দিতে লোকটাকে ব্যঙ্গ করে। আবার পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত সততাকে বিড়ম্বনা মনে করে বাবাকেই মনে মনে অনুযোগ করে অতীশ 'মানুষের ভূমিকা' গল্পে।

মধ্যবিত্তর সুবিধাবাদী মানসিকতাকে চাবুক মারে 'সাদা অ্যাম্বুলেন্স' গল্পটিও। দীর্ঘদিনের অনুগত কাজের লোককে চিকেন পক্স হলে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলে। তার আপনার হয়ে ওঠে বেওয়ারিশ দুই নাবালক। সাদা অ্যাম্বুলেন্স উচ্চবর্গের প্রতীক হয়ে ওঠে, যে সুবলদের মত মানুষদের শুশ্রূষার মাধ্যম হয়ে ওঠে না। দুই নাবালককে নিয়ে সুবলের প্রতীকী প্রতিবাদের ইঙ্গিত গল্পটিকে অন্য তাৎপর্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। মধ্যবিত্তের সুবিধাবাদী অবস্থানের কথা আছে 'অবাস্তব গল্প' নামের গল্পটিতেও। বৃদ্ধের চোখে জীবন-মৃত্যু, দার্শনিকতার অনুভব। বাস্তব গ্রহান্তরের চেয়েও অন্য জগতের পরিচারিকা সবিতারা। মধ্যবিত্তরা তাদের খবর রাখে না। তবু তুচ্ছতার বিপ্রতীপে জীবন বহমান।

আর টিকে থাকার মধ্যেও যারা বেঁচে থাকতে চায় তাদের ব্যর্থতার ছবিও এঁকেছেন অতীন। 'কঠিন হ য ব র ল' গল্প যেমন সত্যিকারের শিল্পী হয়ে বাঁচতে চাওয়া সজলের ব্যর্থতার দিনলিপি। কাজ নেই, ভালোবাসা দূরে সরে যায়। পাগলের মত হয়ে যায়, পরিচিতদের মিথ্যা বলে, নেশা করে, স্বপ্ন দেখে হ্যাপি প্রিন্সের।

৫

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা সম্পর্কে বলা হয়—আঙ্গিক সম্পর্কে সেরকম কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁর লেখায় নেই। আমার মনে হয়েছে, এই সচেতন ছকে গল্প না বাঁধাটাই তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে। এ যেন গল্পের নিজস্ব প্রয়োজনেই

গল্প তৈরি হয়ে যায়। গানের মীড়ের মত গল্প বয়ে চলে। যেখানে গল্পের ভাবের আশ্রয় হিসেবেই তৈরি হয়ে যায় রূপ। তাই তাঁর সব গল্পেই গল্প বলার ধরন মূলত একরকম। পরোক্ষ বিবৃতিতে এগিয়ে চলে বেশিরভাগ গল্প। প্রত্যক্ষ দৃশ্য-বর্ণনার মধ্যেও পরোক্ষবিবৃতির আড়ালটুকু থেকে যায়। মাঝে মাঝে দু-এক টুকরো সংলাপ, সেখানেও এসে যায় মুক্ত পরোক্ষ রীতি।

প্রতীক বা রূপকের ব্যবহার দেখা যায়—'সাদা অ্যাম্বুলেন্স', 'নদী, নারী, নির্জনতা', 'গাছ ও তার প্রতিপক্ষ', 'ঈশ্বরের বাগান' প্রভৃতি গল্পে। মূলত বঙ্গালী উপভাষার প্রয়োগ। এছাড়া রাঢ়ী উপভাষা দ্বিস্বরের ক্ষেত্রেও লেখকের ভাষা, বরেন্দ্রী উপভাষার প্রয়োগও দেখা যায়। তৎসম সব্দের সঙ্গে দেশজ শব্দের সহজ অবস্থান তাঁর গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'আবাদ', 'পোকা-মাকড়েও খায়, বাঁচে', 'কালভুজঙ্গ'—এরকম অনেক গল্পতেই এই প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, 'আবাদ' গল্পে সুমার, উরাট, ভোঁস, তিড়িং তিড়িং, নাল, হ্যাঁচকা, তেড়া, আবাল, ড্যাপড্যাপ, ছেনালি, শাবন, খেতার পাশাপাশি কালান্তক, অদৃশ্য কুহকিনী, বাহ্যজ্ঞান, সংরক্ষণ, প্রযুক্ত হয়। উপমা-প্রয়োগের ক্ষেত্রেও এই মিশ্র রীতি দেখা যায়। প্রসঙ্গত, 'কাল-ভুজঙ্গ' গল্পে একই উপমা শোষক আর শোষিত দুজনের বিশেষণ হয়ে ওঠে অবস্থান্তরে—

'সোনামনির চোখ দুটো কাল-ভুজঙ্গের মতো ফোঁস ফোঁস করছিল তখন।'

আবার *'কালো কুচকুচে এক ভুজঙ্গ পাখি ধরার জন্য নেমে আসছে।'*

শশী আলিসান ভুজঙ্গ আর সোনামনি পাখি—এই উপমা গল্পের শেষেও ব্যবহৃত হয়েছে।

গল্পের সূচনা ও সমাপ্তি নিয়ে যে ছোটগল্পের নিটোল কথাবৃত্ত গড়ে ওঠে, সে বিষয়ে তাঁর সচেতনতার দু একটা উদাহরণ দিই—

১. 'গ্রেট ক্যালকাটা শো' গল্পের সূচনা : *'বকুল কলকাতার ফুটপাথ ধরে হাঁটছে। অবিনাশ বকুলের হাত ধরে হাঁটছে।'*

সমাপ্তিসূচক পংক্তি : *'কথিত আছে, বিদ্যাসাগর মশাই এই পথে পিতার হাত ধরে কলকাতায় এসেছিলেন।'*

২. 'দেবী নিধন পালা' গল্পের সূচনা : *'ঋতুটির রং বড়ই অগ্নিবর্ণ হে।'*

সমাপ্তিসূচক পংক্তি : *'অগ্নিবর্ণ ঋতুর পালাটি এখানেই শেষ।'*

৩. 'আজ আমার সংবর্ধনা' গল্পের নামটিই গল্পর প্রথম এবং শেষ পংক্তি।

৪. 'আরোগ্য' গল্পের সূচনা : *'শীত আসছে। সকালে রোদ নরম উষ্ণ মাখনের মতো।'*

সমাপ্তি : *'সারা বাড়িতে রোদ—এক গভীর উষ্ণতা। শীতের বুড়ো উষ্ণতার ভয়ে দেবদারু গাছের ছায়ায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।'*

৫. 'অবাস্তব গল্প'-এর সূচনায় : *'অসীম অনন্ত সূর্যের আলোকিত ভূমণ্ডলে সহসা তিনি দেখেন ভ্রূণের মত এক অগ্নিকণা।'*

সমাপ্তি : *'গর্ভে ভ্রূণ ধারণ করার পর এমন হয়।'*

অর্থাৎ কথাবৃত্ত আক্ষরিক-অর্থেই বৃত্তাকার একটি কাহিনি-বর্ণনার প্রবণতা নিয়ে নির্মিত। সূচনা প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, অতীনের বহু গল্পের সূচনা হয়েছে (*বোকালাক, আরোগ্য, রাজার টুপি, বয়স*) আকাশের অবস্থা দিয়ে যা মানব-মনের দ্যোতক হয়ে যায়।

আগেই দেখেছি প্রকৃতির বর্ণনা তাঁর লেখায় কতটা জায়গা জুড়ে থাকে। ষড়-ঋতুর ঐশ্বর্য-রুক্ষতা নিয়ে বাংলার প্রকৃতি তাঁর লেখায় উপস্থিত। সবুজ ধান্য থেকে সোনালি ধান্য হয়ে ওঠার পরম্পরা তাঁর লেখায় ছড়িয়ে আছে। রাতের নিসর্গ, শীতের রাত, গ্রীষ্মের তীব্রতা, আকালের রিক্ত প্রকৃতি, নদীর রূপ-বদলানো সৌন্দর্য, (*সমুদ্রও তার অনেক গল্পে স্থান-পট, প্রতীকও*), পাখি থেকে তুচ্ছ কীটপতঙ্গ—সবকিছুই তাঁর লেখায় উপস্থিত। প্রকৃতি-প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি। তবু আর কয়েকটা উদাহরণ দেখা যাক—

পরাণের দাঙ্গাবাজদের হাতে মৃত্যুর সময়ের বর্ণনা—*'নিজের দেশ, নিজের এই মাটিতে শুয়ে পরাণ স্বপ্ন দেখছে—কলমীলতায় আবার ফুল ফুটেছে। পাখি উড়ছে আকাশে। যব গম খেতের ভিতর পরাণ কিরণীর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে।'* (*কাফের*)

শুধু শোভনার কাছ থেকেই নয় অভিজিতের নিজের কাছ থেকেও পালিয়ে যাওয়ার বর্ণনায় এসেছে শীতের ঠাণ্ডা, ভগ্ন সাঁকো, নদীর চরা, মৃত পাখি মুখে করে খেঁকশিয়ালের অন্ধকারে ছুটে চলার বর্ণনা (*সময়োচিত নিবেদন*)। মানুষের স্বপ্নের প্রকৃতিকে অতীনের ভাষায় বলতে হয় 'জীবন রে জীবন'। এই স্বপ্নের খোঁজে, এই নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে ছুটে চলে মানুষ। আজীবন। বাস্তবের রূঢ় প্রকৃতিকে প্রাণপণে অতিক্রম করে। এই অন্বেষণ বড় যত্নে আঁকেন লেখক।

কোনও লেখকই সবদিক দিয়েই ত্রুটিহীন হতে পারেন না। আঙ্গিক নিয়ে অতীনের সচেতনতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে—তা দেখেছি। অতীনের গল্পে হয়তো কখনও কখনও পুনরাবৃত্তি কাজ করে। ভাষা বা প্রতীকের দুর্বোধ্যতাও যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে গল্পপাঠে বাধা দিতে পারে না এমন নয়। শরীরী-প্রসঙ্গ কোথাও কোথাও অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। পাঠক-সমালোচক মূলত এই অনুযোগগুলি অতীন সম্পর্কে করে থাকেন। কিন্তু অতীন এই সামান্য না পাওয়াগুলিকে তাঁর কলমের

জোরেই উড়িয়ে দেন। সব মিলিয়ে তাঁর গল্পগুলিতে এক চিরায়ত-আবেদন থাকে। আদর্শ ছোটগল্পের মতোই প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত ধরে রাখতে পারেন পাঠককে। ছেঁড়া পাজামার মত তুচ্ছ বিষয় হয়ে ওঠে অসামান্য গল্পের উপাদান। দেহোপজীবীর কাছে একরাত্রির গল্প ধরে রাখেন শুধু ছোট ছোট সংলাপ আর তাদের জেশ্চার দিয়েই। অন্নহীন, দেশহীন, জমিহীন মানুষদের কথামালাও তাঁর কলমে আশ্চর্য জীবন্ত হয়ে ওঠে। শেষ করা যাক অগ্রজ সাহিত্যিকের কথা দিয়েই—*'অতীন বুঝি গল্পের পটুয়া। নিজের মনের মতন করে আঁকেন, নিজের মনের পছন্দসই রং ব্যবহার করেন—যার উজ্জ্বলতা প্রখর নয় অথচ স্নিগ্ধ ও লাবণ্যময়।'*[৪]

**জন্মসাল হিসেবে ১৯৩৪ খ্রি: সব জায়গায় নথিবদ্ধ থাকলেও অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃত জন্ম-তারিখ ২২ কার্তিক ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ইং ৬ নভেম্বর ১৯৩০ সাল। একথা অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও স্বীকার করেছেন।*

সূত্রাবলী :

১. *কিছু কথা, দ্র: পঞ্চাশটি গল্প, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ, ২০১৪।*
২. *ভূমিকা, দ্র: পঞ্চাশটি গল্প।*
৩. *তদেব।*
৪. *তদেব।*

পম্পা মুখোপাধ্যায়

জন্ম : ২ মার্চ [illegible] জেলার সোনামুখী[illegible] অধ্যাপনা। প্রকাশিত গ্রন্থ :

'মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে ইতিহাস ও রাজনীতি'।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রামদর্শন : অন্য চোখে

বন্ধুদের অনুরোধে লেখা প্রথম গল্প 'কার্ডিফের রাজপথ', প্রকাশিত হয়েছিল বহরমপুরের 'অবসর' পত্রিকায়। ওয়েলস-এর বন্দর শহর নিয়ে লেখা এই গল্পে নিজের অভিজ্ঞতার ঝাঁপি উজাড় করে দিয়েছিলেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ৬ নভেম্বর ১৯৩০) —বাংলা সাহিত্যের 'সমুদ্র মানুষ'। বিচিত্র সব ঘটনায় ঋদ্ধ তাঁর জীবন। ঢাকার রাইনাদি গ্রামে তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা, ওপারের সচ্ছল পরিবার দেশভাগের সময় এপারে এসে সরকারি খাতায় চিহ্নিত হল উদ্বাস্তু হিসেবে। প্রাত্যহিক যাপনের জন্য তখন শুরু হল এক সংগ্রাম। চোখের সামনে প্রতিদিন নিজের লোকদের অনাহার সহ্য করার উদাসীনতা ছিল না অতীনের। আই এ পাশ করার পর জাহাজে কয়লা যোগানের কাজ নিয়ে চলে গেলেন। নানা দেশের নানা বন্দরে নোঙর করেছে জাহাজ—শ্রীলঙ্কা ডারবান কেপটাউন, ব্রাজিল বুয়েনস এয়ারেস পেরু। সাক্ষাৎকারে একবার বলেছিলেন—

'মানুষের জীবনকে খুঁটিয়ে দেখার আর্তি অথবা স্বভাবটা আমি বোধহয় বেশ কিছুকাল জাহাজে থাকার কারণেই অর্জন করেছি।' *(বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন ২০১২, পৃ. ১১৮)*

জীবিকার তাগিদে আরও বিভিন্ন ধরনের কাজ করেছেন—কখনও ট্রাক ক্লিনার, তাঁত বোনার কাজ, কারখানার ম্যানেজার, শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা এবং আরও হয়তো অনেক কাজ। এবং এসব করেছেন স্বভাবের বাউন্ডুলে নেশার জন্য নয়, সংসারের অভাবের তাড়নায়। বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে যেভাবে হোক্ রোজগার করে পরিবারকে দিতে হবে, এই অন্নচিন্তাই তখন 'চমৎকারা' আর এইভাবেই তিনি ভূয়োদর্শী। একদিন উপার্জনের তাগিদে যেসব ঘটনার তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, ধীরে ধীরে তাঁর অনুভবের মধ্যে তা জারিত হয়ে তাঁর জীবনের আর সাহিত্যের অর্জন হয়ে উঠল। ফেলে আসা গ্রাম, গ্রামের প্রকৃতি, গ্রামের মানুষ; নোনা জলের ঢেউ থেকে দূরবীন দিয়ে দেখা ডাঙার জীবন, বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষ আর তাদের জীবন উঠে এল অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসে। বিমল কর অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পঞ্চাশটি গল্প' (*আনন্দ পাবলিশার্স*, ১৯৯৯) সংকলনের ভূমিকায়

তাই বলেছিলেন—

'জীবন হল অনেকটা সাদা ব্লটিং পেপারের মতন। তার ধর্মই হল কালির দাগ শুষে নেওয়া। আমাদের ছোট বড় নানান অভিজ্ঞতাকে জীবন যে কোথায় কতটুকু শুষে নেয়, বা কী ছাঁদে তার বিচিত্র অস্পষ্ট ছাপ থেকে যায়—বলা মুশকিল। তবে একথা তো সত্যি মানুষের মনের গঠন, তার সচেতনতা, মানসিক ঝোঁক, স্বভাব—এই অভিজ্ঞতার কম-বেশি প্রভাব ও চাপে গড়ে ওঠে। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প পড়লে অনুভব করা যায়—তিনি না পলাতক, না উদাসীন। তাঁর চরিত্রগত গুণটিই হল মমতা, সমবেদনা, উদ্বিগ্নতা নিয়ে এই সমাজ ও সংসারকে দেখা। মানবিক বোধই যে অতীনের লেখার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ—তা অস্বীকার করা যায় না।'

গোড়া থেকেই অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় ভিন্ন এক স্বাদ, এবং সেটা 'শহুরে স্বাদ' নয়। যিনি এখনও চোখ বুজলে দেখতে পান ছেড়ে আসা গ্রাম—'তরমুজ খেত, সোনালি বালির চর, পুকুরপাড়ে নিমগাছ, নোনা-ধরা ইঁটের প্রাচীন মসজিদ', নাগরিক জীবন আর ব্যক্তিমানুষের সংকট নিয়ে সাম্প্রতিক লেখালেখিকে তাঁর অনেকটাই 'পশ্চিমি দেশগুলোর অনুকরণ' মনে হয়। বিপরীতে গ্রাম, গ্রামের প্রকৃতি আর গ্রামের মানুষগুলোর সংস্কারমথিত ঈর্ষাকাতর অভিমানী হাসিকান্নাময় জীবনের তিনি ভাষ্যকার। কিন্তু নিছক যা ঘটে তিনি তার বর্ণনা দেন না, অতীন খুব সাধারণ প্রান্তিক জীবনের মধ্যেও যেন কিছু খোঁজেন। জীবনের মতোই তাঁর বলার ভঙ্গিটাও 'এলোমেলো', আর এই এলোমেলো জীবনের মধ্যেও নিহিত থাকে যে রহস্যময়তা—তাঁর লেখা জীবনের বর্ণমালাও কখনও পাঠকের কাছে এমন কিছুর সন্ধান দেয়, যাকে সবসময় হয়তো চিহ্নিত করা যায় না। আর এই অস্পষ্ট অচেনা জীবনের প্রতি উন্মুখতা আমাদের অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের প্রতিও উৎসুক করে তোলে। বিভূতিভূষণের উত্তরাধিকার হয়তো একভাবে তিনি বহন করেন, তারাশঙ্করও হয়তো কখনও তাঁর গল্পে ছায়া ফেলে যান। কিন্তু সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজকেই কখনও তাঁর সহযাত্রী মনে হয়। নিজেও একবার বলেছিলেন—

বাড়ির কাছেই ছিল হিজলের বিল। সে প্রায় মাইলের পর মাইল, সিরাজের গ্রাম বিলের ওপারে, হেঁটে হেঁটে আসত, আড্ডা হত।

গ্রাম তাঁদের লেখায় স্বভাবতই এসেছে, কিন্তু গ্রাম্যতা নয় বা পল্লীপ্রকৃতির শুধু বর্ণনা নয়। তাঁদের দুজনের লেখাতেই গ্রাম এবং গ্রামের মানুষজনকে কেন্দ্র করে যে 'দর্শন' আছে, সেই মানবজীবনদর্শনেই তাঁদের রচনার স্বাতন্ত্র্য।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশকিছু গল্পের বিষয় গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষের বেঁচে থাকার জন্য নিরন্তর লড়াই—অসম সেই লড়াইয়ে প্রায়শ মানুষগুলো হেরে যায়, মরেও যায়। তবু এদের লড়াইটা যে মিথ্যে নয়—তার মধ্যেই থেকে যায় বাঁচবার

দুর্মর আকাঙ্ক্ষা—এই আকাঙ্ক্ষাতেই জীবন অন্য মাত্রা পেয়েছে। গল্প শিল্প হয়ে উঠেছে। ধরা যাক্, 'পোকা মাকড়েও খায়, বাঁচে' গল্পটির কথা।

যে সংসারে দু-মুঠো অন্নের অভাব, সে-ই ঘরের ছেলের নাম আকাল ছাড়া আর কী-ই বা হতে পারে! সেই আকালের বাপ মাছ মেরে অতি কষ্টে সঞ্চয় করে দু-বিঘা জমি করেছিল, দো-ফসলি জমি। কিন্তু পেটের দায়ে ছেলে সে-জমি লাটুবাবুর কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। মাঠভরা শস্যের পুরোনো সেই দিনের কথা ভেবে আকালের মা-র চোখে জল আসে। জমি এখন অন্যের হলেও পেটের জ্বালায় এখন সেই জমি থেকে ধান চুরি করে আকাল আর তার বউ নয়না, সঙ্গে নেয় জরতী বুড়ি মা-কেও। কেননা তিনজনে বেশি ধান একসঙ্গে সরাতে পারবে। বুড়ি ইতস্তত করলেও আকালের যুক্তি—

নিজের ভুঁই থেকে চুরি কইরলে পাপ হয় না। ভগবান গোসা করে না। সত্যিই 'ভুখা' মানুষের পাপ-পুণ্যের বোধ আলাদা। তাই শীতের রাতে ঘাসে কুয়াশার জলে সমস্ত শরীর অবশ বোধ হলেও ভাতের কথা মনে হতে যেন নতুন করে বল পায় বুড়ি, আর ভাবে, পাকা ধানের গন্ধে কত কীটপতঙ্গে মাঠ ভরে গেছে।

কীট পতঙ্গ খায়, পাখ-পাখালি খায়। মাঠের ধান পোকামাকড়ে খায়। তারা তো মানুষের অপোগণ্ড। তারা খাবে না কী করে হয়। চুরি করা মহাপাপ মনে থাকে না বুড়ির।

সারাদিন রিলিফের গম-ভাজা পেটে আর ন্যায়-অন্যায়ের বোধ নেই আকালের। তার উপর তুষের সঙ্গে খুদকুঁড়োর সঙ্গে চাল চুরি করার অপরাধে লাটুবাবুর বাড়িতে বৌ নয়নার ধানভানার কাজটিও গেছে। নয়না মিনতি করেছিল—

এই একটা দুটা দানা... মিশা গেছে। দোষ খণ্ডন কইরে ন্যান। কাগে বগে খায়—পোকা মাকড়ে খায়, আমরাঅ খাই। ...দুই চারটে দানা কাগে বগের প্যাটে গেছে ধরে লেন।

কিন্তু মালিক অত সদয় নয়, কাকে-বকে পোকামাকড়ে খেতে পারে, কিন্তু মানুষকে দেওয়া যায় না। শীতরাত্রির অন্ধকারে তাই মাথায় ধানের বোঝা নিয়ে আকাল ছুটছে, নয়না ছুটছে, কিন্তু বুড়ি ছুটতে পারছে না স্বাভাবিকভাবেই। রূপকথার লালকমল-নীলকমলের কাহিনীতে 'কে জাগে?' হাঁকের উত্তরে রাক্ষসের ভাই খোক্কস জাগে কথাটিকে যেন ধ্রুবপদের মতো উচ্চারণ করা হয়েছে। লাটুবাবুর মাঠে রাতপাহারার জাগালদার, নয়নাকে এমনি ছেড়ে দেবে না তারা জানে, ফলে নয়নারা দৌড়াতে থাকে। আর হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় বুড়ি। তাকে ঘিরে নামতে থাকে শীতের ঘন রাত। জমি জুড়ে থরে থরে ধানের আঁটি সাজানো। যেন সদয়া প্রকৃতি তার আঁচল বিছিয়ে ডাকছে—অরে মনুষ্য, তোরা খেয়ে বাঁচ। কিন্তু জাগালদার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। বুড়ি অর 'সোয়ামির জমিনে' ধানের বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে,

মংলুকে গাল দেয় 'অরে খোককস তর মরণ হয় না ক্যানরে। আমার মরদের জমিন।' কিন্তু জাগালদারের দণ্ডের আঘাতে সে ভূমিশয্যা নেয়, বুকের উপর ধানের ভারী আঁটি বাঁধা বোঝা। শীতের রাতে গরম ভাতের স্বপ্ন নিয়ে বুকের ওপর ধানের বোঝা নিয়ে তার মরদের সাধের জমির উপর বুড়ি মরে পড়ে থাকে। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় পোকামাকড়ের মতো মানুষের এই বেঁচে থাকাকে এক মহাজাগতিক ক্যানভাসে স্থাপন করে দেন—

এই সুমার মাঠ তার সামনে অতিকায় এক কাল-রহস্য হয়ে গেছে। কীটপতঙ্গের আওয়াজ শুধু। আর পোকামাকড় হেঁটে বেড়ায়। এক বুড়ি ধানের আঁটি বুকে নিয়ে সোয়ামির ভূখণ্ডে শুয়ে আছে। অকাতরে আকাশ দেখছে। পলক ফেলছে না।

একদিকে এই মৃত্যু, আর অন্যদিকে শীতের রাতে জীবনের কাছে ফিরতে চেয়ে নারী-পুরুষের পরস্পরের শরীরী তাপে বাঁচার রসদ সংগ্রহ— আকাল আর নয়না।

শরীর দুজনেরই গরম। শীতের কামড় আর দাঁত বসাচ্ছে না। দুজনে খানিক বাদে আলগা হয়ে গেল।

মাঠের ধান খেয়ে পোকামাকড়ের যেমন কোনো অপরাধবোধ নেই, নেই তাদের প্রজননের তাদের মিলনের ক্ষণ। বুড়ি মা-কে শীতের রাতে মাঠে পড়ে যেতে দেখেও আকাল ফেরেনি, লাটুবাবুর কাছে কী জবার দেবে ভেবে রেখেছে, ধানের বোঝাও যথাস্থানে লুকিয়ে রেখেছে, তারপর নারীতে উপগত হয়েছে। ধানচুরিতে কোনো অন্যায়বোধ তাকে দংশন করেনি। অতীন মানব-পতঙ্গের এই শস্যচুরিতে গল্প শেষ না করে ভিন্ন এক দার্শনিক দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন—

আর এই গভীর নিশুতি রাতে মাঠে আবার সোনালি ধানের মহিমা। মানুষের ক্ষুধা বড় প্রখর, দুঃখী মানুষের জন্য শুধু রয়ে গেছে আল্লার গজব। কে-জানে ধরায় কোন ধামে সুখ তাদের জন্য অবিরাম কালাতিপাত করছে। কে-জানে, আকালের মা সেই আশায় মাঠে শুয়ে আছে কি না। সবাই খায়। পাখপাখালি খায়, কীটপতঙ্গে খায়, পোকামাকড়ে খায়। খেয়ে বাঁচে। প্রজনন বাঁচিয়ে রাখে।

আকালও প্রজনন বাঁচিয়ে রাখার জন্য ধানের আঁটি লুকোবার পরই মায়ের জন্য কাঁদতে থাকে। ফকির আর জাগালদারও গল্পে অন্য তাৎপর্যে চিহ্নিত। এ-গল্প ধানচুরি কিংবা জোতদারের অত্যাচারে-অবিচারে সীমাবদ্ধ না থাকায় গল্পকারের ভাবনার ভিন্নতা স্পষ্ট হয়।

মনে করা যেতে পারে, তাঁর '[illegible]জঙ্গ' [illegible] প্রচণ্ড খরায় যখন মাঠে আগুন জ্বলছে, আর আগুন জ্বলছে পেটেও তখন থাকার কিংবা শুধুই টিকে

থাকার রসদ জোগাড় করতে নিশি তার বউ সোনামনি আর দুই মেয়ে অঙ্গি-বঙ্গিকে নিয়ে সরকারি বীজতলা থেকে ধান চুরি করতে যায়। চুরি পাপ অন্যায় এসব বোধ তুচ্ছ হয়ে যায় পেটের প্রচণ্ড খিদের কাছে। নিশি ঢোল বাজাত পুজো-পার্বণে। একসময় পাঁচকাঠা জমির উপরে তার ঘর ছিল, শশীর কাছে সব বন্ধক রেখেছে। শশী এখন সরকারি খামারের দারোয়ান, নজর তার সোনামনির উপর। অঙ্গি-বঙ্গির আহার বলতে এখন কচুসেদ্ধ। আকালের দেশে নিশির রোজগার নেই, কিন্তু খিদে আছে। রাতের অন্ধকারে ভুখা-পরিবার তাই মাঠে নেমে গেছে—কাদাজমির ভিতর।

'ওরা প্রায় চারটা পাখির মতো খুঁটে খুঁটে যেন ধান খেতে থাকল। খুঁটে খুঁটে খুব সন্তর্পণে—আলগোছে হাত বাড়িয়ে তুলে আনল ধান। একটা ধান, দুটো ধান, একসঙ্গে... পাঁচ সাতটা ধান তুলতে গেলে এক মুঠো কাদা উঠে আসছে। জ্যোৎস্না প্রায় মরে আসছিল। ওরা ধানের চেয়ে কাদা তুলছিল বেশি।...

ঠিক পাখির মতো ওরা এক পা দু পা করে এগুচ্ছিল। কাদার ভিতর হামাগুড়ি দিচ্ছিল। ধান খুঁটে যে যার গামছায় রাখছে।'

কাদাযুক্ত ধান কোঁচড়ে গামছায় রাখতে রাখতে তা ভারি হয়ে যাওয়ায় পরনের কাপড় খুলে সেখানে ধান রাখছিল সোনামণি, নিশিকেও উলঙ্গ করে দিল সে। তাদের পরস্পরের কথোপকথন, অত ধান দেখে সোনামণির উল্লাস, নিশির আসঙ্গবাসনা সবকিছু মিলেমিশে শশীকে যেন সতর্ক করে দিল। বীজতলাকে পাখির ঝাঁকের থেকে বাঁচাতে সে টিন বাজায়। নিঝুম রাতে শব্দটা বড় ভৌতিক লাগে, মনে হয় কেউ যেন মাঠময় আকালের ঘন্টা বাজাচ্ছে। সেই রাতে চারটে কাদামাখা শরীর ধান কুড়োচ্ছে। শশীর গলা পেয়ে অঙ্গি-বঙ্গি আর নিশি ছুটে পালাল। পারল না সোনামণি। তার বোঝা ভারি। কাদায় পা আটকে গেল বারবার। শশী যেন এক কালসাপ, আর সামান্য এক পাখির মতো, কাদার ভিতর পাখির মতো ধরা পড়ে গেল সোনামণি। শশী দাঁড়িয়ে কাদার ভিতর পাখিটার ছটোপুটি দেখছে—চিৎকার করে উঠল, আমি কাল-শশী। তোমাকে আমি ফাঁদে ফেলেছি হে সোনামণি।

সোনামণি চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না, 'সে উড়ে উড়ে পাখির মতো ভুঁইয়ে খেলা দেখাতে থাকল শশীকে। সে প্রায় উড়ে উড়ে ছুটতে লাগল।' কিন্তু এ যে বড় বিষম খেলা। 'ভুজঙ্গ পাখি ধরার জন্য লড়ছে, পাখি প্রাণ বাঁচানোর জন্য লড়ছে।' সোনামণি শেষপর্যন্ত খেলাটায় হেরে গেল। বলা যায়, হারার আগে আরেকবার জিতে গেল। আগে যখন শশী তাকে ঘিরেছিল, তখন তার হাতে কামড় বসিয়ে সে পালিয়েছিল। এখন যখন শশী কাদামাখা বিবস্ত্র শ্রান্ত শরীর দংশনে উদ্যত, তখন সোমামণি তার গলাটা কামড়ে ধরল। একবার নিশি দেখতে গেল তাকে সেই বিলাপ,

আর একবার তার সংগ্রহের সোনার ধান রাখতে না-পারার বিলাপ— হাহাকারে সে নারী তখন আর ফাঁদে-পড়া পাখি নয়, বরং কালভুজঙ্গীর মতো সে শশীকে মেরে ফেলেছে। গল্পকার লিখলেন—

'সোনামণি জবাব দিল না'। মরা গোসাপের মতো চিত হয়ে পড়ে থাকল। কারণ এতটুকু শক্তি আর সোনামণির অবশিষ্ট ছিল না।...'

'তু আমার সোনার ধান্য চুরি করে লিচ্ছিস' একথা বলেই সে শশীর গলাটা কামড়ে ধরল আর—

'ভালমানুষের ছা শশী মুরগির মতো, জবাই করা মুরগির মতো উঠে দাঁড়াল। দু-তিনটে বড় লাফ দিল কাদার ভুঁইয়ে, পাগলের মতো দু-হাত উপরে তুলে ঘুরে ঘুরে শেষে এক আলিসান ভুজঙ্গের মতো লুটিয়ে পড়ল। সোনামণি, সামান্য এক প্রাণ-পাখি শশীর মতো দানবের, যে আকালের ঘন্টা বাজাত, প্রাণ হরণ করে চলে গেল।'

একটু আগেও শশীর শ্লেষ উচ্চারিত হয়েছিল কাদামাখা উদোম সোনামণিকে দেখে—'খোলা গায়ে মুরগি ওড়ে, হায় কত সুখ রে'। অল্পপরেই শশীর জন্য উচ্চারিত হল জবাই-করা মুরগির উপমা। আকালের ঘন্টা এখন আর বাজবে না। তবে কি সোনামণি নিজের জীবন দিয়ে খরা থেকে আকাল থেকে অঙ্গি-বঙ্গিকে মুক্তি দিয়ে গেল? তারা কি এবার থেকে নিরাপদে খুঁটে নেবে ধান? আকালের ক্ষুধার পাশাপাশি অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এইসব গল্পে রয়েছে শরীরের দাহ আর সৃষ্টির বীজ-ধারিণী নারী কখনও আবির্ভূত হয় হন্তারকের ভূমিকায়। 'আউড়ি বাউড়ি' গল্পেও জননী তার আসঙ্গলোভী গুপিকে এইভাবে হত্যা করেছে। পেটের দায়ে জননীর হাঁটুজলে নেমে শাক তোলা, আর নিত্য ছিপ-ধরে গুপির জননীর দেহ-আস্বাদন। এই গল্পেও রয়েছে সীমান্ত পেরিয়ে আসা হা-ঘরে পরিবারের নিরন্তর দারিদ্র্য।

জমিজায়গা নেই, তবে গতর আছে জননীর। এপারে এসে গুপির আগ্রহে কটুবাবু তাদের রেশন কার্ড দিয়েছে। গুপির আগ্রহের কারণ জননীর শরীর। জননী কটুবাবুর বাগানে ধান ওড়াতে চায়, বলে 'আউড়ি বাউড়ি', শ্রমের বদলে এক কেজি চাল। গ্রাম্য চল্‌তি কথায় থাকে অন্য স্বাদ—আউড়ি বাউড়ি। জননী বলে—

ধানের আউড়ি বাউড়ি বাতাসে ওড়ে—উড়ে যায় বাবু। পড়ে থাকে সোনার ধান্য। যারে কয় পরমান্ন। আমরা হুজুর সব আউড়ি বাউড়ি। হাওয়ায় উড়ি। পরমান্ন যার সে তোলে। আমরা হু হাওয়ায় উড়ে উড়ে রেল পাড়ে হাজির। আপনের বাগানে আউড়ি বাউড়ি হয়ে থাকতে দিন। বাঁচতে দিন হুজুর।... এই ধানের আউড়ি বাউড়ি দু-চার মাস কাল। মাঘ ফাল্গুনে শেষ। জননী আউড়ি বাউড়ি ওড়ায়। খুঁদকুঁড়া পায়। অন্ন পায়।

তা এমনি করেই দিন কাটছিল জননীর, ধান উড়িয়ে কলমি তুলে। তার স্বামী সদা জঙ্গল সাফ করে, ডাল কাটে। আর জটা পটা কটা এখান ওখান থেকে যা কিছু কুড়িয়ে আনে। আর খুব যত্ন করে গোপন রাখে জননী তাদের রেশন কার্ডগুলি। এপারে ঐ কার্ডই যে তাদের অস্তিত্ব, তাদের পরিচয়। কিন্তু বাদ সাধে গুপি। কয়েকবার 'এটেম' নিয়ে ব্যর্থ হবার পর 'শালীর সতীপনা... বেইমানি'-র বদলা নিতে মোক্ষম চাল দেয় গুপি, কার্ড ক'খানা ফেরত চায়। জাল জুয়াচুরি করে কার্ড ভাঙিয়ে ভোটার লিস্টে নাম তোলার কাজে সে বাধা দেয়। জননী তর্ক করে, কিন্তু ভয়ও পায়। গুপি যদি তাদের ওপারের ঠিকানা বাতলে দেয়। ভোটার লিস্টে নাম উঠলেই যেন তার অন্নসংস্থান পাকা, ধর্ষণের ভয় নেই, প্রতিদিনের উচ্ছেদের আতঙ্ক নেই... জননীর চোখে ভাসে সেই স্বপ্ন। গুপি বুঝি তার হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিতে চায়। 'একবার না হয় নাই ফেরাল'। সে গুপিকে ডাক দেয়—'দেখা হয়ে গ্যালে মন্দ হয় না।'

'আর সেই দেখা হওয়াই কাল হল গুপির। সাঁঝ লেগে গেছে। দূরে, অনেক দূরে ঝুপড়ি। টেমি জ্বলছে। ঝুড়িতে শাকপাতা মাথায় ফিরছে জননী। একখানা গামছা শরীরে জড়ানো। বুক কোনওরকমে ঢাকে।... ভিজা শাড়ি গামছা পরে... শরীর তার এখন আগুন। গুপি ঝুপ করে জঙ্গলে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেছে। সে-ও। তারপর এক হ্যাঁচকায় গুপি গামছাখানা টেনে খুলে ফেলল। ছিন্নমস্তা নারী বুঝবে কী করে। আর দু-পায়ের হাঁ-করা মাছটার মুখে টোপ ফেলতেই, গুপির গলা কামড়ে ধরল। চিতাবাঘের মরণ কামড়। শিকারি বাঘিনীর আহার। গুপি ছটফট করছিল। তারপর তরল হয়ে গেল। ঠাণ্ডা মেরে গেল। বাঘিনী জলে ডুব দিয়ে ঘরে ফিরছে।'

হাঁটুজলে, কখনও কোমরজলে নেমে জননীর শাক তোলা আর সে-ই পুকুরে ছিপ ফেলে গুপির তার প্রতি চোরা-চাউনির দৃশ্যে যৌনতা আছে। হতদরিদ্র মানুষগুলোর জীবনে অন্নহীনতা যেমন সত্য, তেমনই সত্য শরীর-বাসনা। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় নিছক শরীরী রমণের গল্প বলেন না। তিনি দেখান নারী কীভাবে তার শরীরকে আয়ুধ করে তোলে, কখনও নিজেকে রক্ষার জন্য কখনও সংসারকে রক্ষার জন্য। পোকামাকড়ের মতো জীবন তাদের, পাখির মতো ধান খুঁটে খাবার জীবন তাদের, ধানের আউড়ি বাউড়ি বাতাসে ওড়ার মতো জীবন তাদের—সেই জীবনে তাদের সম্ভ্রমের কেউ মূল্য দেয় না। শ্রমে স্বেদে তাদের বেঁচে থাকাকে গল্পকার গভীর সংবেদনে অনুভব করেন। উপস্থাপন করেন।

'বেঁচে থাকা' গল্পে তাই তিনি দেখান বিধবা শ্যামা গর্ভবতী ফুল্লরা ধিরুর মা কপিলের বউ কোকিলার নিত্যদিনের যাপনচিত্র। তার 'মরদ মচকানো' হাসিটাকে

শ্যামা ব্যবহার করে বুড়ো বাপ-মা আর ছোট ভাইদুটোকে প্রতিপালনের জন্য, কোকিলা বুঝেছে যার ভাত দেবার মুরোদ নেই শুধু কিল মারার গোঁসাই সেখানে 'দেহখানা জিম্মা রেখে কী হবে'! নিকোনো উঠোন আর তুলসীমঞ্চের সংসার তাদের জন্য নয়। 'উদর হল গে বড় সমস্যে', তার জন্যই 'কলঙ্কিনী রাই যায় বৃন্দাবনে'। হাত দেখার বিদ্যে নিয়ে তঞ্চকতা করে জেল-ফেরত নারান ফুল্লরাকে জব্দ করতে ভ্রষ্টা কুলটার তক্‌মা দেয়। তবু শীতের রাতে কাঁথার নীচে ফুল্লরা আর নারান জীবনের ওমে বেঁচে থাকে, তখন পৃথিবীটা বড় মহার্ঘ্য ঠেকে। নিম্নবর্গ প্রায় নিঃস্ব এই বেঁচে থাকাকে অতীন বিবৃত করেন পোকামাকড়েরই রূপকে—

'শীতে পোকামাকড়ও ওম চায়। ওদের তাও ছিল না। শুধু হেঁটে প্রমাণ করছে ওরা বেঁচে আছে। রক্তে ওম ধরাতে হয়। নাহলে বাঁচা যায় না। ঠাণ্ডায় কাবু হয়ে এই মাঠের মধ্যে পড়ে থাকার কথা। দেখলে মনে হবে শুধু আত্মরক্ষার্থে পায়ে পায়ে দঙ্গল বেঁধে তারা ছুটছে। সূচের মতো কনকনে ঠাণ্ডায় হাত পা অবশ। তবু ওরা হাঁটছিল। ওদের হুঁশ কম, গরিব মানুষের বেশি হুঁশ থাকা ভাল না। কথাবার্তা বলছিল। কথাবার্তা বললে, ওরা বেঁচে আছে বুঝতে পারে। ছায়া ছায়া ভূতের মতো মনে হয়—যেন ভেসে যাচ্ছে বাতাসে কিংবা দূরে থেকে মনে হয় ক্ষুধার্ত পঙ্গপাল বের হয়েছে কোনও সবুজ শস্যক্ষেত্রের সন্ধানে।'

নারীবাহিনীর এই সম্মিলিত যাত্রাকে কখনও মনে হয় পোকামাকড়ের নাড়াচাড়া, কখনও মনে হয় একদঙ্গল কাঁকড়া হেঁটে যাচ্ছে, আরও পরে 'কীটপতঙ্গ থেকে ধীরে ধীরে যখন মানুষের অবয়ব হয়ে যায় তখন বুঝতে দেরি হয় না এই সেই তারকপুরের দঙ্গলটা', বিশ পয়সার চা আর শুকনো রুটি খেয়ে ট্রেন ধরবে বলে হাঁটছে। সংসারের হাঁ-মুখ ভরাবার জন্য পরিশ্রমী এই যাপনকে অতীন বারবারই পোকামাকড়ের সঙ্গে তুলনা করেন, বোধহয় দেখাতে চান অপেক্ষাকৃত বিত্তবান মহাজন কিংবা গৃহস্থর কাছে এই অতিদরিদ্র মানুষগুলোর মূল্য ঐ পোকামাকড়ের মতোই—তারা জানেই না হয়তো তাদের বেঁচে থাকার মানে। চুরি করে খেতে তাদের অপরাধবোধ নেই, শরীর ব্যবহারে তাদের শুচিবায়ু নেই, জানে 'হাত পাত দেখবি থুতু ছিটাবে।... দেহখানা লিয়ে এক কথা তেনারা বুলতে ভালবাসেন, দেহখানা ছাড়া তেনাদের জিভে জল আসে না।' ফলে কৃত্রিম শিষ্টতার ধার ধারে না তারা। এই গল্পগুলিতে অতীন আরও বলেন গ্রামের মানুষের কুসংস্কারের কথা, মিথ্যা বলে কৌশলে টাকা হাতিয়ে নেবার কথা, সরকারী ঋণের টাকায় সেলাইকল পাবার কথা, কুমারী কন্যার গর্ভনাশে তুকতাকের কথা, পেটের দায়ে ধ্যানস্থ ফকিরেরও ধান চুরি করার কথা—বিস্তৃত এই চালচিত্রে তিনি গ্রামের হা-ঘরে মানুষগুলোর দীর্ঘশ্বাস অপমান আঘাত-প্রত্যাঘাত চুরি ভিক্ষা খিদে আর তার পাশাপাশি দেখান তাদের বেঁচে থাকার

ইচ্ছের কথা, বংশধারা জিইয়ে রাখার কথা।

'দেবী নিধন পালা' কিংবা 'এক বর্ষার গল্প' গ্রামীণ প্রেক্ষিতে মানুষের সংস্কার মানুষের কামনাবাসনাকে ভিন্ন মাত্রায় ধরে দেয়। অগ্নিবর্ণ বসন্ত ঋতুতে মারণ রোগের প্রাদুর্ভাবকে ঘিরে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যে 'কালপুরুষ' হয়ে-ওঠা ঠাকুরদার শক্তি ও শক্তিহীনতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে গল্পকথক সুনু আর আবুর বয়ঃসন্ধির যৌনতা। লেখনীগুণে গল্পটিকে লৌকিক-অলৌকিকের সীমারেখায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। ভরা বাদর মাহ ভাদরে একদিন নৌকা নিয়ে ভাসল রস আর বুড়ি—ওরা জলের নীচে নেমে জলের উপর ভেসে অথবা ঘুরে ঘুরে, ডুবে ডুবে সাঁতার কাটল, শাপলা তুলল, শালুক তুলল। কিন্তু কিছুতেই আর ভেসে উঠতে পারল না। ক্রমশ জলজ ঘাসের ভিতর শালুক লতার ভিতর জড়িয়ে যেতে থাকল আলিঙ্গনে আবদ্ধ নগ্ন দুটি কিশোর-কিশোরী। এক বর্ষার এই গল্পকে প্রায় কবিতার কাছাকাছি নিয়ে গেছেন অতীন। এখানে কোনো ঘটনার ঘনঘটা নেই আছে অনুভবের বিচিত্র সব আঁকিবুকি। অতীনের গল্পে বুভুক্ষার পাশাপাশি উচ্চারিত হয়েছে যৌনতার কথা। নিতান্ত হা-ঘরে মানুষগুলো দু-মুঠো গরম ভাতের জন্য উন্মুখ, কাতর শরীরী উত্তাপের জন্যও। আর তাঁর আখ্যান জুড়ে প্রায়শ যে 'যৌনতার ওম' সে সম্বন্ধে অতীনের বক্তব্য, তাঁর রচনায় যৌনতার বিষয়টি খুব স্বাভাবিক—

'সুদীর্ঘকাল ধরে আমি যেটা উপলব্ধি করেছি, আমরা যে সংঘবদ্ধ হয়ে আছি, তার কারণ, এর মধ্যে একটি নারী আছে। যদি নারী না থাকত তা হলে এই সমাজ, রাজনীতি, শিল্পসৃষ্টি কিছুই থাকত না। এই থাকাটাই মূল্যবান। আর এর কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে যৌনতা। আমি মনে করি যৌনতাই প্রাণ, যৌনতাই সৃষ্টির উৎস, যৌনতাই ঈশ্বর, যৌনতা আমার কাছে ভোগের বস্তু নয়।' *(সাক্ষাৎকার, বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন ২০১২, পৃ. ১০৭)*

এইজন্যই তাঁর 'পোকামাকড়েও খায়, বাঁচে', 'কালভুজঙ্গ', 'আউড়ি বাউড়ি' 'বেঁচে থাকা' প্রভৃতি গল্পে যৌনতার এমন অন্তঃশীল প্রবাহ।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের প্রায় অর্ধেক পরিসর জুড়ে রয়েছে প্রকৃতি, গ্রামীণ নিসর্গ, সীমান্তের ওপারে যে প্রকৃতিকে তিনি ফেলে এসেছিলেন তাঁর কৈশোরে, সেই 'অদ্ভুত স্নিগ্ধ প্রকৃতি। পুকুর, নদী, খাল, বিল, চাষের জমি। ডাঙা, জল যেন সমান' —এইসব ছবি তাঁর স্বপ্নের ভিতর হানা দিত প্রায়শ। কৈশোরের সেই রসদ থেকে তিনি ধীরে ধীরে শক্তি সংগ্রহ করেছেন এবং লেখার সময় যেন ফিরে গেছেন সেই অতীত স্মৃতির মধ্যে—আর সেখান থেকে তুলে এনেছেন চষা খেত জল-ভরা জমি, ফসলশূন্য বিস্তৃত মাঠ, রৌদ্রতপ্ত গাছ, পাখি আর পোকামাকড়। তাঁর বেশিরভাগ

গল্প জুড়ে শস্যহীনা ধরিত্রীর শুষ্ক রূপ, 'আবাদ' কিংবা 'নীলবসনা সুন্দরী' গল্পে দহন আর খরার ছবির সঙ্গে কুঞ্জ ঠাকুর পালান সুবলের বেঁচে থাকার ভিন্ন এক মাত্রাকে যুক্ত করেছেন অতীন। অতীনের চমৎকার গদ্যে গ্রামবাংলার নিসর্গ তার সব শূন্যতা দাহ আর পিপাসা নিয়েই ধরা পড়ে।

'রুখো হাওয়া দিচ্ছে কেবল। সেই কবে কার্তিকের শেষাশেষি বড় বাদলা গেছে তারপর আর আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটাটার দেখা নেই। উত্তুরে হাওয়ায় শীত এল, যব-গমের গাছে কুয়াশা লেগে থাকল কিছুদিন। তারপর ফের ভাপ উঠতে শুরু করেছে। নদী নালায় জল নেই, ঝড়ো রুখো বাতাসে কেবল ধুলো ওড়ে। লালমাটির ধুলোয় গাছপালায় রং ধরে যায়। বৃষ্টি বাদলা না হলে জীবন আর বাঁচে না।

বড় অসময় মানুষের। জীবজন্তুর। পাখপাখালির, উরাট হয়ে আছে। জমিজমা—জগৎজননী মা এখন চামুণ্ডা।'

পৃথিবীর ভাঁড়ার থেকে ক্রমশ যেন মানুষের পাখপাখালির সব খাবার ফুরিয়ে যাবে, এমন আশঙ্কায় ভয় পায় ক্ষেত্রমণি। যদিও ছোটগল্পের একমুখিতা এখানে বিপর্যস্ত হয়েছে—ক্ষেত্রমণির যে আশঙ্কায় গল্পের শুরু, পিপাসার্ত গাভীর মৃত্যুতে যে গল্পের আবহ বিষণ্ণ, গল্পের শেষে বাপের তাড়ায় উলঙ্গ সুবলার মরা গাভীর পেটের নিচে আত্মগোপন ও করালী কাকার মেয়ে নীলবসনা সুন্দরী রুইদাসী যদি তাকে এমনভাবে দেখে ফেলে—বয়ঃসন্ধির সেই যৌনভাবনায় লজ্জায় কুঁকড়ে যাওয়া। বস্তুত, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প বলার ধরণাটাই এমন. 'এলোমেলো', এই অবিন্যস্ত ভঙ্গিই তাঁর লেখার বিশেষত্ব। তবু এরই মধ্যে বালি সরিয়ে জল-সন্ধানের ছবিতে, রৌদ্রদগ্ধ দুপুরে বেস্ম মাঠে জলের তরাসে 'তেনার' মরণের ছবিতে, শ্রমক্লান্ত পুরঞ্জয়ের ভাত না পেয়ে ক্রোধের ছবিতে আতপ্ত শুষ্ক ক্ষুধার্ত গ্রামবাংলার এক ভিন্ন অবয়ব ফুটে উঠেছে এই 'নীলবসনা সুন্দরী' গল্পে। আর 'আবাদ' গল্পে খরার মাঠে আগাছা আগলে থাকা কুঞ্জ ঠাকুর, পাইকার বেচু মণ্ডলের ক্রমাগত দরদাম, তার হাত থেকে শুধু জমি নয় বিধবা পুত্রবধূকেও রক্ষার চেষ্টা কুঞ্জর আর সে তার নাতি পালানকে বাঁচাতে চায় আকালের দিনে উড়ে-আসা শকুনের গ্রাস থেকে। গ্রামের দরিদ্র এই প্রৌঢ়কে যে কত কিছুর গ্রাস থেকে রক্ষা করতে হয় পরবর্তী প্রজন্মকে, নাতির জন্য তার যে কী উদ্বেগ আর মমতা—গল্প জুড়ে তার বিস্তার। কুঞ্জ ঠাউরদার এই ভাবনা প্রকৃতির আশ্রয়েই প্রকাশ পায়—

'আমার পালান আছে না! গাছেরও গাছ থকে। বীজেরও বীজ গাছ বড় হয়, বাড়ে। ফুল ফোটে—ফল ধরে।'

ঐ খরাদগ্ধ মাঠই কুঞ্জর কাছে জননী, সে প্রাণপণে ঐ জমিকে বাঁচাতে চায়।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রামকেন্দ্রিক গল্পগুলিতে সমসাময়িক বাস্তবের সরাসরি প্রতিফলন নেই। তাঁর গল্প সমকালের রাজনৈতিক কর্মসূচী, আর্থিক সংস্কার, সামাজিক প্রকল্পের ডক্যুমেনটেশন্ নয়। অতীনের গল্পের পরিসরে জীবনের এমন এক রহস্যময়তা আছে যা প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত এক ভুবন গড়ে তোলে। জমি নিয়ে দলাদলি, মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব, প্রকৃতির রুদ্ররোষ, বেঁচে থাকার জন্য কঠিন লড়াই, গ্রামের সাধারণ মানুষগুলোর অতি সাধারণ জীবনধারণ—তাদের বাসনা তাদের বিতৃষ্ণা তাদের হিংসা আর যৌনতা, ভুখা মানুষের পাপ-পুণ্যের বোধ—অতীন এ-সবই বলেন, কিন্তু অন্যভাবে বলেন। দেখার চোখ আর বলার ভঙ্গির এই ভিন্নতাই অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিছক জনপ্রিয়তা দেয়নি, বরং খাঁটি সোনার উজ্জ্বলতা দিয়েছে। 'পঞ্চাশটি গল্পে'র ভূমিকায় বিমল কর যখন লেখেন—

অতীনের লেখার ধরনটাই আলাদা। তার কোনও নির্দিষ্ট ছক নেই, মাপজোক করে হিসেব মিলিয়ে গল্প লেখার ধাত তাঁর নয়। প্রায় সব লেখাই স্বতঃস্ফূর্ত, ভেতরের তাগিদেই নিজের মতন করে গড়ে উঠেছে। কোনও কোনও সময় মনে হয়, অতীন বুঝি গল্পের পটুয়া। নিজের মনের মতন করে আঁকেন, নিজের মনের পছন্দসই রং ব্যবহার করেন—যার উজ্জ্বলতা প্রখর নয় অথচ স্নিগ্ধ ও লাবণ্যময়।

আর যা কিছু তাঁর গল্পকে ঘিরে রয়েছে তা হল বাংলা দেশের মাটির গন্ধ জলের ঘ্রাণ পোকামাকড়ের চলাফেরা পাখপাখালির ওড়াউড়ি। পিতামহ আর পৌত্রের সম্বন্ধের ভিতরকার স্বরটি অনবদ্য উচ্চারিত হয় তাই তাঁর 'আবাদ' গল্পে—

বুড়ো মানুষটি হেঁটে যাচ্ছে। কাঁধে তার পালান। নীচে তার দু-খণ্ড ভুঁই। উত্তরের আকাশ থেকে নেমে-আসা শকুন দেখে ভয় পায় পালান, আশ্রয় খোঁজে দাদুর কাছে। ভয় পায় কুঞ্জ ঠাকুরও—

—তালে কি মরা গন্ধ উঠছে তার শরীর থেকে। সেও কি আর একটা খড়ের জমি! বেচুর গোরু বাছুরে খাবে বলে মাথার উপর ভাসছে! সে দ্রুত পা ফেলতে থাকল। না'লে মাথার উপর ওগুলো ওড়াউড়ি করছে কেন! সে পালানের হাত ধরে ছুটতে থাকল। —পালান আয়। শিগগির আয়। সব বেচুর কম্ম। ঠিক ছেড়ে দিয়েছে। আবাদ বলে কথা। আয় আয়। আমি না হয় খড়ের জমি—তুই। তোর ঝাড় হবে। তুই বাড়বি। বড় হবি। গাছেরও গাছ থাকে। বীজেরও বীজ। গাছ বড় হয়, ফুল ফোটে, আয়। তাড়াতাড়ি আয়। ফল ধরে—বীজ হয়। আয়। তাড়াতাড়ি করে কর রে ব্যাটা। বীজ উড়ে না গেলে গাছ তারে ছাড়ে কী করে! সে পালানকে আড়াল করে পাগলের মতো আকালের কাছে থেকে ছুটে পালাতে লাগল।

অন্য কলমে এ গল্প সাধারণত পাইকারের হাতে জমি বেচার কান্নায় শেষ হত, মহাজনের হাতে বিধবা পুত্রবধূর লাঞ্ছনায় শেষ হত, কিংবা আকালে অনাহারে

ক্রমশ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ায় গল্পে যতি পড়ত। কিন্তু অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুর অতিকায় ডানার আড়াল থেকে এখানে জীবনকে মুক্তি দিতে চান। বুড়ো মানুষটা, যে তার জমি কিছুতেই বেচতে চায় না, ভাবে... আর একটা বৃষ্টিই সব শুষ্কতার শেষে জমিকে আবার ফলনশীল করে তুলবে, সেই আশাতেই সে জমিকে রক্ষা করতে চায়। এইভাবেই বুড়ো মানুষটা যেন ভারতবর্ষের প্রতীক হয়ে ওঠে, স্বদেশের প্রতীক হয়ে ওঠে যে তার স্বজনকে তার উত্তরাধিকারকে দু-মুঠো ভাতের নিশ্চয়তা দিতে চায়—কাঁধে নাতিকে নিয়ে বুড়ো মানুষটার মাঠ ভাঙার ছবিতে গল্পকার এখানে জীবনের এক বৃহত্তর ও মহত্তর তাৎপর্যের সন্ধান দেন পাঠককে।

শ্রাবণী পাল

জন্ম : ১৯৬৬ সাল। পেশা অধ্যাপনা। গবেষণার বিষয় ছিল—রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্য। আগ্রহের বিষয় : রবীন্দ্রনাথ এবং উনিশ ও বিশ শতকের কথাসাহিত্য। প্রকাশিত গ্রন্থ : 'ছোটগল্পের পুষ্পিত প্রান্তর', 'শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়' (জীবনী), 'রবীন্দ্রনাথ : বিচিত্রের দূত', 'কুমুদরঞ্জন মল্লিক' (জীবনী), 'বাংলা কথাসাহিত্যে পঞ্চাশে মন্বন্তর—অশনি সংকেত', 'পরিবর্তমান গ্রামসমাজ : গল্পকারের ভাবনা'। সম্পাদনা : 'বীরাঙ্গনা কাব্য', 'পঞ্চভূত', 'বিশ শতকের ছোটগল্প'।

অলৌকিক জলযান—অলৌকিক যাত্রাকথা

বিশ্বজিৎ পাণ্ডা

বাংলা সাহিত্যের—বাংলা কথাসাহিত্যের পটভূমি-পরিবেশ হিসেবে যতটা ডাঙা-স্থল-জঙ্গলের কথা এসেছে ততটা আসেনি জলের কথা। নদী-নির্ভর উপন্যাস বাংলায় কিছু কম লেখা হয়নি। কিন্তু সমুদ্র! দুরন্ত রোমাঞ্চকর সমুদ্রকে পটভূমি হিসেবে খুব একটা বেছে নেননি বাঙালি লেখকেরা। তার প্রধান কারণ হয়তো সমুদ্রজীবনের অভিজ্ঞতার অভাব। যে-দুএকজন লেখকের লেখায় নাবিকজীবন-সমুদ্রজীবনের কথা বার বার এসেছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের অজানা-অচেনা রহস্যময় সমুদ্রজীবনকে কেন্দ্র করে রচিত বাংলা গল্প-উপন্যাসগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ অবশ্যই 'অলৌকিক জলযান'। এই উপন্যাসের সূত্রেই বাংলা কথাসাহিত্যের ভৌগোলিক সীমানা আরও ব্যাপ্ত হয়ে গেল। বাঙালি পাঠক ডাঙা ছেড়ে সমুদ্রে পাড়ি দিল অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে। উল্লেখ করা যেতে পারে এর আগে শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু লেখায় এসেছিল সমুদ্রের পটভূমি—নাবিকজীবন-দ্বীপজীবনের প্রসঙ্গ। 'অলৌকিক জলযান'-এর সঙ্গে তার তুলনা চলে না।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন সমুদ্রে—জলে জলে। বিশ শতকের বাহান্ন তিপান্ন সাল নাগাদ তরুণ বয়সেই জাহাজে কোলবয়ের চাকরি নিয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন সমুদ্রে। আরামের চাকরি ছিল না। এক জায়গায় এ সম্পর্কে বলেছেন—"সৌভাগ্যবশত কাজটা খুব কঠিন ছিল। জাহাজে তিনটা বাঙ্কার ছিল। কয়লা ঢালতে হত"। ('এবং মুশায়েরো', বৈশাখ-আষাঢ়, ১৪২০)। টানা বাইশ মাস ছিলেন জলে। দীর্ঘ সমুদ্র সফর। তাঁর জীবনের এই সময়পর্বের মূল্য কিছু কম নয়। তিনি নিজেই এই সম্পর্কে বলেছেন—তরুণ হয়ে গিয়েছিলেন; "যখন ফিরলাম মনে হল যুবক হয়ে গিয়েছি।" ('আমার সময়', ডিসেম্বর ২০০৯)। যে বিচিত্র পরিবেশে অদ্ভুত মানুষদের সঙ্গে তিনি সফর করেছিলেন, সেই পরিবেশ সেই মানুষজনদের কথা তাঁর বহু লেখায় উঠে এসেছে।

'অলৌকিক জলযান' গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় মাঘ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে। এই দীর্ঘ উপন্যাসটির শুরুতে দেওয়া আছে একটি সুনির্দিষ্ট তারিখ। ১৭ই মে—১৯৫৩। কাহিনি শুরু হচ্ছে এই তারিখে। কলকাতার জাহাজঘাটে। জাহাজি ট্রেনিং নেওয়ার পর

সোনা নামের একটি তেরো-চোদ্দ বছরের তরুণ রোজ শিপিং অফিসে আসছে-যাচ্ছে। মাসতার দিচ্ছে। কিন্তু কোনও জাহাজ পাচ্ছে না। তার বয়স আর মায়াবী নরম চেহারার জন্যই জাহাজ ধরতে পারছে না। জাহাজে কঠিন কদর্য শক্ত মুখ চোখ না হলে সমুদ্রের সঙ্গে যোঝা কঠিন। এভাবেই সোনার সঙ্গে আলাপ হয় একজন সারেঙের। সেও জাহাজের অপেক্ষায়। বুড়ো মানুষটা তাকে কাছে বসায়। কথা বলে। তার কথা মতোই সোনা 'এস-এস সিউল ব্যাংক' নামের একটি জাহাজে মাসতার দেয়। সেখানে অবাক বিস্ময়ে দেখে এতবড় জাহাজে ক্রুদের নেওয়া হবে তবু ভিড় নেই। যতজন লোক দরকার তার সিকি ভাগ লোকও নেই। সেখানেই সে কোলবয়ের কাজ পেয়ে যায়। ভেসে যায় জলে। কাহিনিও উপন্যাসের শুরুতেই ডাঙা ছেড়ে পাড়ি দেয় সমুদ্রে। সমাজ সংসার থেকে, মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন একেবারে ভিন্ন এক জগতে।

কেবল নীল আকাশ, নীল সমুদ্র, পাহাড় আর মাঝে মাঝে সমুদ্রপাখিদের ওড়াওড়ি। রাতের জোৎস্নায় নীল আকাশ, সবুজ নক্ষত্র এবং সমুদ্র থেকে ঠাণ্ডা বাতাস। একনাগাড়ে ডেকে বসে থাকলে মনে হয় কেমন এক গোলাকৃতি নীল বিরাট একটা টানেলের ভিতর দিয়ে জাহাজটা নিশিদিন ছুটে যাচ্ছে। যেন অতিকায় স্পেস রকেট। কোনও বৈচিত্র্য নেই। যখন ঝড় সাইক্লোন দেখা দেয়, তখন বোধহয় বৈচিত্র্য আসে। সব মানুষগুলোকে একেবারে পাগলা করে দেয়। অথবা কুয়াশার ভিতর ঢুকে গেলে বা কোনও হিমশৈল।

মাঝে মাঝে কোনও বন্দরে জাহাজ থামে। রসদ ওঠে। জল নেওয়া হয়। মাল লোড-আনলোড হয়। একটু মাটি দেখতে পাওয়া যায়। জাহাজিদের কাছে তা বড় আনন্দের। বন্দরের কাছাকাছি এলে সকলেই কিনারা দেখার চেষ্টা করে। *"কিনারা দেখার ব্যাপারটা জাহাজিদের কাছে আশ্চর্য অভিজ্ঞতার মতো। যেন জল শুধু জল দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল, পৃথিবীর কোথাও ডাঙ্গা আছে ভাবাই যায় না। সমুদ্রে জাহাজ চললে, নিশিদিন জাহাজ চলতে থাকলে ভাবাই যায় না, মানুষেরা ডাঙ্গায় থাকে। কোথাও মানুষ, গাছপালা, পাখি এবং মাটি আছে বিশ্বাসই করা যায় না। কিনারার নামে নতুন ডাঙ্গা দেখার জন্য সবাই পাগলের মতো ওপরে ছুটছে। যে-যার কাজ ফেলে এখন ওপরে উঠে যাচ্ছে।"* মানুষে কাছে ডাঙা যে কত বড়, একজন নাবিকের চোখে দেখলে তা টের পাওয়া যায়।

বন্দর ছেড়ে আবার জাহাজ সমুদ্রগামী হলে ডেকের উপর ভিড় করে জাহাজিরা। বন্দর এলাকায় জাহাজটা পথ করে ক্রমে সমুদ্রে, গভীর সমুদ্রে নেমে গেলে মনে হয় এক রহস্যময় বন্দর ফেলে ওরা চলে যাচ্ছে। যত বাড়িঘর এবং জাহাজের মাস্তুল দূরবর্তী হয়ে যায় তত এই জাহাজিদের আপ্রাণ চুপচাপ ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা।

আসলে এই হচ্ছে জাহাজ, জাহাজের মানুষ। তারা নিরন্তর বন্দর ফেলে চলে যায়। এক বন্দর ফেলে গেলেই প্রত্যাশা আবার কবে বন্দর পাবে। এই বুঝি নিয়ম জাহাজি মানুষের। যা চলে যায়, তার জন্য মায়াও শেষ হয়ে যায়। আবার নতুন মায়া গড়ে ওঠে এবং স্বপ্ন। বন্দর এলে কীভাবে যে তাদের দিনগুলি কেটে যায়।

জাহাজে থাকলে এভাবে এক বিচিত্র জীবন গড়ে ওঠে। কিনারার প্রতি টান, পরিবারের জন্য মায়া, তারপর দীর্ঘদিন বাদে ডেবিডের যেমন মনে হয়, সে একজন নিরালম্ব মানুষ, সে আছে এই জাহাজেই। জাহাজেই তার জন্ম জাহাজেই তার শৈশব, যৌবন এবং বার্ধক্য। এবং এভাবে সে মরে যাবে। তখন মনে হয় না, তার স্ত্রী আছে, ছেলেপুলে আছে, কেবল মনে হয়, সে একটা যানে চড়ে ক্রমান্বয়ে সমুদ্র, দ্বীপ এবং পাহাড় অতিক্রম করে পৃথিবীর সব মানুষের ঘরে ঘরে পণ্য পৌঁছে দিচ্ছে। *"সাংসারিক জীবন স্ত্রী-পুত্র অনেক দূরে মনে হয় তখন। বন্দরে নেমে তখন একটু বেলাল্লাপনা করতে না পারলে ভাল লাগে না। পুরনো ছবির মতো মেয়েমানুষের শরীর একটা যাদুঘর হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে ঠাণ্ডা, অতি ঠাণ্ডা কোমরের নিচু অংশটা। কেন যে সেখানে ফুল ফোটার মতো উত্তাপ থাকে না।"*

মানুষের জন্য যা যা দরকার সব আছে জাহাজে। শুধু আসল জিনিসটা নেই। ওম্যান। ওয়াচের সময় দূরবীনে চোখ রেখে কিনারার ওম্যান খোঁজার চেষ্টা করে কেউ কেউ। লুকিয়ে ডাঙায় মেয়ে দেখার ইচ্ছে হয়। কেউ জাহাজে বীভৎস সব ছবি জোগাড় করে দেখে। উলঙ্গ-নগ্ন নারীদের ছবির ভিতর ডুবে থাকে। বন্দরের সেকেন্ডহ্যান্ড মার্কেট থেকে কেনা কোনও মেমসাহেবের স্লিপিং গাউন পরে অনিমেষ মজুমদার মেহফিল বসায়। নেচে নেচে ঘুরে বেড়ায়। তখন কেউ তাকে জড়িয়ে ধরে কামড়ে দিতে চায়। কেউ হাত ধরে চুমু খায় এবং বিনিময়ে পয়সা দেয়।

আর বন্দরে এলে নেমে গিয়ে মেয়ে ধরে। দেদার পয়সা ওড়ায়। কার্নিভালে যায়। মৈত্র যেমন কার্নিভাল থেকে একটা মেয়ের সঙ্গে তার বাড়িতে যায়। তার খারাপ অসুখ জেনেও তার সঙ্গে রাত কাটায়। পরদিন বিদায়বেলায় মেয়েটি বারবার করে বলেছিল ডাক্তার দেখিয়ে নিতে। মৈত্র তা করেনি। অনেক পরে দেখিয়েছিল। সুস্থ হয়নি অবশ্য। দেশে তার স্ত্রী শেফালী আছে। বড় ভালোবাসে সে স্ত্রীকে। প্রতিটি বন্দরে এসে প্রতীক্ষায় থাকে তার চিঠির। বারবার করে পড়ে স্ত্রীর চিঠি। পড়তে পড়তে শেফালীর গন্ধ পায় সে। অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী টাকা পাঠাতে বলে বারবার। মৈত্র চেষ্টাও করে পাঠানোর। কিন্তু বন্দরে নেমে টাকা পাঠানোর থেকে জরুরি হয়ে পড়ে কার্নিভালে যাওয়া। মদ-মেয়েছেলেতে টাকা ওড়ানো। মাতাল হয়ে সবাই সব ব্যর্থতা ভুলে জাহাজে উঠে যায়। জাহাজের একঘেয়েমি কতটা তীব্র বোঝা যায় এর

থেকে। বুয়েনস্ আয়ার্স থেকে টাকা পাঠাতেই ভুলে যায়। এভাবে জলের জীবনের সঙ্গে একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হয় স্থলের জীবনের।

পানামা ক্যানেলে ভেবেছিল শেফালীর চিঠি পাবে। আসেনি। নিউ অরলিনসে আসেনি। ভিকটোরিয়া বন্দরেও না। ছোট্ট বন্দর নিউ-প্লিমাউথ-এ অনেকদিন পর মৈত্র চিঠি পায়। চিঠিটা পেয়েই লাফিয়ে উঠল সে। চুমো খেল। ছেলেমানুষের মতো সে কী করবে ভেবে পেল না। পড়তে গিয়ে দেখে শেফালীর হাতের অক্ষর জ্বলজ্বল করছে না। দ্রুত পড়ে নেয়। পিসিমার চিঠি। মাস দুই আগে শেফালী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছে। সন্তান নিয়ে বহু স্বপ্ন ছিল তার। আনন্দিত হওয়ার কথা। কিন্তু এই খবরে সে হতবাক হয়ে যায়। কোথায় যেন একাটা গন্ডগোলের ছবি চিঠিতে। সে হিসেব মেলাতে পারে না। লেখক ছোট্ট একটি মন্তব্য করেন— "জাহাজিদের ভাগ্যে এমন ঘটনা নতুন নয়।" এই একটি বাক্যে যা বলার বলে দেন লেখক। এভাবে সমাজ-সংসারের সঙ্গে জাহাজিদের আশ্চর্য একটা সংঘাত চলে প্রতি মুহূর্তে।

বোকার মতো বারবার কড় গুণে চলে। নিজের হিসাবের ভুল ধরার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। সে সময় তো সে বাড়ি ছিল না। না তখন সে সমুদ্রে। শেফালীর একা একা ভালো লাগছিল না বলে বিমলবাবুর সঙ্গে চুপি চুপি দেখা করেছিল। পা টলে তার। মনে হয় পাগলই হয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত পাগলই হয়ে যায় সে। সমুদ্রেই আত্মবিসর্জন করে মৈত্র। তার শেষকৃত্যের প্রসঙ্গও এসেছে। জাহাজে যে কজন ভারতীয় হিন্দু ছিল তারা চেয়েছিল দাহ করতে। কাপ্তান বন্দর শহরের মেয়রের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। রাজি হয়নি সে। তারপর দূরের কোনও দ্বীপে দাহ করার অনুমতি মেলে। ভারী বীভৎস সেই দৃশ্য দূরে দাঁড়িয়ে দেখেন কাপ্তান, ডেবিড। মানুষের শরীর আগুনে পুড়ে যায়—জীবনেও ওঁরা দেখেনি। সমুদ্রের পাড়ে পাড়ে ভিড় করে সামোয়ান নর-নারীরা। অতি উৎসাহী অনেকে বোট ভাড়া করে দেখতে আসে মানুষ পোড়ানোর দৃশ্য। জ্যোৎস্নায় ছায়া ছায়া সব মানুষের মিছিল। দ্বীপবাসীর কাছে বড় খবর এটা—*"যেন দিন কাল মাস কেটে যাবে, বছরের পর বছর কেটে যাবে, তবু খবরটা ওরা বয়ে বেড়াবে আজীবন। বাংলাদেশের নাবিক বসন্তনিবাস এখানে সমুদ্রে ডুবে মরেছিল। ঐ যে দেখছ পাহাড়টা, সমুদ্র থেকে খাড়া উঠে গেছে, ঠিক আকাশের নীচে, তার মাথায় সারারাত আগুনটা জ্বলেছিল। একজন মানুষের শরীর প্রায় সারারাত পাহাড়ের মাথায় জ্বলেছিল—বড় দুঃসাহসিক ঘটনা।"*

আমরা আমাদের চারপাশটাকেই মনে করি জগৎ সংসার। ভারতীয় হিন্দুদের ধারণা মৃত্যুর পরে দাহ করাটাই পৃথিবীর বহু দেশে প্রচলিত। তা যে একেবারেই

নয়, লেখক বেশি কিছু না বলেও বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমাদের কাছে যেটা স্বাভাবিক সহনীয়, বিশ্বের বহু মানুষ তার মধ্যে নৃশংসতা দেখতে পায়। সিউল ব্যাংক জলে জলে পৃথিবী সফর করেছে। কলম্বো বন্দর, লরেঞ্জু-মরকুইস, ডারবান, সেন্টিস, মন্টিভিডিও, সিঙ্গাপুর, জাভা, সুমাত্রা, দক্ষিণ আমেরিকার পাহাড়ি উপকূল, ভিকটোরিয়া পোর্ট, উইন্ডওয়ার্ড দ্বীপ, ইউকাটন প্রণালী, পোর্ট অফ জ্যামাইকা, ম্যাকসিকো উপসাগর, নিউ-প্লাইমাউথ, তাহিতি-নু, তাহিতি-ইতি...। একটু একটু করে এসেছে বন্দর শহর, ছোট ছোট দ্বীপগুলোর কথা। সেখানকার মানুষজনদের কথা। তাদের সংস্কার-বিশ্বাস ইত্যাদির কথা সেভাবে আসেনি ঠিকই, কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির স্পর্শে জাহাজে নতুন একটি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। জাহাজ-জীবন তার মতো করে সংস্কার-বিশ্বাস তৈরি করে নিয়েছে।

জাহাজিদের অনেক সংস্কার-বিশ্বাস এসেছে এই আখ্যানে। সেই বিশ্বাস-সংস্কারও লেখকের অভিজ্ঞতাজাত। উপন্যাসে আছে অ্যালবাট্রস পাখির কথা। একজোড়া অ্যালবাট্রস জাহাজের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে। তাকে কেন্দ্র করে জাহাজিদের ভয়। জাহাজের একজোড়া চড়াই পাখির একটাকে খেয়ে ফেলে অ্যালবাট্রস। তারপর সেই পাখিটাকে গুলি করে মেরে দেওয়া হয়। একটি সাক্ষাৎকারে লেখক তাঁর জাহাজবাসের সময়কার এরকম অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন—*"জাহাজে খাবার খাওয়ার জন্য অ্যালবাট্রস পাখিগুলো আসত। তারা চড়াই পাখিটাকে খেয়ে ফেলেছিল। সেই চড়াই ছিল সকলের প্রিয়। তাই অ্যালবাট্রসকে মেরে ফেলেছিলাম। গল্পের প্রয়োজনেই মৃত্যু। আর বাকিটা জাহাজিদের সংস্কারকে কিছুটা হলেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।" ('এবং মুশায়েরা', বৈশাখ-আষাঢ়, ১৪২০)*

পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে যেমন সম্পৃক্ত হয়ে থাকে জাহাজিদের বিশ্বাস-সংস্কার, তেমনি আনন্দ-বিষাদ-বিনোদন, সমগ্র যাপনচর্চা নিরন্তর চলতে থাকে জাহাজ। জাহাজিদের তখন মনে হয় আর কখনও বন্দর পাবে না। যেন নিরবধিকাল এভাবেই চলবে। এর চলার শেষ নেই। নিরন্তর কাজ করে চলতে হয় জাহাজের ভিতরের মানুষদের। তারা যেন জাহাজের কলকব্জা। আদিগন্ত জলে থাকতে থাকতে অদ্ভুত ইলিউশন তৈরি হয়। অলৌকিক বিভ্রমে পড়তে হয় কম বেশি সকল জাহাজিদের। সেই বিভ্রম কখনও কখনও সামগ্রিকভাবেও দেখা যায়। একই রকম অলৌকিক দৃশ্যের সম্মুখীন হয় একই সঙ্গে সকল জাহাজি। একই রকম বিভ্রম, একই রকম আতঙ্ক সকলকে একইভাবে তাড়িত করে। এটাই সমুদ্রের জীবন। কখনও-বা সমুদ্রের ছলনার শিকার হতে হয় সামগ্রিকভাবে। ডাঙায় থেকে এই রহস্যের কিনারা করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। একদিন রাতে দেখা গেল— সমুদ্রে যেন মশাল জ্বলছে সব। ডেক-জাহাজি এলার্মিং বেল বাজিয়ে যায়। সিউল ব্যাংকের সকলে স্তম্ভিত হয়ে দেখে—*"আগুন, চারপাশে আগুন। দূরের জাহাজ থেকে সব আগুনের গোলা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ছে জলে। আর পড়েই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে. বিন্দু বিন্দু হয়ে যাচ্ছে, তারপর আরও ছোট, আকাশের নীচে অজস্র সোনার পদ্ম সমুদ্রে ফুটে উঠেছে। ...সবার চোখেই ভীষণ ত্রাস। সবাই ব্যাপারটা রেলিং-এ ঝুঁকে বোঝার চেষ্টা করছে।"*

তেলের জাহাজে আগুন লাগলে এমন হয়। সমুদ্রে তেল যত ছড়িয়ে যায়, আগুন তত ছড়িয়ে যায়। ঢেউ এসে সেগুলো আরও ভেঙে দেয়। আগুন ক্রমশ বিন্দুবৎ হতে হতে কখন আগুনের ফুলকি হয়ে যায়। এগিয়ে দেখা গেল জাহাজটার পিছনে আগুন। পিছনে লোক-লস্কর আবছা দেখা যাচ্ছে। কাপ্তেনের নির্দেশে দুটো বোট গেল দগ্ধ জাহাজের জাহাজিদের উদ্ধার করতে। তারপর দেখা গেল আগুনলাগা জাহাজটাকে কিছুতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কাপ্তান বুঝতে পারলেন না জাহাজের আগুন ক্রমশ সিউল ব্যাঙ্ক থেকে দূরে সরে যাচ্ছে কেন। রাত দুটো বাজে তখন। ট্রান্সমিটারে ভৌতিক শব্দ।

পরে পুড়ে যাওয়া জাহাজকে খুঁজে না পেয়ে ফিরে আসে বোট। রেডিও-অফিসার যোগাযোগ করতে পারে এরিয়া স্টেশনের সঙ্গে। কাপ্তান হিগিনস বিরক্ত গলায় বলেন—দুপুর রাতে জাহাজডুবি হল কোনও খবর রাখো! খবর শুনে তারা জানায়—মাঝে মাঝে জাহাজিরা এমন দেখেই থাকে। বছর দুই আগে একটা আমেরিকান অয়েল-ট্যাঙ্কার ডুবেছিল। কী করে আগুন লেগে যায়। একটা দিক বিস্ফোরণে উড়েই গেছিল। আর একটা দিক ডুবে গেছিল। কাউকে রক্ষা করা যায়নি। কেউ যেতে পারে পারেনি কাছে। চারপাশে আগুন। সারারাত সমুদ্রে সব আগুনের ফুলকি ভেসেছিল।

জাহাজিদের এরকম সব অলৌকিক কাণ্ডকারখানা প্রত্যক্ষ করতে হয় নিরন্তর। প্রতিটি মুহূর্তে লড়াই করতে হয়। শুধু অলৌকিকতার সঙ্গে বা বিভ্রমের সঙ্গে লড়াই নয়, লড়তে হয় কত কত প্রকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে। নিরিবিলি সমুদ্রে হঠাৎ করে চলে আসে অতিকায় ব্রেকার। ঐ সময় ডেকে থাকলে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কিছুই করার থাকবে না আর। জাহাজ অনেকটা উপরে উঠে যায়। জাহাজের উপর দিয়ে জল চলে তখন। সহসা জলোচ্ছ্বাস অবশ্য বেশিক্ষণ থাকে না। কিছুক্ষণ পর সমুদ্র শান্ত হয়ে যায়। "যেন জাহাজ সমুদ্রে কিছুক্ষণ ডুবসাঁতার কেটে আবার অবিরাম ভেসে চলেছে।" কেন হয় কেউ জানে না। আগাম কোনও বেতার-সংকেতও থাকে না। রহস্যের আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে ভেসে যায় জাহাজ। একবার অজানা

এক পাখির আক্রমণের শিকার হয়েছিল জাহাজ। অতিকায় পাখির ঝাঁক উড়ে গিয়েছিল জাহাজের উপর দিয়ে। তাদের বিষাক্ত মল-মূত্র পড়ে ফোসকা উঠেছে। ওই পাখির বর্জ্যে আর্চির চেহারাটাই বদলে গেছে। কদিন যন্ত্রণায় কাতরেছে শুধু। তারপর তার মুখের আদল হয়ে গেছে পশুর মতো।

সমুদ্র সফরে রহস্যময়তা থাকে। তারই সূত্রে গড়ে ওঠে নানান মিথ, বিশ্বাস। সিউল ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে রহস্যের প্রাচীর আরও গাঢ়। জাহাজটা সম্পর্কে এত বেশি প্রচার ছিল, এত পুরনো সব খবর জাহাজিদের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছিল যে জাহাজে উঠলেই সবাই ভয়ে একটা অস্বস্তিকর পরিবেশে পড়ে যায়। বাধ্য না হলে এই জাহাজে কেউ কাজ নেয় না। এটা আর একটা পাঁচটা কার্গো-শিপের মতো নয়। একে ঘিরে আশ্চর্য সব মিথ। আসলে এটা একটা বহু পুরোনো বাতিল জাহাজ। ব্যাংক লাইন কোম্পানি, ২১, বারি স্ট্রিট, লন্ডনের একটা ভাঙা জাহাজ। এটা কোন্ আমলের জাহাজ কেউ বলতে পারে না। কেউ বলে ডেনিসদের ওটা যুদ্ধজাহাজ ছিল, কেউ বলে পালের জাহাজ, আবার কেউ বলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাহাজটা ঘায়েল হয়েছিল। মাঝদরিয়া থেকে মাঝিমাল্লারা টেনে কার্ডিফে নিয়ে যায়। চক্ পাল্টে ওটাকে ওরা কার্গো-শিপ বানিয়ে ফেলে। সব কাপ্তান পারেও না এই ভাঙা জাহাজ চালাতে।

এই জাহাজে কাপ্তান বৃদ্ধ হিগিনস্ পৃথিবী বিখ্যাত কাপ্তান। জাহাজটা বড় প্রিয় তাঁর। এই জাহাজের মধ্যেই তিনি বেড়ে উঠেছেন। কৈশোর-যৌবন-প্রৌঢ় থেকে এখন বৃদ্ধ তিনি। তাঁর আত্মার আত্মীয় এই জাহাজ। সিউল ব্যাংক-কে কেউ ভাঙা বললে বড় কষ্ট হয় তাঁর। তাঁর ভাবনায় সিউল ব্যাংকও জীবন্ত। কলকব্জার জড় পদার্থ নয়। জাহাজে উঠেই ব্রীজে দুবার পায়চারি করেন। দুবার পায়চারি করলে সমস্ত জাহাজটা চোখের সামনে কেমন আশ্চর্য জ্যান্ত হয়ে যায়। জাহাজটা আর জাহাজ থাকে না। তিনি চিৎকার করে বলেন— "হেই, হেই ডার্লিঙ এসে গেছি।" এই জাহাজের প্রতি সমুদ্রের প্রতি ভারি আশ্চর্য একটা টান আছে তাঁর। এটাই তাঁর সংসার। একমাত্র মেয়ে বনিকে জ্যাক সাজিয়ে এই জাহাজেই রেখেছেন। পৃথিবীর যাবতীয় দেশ, সমুদ্রের দ্বীপ, গাছপালা, ঝড়, টাইফুন, তিমি মাছ, ডলফিনের ঝাঁক অথবা সিন্ধুঘোটক দেখে বেড়িয়েছেন জাহাজ নিয়ে।

এবার তাঁর শেষ সমুদ্রযাত্রা। তাঁর ইচ্ছা সব সফরে মতো যত ঝড় সাইক্লোন, খারাপ ওয়েদার থাকুক, চোরা হিমবাহ থাকুক, গোপনে সমুদ্রের নীচে পাহাড় থাকুক, তার ডার্লিংকে সমুদ্র পার করে দেবেন। তবু কেমন এক অজানার আশংকা। ঈশ্বরভক্ত এই মানুষটির কেবিনের দেওয়ালে একটা খ্রিস্টের ছবি যতবার টাঙানোর

চেষ্টা করছেন ততবারই তা বেঁকে যাচ্ছে। সোজা থাকছে না। সমগ্র সফরে যখন একটার পর একটা দুর্ঘটনা ঘটে, অলৌকিক ঘটনা ঘটে তখন তাঁর মনে হয় কোনও অশুভ ছায়া ভর করেছে সিউল ব্যাংকে। তাঁর তরুণী স্ত্রী এলিসের মৃত্যু হয়েছিল জাহাজেই। এলিসের আত্মা যেন ঘুরে বেড়ায় জাহাজে। তা তিনি অনুভব করেন। বনির মধ্যেও মাঝে মাঝে খুঁজে পান এলিসকে। শেষ পর্যন্ত তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন সকল অশুভ শক্তির হাত থেকে প্রিয় সিউল ব্যাংককে রক্ষা করতে। পারেন না। তাঁর এই লড়াই-সংগ্রাম এবং হাহাকারের আখ্যান উপন্যাসে চমৎকার ফুটে উঠেছে।

জাহাজ যত তাঁর প্রিয় হয়ে ওঠে, বিশ্বাসী হয়ে ওঠে, অশুভ শক্তি যেন ততই ক্ষিপ্র হয়ে ওঠে। তিনি স্মৃতি-বিস্মৃতির জটিলতায় তলিয়ে যান। হিগিনস জরুরি চিঠি লেখেন হেড অফিসে। মেন-জেনারেটার কাজ করছে না। বয়লার-চক বসে যাচ্ছে। বড় কোনও বন্দরে দু-চারমাস বসিয়ে দিয়ে মেরামত না করলে চলবে না। কিন্তু এই ভাঙা জাহাজের পিছনে কোম্পানি আর খরচ করবে না। বড় বন্দরের অনেক নিয়মকানুন। সেখানে এই জাহাজ ঢুকতে দেবে না। কোম্পানি চায় সস্তায় মাটি নিয়ে জলে জলে ঘুরে বেড়াক সিউল ব্যাংক। বছর ঘুরে গেলেও জাহাজিদের ফেরার আশা থাকে না। ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তারা। কোম্পানি জানিয়ে দেয় আরও এক বছর সমুদ্র সফর করতে হবে।

পরে কোম্পানি এই অচল জাহাজটিকে বিক্রি করে দেয়। হিগিনস সে খবরে আর্তনাদ করে ওঠেন। না চাইলেও বিক্রির কাগজপত্রে সই করতে হয় তাঁকে। জাহাজটার গিলোটিন হয়ে গেল। কিংবদন্তীর মতো যে ছিল তাঁর কাছে অজর অমর, কলমের এক খোঁচায় সে শেষ হয়ে গেল। তাঁর ইচ্ছে করে জাহাজ নিয়ে যদি পালিয়ে বেড়াতে পারতেন। নিজেকে বারবার কেবল জাহাজের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত করেন। মনে হয় জাহাজের প্রতিটি রিব রক্তমাংসের।

জাহাজিরা ঠিক করে কেউ থাকবে না এই ভূতুড়ে জাহাজে। বন্দর এলে নেমে যাবে। তার আগেই এসে গেল কঠিন সময়। দুর্যোগ মাস্তুল দড়িদড়া উড়িয়ে নিয়ে গেল। ইন্টারমিডিয়েট স্টপ ভালব ছিঁড়ে গেল। সহসা বন্ধ হয়ে গেল জেনারেটার। চারিদিকে অন্ধকার, সোরগোল। এলোপাথাড়ি ছুটছে সব। অন্ধকারে বুঝতে-দেখতে পাচ্ছে না কেউ। ফানেলের অংশ উড়ে গেল। ব্রিজ, মাংকি-আয়ল্যান্ড চার্টরুম, ট্রান্সমিটার-রুম [illegible] গেল সমুদ্রে। হুইলরুমের সব লণ্ডভণ্ড। ডাঙার সঙ্গে [illegible] ছাড়া কিছুই আর থাকল না! অনন্ত অপেক্ষা এখন!

স্টোররুমে [illegible] বার বারে আনা হত [illegible] পচে যেত। মাংস যা ছিল

তা আগুনে ঝলসে নেওয়া হল। কাপ্তান কিপটের মতো খরচ করলেন সব। কিন্তু এভাবে শুধু বিশ্বাসে ভর করে অপেক্ষা করতে চাইল না জাহাজিরা। তাদের মনে হল একজন মাথা খারাপ কাপ্তানের সঙ্গে থেকে যাওয়া ঠিক না। প্রায় সকলে বোট নিয়ে চলে গেলে জাহাজ ছেড়ে। কাপ্তানের সঙ্গে থেকে গেল মেয়ে বনি, ছোটবাবু আর বৃদ্ধ সারেঙ। *"জাহাজ তেমনি সমুদ্রে ভাসমান। মাস্তুলে তেমনি জ্বলছে মশাল। ভারী নিভৃতে যেন জাহাজটা অজানা সমুদ্রে পালিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর সব সংযোগ হারিয়ে চুপচাপ নিশিদিন বেশ আছে সে—মনের সুখে সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে।"*

মুক্তি ঘটল বনিরও। এতদিন সে ছেলের পোশাকে ছিল। কাপ্তেন সারেঙকে ডেকে বলে দিলেন বনির কথা। ক-দিন পর হিগিনস বুঝতে পারলেন কোনও আশাই নেই আর। শেষ যে বোটটি ছিল সেখানে বনিকে আর ছোটবাবুকে তুলে দিলেন।

সারেঙ আর কাপ্তান। সেই অহংকার তাঁদের—*"জাহাজটাকে সমুদ্রে ফেলে ডাঙ্গায় ফিরে গেলে লোকে হাসাহাসি করবে। বুঝতে পারছ না জাহাজ না নিয়ে আমাদের বন্দরে যাবার নিয়ম নেই।"*

বনি এবং ছোটবাবু মৃত্যু এবং বিধাতাকে অস্বীকার করে পৃথিবীতে ফিরতে চাইছে যখন তখন স্যালি হিগিনস্ জাহাজে চুপচাপ শুয়ে। শেষ সম্বল যেটুকু খাবার ছিল তা পাশের টেবিলে রেখে চলে গেছে সারেঙ। সারেঙের কাছে এখন এই জাহাজ, সমুদ্র, জলোচ্ছ্বাস সব সমান। তার কাছে বিশ্বস্ত থাকার চেয়ে বড় কিছু নেই। *"জীবনের এক রহস্যময় যাত্রা থেকে অন্য এক রহস্যময় যাত্রায় তিনি আবার রওনা হলেন। গভীর বায়ুহীন অলোহীন এক জগত তাঁকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলল।"*

জাহাজে হিগিনস্ একা। জাহাজটার জন্য ভীষণ মায়া বোধ করলেন তিনি। এক অলৌকিক জলযানে তিনি সমুদ্রে ভেসে যেতে থাকলেন। রাতে পোর্ট-হোলে আকাশের নক্ষত্র দেখতে পান। চাঁদের আলো এসে পড়ে। সমুদ্র নিথর, বর্ণহীন, গন্ধহীন। সাদা বিছানায় সাদা পোশাকে লম্বা শুয়ে আছেন। শেষ খাবার আর জল টেবিলে। হাত তুলে খেতে পর্যন্ত পারছেন না। হাত-পা ক্রমে ঠান্ডা হয়ে আসছে। অসাড় চোখ। দুহাত দিয়ে সমস্ত বায়ুপ্রবাহ গিলে খেতে চাইছেন। পারছেন না।

"সিউল-ব্যাংক জাহাজ নীল আকাশের নীচে ঘুরে ঘুরে কখনও অন্ধকারে, অথবা সাদা জ্যোৎস্নায় অজানা সমুদ্রে এভাবে ভেসে যাচ্ছিল। তার প্রিয় ক্যাপ্টেন স্যালি হিগিনস ভেতরে শুয়ে আছেন। সাদা চাদরে ওঁর শরীর ঢাকা। পোর্ট-হোলে তেমনি [illegible] আলো, কখনও সমুদ্রের জল, কখনও সব নক্ষত্রমালার ছবি।

অসীম সমুদ্রে সিউল-ব্যাংক এখন একটা ভাসমান কফিনের মতো। নীল আকাশের নীচে নীল অন্ধকারে সাদা জাহাজটা এখন শুধু একজন ক্যাপ্টেনের কফিন। আর কিছু না। ক্যাপ্টেন স্যালি হিগিনস যেন ভেতরে শুয়ে আছেন। ঘুমিয়ে আছেন। ভেসে যাচ্ছেন তাঁর

প্রিয় অলৌকিক জলযানে। যেন বলছেন, গ্লোরি হ্যালে লুজা, আই অ্যাম অন মাই ওয়ে।"

এভাবে উপন্যাস শেষ হয়। কিন্তু কাহিনি বোধ হয় শেষ হয় না। তার অমোঘ রেশ থেকে যায় পাঠকের মনে। দুর্জয় প্রকৃতির কাছে ব্যক্তিমানুষের অনিবার্য পরাভবের মর্মন্তুদ আলেখ্য এই আখ্যান। হিগিনসের এই নিরুপায়ত্বের মধ্যে কোথাও যেন একটা নিয়তিবোধের স্পন্দন ধ্বনিত। সেই ধ্বনি ব্যক্তি-পাঠকের অনুভবেও জাগিয়ে দেয় অসহায়তার বোধ। তাই শেষ পর্যন্ত পাঠক-হৃদয়ে একটা মায়া থেকে যায়। অলৌকিক মায়া। স্যালি হিগিনসের জন্য মায়া। সিউল-ব্যাংকের জন্য মায়া। সমুদ্রের জন্য মায়া। মায়া থেকে যায় জাহাজিদের জন্যও।

* * * *

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে যৌনতার। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

"যৌনতার ব্যাপারটা ব্যক্তি বিশেষে আলোড়ন তৈরি করে। ব্যক্তি বিশেষে যৌনতার বিভিন্ন অর্থ আছে। যেন মানুষ খোলা মনে নিজের জন্ম, মানুষের জন্ম নিয়ে চিন্তা করে, তাহলে বুঝবে সর্বত্র একটা যৌনতা কাজ করছে। যৌনতাই এই সমাজকে সংঘবদ্ধ করে রেখেছে। যৌনতাই মানুষকে দায়িত্বশীল হতে শিখিয়েছে। তাই নয় কি? যৌনতাটা হচ্ছে অনেকটা পূজাপাঠের মতো। ঈশ্বরের আরাধনা। ঈশ্বরতুল্য বিষয়। যৌনতার আরাধনা অদ্ভুত এক রহস্যময় জগৎ। স্পর্শে, ঘ্রাণে মানুষ বুঁদ হয়ে যায়। ওখান থেকেই তো শিশুর জন্ম।

উপন্যাস লিখবে, গল্প লিখবে যৌনতা ছাড়া? যৌনতা বহির্ভূত কাহিনি হয় কি? উপন্যাসে মানুষের জীবনের আচরণগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়। একটা মানুষ জীবনে যৌনতায় যে সময় দেয় তা অন্য কোনও বিষয়ে দিতে পারে না। জীবনের মূল কনসেন্ট্রেশন তো ওখানেই। জীবনে তোমার যতদিন যৌনতা আছে ততদিন তুমি জীবিত। যৌনতা নেই মানে তোমার মৃত্যু হয়েছে। যৌনতা ছাড়া একটা মানুষ অযোগ্য হয়ে পড়ে। ফাঁকা হয়ে যায় তার শরীর। সে পাগল হয়ে যায়।

এই যে একটা মানুষ প্রতিদিন বাইরে যায় তারপর বাড়ি ফিরে আসে—কেন? নারী তাকে ধরে রেখেছে। যৌনতা আছে বলে সব আছে। যৌনতাবিহীন শিল্প, সাহিত্য হয় না। আর এ নিয়ে ন্যাকামি করাও উচিত নয়। এখনকার সমাজব্যবস্থায় একটা ছেলে বা মেয়ে সব জানে। ভালো জানে। স্কুলে পড়ানোও হয়। স্বামী-স্ত্রীর প্রেমটা তো যৌনতা থেকেই তৈরি হয়। এই প্রেম প্ল্যাটনিক যারা বলে তারা ভুল করে। আমি তো একটা গাছকে ভালোবাসতে পারি। বাগান করতে পারি। গাছের সঙ্গে মানুষের ভালোবাসার কোনও পার্থক্য নেই? গাছের সঙ্গে কি প্রেম হয়? অবশ্য বৃক্ষ-প্রেমিকরা তো আছেন। প্রেম-ভালোবাসা কথাটা এসেছে নারী-পুরুষের যৌনতা থেকেই। এটা আমাদের অ্যাকসেপ্ট করতে হবে... আমার সব উপন্যাসেই যৌনতা আছে। প্রয়োজনের তাগিদেই আছে। না থাকলে চরিত্রগুলো দাঁড় করানো যায় না। তাহলে তো প্রাণহীন চরিত্র হবে। প্রাণ স্থানেই তো যৌনতা—তাহলে একে অকারণ দোষ

দিয়ে লাভ কী? তবে দেখতে হবে কোনটা অশ্লীল। যৌনতার যে বর্ণনা সেটা যদি পরিশীলিত না হয় তবে সেটা অশ্লীল। ঠিকমতো গদ্যে যদি ওই বর্ণনা না লিখতে পার তুমি তোমার সাহিত্যকে নোংরা করে ফেললে। আসলে লেখকের গদ্যের জোরটা কত সেটাই দেখার।

শব্দচয়ন অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বাক্যের গঠন এমন শব্দের মাধ্যমে করতে হবে যাতে যৌন বর্ণনা উজ্জীবিত হয়। তা সাহিত্যকে খাটো করে না। অশ্লীল হচ্ছে দুর্বল গদ্য যা যৌনতার বর্ণনাকে রসালো করে।" ('আমার সময়', ডিসেম্বর ২০০৯)

মনে রাখতে হবে তিনি একে ঈশ্বর আরাধনার মর্যাদার দিয়েছেন। বর্ণনাভঙ্গি এবং শব্দ চয়নকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। আর এখান থেকেই আলাদা করতে চেয়েছেন শ্লীল অশ্লীলের বিষয়টি। লেখক যৌনতা সম্পর্কে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি বলেছেন এখানে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই 'অলৌকিক জলযান'-এও যৌনতা এসেছে। জ্যাককে কেন্দ্র করে যৌনতার অনেকগুলি স্তর উন্মোচিত হয়েছে।

উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র কাপ্তেনের দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান বনি—জ্যাক। আদতে সে মেয়ে হলেও তাকে ছেলে সাজিয়ে জ্যাক বানিয়ে রাখা হয়েছে। এর আগের সফরেও সে সঙ্গে ছিল। কাপ্তেনের ভাই চিফ-অফিসার ছাড়া তার আসল পরিচয় জাহাজের কেউ জানে না। জ্যাক সম্পর্কে একটা কৃত্রিম ভয় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে জাহাজে। সে আপন মনে থাকে। চিফ-অফিসার সবাইকে জ্যাক সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছে। এরই মধ্যে জাহাজে তার বয়সী একজন ছেলে সোনা—ছোটবাবু এসেছে। সবার থেকে আলাদা এই ছোটবাবু। জ্যাকের বড় ভালো লাগে তাকে। কম বয়সী এই নাবিকটির সঙ্গে জ্যাকের ভারী বন্ধুত্ব হয়ে যায়। নিজেকে উজাড় করে দিতে চায় সে ছোটবাবুর কাছে। সে ছেলে নয় মেয়ে, বনি তা জানাতে চায়। কিন্তু পারে না। সারাদিন জাহাজে পুরুষ সেজে থাকতে তার খারাপ লাগে। শরীরে তার ভালোবাসার আধারগুলো ক্রমে পুষ্ট হচ্ছে।

জাহাজে দুটো চড়ুই পাখি ছিল। ছোটবাবু তাদের জন্য কাঠ দিয়ে বাসা বানিয়ে দিয়েছিল। জ্যাকও মেতে ছিল পাখিদুটোকে নিয়ে। কিন্তু জাহাজের একমাত্র ওম্যান—মেয়ে পাখিটাকে জাহাজ ছাড়া করতে চায় সে। ছোটবাবুর সঙ্গে মেয়ে পাখিটার সম্পর্কও সে মেনে নিয়ে পারে না।

একদিন সেকেন্ডের সঙ্গে ছোটবাবুকে মদ খেতে হয়। ডেকের উপর বেহুঁশ হয়ে পড়ে। জ্যাক দেখতে পেয়ে দাঁড় করায় তাকে। সিঁড়ি দিয়ে সন্তর্পণে নামানোর সময় কেমন হড়কে গিয়ে ছোটবাবু জ্যাককে পুরোপুরি জড়িয়ে ধরে।

"জ্যাক চোখ বুজে রয়েছে। জ্যাকও ছোটবাবুর কাঁধে মুখ লুকিয়ে একেবারে একটা লতার মতো জড়িয়ে থাকতে চাইল। ...এই নীল এবং চুল বড় মহিমাময়। আশ্চর্য ঘ্রাণের

মতো এক সৌরভময় জগতে সে আছে। সে যেন এক সুন্দর পৃথিবীর বাসিন্দা হয়ে যায় তখন। কেউ জানে না, এই যে যুবক অথবা কাজ করে ছোটবাবুর ঋজু চেহারা, আর শরীরে কি উজ্জ্বল রঙ আর ঘাসের মতো নরম বাহুর ভেতরে হারিয়ে যাবার কি যে আশ্চর্য প্রলোভন। কেউ বুঝতে পারে না। জ্যাক যেন নিরবধিকাল এভাবে জড়িয়ে থাকবে ছোটবাবুর শরীরে। সে বারবার মিশে যেতে চাইছে অথবা ছোটবাবুর শরীরে সে হাত দিয়ে দেখার এমন সুযোগ আর পাবে কিনা জানে না। যেন জ্যাক এক পাথরের মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে আছে। অকারণ চারপাশে ওর নরম আঙুলগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে শরীর এবং কি ভেবে হাঁটু গেড়ে বসে ওর দুপায়ের ফাঁকে মুখ রেখে ফিস ফিস করে বলছে, ছোটবাবু আমি মেয়ে। তুমি বিশ্বাস কর আমি মেয়ে। ...একেবারে হুঁস নেই ছোটবাবুর। চুরি করে সে ছোটবাবুর ঠোঁটে চুমো খেয়েছে। ছোটবাবুর গালে গাল লাগিয়ে রাখছে।"

গভীর রাতে ডগ-ওয়াচের ঘন্টায় ওর ঘুম ভেঙে যায়, তখন খুব দামি দামি স্কার্ট এবং সুন্দর সব গাউন পরে নিভৃতে বসে থাকে। আয়নায় প্রতিবিম্ব ভাসে। ছোটবাবু যে কি বোকা। কিছুতেই বোঝে না সে মেয়ে। মেয়ের পোশাকে যায় ছোটবাবুর কাছে। সাধারণত কার্গো জাহাজে মেয়ে দেখা ভূত দেখার সামিল। সে বলে, "তুমিও! মজুমদারের মতো মেয়ে সেজে মজা করছ জ্যাক। ঠিক না। ...তুমিও মজুমদারের মতো দেখছি ঠিক ফলস্ পরে... দ্যাটস ভেরি আগলি।" আর্তনাদ করে ওঠে বনি। অপমানে লজ্জায় কান্নায় ভেঙে পড়ে। তার নারীত্ব বারবার অপমানিত হয় ছোটবাবুর কাছে।

অপমানিত হয়ে জ্যাক ছোটবাবুকে নানা ভাবে বিরক্ত করে। নিজেকেও নানাভাবে ক্ষতবিক্ষত করে। সে ভাবে নিজের পোশাকে নাভিমূল পর্যন্ত ছিঁড়ে দেখাবে ছোটবাবুকে—"এই দ্যাখো—আমি কি দ্যাখো। আমি বনি। কাপ্তানের মেয়ে বনি। বাবা আমাকে গোপনে জাহাজে ছেলে সাজিয়ে রেখেছে।" ছোটবাবুর কেবিনে এসে একদিন সে নিজেকে উজাড় করে দেয়। কিন্তু ছোটর চোখে তখন বিভ্রম। চোখে মুখে হতাশা। আশ্চর্য মায়া মনে হয় তার।

জাহাজে উঠে কেমন সমকামিতায় পেয়ে বসে। সব পুরুষের শরীরে তখন মেয়ে মেয়ে গন্ধ—জ্যাক তো অসামান্য সুন্দর। নীলাভ বড় চুল, ঢোলা কিছুটা বেল-বটসের মতো পোশাক। সহজেই মেয়ে ভাবতে ভালো লাগে। দুর্বলতা এভাবে উঁকি মারবে স্বাভাবিক। ছোটর এমনটাই মনে হত প্রথম। ছোটর মনে হয় এই ছেলেটাকে দেখতে বেশ মেয়েলি মেয়েলি। তার শরীরের ঘ্রাণ সবার থেকে আলাদা। জ্যাকের পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে তার মাঝে মাঝে ভালো লাগে।

তাই জ্যাকের প্রতি একটা টান অনুভব করলেও তাকে মেয়ে ভাবতে পারেনি। তার নিজের অজান্তে সে যে প্রতিনিয়ত একটি কিশোরী মেয়েকে অপমান করছে তাও

বুঝতে পারেনি। একমাত্র আর্চি বুঝতে পেরেছিল জ্যাক আসলে মেয়ে। বনিকে আর্চির অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচিয়েছে ছোট। এমন কী ছোটর হাতে আর্চির মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এই আখ্যানে ছোট-বনি দুটো কিশোর-কিশোরীর প্রেম সম্পর্ক—যৌন সম্পর্ক চমৎকারভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। যৌন-অনুষঙ্গের বর্ণনায় অতি পরিশীলিত রুচিবোধের পরিচয় দিয়েছেন লেখক। বিকৃতিহীন সমাজ অ-অনুমোদিত যৌনতার এহেন শিল্পিত প্রকাশ সমসাময়িক লেখকদের লেখায় বড় দুর্লভ।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে এই জ্যাককে নিয়ে লেখা অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্প 'প্রগাঢ় উদ্ভাস'-এর কথা। সরাসরি লেখকের জবানীতে গল্পটি লেখা হয়েছে। জ্যাকের শরীর-প্রেম-যৌনতা অন্য ভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে এখানে।

সামান্য কোলবয়কে বড় ভালোবাসত নাবিকের ছেলে জ্যাক। দীর্ঘদিন জাহাজে থাকতে থাকতে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেছিল লেখকের। বাংকারের অন্ধকারে কর্মরত লেখকের কাছে চলে আসত সে। তাকিয়ে বলত— "শাবাশ—হাত পায়ের দৃঢ়তা দেখত, হাতের মাংসপেশী টিপে দেখত জ্যাক—তারপর আমার শরীরে কিংবা বুকে মুখ রেখে হৃৎস্পন্দন শুনতে ভালোবাসত।" কাজে জোর করে সাহায্য করতে তাঁকে। নিজের টিফিনের আপেল কলা দিয়ে যেত।

জ্যাক পুরু কাপড়ের ঢোলা জামা-প্যান্ট পরত। সমুদ্রের উষ্ণ অঞ্চলেও সে তার বেঢপ জামাপ্যান্টের অন্তরালে থাকতে পছন্দ করত। তাকে কখনও খালি গায়ে বোট ডেকে ওঠা-নামা করতে দেখা যায়নি। নিজেকে লুকিয়ে রাখতে সদা ব্যস্ত ছিল। জ্যাক কেবিনে এসে গান গাইত। লেখকের মনে হত জ্যাক আসলে বনি। পুরুষ নয়, নারী। সেই তরুণ বয়সে কোনও নারীর ঘ্রাণ তাঁর চেনা ছিল না। জ্যাক সমুদ্রের জল থেকে উঠে এলে ভেজা পোশাক লেপ্টে থাকে তার গায়ে। সেখানে "প্রস্ফুটিত স্তনের স্পষ্ট আভাস" পান লেখক। তাঁর তখন মতিচ্ছন্ন অবস্থা। পরে লেখকের মনে হয়েছে, "চোখের ভুল। নারীর কামনা-বাসনায় আমি জড়িত হয়ে আছি, একজন সুন্দর সুষমামণ্ডিত বালকের মুখ শরীর নারীর রূপ পরিগ্রহ করতেই পারে।" গল্পে এক জায়গায় সমুদ্রের বর্ণনায় লেখকরে বক্তব্য—

"আসল কথা সমুদ্র একদিকে যেমন অপার রহস্য এবং অপ্রতিরোধ্য মোহের উৎসস্থল অথবা এই গ্রহের যোনিদেশ এবং জরায়ুর গভীরতর অন্ধকার নিয়ে বিদ্যমান, তেমনি অন্যদিকে নির্মম অতিপুরুষ যিনি প্রগাঢ় বীর্যে এবং প্রচণ্ড কামনায় সমুদ্রগামী জাহজগুলিকে (যা সব সময়ই স্ত্রীলিঙ্গ) মন্থন করেন। এই ক্ষুরধার মন্থন ক্রিয়া জাহাজিদের উন্মুখ করে রাখে প্রগাঢ় বীর্যে এবং নারী যেন তার অদৃশ্য করতলে—অতিমাত্রায় কামুক পুরুষের বীর্য ধারণ করে রাখার প্রলোভনে মত্ত হয়ে ওঠে—যা জাহাজি মানুষের নির্দিষ্ট নিয়তি।"

জ্যাককে মেয়ে ভেবে তার শরীরী-সংস্পর্শে লেখকের যে মগ্নতা, যৌনতা, প্রগাঢ় উদ্ভাস এসবের কেন্দ্রে সেই নিয়তি। এই নিয়তির শিকার হতে হয় জাহাজ-প্রবাসীদের। উপন্যাসে অবশ্যি নিয়তির কথা সরাসরি বলেননি। কিন্তু যেভাবে ছোট প্রথম থেকে জ্যাককে দেখেছে তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ যেন গল্পের এই অংশে বিধৃত। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে জিজ্ঞেস করা হয়েছে এই ঘটনার কথা। বাস্তব বনির অস্তিত্বের কথা। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

"আমাদের জাহাজে আয়ারল্যান্ড বা ওয়েলস-এর একজন ছেলে ছিল সে আমারই বয়সী। অনেক বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল। বলতে পার তার শারীরিক গঠন, কমনীয়তা, খেয়ালী মন তাকে নারী হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।" ('এবং মুশায়েরা', বৈশাখ-আষাঢ়, ১৪২০)

লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা জ্যাক চরিত্রটিকে আমরা সহজে ভুলতে পারি না।

* * * *

'অলৌকিক জলযান'-এ জাহাজিদের কথা যেমন এসেছে তেমনি জাহাজের কথাও। জাহাজের ভিতর এমন ভয়াবহ সব জায়গা আছে দীর্ঘদিন থেকেও অনেকে জানে না। লেখক ধীরে ধীরে উন্মোচন করেছেন তাঁর দীর্ঘ জাহাজবাসের অভিজ্ঞতা। সেই উন্মোচনের ভিতর দিয়ে আবিষ্কারের ভিতর দিয়ে পাঠক্রিয়া চলে বলে দীর্ঘ আখ্যানে একঘেয়েমি থাকে না। একজন মানুষ কীভাবে সমুদ্রের ছলনায় পড়ে যায়; সারা জীবন জাহাজ চালিয়ে চালিয়ে একটা অদ্ভুত জীব হয়ে যায়; কেমন যেন কঠিন হয়ে যায়; বহু বিষয়ে সাধারণ মানবিক কৌতূহলটুকুও থাকে না; অলৌকিক জলযানে নিরুদ্দেশ পাড়ি জমায়—শেষ পর্যন্ত একজন সামাজিক মানুষ কী করে জাহাজের কলকব্জা হয়ে যায় তারই আখ্যান এই উপন্যাস। মানুষ থেকে জাহাজি হওয়ার আখ্যান। একাধারে নাবিকের ডায়েরিও। ডাঙার পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন নাবিকের ডায়েরি।

শুধু ডাঙার পৃথিবী, সমাজ সংসার থেকে যে জাহাজিরা বিচ্ছিন্ন থাকে তা নয়; জাহাজের মধ্যেও অদ্ভুত এক বিচ্ছিন্নতা। নিজের ফোকসালের লোকেদের বাইরে তেমন যোগাযোগ থাকে না। জাহাজিদের কাজেরও অনেক ভাগ। ডেক-জাহাজি, ইনজিন-জাহাজি সব আলাদা। এক দলের সঙ্গে আর এক দলের তেমন সম্পর্কই তৈরি হয় না। ডেক-জাহাজিরা কাজ করে ডেকে। এনজিন-জাহাজিদের কাজ-কারবার এনজিন-রুমে। আর কাপ্তান, বড়-মেজো মিস্ত্রী, এনজিনিয়ার, মালোম ইত্যাদিরা থাকে জাহাজের ভিন্ন মেরুতে। তাদের খাওয়া-দাওয়ার জন্য ডাইনিং হল আছে। পৃথক ব্যবস্থা সেখানে। স্যুপ-পাস্তা-রোস্ট এইসব। ভাতের ব্যবস্থা নেই। তাই ছোট ছ-নম্বর হয়ে কেবিনে যাওয়ার পরে পেট পুরে খেতে পারত না। কেউ কেউ

লুকিয়ে তার কেবিনে ভাত রেখে যেত। ফোকসাল নয়, তারা থাকে সুসজ্জিত বিলাসবহুল কেবিনে। এমন কী একই জাহাজে মাসের পর মাস থেকেও সব নাবিকদের চেনে না সাহেবরা। এই জাহাজের বড় মিস্ত্রী রিচার্ড যেমন অমিয়কে চিনতে পারেনি। তাকে বন্দর শহরের মেয়ের দালাল ভেবেছিলেন। এবং একই দালাল পৃথিবীর বিভিন্ন বন্দরে কীভাবে আসছে, এমন কী একবার তাকে জাহাজে দেখে আতংকিত হয়ে পড়ে। ভূত দেখেছে মনে হল। এমন হয় যে ভয়ে বড়-মিস্ত্রী জাহাজ ছেড়ে পালায়।

পেশা-বিত্ত-ধর্ম-বর্ণ অনুযায়ী যে ভেদাভেদ তা জাহাজেও প্রখর। লতিফ পড়ে গেলে মেজ-মিস্ত্রী তার জুতোর টো দিয়ে দেখছিল মানুষটা কেমন আছে। আবার ছোটকে যখন কাপ্তান ছ-নম্বর করে নিতে চাইলেন তখন মেজ-মিস্ত্রী আর্চি মেনে নিতে পারেনি। কারণ ছোট একজন নেটিভ। একজন ভারতীয়র জাহাজের এমন উচ্চ পদে আসা মানতে পারেনি সে। পরে নানা ভাবে ছোটকে টর্চার করেছে। অবশ্য ডেবিডের মতো সাহেব ছোটর ছ-নম্বর হওয়ার বেশ খুশি হয়েছিল।

জাহাজের মধ্যেও অনেকেই তার নিজস্ব ধর্মাচরণ করে গেছেন। যেমন সারেঙ-সাব সময় মতো খোলা আকশের নীচে হ্যাচের ওপর মাদুর বিছিয়ে নিয়মিত নামাজ পড়তেন। মৈত্রকে মৃত্যুর পরে হিন্দু মতে দাহ করা হয়েছে। জাহাজিদের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে একই মেনু। মাংস বলতে প্রধানত বিফ। সারেঙ-সাব ইচ্ছে করলেই এদের জন্য আলাদা মটনের ব্যবস্থা ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু হিন্দু পোলাদের বিফ খাওয়াবার এমন একটা সুযোগ তিনি ছাড়তে চান না। বাধ্য হয়ে অধিকাংশ হিন্দুই জাহাজে বিফ খেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

সর্ব-ধর্মের মিলন তীর্থ এই জাহাজ। ধর্ম সমন্বয়ের উদাহরণও। হিন্দু-মুসলমান-খ্রিশ্চান... ভারতীয়, বাংলাদেশি-বৃটিশ... সব—সকলকে একই সূত্রে বেঁধে ফেলতে পেরেছিল সমুদ্র। পৃথিবীর চারভাগের তিনভাগই তো এই সমুদ্র। গ্লোবালাইজেশনের অনেক আগেই সিউল ব্যাংকের মতো জাহাজ গ্লোবাল হয়ে গেছিল। বিশ্বায়নের পূর্বের বিশ্বতীর্থ বলা যেতে পারে একে।

শুধু আয়তনে বড় নয়, বিষয়ের অভিনবত্ব, গভীরতা ও ব্যাপ্তিতে 'অলৌকিক জলযান' মহাকাব্যিক ঐশ্বর্য লাভ করেছে। আসলে লেখকের জীবনটাই ঘটনাবহুল। এই উপলব্ধ ঘটনাগুলিকেই তিনি বিন্যস্ত করেছেন সাহিত্যে। তাঁর সাহিত্যিক হয়ে ওঠার উৎসেও আছে জীবন অভিজ্ঞতার প্রকাশ। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি এই সম্পর্কে বলেছিলেন—

"আমি যখন জাহাজ থেকে ফিরে এলাম তখন অনেক বন্ধুদের কাছে সেই দিনগুলো

সম্পর্কে গল্প করতাম। আমরা তখন বহরমপুরে থাকি। সেখানে থাকার সময় প্রচুর বন্ধুও জুটেছিল। একটা সাহিত্য গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। তারা কাগজ বের করত। আমাকে আমার জীবনের ঘটনা নিয়ে লিখতে বলত... তা থেকেই লেখা শুরু।" ('এবং মুশায়েরা', বৈশাখ-আষাঢ়, ১৪২০)।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসে গল্প ফাঁদেননি, কাহিনি তৈরি করেননি। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই লিখে গেছেন। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে তাঁর জাহাজবাসের যে অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন তারই সারাৎসার 'অলৌকিক জলযান'। তাই এই উপন্যাসের এত জোর। লেখকের বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান এবং তথ্যনিষ্ঠা উপন্যাসে আলাদা মাত্রা যোগ করেছে।

'অলৌকিক জলযান' শুধু একজন নাবিকের ডায়েরিতেই আটকে থাকেনি। অজানা সমুদ্রের চঞ্চলতার সঙ্গে জীবনের সকল প্রতিকূলতা, চলিষ্ণুতা, সংগ্রামমুখিতা একাকার হয়ে গেছে এই আখ্যানে। তার সঙ্গে মিশেছে সামাজিক মানুষের স্বদেশ-বিচ্ছিন্নতার বেদনাবোধ। উপন্যাসটির গদ্যভাষা-বর্ণনায় কোনও আড়ষ্টতা নেই। সাধারণভাবে অভিজ্ঞতা-নির্ভর আখ্যানে লেখকের বিশ্লেষণী মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায়। ঘটনার ব্যাখ্যাতা হিসাবে উপস্থিত হন তিনি। প্রয়োজনে বিশেষ ঘটনার সমালোচনা করেন। কিন্তু এখানে লেখক যেন নির্লিপ্ত দর্শক। সাবলীল গদ্যে নৈর্ব্যক্তিকভাবে বলে গেছেন। তারই মধ্যে উদগ্র হয়ে উঠেছে সমুদ্রসফরের উৎকণ্ঠা-টেনশান-বিষণ্ণতা-বিপন্নতা...। পাঠকের মনে এই উপন্যাসের বিভিন্ন ঘটনা, চরিত্র একেবারে গেঁথে যায়। লেখকের জীবন-উপলব্ধির সত্যতা না থাকলে শুধু অভিজ্ঞতার জোরে এমনটা হয় না। ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার সঙ্গে লেখকের জীবনবোধ দর্শন এবং আত্মোপলব্ধির মিশ্রণে উপন্যাসটি স্বতন্ত্র ও স্বমহীম হয়ে উঠেছে।

বিশ্বজিৎ পাণ্ডা

জন্ম : ১৯৭৪ সাল, গাঙ্গুরিয়া, প: মেদিনীপুর। প্রাবন্ধিক। পেশা অধ্যাপনা।

নিয়তি? নাকি...

স্বপ্না ঘোষাল

প্রায় শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা চিনি 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'-র লেখক রূপে। এই মহৎ উপন্যাসটি তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের জনপ্রিয়তাকে কেড়ে নিয়েছে। সমুদ্র ও সমুদ্রে ভাসমান জাহাজি মানুষকে নিয়ে তিনি অনেকগুলো আখ্যান রচনা করেছেন। 'সাগর জলে', 'সমুদ্রে বুনো ফুলের গন্ধ', 'সাগরে মহাসাগরে', 'অলৌকিক জলযান', 'ঈশ্বরের বাগান', 'সমুদ্রযাত্রা', 'সমুদ্র ও তার জলবায়ু' এবং আমাদের আলোচ্য মানিক স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস 'সমুদ্র মানুষ' (১৯৬০)। কর্মজীবনে একসময় নাবিক হয়ে প্রায় সারা পৃথিবী পর্যটন করার ফলে সামুদ্রিক জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে লেখকের বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা ধরা পড়েছে ওইসব রচনায়।

'সমুদ্র মানুষ' অর্থাৎ যে মানুষ সমুদ্রে বিচরণ করে, যার জীবন ও জীবিকা সমুদ্র নির্ভর। উপন্যাসটির কাহিনি-কাঠামো কী? এক কথায়, দরিয়ার টানে নাবিকের রক্তের মোচড়ে কিভাবে এক বিশেষ অঞ্চলের মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নাবিকবৃত্তি গ্রহণ করে এবং ওই বৃত্তিতে যে পাপকর্ম অবশ্যম্ভাবী সেই অনৈতিক পাপে বিদ্ধ হয়ে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়, তারই মর্মন্তুদ বিশ্লেষণ 'সমুদ্র মানুষ'। বহু বছরের ব্যবধানেও পিতা-পুত্র নিয়তির ফেরে একই ধরনের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে যেন বৃত্তিগত পাপের উত্তরাধিকারকেই স্বীকৃতি দেয়। বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের কিছু পরিবার বংশপরম্পরায় নাবিকবৃত্তি গ্রহণ করে। কখনো কখনো সাত পুরুষ ধরে তারা জলযাত্রায় যায়। উপন্যাসের নায়ক মোবারকের পিতামহের পিতামহ ১৮৫৩ সালে কলের জাহাজ তৈরি হওয়ারও আগে জাহাজি ছিলেন। এঁরা মনে করতেন তাদের মাতৃভূমি শামীনগড়ের মাটিতে নাকি নাবিক রক্তের বিষ মাখানো আছে। এখানকার আকাশে-বাতাসে সর্বত্র হাতছানি দেয় নাবিক হওয়ার ডাক। এ মাটিতে জন্মালেই নাবিক হয়ে জন্মাতে হয়। সমুদ্র তাদের টানে। এ গ্রামের শিশুদের স্বপ্ন উত্তরমেরু, দক্ষিণমেরু, লন্ডন, নিউইয়র্ক, পানামা, সুয়েজ। কিন্তু মোবারকের বাপজী চাননি তার ছেলে নাবিক হোক। তার নিজের জলজীবনে হাজারো গুনাহের যোগ ঘটেছে। বিশ্বস্ত থাকেননি বিবাহিত জীবনে, হত্যার অপরাধেও তিনি অপরাধী। মোবারক যেন ওই জীবনকে না চেনে, সে যেন চাষবাস করে সাধারণ গৃহস্থ হয়ে বাঁচে। কিন্তু বিধিলিপি খণ্ডাবে কে? একদা এক

সামুদ্রিক ঝড় মোবারকের জীবনে যে তুফান তুলেছিল, সেই ঝঞ্ঝা তাকে শামীনগড় থেকে উপড়ে জাহাজের ডেকে এনে ফেলল। কীভাবে মোবারকও এক অচ্ছেদ্য গুনাহের জালে জড়িয়ে পড়ল তারই মর্মন্তুদ কাহিনি 'সমুদ্র মানুষ।'

প্রবাদ আছে, প্রতিটি বন্দরে নাবিকদের একজন বধূ থাকে। জাহাজিদের মধ্যে প্রচলিত ঠাট্টা "No girl in the port means you are not a sailor." একঘেয়ে জলচর জীবন মাটির স্পর্শ পায় যখন, বন্দরে নেমে নারী-সান্নিধ্যের জন্য ওরা উন্মুখ হয়ে ওঠে। সারা রাত বন্দরবধূর ঘরে ফূর্তি করে, আকণ্ঠ মদ গেলে, ভোরে জাহাজে ফেরে। এতে তাদের কোনো লজ্জা নেই। মোবারকের বাপজীও কালির্ডক বন্দরে ফুলওয়ালি রেনীলের প্রেমমুগ্ধ হয়েছিলেন। সেই ক্ষণ-প্রেমিকাকে উপহার দিয়েছিলেন একটা ঘড়ি। বন্দর থেকে জাহাজ ছেড়ে যাওয়ার পর সে জানতে পারেন তার প্রিয় জাহাজি-সঙ্গী রহমৎও রেনীলের রাতের অতিথিদের একজন। উপহারের ঘড়িটা সে রহমৎকেই বেচে দিয়েছে। বন্ধুতা আর প্রেমের এমন অমর্যাদা সইতে পারেননি বাপজী। ক্রোধান্ধ হয়ে হত্যা করে ফেলেন রহমৎকে। তারপর অনুশোচনায় জ্বলেপুড়ে মরেন। ঘরে ফিরে তিনি স্ত্রীর কাছে স্বীকারোক্তি করেন যে, বন্দরবধূর ঘরে আতিথ্য নেন ঠিকই কিন্তু স্ত্রীকে তিনি সত্যিই ভালোবাসেন। তাই তার কাছে সান্ত্বনা পাওয়ারও চেষ্টা করেন। পুনরায় যান সমুদ্রযাত্রায়, নিয়তির টানে। এবার জাহাজডুবি হয়ে মৃতপ্রায় বাপজী আশ্রয় পান নিউজিল্যান্ডের প্লাইমাউথ বন্দরে বিবাহবিচ্ছিন্না এক মহিলা ডাক্তারের কাছে। কিন্তু তিনি হারান তার বাক্ ও শ্রবণশক্তি। সুদর্শন জাহাজিটিকে বিবাহ করে ডাক্তার। এক কন্যাসন্তানও হয় তাদের, লিলি ব্লু, যে এই আখ্যানের নায়িকা। এই পর্যন্ত একটি প্রজন্মের কাহিনি।

পরবর্তী প্রজন্মের কাহিনির মধ্যমণি মোবারক। শামীনগড়ে বিধবা মাকে নিয়ে শান্ত নিরুদ্‌বিগ্ন জীবন অতিবাহিত করছিল সে। কিন্তু রশীদ চাচাকে জড়িয়ে মিথ্যে সন্দেহে মাকে কটু কথা বললে সাধ্বী মা নিঃশব্দে গৃহত্যাগ করে। মোবারকের দাঁড়ানোর জায়গা থাকে না। ছেলেবেলার সঙ্গিনী জৈনবেরও অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়। সবদিক থেকে আশ্রয়হীন মোবারকের নিয়তি তাকে ঝড়ে উপড়ানো গাছের মতো আছড়ে ফেলে জাহাজের ডেকে। তার ভাগ্য তাকে নিয়ে যায় নিউপ্লাইমাউথ বন্দরে। সেখানে সিম্যানস্ মিশনে মাউথ অর্গান বাজানোর সূত্রে আলাপ হয় তার লিলির সঙ্গে। মাউথ অর্গানের সুরের সঙ্গে সঙ্গে পোষা সাপ নাচানোর খেলায় মগ্ন লিলি মোবারককে জীবনসঙ্গী করতে চায়। ভক্ত প্রেমিকার সঙ্গে দেহ ও মন বিনিময়ের পালা চুকিয়ে লিলির মায়ের বাড়ি যায় মোবারক। সেখানে সে দেখতে পায় তার মৃত পিতার ছবি লিলির মায়ের পাশে। অতীতের ঘটনা এই সূত্রেই সামনে আসে। কারোকে কিছু না বলে নিঃশব্দে পালিয়ে যায় সে জাহাজে। না জেনে যে অপরাধ সে করে ফেলেছে,

তার হাত থেকে মুক্তি নেই মোবারকের। কিন্তু সে রাজা ইডিপাস নয়। তাই লিলিকে নিজের বোন বলেও সে ভাবতে পারে না। সে তাকে ভালোবাসে, বিবির মতো ভালোবাসে। আর সেটাই তার অপরাধ, তার গোস্তাগী। নিয়তিতাড়িত, হতভাগ্য, অসহায় মোবারক আর্ত চিৎকার করে, "আমার মনের হারেমে হারাম খাচ্ছি। (লিলিকে) বোনের মত, রক্তের সম্পর্ক আছে বলে কিছুতেই ভাবতে পারছি না। বিবেক তাই জলে ডুবিয়ে মারতে চাইছে। ...আমার বাঁচা মরা দুইই সমান। ...কি নিয়ে বাঁচব শেখর? কাকে নিয়ে বাঁচব? ...বাঁচা মরা দুইই সমান। বেঁচে থাকতে বিবেক শুধু বলবে, তুমি হারাম, গুনাহ্‌গার, না-পাক্। মরলে খোদা আমায় ক্ষমা করবে না।" (পৃ. ১৭২) অনুতাপদগ্ধ মানুষটি শেষপর্যন্ত মৃত্যুর মধ্যে শান্তি পেল। বন্ধু শেখর প্রার্থনা জানালো, "খোদা, তুমি ওকে শান্তি দাও। ঈশ্বর, তুমি ওকে ক্ষমা কর।" (পৃ. ১৮৬) যেমন করে মোবারকের পিতার ঘৃণা জন্মেছিল তার নিজের ওপরে, 'খোদা হাফেজ' করে করে গুনাহের হাত থেকে মুক্তি খুঁজেছিলেন, তেমনি করে মোবারকও খোদার কাছে ক্ষমা চায় অজ্ঞাতে অনুষ্ঠিত পাপের জন্য। পাঠকের মনে এখানেই প্রশ্ন জাগে, নাবিক বংশে কি পাপের পুনরানুষ্ঠান ঘটে?

এই উপন্যাসে বিশেষ কোনো তত্ত্বকথা শোনাতে চাননি লেখক। চট্টগ্রামের এক অখ্যাত নাবিক পরিবারের দুই পুরুষের নিয়তি লাঞ্ছিত জীবনকাহিনি উপস্থাপিত করেছেন। কখনও অতীতকে এগিয়ে এনে, কখনও বর্তমানকে সামনে রেখে খুব সহজ ভাষায় উপন্যাসের আখ্যানকে ঘনিয়ে তুলেছেন, গল্পপিপাসু পাঠককে যা চুম্বকের মতো আকর্ষণ করেছে। উপন্যাসে চিত্রিত চরিত্রগুলি সমুদ্র সংক্রান্ত অতীনের অন্য উপন্যাসেও ঘুরে ফিরে এসেছে। কাহিনির দুটি জায়গায় পাঠকের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে বাস্তবতা। বাপজী যখন তার ভিন্ন নারীসঙ্গের স্বীকারোক্তি করছেন স্ত্রীর কাছে তখন মোবারকের আম্মাজানের কেন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখানো হল না? সে কি স্বামীর পরনারীগমন মুখ বুজে মেনে নিল? একি স্বামীর প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ না অসহায়তা? ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না। দ্বিতীয়ত, মুসলমান সম্প্রদায়ে বিধবা বা বিবাহবিচ্ছিন্ন নারীর দ্বিতীয় বার পতি নির্বাচনের অধিকার থাকে। তাহলে মোবারকের বাপজীর মৃত্যুর পর শামীনগড়ের মানুষজন কেন তাদের বাড়িতে রশীদের আসা-যাওয়া নিয়ে কানাকানি করত? আর কেনই বা মোবারক এর প্রতিক্রিয়ায় এত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল? এরও কোনো ব্যাখ্যা উপন্যাসে নেই।

এসব ছোটোখাটো ত্রুটি সত্ত্বেও উপন্যাসটি সুখপাঠ্য, চরিত্রগুলি সুসজ্জিত। কাহিনিতে বর্ণিত জাহাজি জীবনের প্রাত্যহিকতার ছবি, নাবিকদের মধ্যে সহজ বন্ধুতার সম্পর্ক, একঘেয়ে জলজীবনের হতাশা, বন্দরের মুক্ত জীবনে যৌবনপিপাসা মেটানোর উদগ্র বাসনার সে ছবি এঁকেছেন লেখক তা খুবই আগ্রহদীপ্ত। এ জগৎ সাধারণ

পাঠকের অভিজ্ঞতার বাইরে। জাহাজ কেমন করে সমুদ্রমানুষের শরীরের ঘাম-তেল-রক্ত শুষে নিয়ে তারপর জলপথে ভেসে চলে সেই বর্ণনায় অতীন লিখলেন :

"শেখর আগওয়ালার পোশাক পরে মাথায় নীল টুপি দিয়ে বের হয়ে এল ফোকশাল থেকে। ...এসে দাঁড়াল বয়লারের সামনে। চেয়ে দেখল স্টীম নামছে! দুশ ত্রিশ থেকে দুশ দশে নেমে এসেছে। আরো নামবে। তাড়াতাড়ি বয়লারের পোর্ট সাইডের দরজাটা খুলে কয়েক শাবল কয়লা হাঁকড়ালো। তবু স্টীম এক পয়েন্ট বাড়ছে না, দু নম্বর বয়লার আর অস্ট্রেলিয়ান কোল মিলে যেন ওকে ব্যঙ্গ করছে। এমন সময়ে চিৎকার উঠল পাশ থেকে, বড় ট্যান্ডেল হাঁকছে—স্টীম নামছে, কয়লা হাঁকড়াও, র‍্যাগ মারো, শ্লাইশ দাগো। সঙ্গে সঙ্গে ডাক উঠল—আল্লা আল্লা! শোঁ শোঁ করে উঠল বয়লারের স্টীমকক্গুলি। একসঙ্গে ছয় বয়লারের ছয় র‍্যাগ উঠল, ঠন্ ঠন্ করে বাড়ি পড়ল নীচে—লোহার প্লেটে। শ্লাইশ হাঁকড়ালো একসঙ্গে—ভিতরের জ্বলন্ত আগুন থেকে ঝাং-ধরা পোড়া কয়লা চড় চড় করে ফেটে উঠল। র‍্যাগ মেরে টেনে আনলো ছাই, পোড়া কয়লা। পাশ থেকে জ্বলন্ত পোড়া কয়লার উপর বালতি বালতি নোনা জল ছিটকে পড়ল। সমস্ত স্টকহোলটা অন্ধকার হয়ে উঠেছে। শেখর চোখ মেলে চাইতে পারছে না—চোখ বুজেই টানছে। দূর থেকে আবার চিৎকার করছে বড় ট্যান্ডেল—স্টীম নামছে। একসঙ্গে দুটো শাবল সন্ সন্ করে উঠল। ঝন্ ঝন্ করে বাড়ি পড়ল লোহার প্লেটে—কয়লা হাঁকড়ালো শাবলের পর শাবল। ছয় বয়লারের পোর্ট সাইডের ছয় চুলো নিমেষে ভরে উঠল। এবার ভাল্ব্টা টেনে দিতেই কালো কয়লা লাল হয়ে উঠল।

শেখর হুম্ হুম্ করে কয়লা মারছে দু নম্বর বয়লারের তিন নম্বর চুলোতে। বার বার করে ত্রিশ সের ওজনের শ্লাইস টানতে গিয়ে মোচড় দিয়ে উঠছিল হাতের নরম পেশীগুলো। অন্যান্য আগওয়ালাদের পোড়া কয়লা টানা শেষ। ছাই হাফিজ হয়ে গেছে। স্টীম ওদের দুশো ত্রিশে। তাই উইন্ডস্হোলের নীচে বসে একটু বিশ্রাম নিতে পারল। কিন্তু শেখরের বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, উন্ডস্হোলের নীচে বসে মুহূর্তের জন্য হাওয়া খেতে পারল না। ঘাম আর ছাইয়ে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে মুখ। পোড়া কয়লায় ঢেকে গেছে চোখ। মুহূর্তের জন্য থেমে রগড়ে নিল একবার চোখ দুটো, কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দেখল স্টীম গেজটা—দুশ ত্রিশে তবু উঠল কই?" (পৃ. ৭৪-৭৬)

পেটে আগুনের রসদ নিয়ে ভাসমান জাহাজের নিখুঁত ও অভিনব ছবিটি দেখার পাশাপাশি স্থলচর পাঠক জানতে পারে নোঙর করা জাহাজের ক্যাপ্টেন রবিবারে জাহাজ ঘুরে দেখেন তা কতটা পরিচ্ছন্ন রাখা হয়েছে; নাবিকদের ঘর, রান্নাঘর সব স্বাস্থ্যসম্মতভাবে 'ক্লীন' রাখা হয়ে কি না, জাহাজিদের খাবারের মান কেমন তা-ও তিনি তদারক করেন। খাবার জলের ট্যাঙ্কে টর্চের আলো ফেলে দেখে নেন তা যথাযথভাবে পরিষ্কার করা হয়েছে কি না। বিভিন্ন পদাধিকারী জাহাজির কাজকর্মের বেশ স্পষ্ট একটা ধারণাও পাওয়া যায় উপন্যাস থেকে। দমচাপা ঘেরাটোপের মধ্যে যে বিশেষ রকমের কাজে অতিবাহিত হয় নাবিকদের প্রায় সবটা জীবন, সেই কর্মটি কীভাবে তাদের চরিত্রগত আপাত পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয় তা

জেনে পাঠকও চমকে যায় :

"ডংকীম্যান একবার এসেছিল ইঞ্জিন্-রুম হতে। —তিন নম্বর মিস্ত্রী দুনম্বর বয়লারের স্টীম চাইছে আরো।

ডংকীম্যান এসে থেমেছিল ইঞ্জিন-রুম পেরিয়ে স্টোকহোলের প্রথম দরজায়। পকেট বাঙ্কারের কোণায় দাঁড়িয়ে বলে গিয়েছিল কথাটা। শেখরের কাছে যেতে ওর সাহস হয়নি। বলা তো যায় না! হয়তো স্টীম তুলতে গিয়ে গনগনে লোহার র‍্যাগটা শেখর ডংকীম্যানের মাথায় মেরে পরখ করে দেখতে পারে, দ্বিতীয়বার সে র‍্যাগ দিয়ে টন্ টন্ আগুনে কয়লার মাথা ভাঙতে পারে কি-না। এমন হানাহানি কতবার কত জাহাজে হল। স্টীম না উঠলে কয়লার জাহাজে, চিৎকার করবে তো ইঞ্জিনিয়ার, ইঞ্জিন-রুম হতে করো, স্টীমের জন্য স্টোকহোলে ঢুকেছ কি মরেছ। প্রথমেই পোড়া লাল লোহার ত্রিশ-সেরী শ্লাইসটা ভিতর হতে টেনে বের করে নিয়ে আসবে—বল্লমের মতো হাঁকড়াবে ইঞ্জিনিয়ারের বুকে, শেষে টেনে এনে মানুষটা সহ শ্লাইসটা ঢুকিয়ে দেবে চুলোর ভিতর! র‍্যাগ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উল্টে পাল্টে দুটো টান। একেবারে সাফাই। গনগনে চুলোটা সাদা মানুষের তেল খেয়ে স্টীম দেবে দুশ ত্রিশ। তাই যখন এমনি হানাহানি চলে স্টীম নিয়ে—ফায়ারম্যান স্টীম দিতে পারছে না, ইঞ্জিনিয়ার স্টীম চাইছে, তখন ডংকীম্যান কিংবা তেলওয়ালাকেই আসতে হয় দূতের কার্য করতে। দহরম-মহরম যা হবার ওদের ওপর দিয়েই হোক। কারণ এ সময়ে ফায়ারম্যানদের স্টীম তোলার ব্যাপারে দু-একজন ইঞ্জিনিয়ারকে পুড়িয়ে দিলে নাকি দড়ি কিংবা হাজতের ব্যবস্থা হয় না।" (পৃ. ৭৬)

এর সঙ্গে সঙ্গে 'ওয়াচ', 'টান্টু', 'ফোকশাল', 'হিবিং লাইন', 'আফটার পিক', 'ফল্কা', 'হাড়িয়া হাফিজ', 'গ্যালী', 'ডেরীক', 'ক্রু গ্যালী', 'ট্যান্ডেল', 'মালোম' সহ জাহাজ সংক্রান্ত অনেক অচেনা শব্দ গোটা উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে যার মাধ্যমে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এক জগতের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয় পাঠকের সামনে।

'সমুদ্র-মানুষ'-এ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় খুব গতানুগতিক, ছকে বাঁধা কোনো আখ্যান শোনাতে চাননি। সাধারণ পাঠকের অভিজ্ঞতার বাইরে যে জাহাজি মানুষের গল্প বলেছেন, তা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। কেননা, বৃত্তি যাই হোক, মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় সে মানুষ। লেখকের কলমে সেই চিরন্তন মানুষের মর্যাদা পেয়েছে মোবারক-লিলি, মোবারকের বাপজী, রহমৎ মিঞারা। এখানেই উপন্যাসটির সার্থকতা।

স্বপ্না ঘোষাল

জন্ম : ১৯৫৫ সাল। পেশা : অধ্যাপনা।

মায়া-কলম

শম্পা রায়

কোনো কোনো লেখকের বিশেষ একটি-দুটি লেখায় এক নতুন ধরনের জগতের সন্ধান পায় পাঠক, জাদু দুনিয়া যার নাম। সেখানে মাটি, মানুষ, প্রকৃতি সবই আছে কিন্তু একটু যেন অন্যরকম। আসলে ওই অবাক পৃথিবীটা লুকিয়ে থাকে প্রতিদিনের চেনা এই দৃশ্যমান বিশ্বের মধ্যেই। এর খোঁজ যে পায় সে নিজে থেকেই পেল, আর যে পায় না তার কথা আর কি-ই বা বলার আছে? এই স্বাতন্ত্র্যধর্মী লেখার মধ্যে সাহিত্যতাত্ত্বিকরা খুঁজে পেয়ে যান ম্যাজিক্যাল রিয়েলিজম বা জাদুবাস্তবতা। তাঁদের ভাষায় :

"A work so designated has a firm plot but the reality of the plot is invaded by the supernatural, dream, myth or fantasy. Often the key qustions are never answered and key identification are never made."[১]

অর্থাৎ এ ধরনের কাহিনিতে দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যে হঠাৎই ঢুকে পড়ে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এলোমেলো করে দেওয়া সত্যি-মিথ্যে-সম্ভব-অসম্ভব। এ যেন এক নিরবধি কালস্রোত যেখানে স্বপ্ন এবং ঘটনা, কল্পগাথা ও গল্পকথা, দেখা আর না-দেখা সবই এক নতুন তাৎপর্যে পাশাপাশি বয়ে চলে।

আসলে জ্ঞান আর বিশ্বাস—এই দুটি উপকরণ দিয়ে মানুষ যে বাস্তব জগৎ গড়ে নিয়েছে সেটা মাত্র কিছুদূর পর্যন্তই বাস্তব। তার বাইরেও থাকে এমন বহু বিষয় যা জীবনের চালিকাশক্তিরই অন্তর্ভুক্ত। যেমন ভ্রান্তি-বিভ্রান্তি, অপধারণা, কল্পনা, উদ্ভুটেপনা, খেয়ালিপনা, অযৌক্তিকতা, মিথ—এমনিতর অনেক কিছুকে নিয়ে আমরা, জাড়িয়ে থাকি কখনও জেনে-বুঝে, কখনো বা অজ্ঞাতসারে। ওই জায়গায় যুক্তি-তর্ক- বিজ্ঞান সব কিছুই অচল। সাহিত্যে এই ধরনের অপরিভাষিত বাস্তবতাগুলো নিয়েই জাদুবাস্তবতা বা ম্যাজিক্যাল রিয়েলিজম গড়ে ওঠে। যুক্তিসম্মতভাবে যে বোধকে বাস্তব বলে মান্যতা দেওয়া হয়, যেটা জীবনের কাছে একটা ধরা-ছোঁয়ার বাস্তবতা, জাদুবাস্তবতার জায়গাটা তার বাইরেকার। সাহিত্যে জাদুবাস্তবতা বাস্তবতারই এক ধরনের সম্মানিত উপস্থাপনা। এ ধরনের গল্প বলা এবং লেখার কৌশলও প্রচলিত ধারার সাহিত্য থেকে আলাদা। গল্প বলার ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে ভেঙে যেতে থাকে বাস্তবের নানা অভিজ্ঞান, আপাত-জটিল নানা

শৃঙ্খল; তৈরি হয় অপার বৈচিত্র্যময় এক আশ্চর্য ভুবন, যেখানে কাহিনির ভেতর প্রতীকী কিছু বিস্তার থাকে যা জীবন যাপনের বিষয়ে গভীর কিছু কথা বলে যায়। সেই নিহিত সত্য এবং প্রত্যক্ষ কল্পনাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করাতেই জাদুসাহিত্য পাঠের সার্থকতা।

আমরা যারা রামায়ণ-মহাভারতকে নিয়ে বেড়ে উঠেছি তাদের কাছে গল্পকাহিনির বিস্তারে বাস্তবতার সঙ্গে অলৌকিকতার সহাবস্থানকে মেনে নেওয়াটা খুবই সহজ। এই ম্যাজিক রিয়ালিটিকে আমরা মেনে নিই এই ভেবে যে, গল্পগুলো এত পুরোনো—সে যুগে মানুষের অপরিমেয় জ্ঞান ও ক্ষমতা ছিল যা দিয়ে ওইসব অলৌকিক ঘটনার সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল। শুধু তাই নয়, মহাভারতের আরম্ভেই এক জায়গায় বলা আছে যে, এই পুঁথির আখ্যানমালায় 'দর্শানো সত্য' 'পরিপূর্ণ সত্য' (absolute truth) নয়। সেই সত্যটি তাদের ভিতরে নিহিত। ঠিক যেমনটি রয়েছে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিন্নির খই লাল বাতাসা' (১৯৯১), আর 'উড়ন্ত তরবারি' (১৯৯৪)-তে। তাঁর অনেক লেখার মধ্যেই চেনা জীবন আর কল্পনার জীবনের মেলামেশা অনায়াস ও স্বচ্ছন্দ। কিন্তু এই দুটি বইতে নিছক কল্পনা নয়; কল্পকাহিনি-উপকথা-রূপকথার মিশেলে সৃষ্টি হয়েছে এক প্রেক্ষিত যেখানে গল্পগুলোর মূল ধারার ওপর বারে বারে আলো ফেলে স্থান বিশেষের ইতিহাস, মফস্‌সল বা গ্রামীণ জীবন, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সঙ্গে গরিব মানুষের সমঝোতা, লোককথা, প্রবাদ, অন্ধবিশ্বাস, তুকতাক, জড়িবুটি ইত্যাদি। মূলত বড়োদের লেখক হিসেবেই অতীনের পরিচিতি। তবে ছোটদের, ঠিকমতো বললে কিশোরদের জন্য, তাঁর যে গল্প-উপন্যাস রয়েছে সেগুলো লেখকের সমকালীন শিশু-কিশোর রচনামালায় বেশ স্বতন্ত্র। কেননা, এখানে যুক্ত হয় অন্য মাত্রা, অরাজকের মতো তা ঢুকে পড়ে প্রতিদিনের একঘেয়ে জীবনে। খ্যাপামো, মজা, দুষ্টুমি অথবা ছোটো ছোটো মনগুলো আঁধার করে রাখা বড়ো, মাঝারি সুখ-দুঃখের গল্প অথবা হারিয়ে ফেলেও ফিরে পাওয়ার অনেক কাহিনি ছোটোদের উপহার দিয়েছেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু উল্লিখিত গ্রন্থদুটির বয়ান এবং স্বাদ অনেকটাই অন্যরকম।

'বিন্নির খই লাল বাতাসা' একটি কিশোর উপন্যাস। এখানে ছোটো বাচ্চুর নিজের দেশটা খুবই সুন্দর। কিন্তু তার তাজ্জব লেগে যেত নয়াপাড়ার জমিদারবাড়ি দেখে—যে জমিদারির সর্বপ্রধান আমলা তার বাবা। শীতলক্ষ্যা নদীর পাড়ে বড়ো-মেজো-ছোটো তরফের চক মেলানো দোতলা বিশাল সব ঘরবাড়ি। ঘোড়াশালে ঘোড়া, পিলখানায় হাতি। শীতলক্ষ্যার বুকে ঝাঁক ঝাঁক পাখি আর সার সার নৌকো। এক মাল্লা, দো মাল্লা, তেমাল্লা। ফি বছর পুজোর সময় বাবার পাঠানো নৌকোয়

চড়ে দাদাদের সঙ্গে বাচ্চু পৌঁছে যেত নয়াপাড়ায়। সেই জমিদারবাড়িতেই দেখা ইন্দুর সঙ্গে তার। বাচ্চুর থেকে একটুখানি বড়ো, কিন্তু যেমন সাহস তেমনই বুদ্ধি ইন্দুর। বাচ্চুকে সে বিন্নির খই আর লাল বাতাসা খাওয়ায়, আবার ভয়ও দেখায়। কখনও পরি সেজে, কখনও সার্কাসের কায়দায় উঁচু কার্নিসের ওপর দিয়ে সটান হেঁটে গিয়ে। বাচ্চু আর ইন্দুকে নিয়ে গড়ে ওঠা এই কাহিনির নির্দিষ্ট আখ্যানটির ক্রম কিন্তু বারে বারেই ভেঙে যায়—নানা কল্পকাহিনি, আশ্চর্য সব বিশ্বাসের অন্যতর এক স্বতঃস্ফূর্ত উদ্‌বোধনে সৃষ্টি হয় যে অদ্ভুত কল্পজগৎ তার কেন্দ্রে কিন্তু থাকে এই দুই কিশোর-কিশোরীই।

যেদিন থেকে বাচ্চু-ইন্দুর আলাপ-পরিচয়-বন্ধুতা তখন থেকেই ইন্দু বাচ্চুকে বলে এসেছে পরির কথা। একবার জমিদারবাড়ির পুজোয় গিয়ে বাচ্চু *"...চুপিচুপি ছাদে উঠে অবাক! ছাদে জ্যোৎস্না দুধের মতো সাদা। ...আর দূরে জ্যোৎস্নায় বাচ্চা পরিটা সত্যি পদ্ম ফুলের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সে দূর থেকে দেখেই কেমন বিভ্রমে পড়ে গিয়েছিল, পরি না অন্য-কিছু। দু'হাত তুলে, পাখা ছড়িয়ে ছোট্ট পরি তবে সত্যি হাজির। ...তার কাছে সবটাই তখন বিশাল ভূতের সাম্রাজ্য। এমন কী নাটমন্দির, ধূপের গন্ধ, ধুনুচির নৃত্য, দেবীর মুখ ধোঁয়ায় আবছা। সবই যেন কুবাতাসের প্রভাবে। ...সে যেন সবই ঘোরে পড়ে দেখছে।"*[২] এখানে বাচ্চুর মানসিক প্রতিক্রিয়ার সত্যি/মিথ্যে পাঠককেও দ্বিধাগ্রস্ত করে। শুধু এটাই নয়, তার অন্যান্য উপলব্ধিও কিশোর পড়ুয়াদের আসল সত্যি-মিথ্যে নিয়ে সংশয়ে ফেলে দেয়। কতটা বিশ্বাস্য আর অবিশ্বাস্যই বা কোনটা! এই উপন্যাসে তাই ঘটনাপর্যায়ের থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কথনপর্যায়। নির্দিষ্ট কথক ছাড়াও যখন কথকের ভূমিকায় উঠে আসে কোনো একটি বিশেষ চরিত্র, তখন বাস্তব কথনের মুখ্য কথক ও কল্পবাস্তবের আপাত গৌণ কথকের বয়ানের মিশ্রণ-কৌশল হয়ে ওঠে অত্যন্ত জরুরি। আর সেই কুশলী শৈলীর সার্থক বিন্যাসেই নির্মিত হয়েছে উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গ কাঠামো, যেখানে সংগতি-অসংগতির দ্বৈততা মিলে গিয়ে তৈরী হয়ে উঠল স্বেচ্ছায় অবিশ্বাস জমা রাখতে বাধ্য করা এক বিশ্বাসের জগৎ।

'বিন্নির খই লাল-বাতাসা' উপন্যাসটিতেও স্পষ্টত এই দুটি বিন্যাস আছে। একদিকে সাধারণ সাংসারিক গল্প যেখানে মা-বড়োপিসি-চার মনিব-মাস্টারমশাই-বড়োজ্যাঠামশাইয়ের কাছে ছোটো বাচ্চু আদরে-শাসনে সময় কাটায়, আর ইন্দুর অনেকটা মন-সময় ভরে রাখে 'লক্ষ্মী'—তার প্রিয় হাতি। আর অন্যদিকে রয়ে গেছে একটা স্বপ্ন-কল্পনার দুনিয়া যা গড়ে তোলা যায় একমাত্র নয়াপাড়ার জমিদারবাড়িতে এবং তৎসংলগ্ন সুপারি-বন, হলুদ-জমিতেই; অন্য কোথাও নয়।

এই বন, জমি, বিভিন্ন রকম নৌকো আর শীতলক্ষ্যা নদী নির্ভুল সংকেত দেয় বিশেষ একটি অঞ্চলের ভূপ্রকৃতির। তা হল রূপসী পূর্ববাংলা। লেখকের জন্মস্থান এবং তাঁর বাল্যের দিনগুলো কেটেছিল এখানেই। তাই সেই পরিবেশ এখানে নানা প্রসঙ্গেই উঠে আসে—*"দূরে কোথায় বাচ্চু ঘুঘু পাখির ডাক শুনতে পেল। নৌকা ক্রমে গাঁয়ের ঘাট ছাড়িয়ে মাঠে পড়ে গেল। বাচ্চু পাটাতনে ঝুঁকে আছে। পাট কাটা হয়ে গেছে বলে বিশাল গাঙের মতো মনে হয়। জলের নীচে জলজ জঙ্গল। অজস্র পাতি-শাপলা ফুল ফুটে আছে। আর জলের নীচে ভারকিনা মাছ, পুঁটিমাছ দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ...তাদের এমন সুন্দর দেশ আছে, কত নদী-নালা, আর বিচিত্র রঙের বাহারি পাখি, পাখির ছায়া জলের গভীরে পর্যন্ত দেখা যায়। স্ফটিক জল, স্বচ্ছ, পাখিরা উড়ে গেলে তার ছায়া কেমন এক পাতালপুরীতে জাদুর দেশ তৈরি করে ফেলে।"*[৩]

দীর্ঘ চার বছর পর ইন্দুদের বাড়িতে পুজোয় নিমন্ত্রিত হয়ে গেলে বাচ্চু যেন আবার নতুন করে ভালোবাসে তার চিরচেনা প্রকৃতিকে। তার এই চোখে দেখা পরিবেশও অনেক সময় আখ্যানের বাস্তব বিন্যাসের ওপর গৃহিত বাস্তবের ছায়াপাত ঘটায়। আর এভাবেই কাহিনির পরিসর বিশেষ বিস্তৃত না হলেও তা যে অনেকটাই নকশাধর্মী হয়ে উঠেছে তার কারণ কাহিনির অন্যতর চলন। কল্পনা-ভাবাবেগ মিলিয়ে ইন্দু যে পরিকাহিনি শোনায় তাকে ভিত্তি করে বাচ্চু গড়ে তোলে এক স্বপ্ন বাস্তব। লেখক আশ্চর্য কৌশলে ঘটনা-সময় আর সংস্থানের গভীর অন্তঃসম্পর্কে মিলিয়ে দেন দুটি বাচন বিন্যাসকে। এই দুয়ের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করে যেন বাচ্চু আর তার বাবার কথোপকথন—"বাবার পাশে শুয়ে রাতে চুপি চুপি বলেছিল, *'আচ্ছা বাবা, মানুষ কখনও পরি হয়! পরি কখনও মানুষ হয়ে যেতে পারে?'* বাবার অদ্ভুত কথা, *'হতেই পারে। কী হয় কী না হয়, কেউ বলতে পারে না।'*[৪] একজন পরিণত বয়স্ক মানুষের এই মন্তব্যে আখ্যানবিন্যাসে আরও গাঢ় ছোপ পড়ে মায়াকাহিনির। বাচ্চুর তখন মনে হতে থাকে, *'ইন্দু বাবুমশাইয়ের কন্যে হতে পারে। আবার ইন্দু ছাদের কার্নিসে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও পরিও হতে পারে। কিংবা ইন্দুর বেশ ধরে কখনও কোনও পরি তার সঙ্গে খেলাও করে যেতে পারে।'"*[৫] আর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে অস্থির এক বালকের অব্যক্ত অস্থিরতা ছুঁয়ে যায় পাঠককেও।

উপন্যাসের শেষে ইন্দু কুসংস্কার আর ধর্মীয় ভণ্ডামির বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ করে। সঙ্গী থাকে বাচ্চু আর লক্ষ্মী। উদ্দেশ্য সফল হলেও তারা কেউই স্বভূমিতে ফিরে আসে না; বরং *"নদী কোথায় যায়"*[৬] তা জানতে যাত্রা করে নতুন পথে, নতুন দিকে। সমাপ্তির এই রহস্যময়তার জন্যও কাহিনিতে প্রায় আদ্যন্ত লেগে থাকে জাদুলোকের স্পর্শ। বাড়িভর্তি বয়স্কজনের আদেশে-নির্দেশে কাটানো বাচ্চুর নিস্তরঙ্গ

দৈনন্দিন যাপন আর পুজোর দিনগুলোতে ইন্দুর সান্নিধ্যে অতি চঞ্চলতায় ভরে থাকা—এই দুই বৈপরীত্যকে অনেক ছোটো ছোটো ঘটনার অদৃশ্য সূত্রে বেঁধে ফেলা হয়েছে। পর পর যে সব ঘটনা কাহিনিতে ঘটে গেছে সেগুলো পরস্পর সম্পৃক্ত অথচ কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি ঘটনাধারার অগ্রগতিকে রুদ্ধ না করেও বিভিন্ন চরিত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে বাস্তবিক ও গৃহীত বাস্তবিকের সীমাটির শুধু যে অবলুপ্তি ঘটায় তা নয়, বিস্তারও ঘটায়। লক্ষণীয় যে প্রায় প্রতিটি ঘটনার মূল চরিত্র হয় ইন্দু—এবং সেদিক দিয়ে দেখলে ঘটনাগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা সন্দেহাতীত—কিন্তু ইন্দু নামের কিশোরীটি নিজেই কি সাধারণ না কি কিছু অ-সাধারণত্ব তারও আছে? বিভ্রম থেকে প্রাত্যহিকে তার অনায়াস গতায়াতে এমন একটা আবছা সন্দেহ উঁকি দেয়।

তবে আখ্যানের শেষে প্রতিষ্ঠিত হয় যে ইন্দু অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি সমৃদ্ধ এক কিশোরী। তাই আখ্যান শেষে চিঠিতে বলা তার কথাগুলো *“বাচ্চুর জন্য ভাববেন না। ওকে আমি নিয়ে গেছি। নদী কোথায় যায় খুঁজতে বের হয়েছি।”* শুধু ব্যঞ্জনাময় বহুস্তরিক বিন্যাসের ও মনস্ক পাঠকের বহুস্বরের অভিব্যক্তি হয়ে ওঠে না, সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট করে দেয় আখ্যানটির ব্যতিক্রমী বুনোটটিও। সম্ভাব্য বিকল্পগুলো গৌণ হয়ে যায়—সীমারেখা মুছে যেতে থাকে আরও একবার। জাদুবাস্তবতার শর্ত মেনেই যেন শেষ হলেও উত্তর মেলে না কাহিনিতলের মূল প্রশ্নমালার। ধোঁয়াশায় ঢাকা থাকে ইন্দুমতী ও বাচ্চুর গন্তব্যের সঠিক ইতিহাস-ভূগোল। ওই ঠিকানা জানা গেলে হয়তো বদলে যাবে দেখাশোনার এই চেনা দুনিয়া। স্বপ্নরঙিন স্মৃতিমেদুর এক বিশ্বে তখন হাজির হবে পাঠক।

‘উড়ন্ত তরবারি’, ‘গুপ্তধনের গুপ্তকথা’, ‘হিরের চেয়েও দামি’—এই তিনটি ছোটোগল্পের সংকলন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘উড়ন্ত তরবারি’। বেশ একটু রহস্যের তবকে মোড়া এই কাহিনিগুলোর শেষে রহস্যের সমাধানও রয়েছে। ‘বিন্নির খই লাল-বাতাসা’-র চেয়েও এই গল্পগুলো যেমন বহুমাত্রিক তেমনি বহুস্তরিক। তারাপদ, বশির, ছকাইয়ের নানা কীর্তিকলাপের কাহিনি এগুলো। তারা নায়কোচিত ভূমিকায় অবতীর্ণ। পুরো আখ্যানের কেন্দ্রস্থিত এরাই—অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলতা এখানে বিশেষ নেই। তার প্রধান কারণ এই যে, কাহিনিগুলোর কেন্দ্রীয় চরিত্ররা কিশোর। তারাপদ আর বশির বয়সে বড়ো হলেও মানস বৈশিষ্ট্যে এই কিশোরদেরই সমধর্মা। তাই এদের নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না। *“চালপড়া, বাটি-চালান, জলপড়া থেকে রাতের বেলা পরি পর্যন্ত নামাতে পারে* [illegible] মানুষ তারাপদ শুধু পরমায়ু সন্ধান করে

বেড়ায়। যেকোনোভাবে লোকের একটু সাহায্য করে দিয়ে সে আপন 'পরমায়ু' জোগাড় করে ফেলে। তার সত্তার এটা এক দিক। আবার রুবির মতো সরল কিশোরীর যখন সে তারাপদদাদু তখন এই লোকই এক ভিন্ন দুনিয়ার বাসিন্দা। যেখানে নাভিনিদ্রায় উড়ে যাওয়া যায়, উড়ন্ত তরবারি হাতে সেখানে যাত্রা করতে হয়। তাহলে কোনটা ঠিকঠাক তারাপদ? এই পরিচিতির একটা সংকট পাঠক মনে জাগতে পারে, যা লক্ষ করা যায় বশির আর ছকাইকে নিয়েও। এই প্রতিটি চরিত্র নির্মাণে বহু স্তরবিশিষ্ট বাস্তব-অবাস্তবের মিলমিশ দেখা যায়।

'উড়ন্ত তরবারি', 'গুপ্তধনের গুপ্তকথা' আর 'হিরের চেয়েও দামি'-তে বাস্তবের ঘটনার সঙ্গে সৃজিত বাস্তব মিলে যায়; আকস্মিকতার সূত্রে তৈরি হয়েছে বোঝা-না-বোঝার টানাপোড়েন। তারাপদ, বশির, ছকাইয়ের একক মনের খেয়ালি আলোয় সত্যের মিশেলে তৈরি হয় কল্পছবি—"*...নাভিনিদ্রায় সে (তারাপদ) কুণ্ডলিনীর যোগে বসে যেতে পারবে। ...নাভিনিদ্রা হলে সে উড়তে থাকে। তার ডানা গজিয়ে যায়। কাক-পক্ষীর মতো উড়তে পারে—তার বায়না যত, সব মিলে যায়। কখনও তরবারি হাতে ঘোড়ায় চড়ে রাজকন্যা উদ্ধারে চলে যায়। সঙ্গে থাকে অশ্বারোহী সৈন্য—সে ঝিকঝাক তরবারি ওঠায়-নামায়। আগু-পিছু হয়। হাতের তরবারি উড়তে থাকে—সেও উড়ে যায়। দস্যু-সর্দার রাজকন্যা অপহরণ করে পালাচ্ছে—আরে ব্যাটা, যাবি কোথা—নাভিনিদ্রায় কুম্ভচক্রে আছে তারাপদ। তার খ্যামতা দ্যাখ কত! বলেই তরবারি ছেড়ে দেয়—যাও কেটে আনো দস্যু-সর্দারের মুণ্ডু। সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ায় ভেসে যায় তরবারি। এক কোপে দস্যু-সর্দারের মুণ্ডু কেটে থালায় সাজিয়ে আনলে তারাপদ যায় রাজার কাছে। 'থাকল কন্যে আর মুণ্ডু। আমি তারাপদ, হরিদাস ঘরামির ব্যাটা, যত দুঃখ মানুষের আছে তারে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিতে পারি।'*"[৯]

ছকাই ওরফে ছকুরও আছে এমন এক আশ্চর্য জগৎ, সে জগতের খোঁজ সে পেয়েছিল ছবিদাদার কাছে—"*কেউ জানে না, ছকাই জানে আর জানে ছবিদাদা—ডিম ফুটলে বাচ্চা হয়, বীজ পুঁতলে গাছ হয়, দুধে-দাঁত জরদার কৌটোয় রেখে দিলে মুক্তো হয়।*"[১০] আর উমাশঙ্কর, সুধীররঞ্জন, চন্দ্রশেখর, সোনা—এই চার কিশোর ভাইকে 'চোরা' বশির মিঞা তাদের পূর্বপুরুষের সঞ্চিত গুপ্তধনের গোপন উৎসটি জানিয়ে দেয়, "*আপনের ঠাউরদার, ঠাউরদার বাবা ট্যাবার জঙ্গলে থাকত...। ...ভিতরে অট্টালিকা আছে। ...শ্বেত গোখরো... গুপ্তধনের মধ্যে যক্ষ হইয়া বইসা আছেন...। যারে কয় কড়া পাহারা। বিঁড়া পাকাইয়া দুলছেন কালনাগিনী। শ্বেত গোখরো মধ্যরাতে বাইর হয়...। এরা দু'জনাই বাস্তুসাপ আপনেগ। ...দুধ-সর্প যারে কয় বাস্তুসাপ—তেনারা আপনার ঠাউরদার খাটের নীচে থাকে। দুধ-কলা মধ্যরাতে খায়। ঠাউরদা মধ্যরাতে দুধ-কলা খাওয়ায়। গৃহলক্ষ্মী বলে কথা। ...শাঁ শাঁ করে ছুটে আসে। সে-দৃশ্য দেখা কপালে না থাকলে হয় না। আপনার ঠাউরদার ঘরে ঢুইকা যায়। খাটের নীচে মেঝেতে গর্ত আছে... বাস্তু সাপের গর্ত।*"

ওর ভিতর দিয়া পাতিলে মাথা ঠেকায়। পাতিল উপরে উইঠা যায়। ফঁস-ফঁস করে। ঠাউরদা উইঠা বসেন। ...পাতিলখানা সরাইলেই তেনার গলা বাইর কইরা দেন। ...তাইন দুধ-কলা দিলে যখ-যখিনি খায়। তারপর অন্তর্ধান করে। যখ-যখনির পিছু নিতে পারলেই গুপ্তধন।"[১১]
এই যে তারাপদ বা ছবিদাদা কিংবা বশিরের বলা কথাগুলো সত্যিকারের ভালোবাসায় এমন টইটম্বুর যা কথনভঙ্গিতেই প্রতীয়মান হয় আর সেই স্নেহ-বাৎসল্যময় ভালোবাসাই ছোটো মানুষদের মনে এক কল্পলোক গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

ছোটোদের জন্য লিখতে গিয়ে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় নেহাতই রূপকথার একটা পৃথিবী সৃষ্টি করে ফেলেছিলেন এমন কথা যদি ভাবা হয় তবে সে ভাবনা আগাপাশতলা ভুল। মানুষকে মানুষের যথাযথ মর্যাদা দেওয়াতে তিনি বিশ্বাসী। সেই বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর লেখায়। তাই কিশোরদের সামনে তাদেরই মতো করে তিনি বাস্তবকে তুলে ধরেছেন যেখানে রয়েছে সামাজিক বিবিধ অন্যায়ের প্রসঙ্গ। কিন্তু তা স্লোগানধর্মী নয়, কোনো ইজম্‌ও নেই তাতে। বরং লেখকের কিশোর উপন্যাসের কাহিনির পটভূমি হিসাবে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের নাম করা হলেও তার মধ্যে জেগে ওঠে নিম্নবর্গীয় মানুষের ভারতবর্ষ, নির্দিষ্ট কোনো ভৌগোলিক বেড়ায় তাই তাঁকে বাঁধা যাবে না। আলোচ্য চারটি আখ্যানেরই স্থানিক গণ্ডির মধ্যে ঢুকে পড়ে অবিভক্ত বাংলাদেশের ঢাকা জেলার আড়াই হাজার থানার রাইনাদি গ্রাম, অতীনের জন্মভূমি। আর তারাপদ, রামসুন্দর, বশির, ছবিদাদার সঙ্গে মিশে থাকে তাঁর বাল্যস্মৃতি। জীবন নামে রহস্যের টানে দেশের অসংখ্য দরিদ্র কী ভাবে খিদের কষ্ট সহ্য করেও বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যায়, একদিকে শিরা বের করা শক্ত হাতে কাজের চাকা ঘোরানো, অন্যদিকে জেগে জেগে স্বপ্ন—স্বচ্ছন্দ যাপনে অভ্যস্ত জনেরা এই জীবনীশক্তির সন্ধান কখনোই পাবে না। অনেকটাই ইচ্ছের জোরে বেঁচে থাকা মানুষদের কথা শুনিয়ে ছোটোদের কোন পথে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বড়ো করে তুলতে চান সে বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যায়। আসলে দুঃখ-কষ্ট না পেলে তো মানসিক গুণাবলি ফুটে ওঠে না। তাই ছোটোদের দরদি মনে তিনি মানবতার বীজ পুঁতে দেন; তারাপদ, বশির, ছকু, অলিমদ্দি-কলিমদ্দি, সর্বজ্ঞ মশাইয়ের মধ্যে দিয়ে তিনি চিনিয়ে দেন সত্যিকারের বাংলাদেশকে।

সব কল্পনার গোড়াতেই থাকে বাস্তব। সেই বস্তুকে টপকে না গিয়ে অদ্ভুত এক রূপান্তরে দেখিয়ে দেন অতীন। গ্রামবাংলা, ঘন জঙ্গল আর পশুপাখির সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা ঘিরেই এই লেখকের ছোটোদের গল্পগুলো দানা বেঁধেছে। সেখানে তাঁর সতত সক্রিয় মনটি কাজ করে যায়। সে কাজ গল্প দিয়ে ছেলে ভোলানো নয়, ছেলেমেয়েদের জাগানো। আপাত তাৎপর্যহীন কাহিনিকে বাস্তব আর কল্পনার

সমানুপাতে এমন সুন্দরভাবে ছোটো-বড়ো সরল বাক্যে সহজ ভাষায় উপস্থাপন করেন তিনি যে কিশোরমনে সেগুলো বেশ স্থায়ী একটা ছাপ রেখে যায়। তাই 'উড়ন্ত তরবারি'র তারাপদকে জানতে গিয়ে মনে আসে রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি'র তারাপদ। এরা কেউই জীবনের দৈনন্দিনতায় আটকে থাকতে পারে না। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য তাদের বার বার ঘরের চৌহদ্দির বাইরে টেনে আনে। আর জঙ্গল, সেখানকার গাছপালা তাদের ফুল-ফল-লতা-কোটর সবই আসে বেঁচে থাকার একঘেয়েমিতে মুক্তির প্রতীক হয়ে। তারাপদর জীবনের সমাপ্তি হয় সেই বনেই আর ওই গাছপালাগুলিই যেন বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে ছকাইয়ের পরিচয় ঘটিয়ে দেয়। বশিরের ন্যায়-অন্যায়বোধ একান্তই তার নিজস্ব। মাতৃহীন শিশুসন্তানদের ভরণ-পোষণের জন্য সে চুরি করে, লোক ঠকায়। তার সঙ্গে আমাদের না মিললেও বুঝতে পারি সে ক্রিমিন্যাল নয়। বরং এরা সকলেই মরমি। অন্যের কষ্টে নিজেরা আলোড়িত হয়ে ওঠে। তাই ঠাকুরবাড়ির ছেলে উমাশঙ্কর লেখাপড়া ছেড়ে গামছা বিক্রি করে খাবে (সাময়িক বৈরাগ্যবশত) শুনে বশির বলেছিল—"*কর্তা গামছা বিক্রি কইরা খাইব ক্যান! ...আপনেরা বিলক্ষণ আমারে চিনেন। আমি আপনেগ বিপদের সময় মিছা কথা কইতে পারি! আমার ইজ্জত আছে না, বড়দা গামছা বিক্রি করলে আমি যামু কোনখানে। মুখ দেখামু কী কইরা।*"[১২] স্পষ্টই বোঝা যায় শ্রেণিচরিত্রের দ্বারা এদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত নয়; যেমন নয় ইন্দুমতীর বাবা। জমিদারির পাঁচ আনা শরিকের মালিক বাবুমশাই তার আমলার পুত্র বাচ্চুর সঙ্গে নিজের মেয়ে ইন্দুর অনাবিল সখ্যতা খুব সহজেই মেনে নিয়েছিলেন। যেন নিজেও উপভোগ করতেন ওই সম্পর্ক, বাচ্চুর মধ্যে তিনি যেন আপন কৈশোরকে ফিরে পেতেন, তার মান-অভিমান-কীর্তিকলাপ দেখে তিনি হাসতেন, "*ভারি পরিতৃপ্ত হাসি। জীবনে এই সুসময় মানুষ একদিন পার হয়ে চলে যায়—তারপর তো সারাজীবন রুক্ষ মাঠ, দাবদাহ, জটিলতা। এমন এক ভীরু বালকের ছবি জীবনে কার না পকেটে আছে।*"[১৩] এই ভাবনাতেই চরিত্রেরা আর বর্ণমালার নির্মিতি থাকে না, হয়ে ওঠে পাঠকের কাছের জন।

শিল্পের নিরিখে প্রতিটি কাহিনির শেষটা বেশ সুন্দর হয় যদি তার মধ্যে কারুণ্যের একটা আবছা রেশ মিশে থাকে। কিন্তু কোনো চরিত্রই করুণার পাত্র নয়। আসলে কৈশোরের মনে জীবনীশক্তির একটা জোর থাকে, সে কিছুতেই হতাশাকে, নিশ্চেষ্ট মৃত্যুকে, কোনোরকম সিনিসিজম্‌কে মেনে নিতে পারে না। তাই এখানে, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিশোর রচনায় কেউই অসহায়ভাবে হারিয়ে যায় না, আত্মসমর্পণ করে না। তারা সোচ্চার প্রতিবাদ জানায়। সেই প্রতিবাদ খুঁজে পাওয়া যাবে এক মহার্ঘ্য ব্যবস্থাপ্রণালীর প্রতি আস্থাহীন, বৌদ্ধিক পরাবাস্তবতার আঁকিবুকিতে;

যা শুধু কিশোর মনে নয়, বড়োদের মনেও এক ঝলক টাটকা হওয়ার ছোঁয়া লাগিয়ে দেয়, ভাবনার খোরাক জোগায়। আর এখানেই লেখকের কলমের মুনশিয়ানা।

আকরগ্রন্থ :

১. *বিন্নির খই লালা-বাতাসা : অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্র. সং ১৯৯১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯।*

২. *উড়ন্ত তরবারি : অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্র. সং ১৯৯৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯।*

উদ্ধৃতিসূত্র :

১. *অন্তর্জাল।*
২. *বিন্নির খই লাল-বাতাসা : অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৫৫।*
৩. *প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।*
৪. *প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।*
৫. *প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।*
৬. *প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০।*
৭. *প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০।*
৮. *উড়ন্ত তরবারি : অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১০.।*
৯. *প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।*
১০. *প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।*
১১. *প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।*
১২. *প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।*
১৩. *বিন্নির খই লাল-বাতাসা : অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৩৩।*

শম্পা রায়

জন্ম : ১৯৮৩। পেশা শিক্ষকতা। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন।

ফিরে পড়া

লিখেছেন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বুদ্ধদেব গুহ তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
সুব্রত মুখোপাধ্যায় আবুল বাশার কিন্নর রায়
মঞ্জুভাষ মিত্র সোহারাব হোসেন তপোধীর ভট্টাচার্য
বীরেন শাসমল হীরেন চট্টোপাধ্যায়

সমুদ্র-মানুষ : অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সিরাজ আকাদেমি পুরস্কার ২০১৪

লেখক অতীন, মানুষ অতীন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

জাহাজে জাহাজে, সমুদ্রপথে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তখন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি। তাঁর সেই সময়কার কাহিনী জেনেছি তাঁর 'অলৌকিক জলযান'-এর মত উপন্যাস পড়ে।

নাবিকের পোষাক ছেড়ে অতীন যখন কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসে আড্ডা দিতে আসতেন, তখনো তাঁকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম না। হয়তো দু'একবার দেখে থাকতে পারি রূপবান যুবকটিকে, কিন্তু এক টেবিলে বসে আড্ডা দেবার সুযোগ হয়নি। তার কারণ, কফি হাউসে তখন লেখক ও কবিদের টেবিল ছিল আলাদা আলাদা। আমি বসতাম কবিদের দলবলের সঙ্গে, কবিদের সীমানা টপকে অনধিকারীর মতন দু'একটা গল্প-উপন্যাস লিখতে শুরু করলেও খাঁটি গল্প লেখকদের কাছে পাত্তা পাইনি, তাঁরা খানিকটা করুণার চোখে দেখতেন।

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' নামে অসাধারণ উপন্যাসটি পাঠ করার পর পরই এই লেখক সম্পর্কে আমার বিশেষ আগ্রহ জাগে। পূর্ব বাংলার বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ মাখা এই রচনায় নিজেকেও যেন খুঁজে পেতাম। অতীন তখন থাকতেন কোন একটা রাজবাড়ীতে, দূর থেকে দেখেছি, কিন্তু বাড়ির অন্দর মহলে কখনো ঢুকতে পারিনি। সেই সময়ই অতীন এক নতুন প্রকাশনীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন, নাম ছিল বোধহয় 'রামায়ণী প্রকাশনী'। আমার কাছ থেকে অতীন একটা উপন্যাস চেয়ে বসলেন সেই প্রকাশনীর জন্য। একটি উপন্যাস ছাপাও হয়েছিল। কিন্তু প্রকাশনী বেশী দিন চললো না। আমার আশঙ্কা হয়েছিল, আমার মতন লেখকের বই ছাপার জন্যই কি প্রকাশনীটি

উঠে গেল? আমার নিজের সেই উপন্যাসটির নামও মনে নেই। সেটি সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেছে।

প্রকাশনার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে অতীন নিজে মুক্ত মনে লিখতে পেরেছেন। আমরা যখন মাসিক কৃত্তিবাস শুরু করি, তাতে গল্প-উপন্যাসও ছাপা হতো, সে পত্রিকাতেও লিখেছেন অতীন। দূর থেকে তীক্ষ্ণ নাশা, উন্নত ললাট যে ব্যক্তিটিকে মনে হতো বুঝি অহঙ্কারী, কাছাকাছি আসার পর দেখি যে মানুষটি ঠিক তার বিপরীত, ভারি সরল ও আন্তরিক ব্যবহার। এই সব মানুষদের মন আর মুখ আলাদা হয় না। এত বছর পরেও অতীনের মুখের ভাষায় কিছুটা বাঙালী টান রয়ে গেছে, সেটা আমার খুব ভালো লাগে। সম্ভবত অতীন ইচ্ছে করেই সে টান বজায় রেখেছেন।

অতীনের অনেকগুলি ছোট গল্প ও উপন্যাস পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু বন্ধু শ্রেণীর লেখকদের রচনা বিশ্লেষণ মোটেই সহজ নয়। সে কাজ করবেন অন্যরা। তবু একটা সামান্য সত্য সব সময় স্থির থাকে। যাঁর লেখা ভালো লাগে না, তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করা সম্ভব নয়। অতীনের সঙ্গে এত বছর যে আমার বন্ধুত্ব বজায় আছে, তার কারণ তাঁর লেখার প্রতি আমার অনুরাগ।

অতীনের আর একটি বিশেষ গুণ আছে, যা অনেক লেখকের মধ্যেই দুর্লভ। নিজে ব্যস্ত লেখক হয়েও তিনি প্রচুর পড়েন, সমসাময়িকদের লেখা এবং নবীনদের লেখা। যে-লেখা ভালো লাগে তা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করতেও পারেন। হাসতে পারেন প্রাণ খুলে। দূরে দূরে থাকি। এখন দেখা হয় অনেক দিন পর পর। কিন্তু যখনই দেখা হয়, অতীনকে মনে হয় যেন প্রিয় আপনজন।

বানান অপরিবর্তিত।

দরবারী সাহিত্য, মাঘ ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত।

প্রিয় অতীন

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

অতীনের সঙ্গে পরিচয় সে-ই কবে। তখন আমরা ছেলেমানুষ। কুড়ির ঘরে বয়স। আনকোরা বাঙাল, কথায় পূর্ববঙ্গের টান এবং সোজা সহজ একজন মানুষ। ঘটনাক্রমে আমিও তার মতোই ঢাকাই বাঙাল। তার সঙ্গে এখনও আমার দেশী ভাষাতেই বাক্যালাপ হয়।

জীবনে কত কষ্ট পেয়েছে অতীন তা বলতে গেলে মহাভারত। যৌবনকালে আমাদের সকলেরই অল্পবিস্তর অর্থসঙ্কট, দারিদ্র্যজনিত কষ্ট ছিলই। উদ্বাস্তু অতীনের কষ্টের কথা তার মুখেই যখন শুনেছি আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে যেত। বেঁচে থাকার জন্য, অন্ন-বস্ত্রের সংস্থানের জন্য তাকে অনেক কিছুই করতে হয়েছে, পড়াশুনোও বারবার ব্যাহত হয়েছে। জাহাজে সামান্য কাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে মহাসমুদ্রে। মাষ্টারী করেছে, কারখানার ম্যানেজারি করেছে। কোনও প্রতিকূলতার কাছেই ভেঙে পড়েনি কখনও। সবেচেয়ে বড় কথা দায়িত্বশীল পুত্র এবং স্নেহশীল দাদা হিসেবে নিজের পরিবারের প্রতি কর্তব্যও সে পালন করেছে কঠোরভাবে। পূর্ববঙ্গের অমিত অভিজ্ঞতা, তার রূপ-রস, পাখি-কীট-পতঙ্গটাও ছিল তার গভীরভাবে চেনা। তার সঙ্গে যোগ হল গোটা দুনিয়া চষে বেড়ানোর দিগন্তবিস্তারী এক অন্য জীবনের ছবি। আর সেই সবই তার লেখায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। এমনকি বহরমপুর, মুর্শিদাবাদের মানুষ ও প্রকৃতির কী সুন্দর অনুপ্রবেশ ঘটেছে তার কাব্যপ্রতিম গল্প, উপন্যাসে।

অতীন কোনদিনই বেশী প্রথা-প্রকরণের ধার ধারেনি। নিজেকে 'শিক্ষিত' করে তোলার জন্য বা আঁতেল হওয়ার জন্য বিদেশী বই-টই পড়তে যায়নি। যা কিছু গ্রহণ করার তা সে জীবনযাপন থেকেই গ্রহণ করেছে। তার পারিপার্শ্বিক, তার দেখা মানুষ, জনগণ, গ্রাম এসবই হল তার যোগানদার।

"নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে" আজকাল প্রায় মহাকাব্যের সম্মান পায়, তবু বলি অতীনের এই গ্রন্থটির জন্য আরও বড় পুরস্কার পাওনা ছিল। এই আশ্চর্য উপন্যাসটি যে কত আধুনিকতার লক্ষণ বহন করেছে তা একমাত্র একনিষ্ঠ পাঠকই বুঝতে পারবেন। তার কিছু ছোট গল্প আমাকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দেয়। অতীনের কলম থেকে এ রকম জটিল মনস্তত্ত্বের গল্প বেরতে পারে তা বিশ্বাস হতে চায় না। তার একটি উপন্যাসের কথা বলি। খানিকটা অবহেলিত ও উপেক্ষিত এই উপন্যাসটির নাম 'শেষ দৃশ্য'। বিষয়বস্তু চণ্ডালদের জগৎ। কী অনায়াস সংস্কারে যে অতীন এই জীবনের ভিতর ঢুকে গেছে তা দেখে হিংসে হয়।

আমি তাকে বলেছিলাম কি করে এ লেখা লিখলি বল তো? কিভাবে যে লেখে তা কি সে নিজেই জানে? জানে না। কারণ অতীন ঠিক সচেতন লেখক নয়। সে লেখে ধ্যানস্থ হয়ে, রূপসায়রে ডুব দিয়ে। সে প্রখর বৌদ্ধিক লেখক ছিল না কখনও, আর সেটাই বাঁচোয়া।

'শেষ দৃশ্য' উপন্যাসটা আমাকে এতটাই মুগ্ধ করেছিল যে, আমি নিজে থেকে বইটির রিভিউ করেছিলাম দেশ পত্রিকায়।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ আর অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনেই মুর্শিদাবাদ জেলার লোক। দুজনেরই পশ্চাদভূমি গ্রাম এবং এক মায়াবী প্রকৃতি। সিরাজ মনে প্রাণে কখনও শহুরে নয়। অতীনও নয়। দুজনের মধ্যে কোথাও একটা চৈতন্যগত মিল খুঁজে পাই। তারা দুজনে এসেই কলকাতা প্রায় জয় করে নিয়েছিল।

দুঃসহ এক দারিদ্র্যপীড়িত জীবন থেকে উত্তীর্ণ হয়ে অতীন যখন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হল, সংসারধর্মে মন দিল, তখনই তার সঙ্গে আমার পরিচয়।

সিরাজ আর অতীনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গভীর। তার কারণ ওরা তো শুধু বন্ধুই নয়, আমার প্রিয় লেখকও। যদিও ঠাট্টা মস্করা কম করি না। কিন্তু অতীন বা সিরাজের ক্ষমতার কথা কখনও ভুলেও যাই না।

জীবন সংগ্রামে অনেক মূল্য দিয়েছে অতীন, অনেক লড়াই করেছে, সাহসিকতার কাজও করেছে। কিন্তু তার মন অত্যন্ত কোমল। নরম মন, বাৎসল্য, বন্ধুপ্রীতি সব মিলিয়ে সে এক প্রাণবন্ত মানুষ। কায়দা-কানুনের ধার ধারে না, এই বালাই বিশেষ নাই। তার মনোভাবের সঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা মিল পাই।

দুই কৃতী পুত্র, সাধ্বী স্ত্রী, বউমা এবং নাতি নাতনী নিয়ে তার এখন ভরা সংসার। ইদানিং সে একটু ঘরমুখো হয়েছে। একটু বুড়োটে ভাবও এসেছে। যদিও জানি, ওটা তার মনের বুড়োমি। এসব ঝেড়ে এখনও সে আবার ভরা যৌবনের প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠতে পারে, এখনও পারে সাতসমুদ্রের অচেনা হাওয়ায় ভেসে পড়তে। তার কলম এখনও কত আশ্চর্য হাতের যবনিকা ধরিয়ে দিতে পারে।

বানান অপরিবর্তিত।

দরবারী সাহিত্য, মাঘ ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত ও লেখকের অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত।

কাছের মানুষ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

আমার লেখালেখি জীবনে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। একজনকে অনেকখানি খুঁটিয়ে দেখতে হলে খানিকটা দূরত্ব দরকার। তাই তার সম্পর্কে বেশী কথা বলা বেশ কঠিন কাজ। আমার কথা বলতে গিয়ে অতীন লিখেছিল, "আমরা দুই মুসাফির এক গাছতলায় বসে আছি।" কথাটা খুব খাঁটি। শ্রদ্ধেয় বিমলদা (বিমল কর) তাঁর সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কার প্রাপ্ত "পঞ্চাশটি গল্প" বইয়ের ভূমিকায় ঠিক একই সুরে বলেছেন কলকাতায় আসার পর সিরাজই ছিল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিমলদা আমার সম্পর্কে লিখতে লিখতে গিয়ে সেই কথাটারই প্রতিধ্বনি করেছেন।

দু'জনকার লেখক জীবনে ঘনিষ্ঠতা শুরু বহরমপুর শহরে। সময়টা বোধ করি উনিশ শ' আটান্ন সাল। ওখানকার লিট্‌ল ম্যাগাজিনে দুজনেরই হাতে খড়ি। সেই সূত্রে প্রথম পরিচয়। কিন্তু চমকে গিয়েছিলাম তার একটি গল্প (কার্ডিফের রাজপথ?) পড়ে। চমকের কারণ তার ভাষায় মায়াবি লালিত্ব। ওই সময় সে তার নাবিক জীবনের ভিত্তিতে 'সমুদ্র মানুষ' নামে একটি উপন্যাস লিখছিল। আমাদের আড্ডায় তার কিছু কিছু অংশ সে পড়ে শোনাত। তখনই বুঝেছিলাম একদা সে বনস্পতি হবে। ওই উপন্যাসটি কিছুকাল পরে উল্টোরথ পুরস্কার পায়। বই আকারে বের করেন মিত্রালয় প্রকাশন সংস্থা। তখনই তার নাম কলকাতায় পৌঁছে যায়। 'দেশ' পত্রিকার তখন উঠতি যৌবন। বিমলদার হাতে গল্প নির্বাচনের দায়িত্ব। আমাদের সমসাময়িক লেখকদের জানার কথা, বিমলদার হাত ছিল খুবই শক্ত। তাঁর কাছে

পাশ মার্ক পেলে তবেই কোন গল্প খাঁটি গল্পের স্বীকৃতি পেত। অতীন সহজেই পাশ করেছিল। আমার কি ঈর্ষা হত না। হত। সত্যি বলতে কি, আমার গ্রামের মানুষ অতীন এক দৌড়ে আমাকে ফেলে এগিয়ে গেছে এই ব্যাপারটাই আসলে আমাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তার নাগাল পাওয়ার জন্য দৌড়েছিলাম। অবশেষে উনিশ শ' তেষট্টি নভেম্বরে বিমলদা আমাকে পাশ মার্ক দিলেন। ডিসেম্বরে পাকাপাকিভাবে কলকাতায় এসে দেখি অতীন প্রায় রীতিমতো একটি রাজবাড়ির বাসিন্দা। শিয়ালদার কাছে কাশিমবাজার রাজবাড়িতে সে ডেরা পেতেছে। তারপর থেকে দুজনে আবার আগের মত কাছাকাছি হয়েছিলাম।

হ্যাঁ, বলতে ভুলেছি বহরমপুরে থাকার সময় সে আমাদের গ্রামের বাড়িতে এসেছে, সঙ্গে কয়েকজন বন্ধু। আমার ঘরে বসে সে তার সদ্য লেখা গল্পও শুনিয়েছে। তারপর চৌরিগাছা রেল কলোনির কাছে (অধুনা কর্ণসুবর্ণ স্টেশনের পরের স্টেশন)। ততদিনে সে প্রেমে পড়ে বিয়ে করেছিল এবং দুটি সন্তানের জনকও। খবর পেয়ে তার কাছে গেছি। ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সেখানকার স্কুল শিক্ষক। রাত্রিবাস করেছি। সাহিত্য নিয়ে কথা বলেছি। বিকেলে হিজল বিলের বাঁধের ওপর হাঁটতে হাঁটতে কতদূর গেছি। দূরের দিগন্তে সূর্যাস্তের পর সে এক মায়াবি আলো। আমরা দুজনে যে যার মনের কথা নিঃসঙ্কোচে উজাড় করে দিয়েছি। এই বুড়ো বয়সে সেই অপার্থিব বিকেলটাকে মনে পড়ে যায়। বিষণ্ণ হই। দুই বন্ধু হয়তো সাহিত্যে স্বীকৃতি অর্জন করেছি কিন্তু এখন তো আর নতুন কোন স্বপ্ন নেই। সেই হিজল বিলের স্বপ্নের বিকেলের মতো।

আগেই বলেছি তার লেখা প্রথম পড়েই জেনেছিলাম সে বনস্পতি অর্থাৎ বড় মাপের লেখক হবে। কলকাতায় এসে ক্রমে ক্রমে আমার মনে সেই বিশ্বাস সত্যে পরিণত হতে দেখেছিলাম। 'অমৃত' পত্রিকায় যখন সে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' লিখছে তখন আর চুপ করে থাকতে পারিনি। অমৃতের প্রতি দীর্ঘ চিঠি লিখে বলেছিলাম 'পথের পাঁচালি'-র পর এতো দিনে এই একটি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের মূল সুরকে অনুসরণ করেছে। অনেক লেখক বন্ধু আমার এ কথায় বাঁকা হাসি হেসেছিলেন। আমার কাছে গোপন ছিল না। এই উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে নিজের আসন স্থায়ী করে নিয়েছে। আমি, অনেক বিদগ্ধ সমালোচক ঈষৎ কুণ্ঠার সঙ্গে প্রশংসা করেছেন, দেখেছি। কিন্তু আমার তাতে মন ভরেনি। সহসা একদা একটি লিটল ম্যাগাজিনে এক অখ্যাত তরুণ অতীনের এই উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখে ফেললেন, "এই উপন্যাসে যা কিছু ঘটছে সবই যেন স্বপ্নের ভিতরে ঘটছে।" এই লাইনটি পড়া মাত্র চমকে উঠে ভেবেছিলাম কী আশ্চর্য! অতি বড় বিদগ্ধ পাঠক

এই উপন্যাসের যে আঙ্গিককে মোটেও বুঝতে পারেননি একজন অখ্যাতনামা তরুণ পাঠক বিস্ময়করভাবে তা শনাক্ত করতে পারলেন!

অতীনের লেখার আরো বিচার বিশ্লেষণ ভবিষ্যতে হবে। কিন্তু তার সম্পর্কে একটা কথা আমার খুবই জানা। সে তার ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার উপাদানকেই এ যাবৎকাল নিপুণভাবে চিত্রিত করে আসছে। তার নাবিকজীবনের নির্মম ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতাকেও সে সাহিত্যে এনেছে। এখনও লক্ষ্য করছি যা কিছু সে ইতঃস্তত লিখছে সেগুলি সবই তার ওই অভিজ্ঞতার নিপুণ চিত্রায়ণ। অনেকে সাহিত্যের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা শব্দটি শুনলেই চটে যান। কিন্তু সব সেরা সাহিত্যের উপাদানই তো সাহিত্যিকের ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কুড়ানো। কেন আমরা ভুলে যাই একজন জাত লেখকের অভিজ্ঞতার আর একজন সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা কখনওই এক নয়। অতীন তার অভিজ্ঞতার শিল্পরূপকেই এতদিন ধরে চিত্রায়িত করে আসছে। অনেক সময় সহসা আমি চমকে উঠি, কী আশ্চর্য! অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এ কি সত্যি না স্বপ্ন?

বানান অপরিবর্তিত।

দরবারী সাহিত্য, মাঘ ১৩০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত।

অতীন

বুদ্ধদেব গুহ

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার আলাপ প্রায় চল্লিশ বছর হবে। সে আলাপ আনন্দবাজারের রবিবাসরীয় সম্পাদক রমাপদ চৌধুরীর ঘরে। অতীন সম্ভবত কোন গল্প দিতে এসেছিল। ঠিক মনে নেই। প্রথম দর্শনেই মনে হয়েছিল এই মেকি দুনিয়াতে সে একজন আস্ত খাঁটি মানুষ। ভণ্ডামি তাকে ঘুণ ধরাতে পারেনি, হয়ত পারবেও না কোনদিন। আরও একটা কথা মনে হয়েছিল, সেটা হল এই যে, নিজের সম্বন্ধে কোনো মিথ্যা শ্লাঘা বা অহমিকা যেমন তার নেই তেমন কোনরকম হীনমন্যতাও নেই। তার নিজের সম্বন্ধে তার ধারণাটা স্বচ্ছ জলের মতোই স্বচ্ছ। কে জানে! জলের মানুষ ছিল বহুদিন সে জন্যেই হয়ত তার মধ্যে জলের স্বচ্ছতা সহজে এসেছে।

প্রথম দর্শনেই হাসিমুখের রসবোধসম্পন্ন অতীনকে আমার ভাল লেগে গেছিল। মনে নেই সে তখনও খৈনী খেত কি না। সাম্প্রতিক অতীত থেকে দেখেছি সে খায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ও যেমন খেত। অতীনকে খুশি করার জন্যে ওর কাছ থেকে খৈনী খেয়েছি, যেমন শীর্ষেন্দুর কাছে থেকে চেয়ে নস্যি নিই।

যখন অতীনের সঙ্গে দেখা হয় তখনও আমি তার কোনো উপন্যাস পড়িনি। যদিও এখানে ওখানে গল্প পড়েছি এবং তার গল্প ছিল তার নিজস্ব। যদিও অতীনের বিমলদার (কর) "নূতন রীতি"তে যাঁরা লিখতেন তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল, "নূতন রীতি"তে যে খুব একটা প্রভাবিত হয়েছিল তা মনে হয়নি। সে তার নিজের মনেই লিখত—নিজেরই রীতিতে। যেমন অরিজিনাল মানুষ সে, তেমনই ছিল তার সাহিত্য।

পরবর্তীকালে অতীনের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' এবং 'অলৌকিক জলযান' পড়ে আমি মুগ্ধ হই। প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকো'র সঙ্গে পটভূমি ও অনুষঙ্গে

মিল থাকলেও এ দুটি বই-ই বাংলা সাহিত্যে দুই দারুণ সংযোজন।

সমুদ্রের বুকে সামান্য চাকরী ভরসা করে সে ভেসে গেছিল। সমুদ্রের নোনা ও নীল সবুজ বাদামী কালো জলের সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে পেরেছিল। অন্য অনেকেরেই মতো শুধুমাত্র তীর থেকেই সে দেখেনি সমুদ্র। সেই সুবাদে বহু দূরদেশের নানা বন্দরে তার পা পড়েছিল। বহু বিদেশীদের সংস্পর্শেও সে এসেছিল—উচ্চশিক্ষিত বা দারুণ সংস্কৃত নারী নয় তারা, তারা মাটির কাছাকাছির মানুষ। তাদের খুব কাছ থেকেই দেখেছিল অতীন। ভালবেসেছিল। তারপরে সে তাদের উপস্থাপিত করেছিল পাঠক-পাঠিকাদের কাছে। তার জীবনের অভিজ্ঞতা সে তার নিজের মধ্যে কৌটো বন্দী করে রেখে নষ্ট করেনি, আমাদের সককে তার ভাগ দিয়েছিল।

অতীনের মধ্যে যে কোনো ভণ্ডামি নেই তা তার মুখের ভাষাই প্রমাণিত করে। অনেক পূর্ববঙ্গীয় লেখক ও কবিরাই যখন তাঁরা যে "বাঙাল" এই সত্যটি অতি সযত্নে গোপন করে রাখতে চান এবং তাঁদের কথ্য ভাষাতে 'করলুম' 'খেলুম' 'গেলুম'-র আশ্রয় নেন তখন অতীন তার মিষ্টি বাঙালপনাকে কোনোরকম ভণ্ডামি করেই ঢেকে রাখে না। পূর্ববাংলার ভাষায় সে কথা বলে, সব সময়ে হেসে কথা বলে এবং তার সঙ্গে দেখা হলে যে কোনো মানুষেরই ভাল লাগে। সেটা লাগে কারণ সে নিজে ভালমানুষ বলে।

আমার জীবন এমনই যে অন্য লেখকদের সঙ্গে তেমন মেলামেশা বা আড্ডা মারার অবকাশ কখনওই হয়নি। আগেও হয়নি, এখনও হয় না। অতীনের মতো অন্য অনেকেরেই সঙ্গে আলাপ হয়েছে রমাপদবাবুর ঘরে আর সেই সব আলাপের কিছু কিছু সখ্যতাতে রূপান্তরিত হয়েছে অবশ্যই, তবে বন্ধুত্ব হয়নি। তাতে দুপক্ষের কারোরই ক্ষতি হয়নি। কারণ "Familarity breeds Contempt" এই প্রবাদের শিকার কারোকেই হতে হয়নি, আমাদের সখ্যতা দূরের বলেই হয়ত।

অতীন অত্যন্ত ক্ষমতাবান লেখক। আমি ছাড়া আমার সমসাময়িক সব লেখকই নানা রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। আমিই একমাত্র অপুরস্কৃত রয়ে গেছি। তাতে ক্ষোভ নেই। বরং এক ধরনের মজাই পাই। সেই সব পুরস্কার কী প্রক্রিয়াতে পাওয়া হয়ে থাকে সে সম্বন্ধে অনেকেরেই যথেষ্ট ধারণা আছে কিন্তু অতীন সম্বন্ধে বলতে পারি অন্য দু-একজন মাত্র সমসাময়িক লেখকেরই মতো সে কোনো পুরস্কারই চেষ্টা করে বা দড়ি টানাটানি করে পায়নি। তেমন করে পায়নি বলেই তার পুরস্কার পুরস্কারই হয়ে থেকেছে, নানা মানী-গুণী মানুষের তিরস্কারের বিষয় হয়নি।

অতীন সুস্থ থাকুক দীর্ঘদিন, ভাল লিখুক, আরও অনেক পুরস্কার পাক, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি।

বানান অপরিবর্তিত।

দরবারী সাহিত্য, মাঘ ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত ও লেখকের অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত।

একজন স্বভাবলেখক

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বভাবকবি শব্দটার সঙ্গে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত, কিন্তু স্বভাবলেখক! কেন জানি না অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা যতবারই পড়ি আমার মনে হয় এই সেই লেখক যিনি লেখক হওয়ার জন্যই জন্মেছেন। তার কলমে অনায়াসে উড়ে এসে বসে পঙক্তিরা। তাঁর কলমে অতিদ্রুত আঁকা হয় রংবেরঙের ছবিরা। কখনও প্রজাপতির মতো বিচিত্র সাজপোশাকে ওতপ্রোত হয়ে, কখনও ফড়িঙের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে। কখনও ধূসর ইঁদুর যেমন মাটির গর্তে ওম খোঁজে তেমনি। তাঁর লেখার এমনই একটা স্বাদু ও নরম জাদুর মিশেল থাকে যে সেই লেখার স্টাইল অনুকরণ করাও দুঃসাধ্য। স্বভাবকবিরা যেমন যখন ইচ্ছে পঙক্তির পর পঙক্তি কবিতা তৈরী করতে পারেন, তেমনই অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্যও যেন অনায়াসলব্ধ।

'অমৃত' সাপ্তাহিকের পৃষ্ঠায় 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' যখন প্রথম পড়তে শুরু করি সে সময় হোঁচট খেয়েছিলাম নানা কারণে। প্রথম কয়েক কিস্তি পড়ার পর মনে হয়েছিল এই কিস্তিগুলো আগেই যেন কোথাও পড়েছি। তাহলে কি লেখাটা অন্য কোথাও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল! তাহলে এই উপন্যাস কি পুনর্মুদ্রণ! কিন্তু 'অমৃত'-র মতো পত্রিকা কেন কোনও লেখকের উপন্যাস পুনর্মুদ্রণ করবে! লেখার কিস্তিগুলো দ্বিতীয়বার পড়তে গিয়ে স্মরণে আসে এগুলো কোনটাই উপন্যাসের কিস্তি নয়, এর আগেই নানা পত্রপত্রিকায় অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক একটি গল্পই। পরে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ই আমাদের জানিয়েছিলেন সম্পাদক যখন

তাঁকে উপন্যাস লেখার কথা বলেছিলেন তিনি সম্পাদকের সঙ্গে কড়ার করে নিয়েছিলেন তাঁর উপন্যাসের প্রথম আট কিস্তি হবে পূর্ব প্রকাশিত তাঁর আটটি গল্প। সম্পাদক সম্মতি জানানোর পরই তিনি শুরু করেন লিখতে।

পরে লক্ষ করেছিলাম নবম কিস্তি থেকে যে-লেখা প্রকাশিত হয়েছিল তা প্রথম আটটি গল্পের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে কি নিখুঁত শৈলীতে। যেন উপন্যাসটির খসড়া হিসেবেই লেখা হয়েছিল গল্পগুলো। কিংবা এমনও হতে পারে যে কোনও লেখকই একটিই গল্প লেখেন সারা জীবন ধরে, একটু একটু করে।

বিষয়টি নাড়া দিয়েছিল আমাদের। তাহলে এভাবেও উপন্যাস লেখা যায়!

তবে সেই ঝাঁকুনি নিরাশ করেনি আমাকে। লেখাটির গদ্য যেমন আপ্লুত করছিল, সেই সঙ্গে বড় উপন্যাস লেখার কলাকৌশলও আবিষ্কার করলাম এই উপন্যাস থেকে। কোনও বড় মাপের উপন্যাসে কাহিনির অনেকগুলো ধারা থাকে। এই আটটি গল্প উপন্যাসটির বিভিন্ন ধারা। তার মধ্যে একটি ধারা প্রধান। অন্যগুলি সেই মূল কাহিনীর সঙ্গে মিশে থাকছে যার যার প্রয়োজন অনুযায়ী।

কিন্তু এ তো গেল উপন্যাস লেখার গঠনকৌশল। কিন্তু আসল বিস্ময় ছিল অন্যখানে। এই উপন্যাসে ব্যবহৃত গদ্যের মধ্যেই সেই আশ্চর্য বিস্ময়। চিরাচরিত যে গদ্যের সঙ্গে আমরা পরিচিত, ঠিক সেরকমটি লেখেন না অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। হঠাৎ এই উপন্যাসের গদ্য পড়লে মনে হবে প্রতিটি অনুচ্ছেদই কেমন অগোছালো, আলুথালুভাবে লেখা। কেমন এলিয়ে পড়েছে পঙক্তিগুলো। অথবা বাক্যগুলো যেন ঠিকমতো শেষ হচ্ছে না। কিংবা বাক্যের গঠন কী দুর্বল!

কিংবা সেসময় এরকম একটা অনুভূতিও হয়েছিল যেন খোলা মাঠের মধ্যে গাঁয়ের একটা মেয়েমানুষ এলোথেলো হয়ে শুয়ে আছে, কেউ তাকে দেখল কি দেখল না তাতে সংবিৎ নেই, তখন তার দিকে নজর পড়লে সহসা যেমন শিরশির করে ওঠে শরীর, এই উপন্যাস ঠিক যেন তেমনি।

পরে আরও নিখুঁতভাবে পড়তে গিয়ে দেখি এই গদ্য একেবারেই অন্যরকম, আর এ ধরনের গদ্য ছাড়া এই উপন্যাসে দাঁড়াতেই পারত না পাড়াগাঁর আলুথালু শরীর। বিষয়ের অভিনবত্ব ছাড়াও এই গদ্যের জন্যই তো এই উপন্যাস পড়তে গিয়ে উদ্বেল হন পাঠক।

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত সেই 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাস পড়ে গোটা বাংলা সাহিত্যের পাঠক আজ থেকে তেত্রিশ বছর আগে সেই যে মজে গিয়েছিলেন তার রেশ আজও কাটেনি তার প্রমাণ এই বৃহদাকার উপন্যাসের বিক্রি আজও সমানতালে অব্যাহত। যখন কোনও উপন্যাস এত বছর পরেও বাংলাসাহিত্যে

প্রাসঙ্গিক থাকে, সেই উপন্যাসকেই তো কালজয়ী বলেন বিশেষজ্ঞরা।

তারপর এই দীর্ঘকালে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন আরও বহু উপন্যাস ও ছোটগল্প। তাঁর সাহিত্যকৃতির পরিমাণ এই দীর্ঘকালে খুব কম নয়। তবু 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' আজও বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস।

কিন্তু কী ছিল সেই বিশাল উপন্যাসে যা আজও বাংলা উপন্যাসের আলোচনায় সমানভাবে প্রাসঙ্গিক!

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, বোধহয় আজ পর্যন্ত আর কোনও ঔপন্যাসিক তাঁর মতো নিজের জীবন নিয়ে দেড়হাজার পৃষ্ঠার উপন্যাস লেখেনি। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'র পর 'অলৌকিক জলযান' ও তার পর 'ঈশ্বরের বাগান'—এই ট্রিলজি আত্মজৈবনিক উপন্যাস সেদিক থেকে একটা রেকর্ড। দেশভাগের পর এক ছিন্নমূল বালক এপারে এসে যেভাবে জীবনকে দেখেছেন, বিপর্যস্ত হয়েছেন বাস্তুহারা হওয়ার সুবাদে, কাজ খুঁজতে গিয়ে জাহাজে উঠে বসেছেন আচমকা, তারপর দেখেছেন জীবনের নানা দিক, সেই জীবন একে একে উঠে এসেছে তাঁর এই ট্রিলজি উপন্যাসের পৃষ্ঠায়।

আত্মজৈবনিক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে বেশ অনেকগুলো লেখা হয়েছে, তার মধ্যে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' অবশ্যই দু-তিনটির মধ্যে। কিন্তু এছাড়াও যে কারণে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তা তাঁর লেখা কিছু অসম্ভব ভালো গল্প। তাঁর যে বইটি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে সেই 'পঞ্চাশটি গল্পে'র যে কোনও একটি গল্প পড়তে শুরু করলেই পাঠক আবিষ্ট হবেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অদ্ভুত গদ্যের মায়ায়। সেই সঙ্গে তাঁর গল্পে যে আশ্চর্য মানবিকতার ছোঁয়া থাকে সেই জাদুতেই আগাগোড়া টেনে রাখে পাঠকের মনোযোগ।

কিন্তু কেন লেখেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়? এ প্রশ্নের উত্তরও তিনি লিখেছেন তাঁর নিজের মতো করে :

"কেন লিখি এ প্রশ্ন বড়োই অবাস্তব। না লিখে আমার উপায় ছিল না। অস্তিত্বের সংকট থেকে লিখি। জন্মেছি, বড়ো হয়েছি, জীবনের নানা সংঘাতে নিজেই জর্জরিত। দেশ ভাগ থেকে দাঙ্গা, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং সমাজের শোষণ আমাকে পীড়া দেয়। আমার অস্তিত্ব নাড়া দেয়, না লিখে পারি না। কিছুটা প্রতিবাদের মতো আমি আমার অনুভূতিমালা সমূহ লেখায় ধরে রাখার চেষ্টা করি।

দেশ ভাগ আমাকে ছিন্নমূল করেছে।

এক জীবনে কত অভিজ্ঞতা। সমুদ্রে ঘুরে বেড়িয়েছি সাধারণ জাহাজী হয়ে। ট্রাক ক্লিনার ছিলাম একটা গ্যারেজে। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাও আছে। তারপর

কোনও স্কুলের প্রধান শিক্ষক। সব ছেড়ে কলকাতায় কারখানায় ম্যানেজার, তারপর সাংবাদিকতা, নানা পেশায় নানা মানুষজনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আমার লেখার বিষয়—একটা সময়কে ধরে রাখা। এই সব অভিজ্ঞতা এমন উৎপীড়নে ফেলে দেয় যে আমি না লিখে পারি না।"

নিজের সম্পর্কে যে লেখক এভাবে উন্মোচন করতে পারেন তাঁর জীবনদর্শন অবশ্যই আকর্ষণ করতে থাকে পাঠককে। তাঁর এই এলানো গদ্যই পাঠককে টেনে নিয়ে যায় কাহিনির কেন্দ্রবিন্দুতে, আস্তে আস্তে, প্রায় অমোঘভাবে। উদ্ধৃত করি কয়েকটি পঙতি :

'লফিকুর এইমাত্র ঘরে ফিরেছে! ফিরেই হাতমুখ ধুয়েছে। সে বারান্দায় সাইকেলটা তুলে রাখেনি। কারণ সে আবার সাইকেলে দেখতে বের হবে—রাতে রাতে ওরা কতদূর পর্যন্ত পোস্টার মেরে আসতে পেরেছে।'

অথবা,

'গাছপাতার আড়ালে সূর্যের আলো—ছায়া ছায়া ভাব, হেমন্তের শীত। সোনা চিঠি হাতে অর্জুন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। শীত শেষ হয়ে আসছে বলে সকাল সকাল দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে।'

কিংবা এই পঙতিগুলো :

'জায়গাটা বড় নির্জন, পুকুরটা প্রাচীন। মজা দিঘির মতো দাম এবং কচুরিপানায় ঠাসা। পাড়ে পাড়ে কত বিচিত্র গাছগাছালি গভীর বনের সৃষ্টি করেছে। পথে শুকনো ঘাস পাতা।'

এমন অজস্র, অসংখ্য ছবির রঙিন সমাহারে একটু একটু করে গড়ে উঠেছে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'র বিশাল শরীর যা বাংলাসাহিত্যের এক পরম সম্পদ। গ্রামবাংলার এক আশ্চর্য রূপকথার জীবন কী সহজ ও সাবলীলভাবে উঠে এসেছে তাঁর আঁকা নানা ধরনের কোলাজের মাধ্যমে। কিন্তু শুধু কি এই বৃহৎ ধ্রুপদী উপন্যাসেই লেখকের সিদ্ধি! তাঁর একটি ছোট্ট উপন্যাস 'অন্নভোগ' থেকেও উদ্ধৃত করি কয়েকটি লাইন যেখানে ফুটে উঠেছে লেখকের জীবনবোধ :

'বনভূমির কী যে থাকে সবুজ ঘ্রাণ, এই বেলায় বাতাসে তার ঘ্রাণ ছড়াচ্ছে। পরীর চোখ বিস্ফারিত। রোমকূপে ঝড়। আকাশ বাতাস থেকে দেবদূতের মতো উঠে আসছে মাত্র একটি মুখ—সে এতই নিষ্পাপ, সে এতই ভীরু, তার যেন জোরজার করারও ক্ষমতা নেই। এখন আর চোখের সামনে কোনো কালভুজঙ্গ দেখতে পাচ্ছে না—যেন দুই নরনারী সংলগ্ন হচ্ছে। সমর্পিত প্রাণ। সে আর স্থির থাকতে পারছে না। এবার পরী নিজেই কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল—ঠিক সাপের ভঙ্গিতে এই মোচড় তাকে পীড়নের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। চোখ লাল, কান গরম—এমন কী বালক-বালিকার সামনে দাঁড়িয়ে সঙ্গম দৃশ্য

উপভোগ করা অশোভন—তা পর্যন্ত খেয়াল নেই। শরীরের গভীর অন্তস্থল থেকে দ্রুত কী সব সংকেত পাঠাচ্ছে হৃৎপিণ্ডে। ধক ধক করছে—বুক। সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। পিলুর কাঁধে ভর দিয়ে কোনো রকমে বলল, আমার কী হচ্ছে! জোর পাচ্ছি না। শিগগির আমাকে নিয়ে পালা। আমি না হলে মরে যাব।'

এভাবে একের পর এক যিনি পাঠককে উপহার দিয়ে চলেছেন এত উপন্যাস, তিনি মানুষটা আসলে কেমন! তাঁর সঙ্গে যেটুকু মিশেছি তাতে এই প্রত্যয় হয়েছে যে লেখক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক যেমনটি, মানুষ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ও খুবই সরল ও মোহময়। ধুতি-পাঞ্জাবীতেই স্বচ্ছন্দ এই মানুষটির কথার মারপ্যাঁচ কম। যা বলেন স্পষ্টাস্পষ্টি। কথায় পূর্ববঙ্গীয় টান, সদাহাস্যময় ও সাধাসিধে মানুষটির ধ্যানজ্ঞান সাহিত্যই। খ্যাতির পিছনে কখনও ছোটেননি, কিন্তু সবার চোখের আড়ালে থেকেও এখন খ্যাতিই ছুটছে তার পিছনে।

কখনও অন্তরঙ্গ আলোচনায় বলেন, 'বুঝলে, লেখায় হিউম্যান টাচ থাকা চাই, তবেই পাঠক তোমার লেখা পড়বে। কলম দিয়ে ছুঁয়ে ফেলতে হবে পাঠকের মন। বড় লেখকের সেইটেই গুণ।'

লেখকের এই বোধ নিশ্চয়ই মনে রাখবেন তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম।

বানান অপরিবর্তিত।

দরবারী সাহিত্য, মাঘ ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত এবং লেখকের আগ্রহে ও অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত।

অতীনদার 'সাদা অ্যাম্বুলেন্স'

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে তিন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আরও কিছু বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন যাঁরা নিজের নিজের মতনই আলাদা। মানুষ এবং লেখক হিসেবে। মানুষ কথাটি এ জন্য বলতে হয় যে প্রথমে মানুষ, পরে লেখক। তবে বিখ্যাত তিন বন্দ্যোপাধ্যায় দিগরের মানুষি বিষয় তো সবার জানার কথা নয়—কেবলমাত্র তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে কিঞ্চিৎ সরিয়ে রেখে, তাঁর সঙ্গে আমার কৈশোরে পিতামহ-পৌত্র সম্পর্ক ঘটেছিল। সে কথা ভিন্ন। কিন্তু অতীনদার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের বহু আগে তাঁর লেখার সঙ্গে দেখা হয়েছে। এটাই স্বাভাবিক।

বাংলা সাহিত্যে তথাকথিত সমালোচক বন্দী হয়ে রয়েছে সেই কবে থেকে। লেখকরা পারতপক্ষে সমালোচনার কলম হাতে নেননি। আবার কুসমালোচনা হলে চটে যান। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় একজন লেখক যদি সমালোচনা করতে বসেন আর এক লেখককে তাহলে বিষয়টা তত্ত্বকথার বাইরে চলে যায়। অনেকটাই সত্যধার্য হয়ে ওঠে।

এ কথা বলার মানে এই নয় যে অতীনদার লেখাপত্র নিয়ে একটি বিস্তৃত আলোচনা ফাঁদার পরিকল্পনা রয়েছে আমার। কিন্তু লিখতে বসে তাঁর হরেক রচনার মধ্যে থেকে একটি গল্পের কথা কেন জানি মনে পড়ছে। সেই গল্পটি অনেকদিন আগে সম্ভবত 'এক্ষণ' পত্রিকায় পড়েছিলাম। গল্পের নাম 'সাদা অ্যাম্বুলেন্স'।

একজন লেখক যে সব সময়েই অভিনেতা এবং বাহ্যত কত আলাদা তার উদাহরণ এই গল্পটি। অতীনদা বাইরে অত্যন্ত সিধে সরল আর ঠোঁটকাটা মানুষ।

কোনও রাখঢাক না করে যা মুখে আসে বলে দেন। ফলে অনেক সময় বিপত্তি ঘটে। সরল সত্য সহ্য করার ক্ষমতা বেশিরভাগ মানুষেরই তো থাকে না। কিন্তু লেখক অতীনদা বড় বড় লেখকের মতনই অন্তর্জগতে রহস্যময় এবং নিজের কাছেই অপরিজ্ঞাত। এই তো একজন লেখকের বাইরের ঘর আর অন্দরমহলের পাকা খবর।

'সাদা অ্যাম্বুলেন্স' গল্পটি আরম্ভ হয় ভারী সরল ধারায়— বাড়ির বয়স্ক কাজের লোক সুবলের হঠাৎ অসুস্থতা দিয়ে। যে লোক কখনও অসুখে পড়ে না তার অবশেষে চিকেন পক্স ধরা পড়ে বাড়ির ছোটবাবুর চোখে। সুবল সে দিন বাজার করেছে। মাংস কিনে এনেছে। সেই সঙ্গে গায়ের গোটা জ্বর আড়াল দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আড়ালে রাখা গেল না সে ব্যাধি। কিনে আনা মাংস ফ্রিজে চলে গেল। বাড়ি সুদ্ধ প্রায় সবাই ছোঁয়াচে অসুখের আতঙ্কে। ছোটবাবু চাইলেন ওকে ভরসা দিতে। কিন্তু প্রতিরোধ ঠেকাতে পারলেন না। সুবল বিতাড়িত হল। চলে গেল। গিয়ে আশ্রয় নিল দূরে তার আত্মীয়সম নিমগাছটির ছায়ায়। এসে জুটল দুই বালক। পরিচয়হীন অনাত্মীয়। তারা ক্রমে সুবলের সঙ্গী হয়ে গেল। ইতিমধ্যে হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স সুবলকে নিয়ে যায় আবার ফিরিয়ে দিয়ে যায় নিমগাছের নিচে। কেননা হাসপাতালে চিকেন পক্সের জন্য কোনো ওয়ার্ড নেই। গাছ থেকে নিমপাতা ঝরে পড়ে। কলকাতার আকাশে চাঁদ ওঠে। বালকেরা ভাঙা এক পাঁচিলের গায়ে সেঁটে দেওয়া পোস্টার দেখে—'বড় মাঠে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হচ্ছে। যে যার মতো এখন চাষ করতে লেগে যাও। সবুজ চারায় ছেয়ে যাবে, ফুল ফুটবে, ফল হবে। মানে পৃথিবীর জায়গা বদল করে নাও।' বালকেরা বলছিল তাকে সেই পোস্টার পড়াতে নিয়ে যাবে। ওই সব কথার মানে বুঝে নেবে তার কাছ থেকে। কিন্তু তার আগেই সাদা অ্যাম্বুলেন্স এসে সুবলকে নিয়ে গেল। বালকদের মন খারাপ। তাদের ওই বুড়োটির জন্য কষ্ট হতে থাকে। এর পর ফিরিয়ে আনে সুবলকে ওই অ্যাম্বুলেন্স যথারীতি। সুবল শুয়ে পড়ল নিমতলায়। রাতে, শহর যখন সুনসান, সুবল বালকদুটিকে সঙ্গে নিয়ে চলল সেই লিখন দেখতে। পরিচিত আশ্রয়ের সামনে এসে দাঁড়াতে সব জানলা-দরজা ভয়ে বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। ব্যালকনিতে চেনা পোষা কুকুরটি ডেকেই চলল। তারা তিনজন বাড়ির হলুদ রঙা দেওয়ালের নিচে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। তারপর চলে গেল পেছনের দেওয়ালে। রাতে রাতে লিখে বেড়াতে লাগল, বড় মাঠে বৃষ্টিপাত হচ্ছে...।

এর পরেও সামান্য কিছু আছে। সেটুকু না থাকলেও বুঝি ক্ষতি ছিল না। কিন্তু গল্পপাঠের পর নিভৃত বিরাম-সমুদ্রের একটি বেদনা চিন চিন করে। এরকম হয়েই চলে। সেই সঙ্গে ওই শিশু দেবদূত-সমান বালকদ্বয়ের জন্য আনন্দও এক ফোঁটা।

যাঁরা ফর্ম, কনটেন্ট, ম্যাজিক এ সব নিয়ে ভাবতে বসবেন তাঁরা এ গল্পটি না পড়লেই ভালো, তবে পাঠকের লাভ। ধরে বেঁধে কায়দা করে গল্প না লেখার ভঙ্গীধারী গল্পমালার বাইরে একটি বিচিত্র গল্প পাঠের দুঃসাহসী অভিজ্ঞতা। এমন তো রোজ রোজ লেখা হয় না। ফলে মরণোত্তর দেহদানের পর কাটাছেঁড়া চলতে থাকুক নিয়ম মেনে।

তবে অতীনদা তো গল্প লিখে খালাস। এবার তথাকথিত পণ্ডিতেরা প্রতীক-ট্রতীক নিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ুন। ম্যাজিক খুঁজুন। আর লেখক বিষাদ থেকে বিষাদান্তরে মগ্ন হয়ে যান। দেবদূত বালকদ্বয়ের ছোঁয়ায় রোমাঞ্চিত হয়ে থাকুন।

বানান অপরিবর্তিত।

দরবারী সাহিত্য, মাঘ ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত ও লেখকের অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত।

অতীনদার সাহিত্য মানুষের দিনলিপি

আবুল বাশার

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ লেখক। তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা সমালোচনা এবং তাঁর সাহিত্যের অনন্যতার হদিস দেওয়াটা সম্পাদক-সমালোচকদের সাহিত্যিক কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে।

অতীনদা জনপ্রিয় লেখক। কিন্তু জনপ্রিয় শব্দটা সিরিয়াস পাঠকের কাছে প্রিয় নয়। জনপ্রিয়তাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা সন্দেহের চোখে দেখেন। ভাবেন, যা জনপ্রিয় তা শস্তা বা মামুলি। কথাটা যে একেবারে ভুল তা-ও নয়।

দেখা গেছে, এককালের বিপুলভাবে জনপ্রিয় লেখক, খণ্ডকাল অতিক্রান্ত হতে না হতেই কালের গহ্বরে তলিয়ে গেছেন, নতুন যুগের পাঠক সেই লেখকের মোটেও কোনও হদিস করেনি। সেই জন্যেই বলা হয় জনপ্রিয়তা সাহিত্যের কোনও মাপকাঠি নয়।

কিন্তু কখনও কখনও দেখা গেছে, অসামান্য সাহিত্যও জনপ্রিয় হয়েছে। সেই জনপ্রিয়তাকে তাই জনপ্রিয় না বলে অন্য কোনও নামে ব্যক্ত করা উচিত। এক্ষেত্রে কেউ কেউ 'প্রভাবশালী লেখক' কথাটা ব্যবহার করেন। 'প্রভাবশালী সাহিত্য' কথাটাও ব্যবহারযোগ্য। সেই প্রভাব যখন দু'তিনটি সময়-স্তরকে অতিক্রম করেও সক্রিয় থাকে, তখনই সেই সাহিত্যকে আমরা যুগোত্তীর্ণ বা কালোত্তীর্ণ সাব্যস্ত করি। সাহিত্যের থাকে কালোত্তর প্রভাব। সাহিত্যের রচিত সময় এবং সেই সময়-উত্তীর্ণ কোনও পরিবর্তিত সামাজিক প্রেক্ষাপট—এই দুইয়ের সেতু[illegible] যে সাহিত্য, তাকেই আমরা খাঁটি সাহিত্য নাম দিই।

সেই দিক থেকে দেখলে মহৎ সাহিত্য আমাদের চলমান জীবনকেই সামনে অন্য এক সময়ের নতুন পরিধিতে পৌঁছে দেয়। আগে থেকে সেই সাহিত্য রচনা করে তোলে আসন্ন নতুন সময়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কিংবা মনোজাগতিক পূর্বলক্ষণ এবং জীবনকে চালনা করবার গতিশীল ধারণাগুলি।

পরবর্তী সময়ের সামাজিক পূর্বাভাস, মানব মনের জটিলতার নানান লক্ষণ এবং সাংস্কৃতিক বিচার-পদ্ধতি বা বিন্যাস সেই সাহিত্যে পরিস্ফুট হয়। এই যে সময়ের ধাতকে আগে থেকে বুঝে তাকে সাহিত্যে ঢেলে সাজিয়ে তোলার দার্শনিক ক্ষমতা, সেটা সব লেখকের করায়ত্ত থাকে না। এই কাজটি এমনভাবে সেই প্রতিভাশালী লেখক করে থাকেন, যার ফলে একটি সময় আর একটি নতুনতর সময়ে বদলে যায়।

এই একটি দিক। সাহিত্যের প্রভাব বলতে এভাবেই আমরা বুঝে থাকি। এর সঙ্গে লঘু জনপ্রিয়তাকে কিছুতেই মেলানো যাবে না।

কিন্তু এই প্রভাব লেখকের সমসময়কেও একটি স্তরে প্রভাবিত করে। সেই প্রভাব সিরিয়াস পাঠক বা মনস্ক পাঠক টের পায়। সেই জন্যই আমরা মনে করি গড়পড়তা পাঠকের চিত্তজয় কোনও কাজের কথা নয়, মনস্ক পাঠকই খাঁটি লেখকের ভরসা। এই পাঠকরাই শেষ পর্যন্ত ঠিক করে দেন সাহিত্যের প্রেক্ষিত, পথের বাঁক বদলের গতিমুখ।

তথাপি লেখকের যুগানুগত জীবনের মৌল প্রধান অভিজ্ঞতাগুলির রূপায়ণ এক মস্ত কাজ। ব্যক্তিগত জীবনের সামাজিক প্রেক্ষাপটে মূল্যবান করে তোলার সাহিত্যিক সংবিৎ সবার কলমে ধরা দেয় না। দেশভাগের উদ্বাস্তু বেদনা কিংবা নাবিক মনের সামুদ্রিক দীর্ঘশ্বাস সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা হিসাবে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় যে ধরনের উৎকর্ষ সৃষ্টি করেছে, তা মানুষের সামাজিক ইতিহাসেরই অবদান—এই চেষ্টাকে সম্মান না দিলে চলবে কেন?

সময়কে বদলে দেওয়ার কাজ অতীনদা করেননি, সেটি তাঁর স্বভাবে নেই। কিন্তু যুগের অন্তরাত্মায় যে চাপা মর্মান্তিক বেদনা গুমরে উঠেছিল, যা বাইরে বাস্তুহারা বা সীমাহারা, তাকেই আখরে আখরে লিপিবদ্ধ করেছেন—এ কাজকে সামান্য বলা যাবে না। তাই তার জনপ্রিয়তা মামুলি নয়। এই লেখকের প্রভাব বুঝে নেওয়াটা এই সংখ্যাটির উদ্দেশ্যে নিশ্চয়। আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি।

বানান অপরিবর্তিত।

দরবারী সাহিত্য, মাঘ চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত ও লেখকের অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত।

নীলকণ্ঠ পাখির পালক

কিন্নর রায়

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরো নাম অতীন্দ্র শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। যেমন বরেন গঙ্গোপাধ্যায় আসলে বরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় হলেন শ্যামলেন্দু বিকাশ গঙ্গোপাধ্যায়—এই রকম আর কি!

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে। তখন উনি কলেজ স্ট্রিটের প্রকাশন সংস্থা 'রামায়ণী প্রকাশ ভবন'-এর অন্যতম উপদেশক। নতুন বাড়ি করেছেন কেষ্টপুরে। দুই ছেলেই কিশোর। শীতের দিনে টেরিকটের প্যান্টের ওপর টুইডের বুক কাটা কোট পরেন। গলায় মাফলার। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। মাথার চুল পাতলা হয়ে এলেও বেশ কালো। নাকের নিচে বাহারি সরু গোঁফ।

'রাময়ণী প্রকাশ ভবন'-এ প্রায়ই বিকেলের দিকে আসেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। ততদিনে ওঁর 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' বই হিসাবে বেরিয়ে গেছে দুখণ্ডে। প্রকাশক অবশ্য 'করুণা প্রকাশনী' নয়। সে যাক গে।

রামায়ণী প্রকাশ ভবনের মালিক শান্তিরঞ্জন সান্যাল। তাঁর দুই ছেলে। বড় ছেলের নাম শেখর। আর শান্তিবাবুর স্ত্রীর নামও শান্তি। এতসব জানতে পারি এই জন্যে তখন জেল থেকে বেরিয়ে নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি করি আয় করার রাস্তা বার করার চেষ্টা নিয়ে। সাদা কথায় উঞ্ছবৃত্তি। তখন থাকি কালিঘাটের ১৬/১, ঈশ্বর গাঙ্গুলি স্ট্রিটে বড় মাসিমার বাড়ি। ঈশ্বর গাঙ্গুলি স্ট্রিটেই ভাড়া বাড়িতে থাকতেন যজ্ঞেশ্বর রায়। তিনি 'ঈগল' নামে একটি ছোট গল্প নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক কাগজ করতেন। দীর্ঘদেহী যজ্ঞেশ্বরবাবু চাকরি করতেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য়। 'লেখকের লেখক ডস্টয়েভস্কি'

নামে তাঁর একখানা বই ছিল। আরো অনেক বই লিখেছিলেন তিনি। বেশিরভাগই প্রবন্ধের, সাহিত্য সমালোচনামূলক। যতদূর মনে পড়ছে 'লেখকের লেখক ডস্টয়েভস্কি'-র জন্য তিনি সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু পুরস্কার পেয়েছিলেন। তখন অখন্ড সোভিয়েত ইউনিয়ন। চলছে লিওনিদ ব্রেজনেভ জমানা। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকেই এই পুরস্কার ও খেতাব দেওয়া হত। যজ্ঞেশ্বর রায় মশাইও কোন না কোন ভাবে যুক্ত ছিলেন 'রামায়ণী প্রকাশ ভবন'-এর সঙ্গে। ওঁর আনুকূল্যেই সেখানে প্রুফ দেখার সুযোগ পাই। প্রুফ দেয়া-নেয়ার সূত্র ধরেই আলাপ হয় শান্তিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে। মাথা জোড়া টাক, দাড়ি-গোঁফ কামানো ভারি, গোল মুখ, কালো ফ্রেমের চশমা চোখে শান্তিবাবুও শীতে ফুল স্যুট পরতেন। থাকতেন সি আই টি-পদ্মপুকুর অঞ্চলে।

'রামায়ণী প্রকাশ ভবন' থেকে ছেপে বেরয় গল্প-উপন্যাস। ওদেরই আর একটি সংস্থা—'স্যাঙ্গুইন পাবলিশার্স'। সেখান থেকে ছাপা হয় স্কুল পাঠ্য বই। আর একটি ছোটদের কাগজ—'শিশুতীর্থ'। প্রতি মাসে বেরন সেই পত্রিকায় ছবি আঁকেন মনোজ বিশ্বাস। তিনি তখন 'বসুমতী', 'বেতার জগৎ', 'যুগান্তর', 'অমৃত' সহ অনেক কাগজেই গল্প উপন্যাসের ইলাসট্রেশন করেন। মলাট আঁকেন বিভিন্ন বইয়ের। অনেক পরে গৌরকিশোর ঘোষের সম্পাদনায় 'আজকাল' বেরনর পর তিনি সেখানে চাকরি পান। ভারি চেহারার সুদর্শন মানুষ। তিনিও মারা গেছেন বহু বছর হয়ে গেল।

'রামায়ণী প্রকাশ ভবন'-এ প্রুফ দেয়া-নেয়া করতে করতে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখি। আলাপ হয়। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা। ১৯৭৬-এ তিনি যোগ দেন 'যুগান্তর'-এ, সাংবাদিক হিসেবে। অতীনদা ও বরেনদার 'যুগান্তর'-এ যোগ দেয়ার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার বহন করে নিয়ে গেছিলাম আমি। তারপর আবার গ্রেপ্তার হই রাজনৈতিক কারণে। সে সব অন্য কথা। মনে আছে বরেনদা তাঁর 'নিশীথফেরী' বইটি উপহার দিয়েছিলেন আমার প্রথম পরিচয়ের পর। অতীনদা দিয়েছিলেন 'যুবতী পরম রূপবতী'।

অতীনদা, বরেনদারা যখন যুগান্তর-এ চাকরি পেলেন তখন বিশিষ্ট ছড়াকার ও রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ অমিতাভ চৌধুরি সবে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ছেড়ে 'যুগান্তর'-এ এসেছেন, সম্পাদনার সর্বময় কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে। চলে গেছেন দক্ষিণারঞ্জন বসু। নতুন করে 'যুগান্তর'-এর খবর, পাতা সাজানোর খেলা চলেছে। 'অমৃত' সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, যোগ দিয়েছেন শিল্পী সুবোধ দাশগুপ্ত।

একটু একটু করে আলাপ, ক্রমে হৃদ্যতা গড়ে ওঠে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ক্রমশ তিনি হয়ে উঠেছেন অতীনদা। অসম্ভব হৃদয়বান মানুষ। স্পষ্ট কথা বলেন। তার জন্যে তাঁকে অপছন্দ করা মানুষও বড় কম নেই। আবার পছন্দের মানুষও অনেক। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে ওঁর সঙ্গে প্রতিবেশী ছড়াকার, ঔপন্যাসিক

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্রমশ খারাপ হয়ে যাওয়া সম্পর্কের কথা। কিংবা 'যুগান্তর'-এ সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়ের শীতল থেকে শীতলতর হয়ে ওঠা দিনগুলি-রাতগুলির স্মৃতি। সে সব ধূসর-প্রসঙ্গ এখন থাক।

মনে পড়ে 'যুগান্তর' রবিবাসরীয় বিভাগে বসে কাজ করছি নোনাপুকুরের বাড়িতে। অতীনদা অফিসে ঢুকলেন। ঢোকার মুখেই বাঁ দিকে আমাদের বসার জায়গা। ঢুকতেই অতীনদা কবি গৌরাঙ্গ ভৌমিককে লক্ষ্য করে বললেন, গৌরাঙ্গবাবু —কি বসে বসে কাজ করছেন! তাড়াতাড়ি এই দিকে আসুন। আর একদিন হয়ত সুবোধ দাশগুপ্তর পেছনে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, কি সুবুধ, বইসা বইসা কি মোখা আকো। তোমার মোখা আকা হয় না। (এখানে মোখা অর্থে মুখ—নারী মুখ। সুবুধ অর্থে সুবোধ দাশগুপ্ত। সবই অতীনদার ঢাকাইয়া উচ্চারণে)।

সুবোধদা হয়ত তখন খুব মন দিয়ে যুগান্তর রবিবাসরীয় সাময়িকীর পাতা করছেন। কিংবা ছবি আঁকছেন। তাঁর ঘাড়, কোমর তীব্র স্পন্ডিলাইটিসে আক্রান্ত। একেবারেই ঘোরাতে পারেন না ঘাড়। ফলে তিনি যে মুখ ঘুরিয়ে, মাথা হেলিয়ে অতীনবাবুকে কিছু বলবেন, তারও কোন উপায় নেই। সুতরাং তিনি সামনে—সাদা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে—এই, কি হচ্ছে কি অতীন! কি হচ্ছে! এমন বলে যেতেন। সেই সময় সুবোধ দাশগুপ্তের ঠিক উল্টো দিকের চেয়ারে বসি আমি।

মনে পড়ে বহু বছর আগে সাপ্তাহিক 'দেশ'-এ 'অভ্যন্তরে ডাকপিয়ন' নামে একটি গল্প লিখেছিলেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। শঙ্কর দাশগুপ্তর একটি গল্পকে ভেঙে সেই আখ্যানের ভিত্তিভূমি তৈরী হয়েছিল। লেখাটির ভিতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছাপ ছিল প্রচুর। যতদূর মনে পড়ে সেই গল্পে ছবি এঁকেছিলেন মদন সরকার। 'দেশ' তখন লাইনো টাইপে ছাপা হয়। দাম একটাকার মধ্যে। সেটা সত্তর দশকের কোন একটা সময় হবে।

তাঁর বিখ্যাত গল্প 'শাদা অ্যাম্বুলেন্স'-ও বেরিয়েছিল। নিজের গল্প বলার ভঙ্গি নিয়ে কখনও কখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। গল্প-উপন্যাসের বাংলাকেও নিজের মতো করে তৈরী করেছেন কখনও কখনও। 'এবং এপার দিয়ে' বাক্যবন্ধ আরম্ভ করার একটি প্রবণতা তাঁর গদ্যের মধ্যে এক সময় ছিল। পরে তিনি তা থেকে খানিকটা সরে আসেন। এই মুহূর্তে তাঁর একটি গদ্যের কথা মনে পড়ছে। সত্তর দশকে আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়তে লিখেছিলেন। তাতে হরিলাল বলে কিশোরের নীল মাঠে ঘুড়ি ওড়ানোর ব্যাপার ছিল। ছিল বাওবাব গাছের কথা। গল্পের নাম আজ মনে নেই। কিন্তু গদ্যভঙ্গি ছিল স্বতন্ত্র।

ষাট-সত্তর দশকে 'উল্টোরথ' পুরস্কার সাহিত্যের পুরস্কার হিসাবে বেশ নামকরা ব্যাপার ছিল। মতি নন্দী, পূর্ণেন্দু পত্রী, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের জন্য এই

পুরস্কার পেয়েছিলেন। এর অর্থমূল্য ছিল এক হাজার টাকা। সেই সময় এক হাজার টাকা নেহাত কম নয়। মতি নন্দী কি বেহুলার ভেলা-র জন্যে পেয়েছিলেন এই সম্মান? পূর্ণেন্দু পত্রীর 'দাঁড়ের ময়না' অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমুদ্র মানুষ' —পেয়েছিল 'উল্টোরথ' পুরস্কার।

ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হিসেবে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছিলেন এপার বাংলায়। দেশভাগের আগে পরে বাংলা ভাষায় যে লেখকরা ওপার বাংলা থেকে চলে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মহাশ্বেতা দেবী, শঙ্খ ঘোষ, সমরেশ বসু, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, অমলেন্দু চক্রবর্তী, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

রিফিউজি হিসাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে নিজের দেশ, ঘরবাড়ি ছেড়ে আসা মানুষের বেদনা অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে যে ভাবে উচ্চারিত হয়েছে, তার জুড়ি মেলা ভার। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' বাঙালি তথা ভারতীয় জীবনের অন্যতম 'সর্ববৃহৎ' একসোডাস-এর ছবি। শুধু আকাঁড়া বাস্তবতাই নয়, জীবনের শিল্পিত বহুমাত্রিকতা ফুটে উঠতে দেখি এই মহা-উপন্যাসের পাতায় পাতায়। অথচ এই মহৎ রচনাটি ধারাবাহিকভাবে মণীন্দ্র রায় সম্পাদিত 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার আগে (যদিও 'অমৃত' সম্পাদক হিসেবে তখন নাম ছাপা হয় শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের) নানা কাগজে—এমনকি ছোট ছোট কাগজেও টুকরো টুকরো বেরিয়েছে।

১৯৬৩-৬৪ সালে নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত 'এক্ষণ' পত্রিকায় 'কিংবদন্তির সূর্য' নামে এর একটি অংশ প্রকাশিত হয়। তারপর সাপ্তাহিক 'দেশ'-এ বেরয় 'কালনেমি', 'হৃদয় একমাত্র বাহক' ইত্যাদি গল্প। সেগুলি পরে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'-র অংশ হয়ে যায়। একই উপন্যাসের বিভিন্ন অধ্যায় স্বয়ং সম্পূর্ণ গল্প হিসেবে নানা পত্রিকায় ছাপার ব্যাপারটা সম্ভবত বাংলা সাহিত্যে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম চালু করেন। পরে অনেক কথাকারই ঢাউস উপন্যাস লিখতে গিয়ে তাঁর রাস্তা নিয়েছেন। তাঁর 'মানুষের ঘরবাড়ি' সমেত বহু উপন্যাসই এই ভাবে লেখা। 'সৃজনী' পত্রিকায় 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' নামে একটি গল্প লিখেছিলেন তিনি। 'মাশুল' নামে আর একটি গল্প মণীন্দ্র রায় সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'অমৃত'তে ছাপা হয়। 'সৃজনী'-র 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'-র পরবর্তী অংশ 'মাশুল'।

'অমৃত'-তে ধারাবাহিক 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' বেরতে শুরু করার আগে এই সব আলাদা আলাদা ভাবে ছাপা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার আখ্যান-অংশ একটিও শব্দ বদল না করে ছাপাতে দিয়েছিলেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

যতদূর জানি অতীনবাবুর প্রিয় লেখক ছিলেন লিও টলস্টয় ও ফিওদর দস্তয়েভস্কি। বাংলা ভাষায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আছেন তাঁর প্রিয়তম লেখকদের মধ্যে। জীবনানন্দ দাশের কবিতা খানিকটা আচ্ছন্ন করে তাঁকে। হয়ত বা কিছুটা 'ফিরে এসো চাকা', 'অঘ্রাণের অনুভূতিমালা' পর্বের বিনয় মজুমদারও। বিনয়ের 'অঘ্রাণের অনুভূতিমালা' শিরোনামটি 'যুগান্তর'-এ একটি ফিচারের হেডিং হিসাবে তাঁকে ব্যবহার করতে দেখেছি।

নোনাপুকুর ট্রামডিপোর উল্টো দিকে 'যুগান্তর'-এর নতুন বাড়িতে তাকে দেখেছি কবি গৌরাঙ্গ ভৌমিক, বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দলাল ভট্টাচার্য, গৌতম ভট্টাচার্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আড্ডা দিতে। খইনি বানিয়ে খেতে। কখনও কখনও রসিকতা করে তিনি বলতেন, 'আমি যুগান্তর-এর শোভা।' 'শোভা' শব্দটি তাঁর ঢাকাইয়া উচ্চারণে প্রায় 'সভা' হয়ে যেত।

১৯৭৬-এ 'যুগান্তর'-এ সাংবাদিক হিসেবে যোগ দেওয়ার পর তাঁর বাবা অভিমন্যু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হন। 'যুগান্তর'-এ চাকরি করার আগে তিনি নানা বিচিত্র পেশায় নিজেকে জড়িয়েছেন বাঁচার তাগিদে। তার মধ্যে দূর সমুদ্রে জাহাজের চাকরি, কাশিমবাজারের বাজবাড়ির এস্টেটের কাজ, শিক্ষকতা—সবই আছে। 'রামায়ণী প্রকাশ ভবন'-এ উপদেশক হিসেবে থাকার কথা তো আগেই লিখেছি।

বড়দের গল্প উপন্যাসের পাশাপাশি ছোটদের জন্যও অসাধারণ সব লেখা লিখেছেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। 'একটি জলের রেখা', 'ফেনতুর শাদা ঘোড়া' তার উদাহরণ। এ প্রসঙ্গে 'বিন্নির খই লাল বাতাসা'-র কথাও বলা যেতে পারে।

এখন 'জনগণ' নামে একটি বিশাল উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব লিখছেন। প্রথম পর্বটি এর মধ্যেই বই হিসাবে প্রকাশিত। সেই উপন্যাসে আছে ওঁর দেখা বহরমপুরের সৎ কমিউনিস্ট ব্যক্তিত্ব সনৎ রাহার মতো বহু মানুষের কথা।

সত্যি কথা বলতে কি 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' বাংলা ভাষার সেই সব মহৎ উপন্যাসের একটি, যা আসলে অংশ হয়ে গেছে বাঙালি জীবনের।

বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—

'দুই বাংলার সাহিত্যিক ঐতিহ্যের ঐক্যে বিশ্বাসী বলে আমার জানাতে দ্বিধা নেই যে অতীনের এই রচনা এ যাবৎকালের নজিরের বাইরে। কারণ তার ঈশম, ফেলু শেখ, আবেদালি, জোটনরা কোন হিন্দুর চোখে দেখা মুসলমান চরিত্র নয়। জোটন, ফকিরসাবের ডিটেসল কিংবা জালালির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বর্ণনা—তাঁর পটভূমির মুসলিম মিথ সমেত জীবনেরই সেই মহিমাকে স্পষ্ট করেছে যা আমরা একদা গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলিতে প্রত্যক্ষ করেছি—যা সম্পূর্ণ মানবিক এবং মানবিক বলেই শ্রেষ্ঠ শিল্পকৃতী। আমি অভিভূত হচ্ছি প্রতিটি অধ্যায়ে—ভাবতে গর্ব অনুভব করছি যে আমার সমকালে এক তাজা তেজস্বী খাঁটি লেখকের আবির্ভাব ঘটেছে। আজ হয়ত তিনি নিঃসঙ্গ যাত্রী। কিন্তু বিশ্বাস করি, একদা আমাদের বংশধরগণ তাঁর নিঃসঙ্গ যন্ত্রণা অনুভব করে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তিরস্কার বর্ষণ করবে। পথের পাঁচালির পর এই হচ্ছে দ্বিতীয়

উপন্যাস যা বাংলা সাহিত্যের মূল সুরকে অনুসরণ করেছে। অতীনের কাছে আমাদের নতুন জেনারেশনের অনেক ঋণ জমে গেল।'

এই উপন্যাসে আছে আশ্চর্য সব চরিত্র। তার মধ্যে অসাধারণ একজন—ঈশম।

উপন্যাসটি শুরু হয় এভাবে—

'সোনালী বালির নদীর চরে রোদ হেলে পড়েছে। ঈশম শেখ ছইয়ের নিচে বসে তামাক টানছে। হেমন্তের বিকেল। নদীর পাড় ধরে কিছু গ্রামের মানুষ হাট করে ফিরছে। দূরে দূরে সব গ্রাম মাঠ দেখা যাচ্ছে। তরমুজের লতা এখন আকাশমুখো। তামাক টানতে টানতে ঈশম সব দেখছিল। কিছু ফড়িং উড়ছে বাতাসে। সোনালী ধানের গন্ধ মাঠময়। অঘ্রাণের এই শেষ দিনগুলিতে জল নামছে খাল-বিল থেকে। জল নেমে নদীতে এসে পড়ছে। সেই জল নামার শব্দ ওর কানে আসছে। সূর্য নেমে গেছে মাঠের ওপারে। বটের ছায়া বালির চর ঢেকে দিয়েছে। পাশে কিছু জলাজমি। ঠাণ্ডা পড়েছে। মাছেরা এখন আর শীতের জন্য তেমন জলে নড়ছে না। শুধু কিছু সোনাপোকার শব্দ। ওরা ধানখেতে উড়ছিল। আর কিছু পাখির ছায়া জলে। দক্ষিণের মাঠ থেকে ওরা ক্রমে সব নেমে আসছে। এ সময় একদল মানুষ গ্রামের সড়ক থেকে নেমে এদিকে আসছিল—ওরা যেন কি বলাবলি করছে। যেন এক মানুষ জন্ম নিচ্ছে এই সংসারে, এখন এক খবর, এখন ঠাকুর বাড়ির ধনকর্তার আঘুণের শেষ বেলাতে ছেলে হয়েছে।'

এভাবে উপন্যাসের পরতে পরতে অখণ্ড বঙ্গভূমির বাঙালী জীবনের এক মহাক্রান্তি লগ্নের ছবি খুলতে থাকে পরতে পরতে।

ব্যক্তি অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নানা সময়ে কাছ থেকে দেখেছি। তখন তিনি চাকরি করেন 'যুগান্তর'-এ। বাগবাজার-এ আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে অফিস। দুই পুত্রের মধ্যে একজন অসুস্থ—বিকলাই হয়েছে। তা নিয়ে উদ্বিগ্ন গলায় তিনি কথা বলছিলেন। আমার আসা কলেজস্ট্রিট। বাগবাজার থেকে ২বি দোতলা সরকারি বাসে উঠেছি। পাশাপাশি সিট। ছেলেদের নিয়ে নানা সময়ে তাঁকে বিভিন্ন ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করতে দেখেছি। বউদির শরীরও ভালো যেত না। তা নিয়েও দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না ওঁর।

ওঁর গর্ভধারিণী মা লাবণ্যপ্রভা দেবী বেঁচেছিলেন আশি বছরেরও বেশি। প্রায় নব্বই। নব্বই দশকের শেষ দিকে তিনি মারা যান। দেশে—ওঁদের বাড়িতেই থাকতেন তিনি। জীবনের শেষ বেলায় এসে কানে প্রায় শুনতে পেতেন না তিনি। সেই মাকে নিয়ে একটি অসাধারণ গল্প লিখেছিলেন অতীনদা, রবিবারের আনন্দবাজার-এ। তাঁর সঙ্গে কথা বললে একজন সরল, শুদ্ধ মানুষের দেখা পাই। যিনি সৃষ্টিকর্মে নিয়োজিত আছেন, এখনও।

বানান অপরিবর্তিত।

দরবারী সাহিত্য, মাঘ ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত ও লেখকের অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সাদা রঙের বোট আসছে

মঞ্জুভাষ মিত্র

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় "পঞ্চাশটি গল্প" গ্রন্থের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন। পত্রপত্রিকায়, বিভিন্ন পূজাসংখ্যায় তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পসমূহ প্রকাশিত হয়—পাঠক পাঠিকারা সে খোঁজ রাখেন। তিনি প্রচুর লিখেছেন। অন্তর্গত খেলা, অন্নভোগ, অরণ্য রাজ্যে ম্যান্ডেলা, অলৌকিক জলযান, ঈশ্বরের বাগান, গল্পসমগ্র, ঝিনুকের নৌকা, তুষারকুমারী, নদীর সঙ্গে দেখা, পঞ্চযোগিনী, মানুষের ঘরবাড়ী, শ্রেষ্ঠ গল্প, সবুজ শ্যাওলার নীচে, সমুদ্র মানুষ, হানস ও সাদা জাহাজ তাঁর বিভিন্ন বইপত্রের নাম। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য সৃষ্টিকে বুঝতে গেলে তিনি প্রথম জীবনে জাহাজের নাবিক হয়ে সাতসমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন এ তথ্যও জানা জরুরী। সমুদ্রেই রয়েছে প্রোটোপ্লাজম বা আদি প্রাণপঙ্ক যার থেকে জীবনের উদ্ভব। আলোচ্য ঔপন্যাসিকও সমুদ্রের কাছ থেকে তাঁর জীবন জাগানো বাঁশিটি বাজানোর দীক্ষা নিয়েছেন। একালের প্রথম সারির বাঙালী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তিনি নিজের জায়গা করে নিয়েছেন সে শুধু তঁর লেখনীর গুণে।

এ বছর (১৪০৯ সাল) "সাদা রঙের বোট আসছে" বলে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি স্বল্প আয়তন উপন্যাস বর্তমান পূজা সংখ্যায় পড়ে ভালো লেগেছে। Narrative Technique বা বলবার ভঙ্গিটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, আবার লেখকের দৃষ্টিকোন বা Point of View-ও সেই কথামালার মধ্যে বেশ ফুটে উটেছে। "সাদা রঙের বোট আসছে" উপন্যাসে পাচ্ছি ম্যান্ডেলা বলে একটি মেয়েকে যাকে যাদুকর বসন্তনিবাস একটি পালকের টুপি দিয়েছে যা পরে সে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। তার সঙ্গী হাইতিতি বলে একটা বাচ্চা ক্যাঙারু। সুতরাং কাহিনীতে রয়েছে অষ্ট্রেলিয় প্রতিবেশ।

"যাকে দোষ দেওয়া যায় না। এমনিতেই তার প্রতিবেশীরা তাকে ভূতুরে মেয়ে বলে ভাবে। তারা বিশ্বাসই করে না যাদুকরের দেওয়া পালকের টুপি পরলে বাতাসে ভেসে যাওয়া যায়—যাদুকর বসন্তনিবাস তাকে পালকের টুপি আর হাইতিতিকে যে রুপোর ঘন্টা দিয়ে গেছে।"

"নিখোঁজ বাবাকে খুঁজতে গেলে সবারই যে চাই পালকের টুপি, রুপোর ঘন্টা, বাবা কবে যে সাদা জাহাজের নাবিক হয়ে ফস করে গেল আর ফিরে এল না। কেউ বলে জাহাজডুবি, কেউ বলে ঝড়ে পড়ে জাহাজ রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে, আবার কেউ তো আরও বাজে কথা বলে, জলে ডুবে আর ফিরে যায় না।"

এই প্রারম্ভিক বাক্যাবলীর ভিতর থেকেই কাহিনীসূত্র বোঝা যায়।

হেনরী জেমস তার 'The Art of Fiction'-এ একটা জরুরী কথা বলেছিলেন —ঔপন্যাসিকের জীবনের ভিতর থেকেই তাঁর উপাদানকে সাবধানে বেছে নিতে

হয়। কল্পিত জীবন তখন বাস্তবের চেয়েও অধিক বাস্তব হয়ে ওঠে। "সাদা রঙের বোট আসছে" উপন্যাসে এই বাস্তব ও কল্পনার আলো-ছায়া আছে। ম্যান্ডেলা, তার মা, ওয়াকা, টিলা-জঙ্গল-পাহাড়-বুনোফুল-প্রজাপতি, সাগর-দ্বীপ, একটা নীল রঙের কাঠের বাড়ি, কাঁচের জানলা, ভগ্নিপতি মরিস, বুচার, হানস, বিশ্বযুদ্ধ, ছোটবাবু, বনি, আর্চি—এমনি নানা বিচিত্র নাম-চরিত্র-সময়-পটভূমি-খুঁটিনাটি উপন্যাসটির উপাদান জুগিয়েছে। "কোথাও সাড়া নেই। পাহাড়ে প্রতিধ্বনি—তুমি কোথায়। শুধু দেখল অদূরে একটি জাহাজ নোঙর করা। একটি সাদা রঙের বোট জাহাজ থেকে এদিকে ভেসে আসছে।"—এভাবেই নভেলটি সমাপ্ত। খোঁজার শেষ হল কিনা আভাসে ইঙ্গিতে বুঝে নিতে হয়।

পুরো উপন্যাসটিতে স্বপ্ন-ম্যাজিক-অবচেতন-রাখালিয়া আবেশ-কুহক-মন্ত্রতন্ত্র -শিশুর বিস্ময়বোধ-মানুষের মনস্তত্ত্ব ইত্যাদির বুনন আছে মার্কেজ-এর 'Hundred Years of Solitude' প্রসঙ্গে 'Magic Reality' বা 'মায়াবী বাস্তবতা' বলে যে শব্দগুচ্ছ উচ্চারিত হয়েছিল তা কারো কারো মনে পড়ে যেতে পারে। লাতিন আমেরিকার ওই উপন্যাসে একটি অদ্ভুত চরিত্র ছিল মেলক্যুফেডস—

'A heavy gypsy with an untamed beard and narrow hands, who introdueced himself as Melqufades put on a bold demonstration of what he himself called the eight wonder of the learned alchemist, of Macedoina (One Hundred Years of Solitude : Gabriel Garcia Marquez : Avon Books. NY)

আলোচ্য বাংলা উপন্যাসটিতে বিদেশী নরনারীর মধ্যে যাদুকর বসন্তনিবাস যেন মেলক্যুফেডসকে মনে করিয়ে দেয়। সে আবার ভারতীয়। ভোজবাজীর কিছু প্রকরণ এ উপন্যাসে আছে। শেকস্‌পীয়রের 'মিরান্দা' নাটকের এরিয়েল, ক্যালিবান প্রভৃতি মায়াবী শক্তি সমূহকেও মনে পড়ে যেতে পারে। ম্যান্ডেলা বলে মেয়েটি যেন কিছুটা এরিয়েল অথবা ক্যালিবানের রহস্যময়ী জীবনীশক্তি নিয়ে এসেছে।

'ম্যাজিক রিয়েলিটি' শব্দগুচ্ছ প্রথম ব্যবহার করেছিলেন কিউবার লেখক কার্পেন্তিয়ার—"Real Maravillaso" বা "Reality Marvellous" এই ছিল তাঁর ব্যবহৃত শব্দবন্ধ। 'The Kingdom of the World'—এই যুগান্তকারী উপন্যাসে এই 'মায়াবী বাস্তবতা'র প্রথম প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। লাতিন আমেরিকার এই লেখক সম্বন্ধে The New York Times Review-তে সমালোচক মন্তব্য করেছেন তাঁর উপন্যাসে রয়েছে 'new lightness of touch' : তা অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচ্য উপন্যাসেও এই হালকা সংস্পর্শ রয়েছে যার প্রতীক হতে পারে পালকের টুপি। বাংলা উপন্যাসেও যে মায়াবী বাস্তবতা এসে যাচ্ছে "সাদা রঙের বোট আসছে" বা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের "নৃসিংহরহস্যে"র মত কোন কোন বই পড়লে বেশ বোঝা যায়। ঔপন্যাসিক অতীন বন্দ্যাপাধ্যায়ের দীর্ঘজীবন ও অম্লান লেখনী কামনা করি।

বানান অপরিবর্তিত।

দরবারী সাহিত্য, মাঘ ১৪২০ সংখ্যায় প্রকাশিত ও লেখকের অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সহজ আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত কারিগর

সোহারাব হোসেন

বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় নামটি নিয়ে খুব বেশি আলোচনা -আলোড়ন না হলেও তিনি অবশ্য অবশ্য রূপে ছোটগল্প-ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট নাম। এই বিশিষ্টতা নানা মাত্রায় প্রমাণযোগ্য। প্রথমত গল্প বিষয়ের বৈচিত্র্যের কারণে ছোটগল্পের ভুবন থেকে তার নামটিকে কখনোই বাদ দেওয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত গল্প নির্মাণের সহজাত কবচ কুণ্ডল নিয়েই তিনি এ জগতে প্রবেশ করায় এক অনায়াস দক্ষতায় তিনি পৌঁছে যান শিল্পরসের মহার্ঘ্য জগতে যা তাঁর সমসাময়িক গল্পকারদের কাছে স্বাভাবিক-ঈর্ষার বিষয় হয়ে ওঠে। তৃতীয়ত যে অভিজ্ঞতার অনিঃশেষ ভাঁড়ার অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের করায়ত্ত সেই অভিজ্ঞতার পরম্পরাটিকে ব্যক্তিমানুষের জীবনপাত্রে প্রতিস্থাপিত করে তাকে চিরন্তন করে তোলার শৈল্পিক দক্ষতা গল্পকার অতীনের জানা-বোঝার ক্ষেত্রটিকে বড়ো করে তুলেছে। এবং চতুর্থত যথার্থ শক্তিশালী লেখকের মতো অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয় নির্বাচনের জন্যে কখনোই আয়াস-সাপেক্ষ অজানা জগতের দিকে হাত বাড়ান না। বরং অনায়াসে যেসব ক্ষেত্রে পৌঁছে যাওয়া যায় সেই সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারগুলির মধ্যে স্ব-উপার্জিত দার্শনিকতার সম্পৃক্তিকরণ ঘটিয়ে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় যে গল্প বলয় রচনা করেছেন তা স্বতন্ত্র—শুধু এই চতুর্মাত্রিক বিশিষ্টতাতেই নয়, গল্পকার অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ছোটগল্পের আসরে দীর্ঘকাল চর্চিত হওয়ার দাবি রাখেন এই কারণেও যে গল্প বিষয় ও শিল্পরীতির রকম অনুযায়ী তিনি তাঁর ভাষা বয়নের পরিসরটিকেও উপযুক্ত করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। সব মিলিয়ে ছোটগল্পকার অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন এক বিশিষ্ট নাম তেমনি শক্তিশালী নামও।

গল্পকার অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয়টিকে গল্পালোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট করার আগে গল্প শিল্পীর স্বরূপ-স্বভাবকে কয়েকটি মাত্রায় স্পষ্ট করা যেতে পারে। যথা :

(১) অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পপাঠে আমাদের মনে প্রাথমিক যে মাত্রাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেটি অতীনের কসমিক্ চেতনা তথা ব্রহ্মাণ্ড চেতনা। শুধু এ বাংলা কিংবা ভারতবর্ষ অথবা এই উপমহাদেশ নয়, গল্পে গল্পে অতীনের জীবনভাবনা যেন সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী একটি অসীমান্তিক ভুবন রচনা করে নেয়। আর সেই

প্রেক্ষিতেই তাঁর গল্পের চরিত্রগুলি হয়ে ওঠে কখনো কখনো অসীমান্তিক মন মেজাজের অধিকারী। তাঁর এ-জাতীয় গল্পগুলির মধ্যে থেকে 'ঈশ্বরের বাগান' ও 'রাজার টুপি'কে বেছে নিয়ে অতীনের এই ভুবনটিকে স্পষ্ট করা হবে।

(২) অতীনের গল্প দ্বিতীয় যে মাত্রায় সমৃদ্ধ হয়েছে সেটি হল বেঁচে থাকার জন্য দরিদ্র মানুষের অসীমান্তিক লড়াই। এই লড়াই তথাকথিত কোনো রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে নয় বরং জগৎ-জীবনের স্বাভাবিক কিছু নিয়মকেই আত্মপক্ষ সমর্থনের রসদ হিসেবে বেছে নেয় চরিত্রগুলো। এ মাত্রাটি বাংলা গল্পের আসরে নতুন প্রবণতা। এ পর্যায়ের দুটি সার্থক গল্প হল 'পোকামাকড়েও খায়, বাঁচে' এবং 'কালভুজঙ্গ'।

(৩) অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পকে জীবন্ত করে তুলেছে যে বৈশিষ্ট্যটি সেটি হল গল্পকারের অপরিসীম মায়া নির্মাণের দক্ষতা। মায়া এবং দরদরূপ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে ফেলে জীবনের যে প্রতিরূপ গল্পে গল্পে এঁকেছেন অতীন, তা তাঁর গল্পকে অনন্য করেছে। এ ধরনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ গল্প হল 'চীনেমাটির পুতুল' ও 'শেষ দেখা'।

(৪) দেশভাগ এবং তদ্‌জনিত অভিঘাতের প্রেক্ষিতে জীবনের কাটা-ছেঁড়া, বাস্তুচ্যুতি এবং নতুন করে জীবন প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশ কিছু গল্প উজ্জ্বল। 'বাতাসী' এবং 'অন্য গ্রহ' এই জাতীয় দুটি বিশিষ্ট গল্প।

অতীন-গল্পের স্বরূপ-স্বভাব নির্মাণের পর এবার বেশ কিছু গল্প অবলম্বনে অতীন-গল্প-ভুবনটিকে চিনে নেওয়ার প্রয়াস করা হলো।

দুই

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশ কিছু গল্পে কেন্দ্রীয় ভাব হিসেবে নিহিত রয়েছে রামধনু রঙে বিকশিত এক বিশ্বাত্মচেতনা। যেন একজন বিশ্ব-ভবঘুরে তার অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে বের করে পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষ এবং তাদের মানসিকতাকে পাঠককে দেখিয়ে যাচ্ছে। সেই দেখানোর মধ্যেই প্রতিচিত্রিত হচ্ছে মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রক কোনো ঈশ্বর এবং তার বহু রঙে রাঙায়িত পৃথিবীখানি। সদর্থে কর্মসূত্রে বিশ্বনাগরিক হয়ে ওঠা অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কসমিক্ চেতনার প্রকাশ তাঁর কিছু গল্পকে বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে অনন্য করে তুলেছে। 'ঈশ্বরের বাগান' সেই ধারারই একটি তাৎপর্যপূর্ণ গল্প।

এই পৃথিবী যদি ঈশ্বরের বাগান হয় তবে সেখানে ভ্রমণ করতে এসেছে নানান মত এবং মন-মানসিকতার মানুষ। এরা হলো রূপম, দীপা, সকুল, বিলাস এবং

রমলা। এদের মধ্যে রূপম ও দীপা এবং বিলাস ও রমলা জুটি বেঁধে থাকে। জুড়িবদ্ধভাবেই তারা ঈশ্বরের বাগানে ঘুরে বেড়ায়। এরা একে অপরের কিছুটা পরিপূরক হলেও কেউ কাউকে সমিধ বলে মনে করে না। সে কারণেই ঈশ্বরের বাগানে ঘুরতে ঘুরতে তারা প্রার্থিত প্রিয়কে খুঁজে বেড়িয়েছে। দীপার অন্বিষ্ট ছিল সকুল অথচ সকুলকে সে পায়নি। রূপমের অন্বিষ্ট ছিল দীপা ব্যতিরেকে অন্য কেউ। সেও তাকে পায়নি। আবার রমলা খুঁজছিল যে মনের মানুষকে সে বিলাস নয়। তৃতীয় আর একজন। রমলা তাকে খুঁজে পায়নি। ঈশ্বরের বাগানে ভ্রমণরত মানুষদের এটাই বোধহয় ট্রাজেডি। কেউ তার আপনজনকে খুঁজে পায় না। অন্যদিকে সেই অন্বেষণে নেমে মানুষেরা দেখে ফেলে অনভিপ্রেত কিছু দৃশ্য। এ গল্পের বিলাস-রূপমরাও তেমন তিনটি দৃশ্য দেখেছে। প্রথম দৃশ্যে কমিশন বাবদ প্রাপ্য টাকার চেক ভাঙাতে ব্যাঙ্কে যাবার পথে বিলাস প্রত্যক্ষ করেছে। ঈশ্বরের বাগানে নির্বিঘ্নে ভ্রমণ করার ছাড়পত্র দেবে যে টাকা তা হুড়মুড়িয়ে আনতে যাবার পথে বিলাস ফুটপাতে মরে পড়ে থাকা একটা মানুষের মৃতদেহের পাশে পড়ে গেছে। তিক্ততায় ভরে গেছে তার মন। দ্বিতীয় দৃশ্যে চোদ্দ বছর বয়সী ফুটপাতবাসিনী নিতান্তই এক কিশোরীর বিনা চিকিৎসায় মারা যাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় দৃশ্যে দেখানো হয়েছে এক অসহায় বালককে, যার মায়ের মৃতদেহ হাসপাতালের মর্গে রয়েছে এবং যার বাবা কিছুতেই মৃতদেহ সনাক্ত করতে পারছে না। রূপম-দীপা ও বিলাস-রমলার ভোগবাদী জীবনযাপন আর একই সঙ্গে প্রিয়তম মানুষটির অতৃপ্তিময়তার পাশাপাশি নিতান্ত পোকা-মাকড়ের মতো জীবন কাটানো মানুষগুলোর চিত্র ঈশ্বরের বাগানের বৈচিত্র্যকেই সূচিত করেছে। বিশ্ব নাগরিক হয়ে গল্প কথক কখনো ভারতবর্ষে কখনো কোরিয়ায় কখনো চীনে কখনো দক্ষিণ আফ্রিকায় এসব দৃশ্যকে ঘুরে ফিরে দেখেছে। এই পরিক্রমায় গল্প কথকের মনে হয়েছে মানুষেরা অফ্রিকার জঙ্গলের বিশেষ প্রজাতির অসহায় এক নিরীহ প্রাণী বই ভিন্ন কিছু নয়। গল্পে দেখি :

"যদি জিরো ডিগ্রিতে পৃথিবীকে ভাগ করা যায় তবে দেখা যাবে, দুদিকে আছে সব জলরাশি, আর ঠিক আফ্রিকার ঘন অরণ্যের ভিতর দিয়ে চলে গেছে জিরো ডিগ্রি। সেখানে ম্যাসাড গাছে একটা টিকটিকি গভীর বনে অনবরত ডাকছে। সূর্যের রোদ ঘন গাছপালা ভেদ করে মাটিতে নামতে পারছে না। গায়ে জ্বর এলে টিকটিকিরা ডাকে। একটু রোদ পেলেই জ্বর সেরে যাবার কথা। ওপরে উঠতে সাহস পাচ্ছে না। সেখানে আছে বিষাক্ত সাপ, ধূর্ত বাঁদরের পাল, ওকে দেখলেই, কেউ খাবে, কেউ মজা দেখার জন্য লেজ ছিঁড়ে ফেলবে—আর এই যখন বনজঙ্গলের অবস্থা, যখন নিচে ঘাসের ভিতর হাঁটছে হিংস্র শ্বাপদেরা, নিরীহ প্রাণীদের মাংস ছিঁড়ে খাবার লোভে সন্তর্পণে হেঁটে যাচ্ছে, তখন টিকটিকিটা করে কি? সে ডেকে যাচ্ছে কেবল, রূপকথা কবে ডেকে যাচ্ছে।"

ধনী-দরিদ্র, ভোগী-উপোসী নির্বিশেষে পৃথিবীর সব মানুষই যেন উভয় সঙ্কটে পড়া আফ্রিকার জঙ্গলের টিকটিকিই প্রতিরূপ। এই কসমিক্ চেতনার সত্যরূপটিকে গল্পকার কিছুটা তির্যক বচনে ও বাচনে স্পষ্ট করেছেন। গল্প থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু উদ্ধৃতি এ প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যেতে পারে।

(১) "মেডিক্যাল কলেজের সামনে একটা উঠতি বয়সের মেয়ে—পৃথিবীর হালখাতায় বয়স চোদ্দ। ওর শরীরে প্রায় পোশাক নেই। সে মরে যাবে, মলমূত্রের ভিতর সে পড়ে আছে। কেউ তাকাচ্ছে না। কেবল গাছের ডালে একটা কাক। বোধহয় মেয়েটা মরে গেলে ওর চোখ ঠুকরে খাবে, এই আশায় বসে আছে। এবং জনগণেরা কি যে নির্ভীক, রুমাল নাকে চেপে রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে। একটা সাদা অ্যাম্বুলেন্স তাড়াতাড়ি পাশ কটিয়ে চলে গেল।"

(২) "এবং এক বালক বসে আছে গাছের নীচে। ওর বাবা গেছে ঠাণ্ডা ঘরে মাকে খুঁজতে। আর তখন বিপ্লবের ডাক দিয়েছে কারা। দেয়ালে দেয়ালে সব নানারকমের লেখা। সে লেখাগুলো পড়তে পড়তে ভাবতে শিখে গেছে, এটাই নিয়ম। মা ঠাণ্ডা লাশঘরে শুয়ে থাকবে। বাবা ঠিক চিনে মাকে খুঁজে আনতে পারবে না। মরে গেলে মানুষের মুখ এক রকম হয়ে যায়। আর তখনও মানুষ গায়— রে... মা... রে... মা... মা... পা... মা... গা, রে... গা... পা... ধা... নি।"

(৩) "দীপা তখন ডাকছে, স.. কু... ল।
সকুল নেমে যেতে যেতে ডাকছে, অ্যা. এখানে দী.. পা।
দীপা বলছে, রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না।
সকুল বলছে, সোজা আমার শব্দ শুনে বনের ভিতর ঢুকে পড়।
দীপা বনের ভিতর গাছপালা ফাঁক করে ঢুকে যাচ্ছে। কত অজস্র-শুকনো পাতা, মরা ডাল, পাখির পালক, সেই মানুষের কুঠার যুগের ছবি—সে লাফিয়ে লাফিয়ে পাথরের পর পাথর পার হয়ে যাচ্ছে। লতা-পাতা-সরিয়ে সকুলকে খুঁজছে।"

(৪) "তখন বিলাস পাগলের মতো ছুটছে। সে কেবল রমলাকে একটা গাছের আড়ালে কেউ চুমো খাচ্ছে দেখতে পেয়েছিল। আর কিছু না। ওই দেখেই ওর কম্পাসের কাঁটা একেবারে ধপাস করে উত্তর থেকে দক্ষিণে নেমে গেল। এভাবে কাঁটা নেমে গেলে কিছুতেই উত্তর মেরুতে পৌঁছানো যায় না। সেও পারেনি। তুষার ঝড়ের ভিতর সে পথ হারিয়ে ফেলেছে। কেবল সে দেখতে পাচ্ছে চারপাশে বরফ আর বরফের পাহাড়। পৃথিবীর সাদা জ্যোৎস্না পাহাড়ের জঙ্গলে পড়ে তখন ওর কাছে জায়গাটা ঠিক উত্তর মেরু হয়ে গেছে।"

গল্পটির সারা অঙ্গ জুড়ে রয়েছে এই অসহায় টিকটিকিসম মানুষের সূত্রে প্রতিফলিত কসমিক্ চেতনার পরশ। আর এই কসমিক্ চেতনাকে পুষ্ট করার জন্য মানচিত্রের কোনো নির্দিষ্ট জায়গাকে পটভূমি না করে প্রতীকী অর্থে ঈশ্বরের বাগানকেই করা হয়েছে। এ বাগানে ঘুরে বেড়ানো সমস্ত মানুষের বুকের মধ্যে প্রোথিত আছে প্রাপ্তি—না-প্রাপ্তির, ভোগ—না-ভোগের দ্বন্দ্বে পড়া কঠিনতম অসুখ। যথার্থ ঈশ্বরের বাগানের এটাই তো বাস্তবতা :

"আসলে ওরা কেউ জানে না, মানুষ এখনও হাতে পাথরের কুঠার নিয়েই হাঁটছে। দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে শুধু কুঠারের চাকচিক্য বেড়েছে। মানুষেরা ঈশ্বরের বাগানে ম্যাসাড গাছে টিকটিকির মতোই বেঁচে আছে। ওপরেও খুব উঠতে পারছে না, নিচেও খুব নামতে পারছে না। কারণ মানুষের ভিতরেই আছে তার নিজের অসুখ। ঈশ্বর কখনও তা নিরাময় করেন না।" —বাঙালীত্বের কিম্বা ভারতীয়ত্বের সীমানা ছাড়ানো ঈশ্বরের বাগানের নাগরিকত্বের কসমিক্ চেতনাই 'ঈশ্বরের বাগান' গল্পটিকে রসময় করে তুলেছে।

কোনো জাগতিক বিষয়কে গল্প বয়নের শৈল্পিক প্রকৌশলের মুন্সিয়ানায় এবং বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে স্তরান্তরিত করার দক্ষতায় কসমিক্ চেতনায় সঞ্জীবিত করার গল্প 'রাজার টুপি'। এ গল্পে এক কারখানা ম্যানেজারের কর্মসঙ্কটের ঘটনাকে পৌরাণিক রাম রাবণের যুদ্ধ—না-যুদ্ধের উপমায় উপমিত করে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাত্মচেতনার সঙ্গে অন্বিত করার মাধ্যমে কসমিক্ বোধকে গল্প-দেহে মূর্ত করানো হয়েছে। গল্পোধৃত এ জাতীয় কসমিক্ ভাবমেজাজকে স্পষ্ট করার আগে গল্পের কাহিনীটি শুনে নেওয়া যেতে পারে। গল্পে দেখি—দুই সন্তান মিন্টু ও বাবুলসহ সতীশ-সুরমার মোটা ভাত মোটা কাপড়ে চলা সংসার। সতীশ পেশায় কারখানা ম্যানেজার এবং অবধারিতভাবে মালিক পক্ষের হয়েই তাকে কাজ করতে হয়। যদিও শ্রমিকদের প্রতি তার হৃদয়ে অন্তঃসলিলা টান একটা ছিলই। তার স্ত্রী সুরমা চিররুগ্ন এবং বেশিরভাগ সময়ে বিছানাতেই থাকে। ছেলে বাবুল খেলার ছলেই রাজার টুপি পরতে চায়। ইতিহাস বইতে সে রাম রাবণের যুদ্ধের ছবি দেখেছে, সেখানে রামের মাথায় রাজার টুপি আছে। সেই থেকেই রাজার টুপি পরার বায়না তার। রথের মেলা থেকে সতীশ রাজার টুপি কিনে দেওয়ার কথা দিলেও শেষ পর্যন্ত খেলনা রেলগাড়ি কিনে দেয়। এরই মধ্যে কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটে একজন শ্রমিক তেওয়ারীর হাত কেটে বাদ যায়। কর্তৃপক্ষের টাকা বাঁচাতে গিয়ে দুর্ঘটনার দায় সতীশ, তেওয়ারীর ওপরই চাপায়। এই ঘটনাই সতীশের অবচেতনে একধরনের পাপবোধের জন্ম দেয়। এই পাপ চেতনার সঙ্গে খেলার ছলে বাবুলের রাজা হওয়া এবং দৈত্য নিধনের অভিযান উপমিত হয়ে গল্প বিষয়কে স্বতন্ত্র করে তোলে। কারণ সেদিনই অবাধ্যতার জন্য বাবুলকে প্রহার করে সতীশ। বাবুলের পিঠে ক্ষত ও রক্ত আর শ্রমিক ঠকানোর পাপচেতনা যে যৌথ রসায়ন সৃষ্টি করেছে তা শেষ পর্যন্ত সতীশকে রাবণ হিসেবে চিহ্নিত করে। এবং শেষতক বাবুলের প্রতি সতীশের স্নেহ ব্যাকুলতায় ও দিক নির্ণয়ের প্রকৌশল শেখানোর ঘটনায় তার রাবণ সত্ত্বা অপসারিত হয়ে অদৃশ্য রাজার টুপির মালিক হওয়ার মধ্য দিয়ে সতীশ রাজারূপ পেয়ে যায়। —গল্পের এই পরিণতি ছোট্ট এক বাঙালী পিতার স্থান থেকে সতীশকে পৃথিবীর

সমস্ত রাজরূপ পিতার আসনে অধিষ্ঠিত করিয়েছে, যা লেখকের কসমিক্ জীবনবোধেরই প্রকাশ। গল্পে তিনটি স্তরের মাধ্যমে এই কসমিক্ চেতনা স্পষ্ট হয়েছে। স্তর তিনটি হলো :

(১) প্রথম স্তর : নিতান্ত মধ্যবিত্ত এক বাঙালী পরিবারের খেলার ছলে রাজরূপ পাওয়ার স্তর। এ স্তরে শিশু বাবুলের রাজার টুপি কেনার যে স্বপ্ন অতিচিত্রিত হয়েছে তা স্থানিক এবং সীমায়িত।

(২) দ্বিতীয় স্তর : নিতান্ত স্থানিক বাঙালী পরিবারের স্বপ্ন পৌরাণিক রাম রাবণের যুদ্ধের অনুষঙ্গে ভারতীয়ত্বের পরিসরে ব্যক্ত হয়েছে। গল্পে দেখি—

(ক) "সে কিছু না বলে গাড়িটাকে টেবিলের উপর রেখে দিল। তারপর একটা চেয়ারে বসে ইতিহাসের পাতা খুলে পড়তে বসল। রাম-রাবণের ছবি। রামের মাথায় রাজার টুপি। বড় লম্বা টুপি দেখলে বাবুলের মনে হয় এই বুঝি রাজার টুপি।"

(খ) "সতীশের ভয়, বাবুল একা একা—যখন সুরমা দুপুরে ঘুমিয়ে পড়বে, যখন নির্জন দুপুরে পাতাবাহারের গায়ে কিছু পাখী ডাকবে—তখন এই বাবুল তালপাতার টুপি মাথায় দিয়ে কাঁধে খেলনা বন্দুক নিয়ে দৈত্য শিকারে বের হয়ে পড়বে।"

(গ) "তারপর বাবুলের পাশে বসে আহত স্থানগুলোতে নরম নরম চাপ দিলে দেখতে পেল টেবিলে নীল আলো জ্বলছে। রাত ক্রমে গভীর হয়ে আসছে। কোথাও আর যেন রাতের কীটপতঙ্গ ডাকছে না। ধরণী শান্ত এবং স্থির। সে দেখতে পেল তখন নীল আলোর ভিতর দুই ছবি। রাম-বাবণের ছবি। রামের মাথায় রাজার টুপি রাবণের মাথায় কাক।"

(৩) তৃতীয় স্তর : রাম রাবণের ভারতীয় উপাখ্যানের হাত শৃঙ্খল ছিন্ন করে যে কোনো দেশের রূপকথার রাজা ও তার টুপির অনুষঙ্গে এবং পৃথিবীর সমস্ত পিতাপুত্রের মধ্যেকার স্নেহ ব্যাকুলতার রাজরূপ প্রাপ্তির অনুষঙ্গে গল্প বিষয় অসীমান্তিক ব্রহ্মাণ্ডেরই সত্যরূপ হয়ে পড়েছে। গল্পে দেখি :

(ক) "বাবুলের উপর রাগটা কিছুতেই মরছে না। বাবুলের কাছ সতীশ বুঝি ধরা পড়ে গেছে। কাপুরুষের মতো চোখ যার, যার মাথা উঁচু নয়—সে মেলা থেকে কী করে রাজার টুপি কিনবে।"

(খ) "ভোরে ঘুম থেকে উঠলে সে আর রেলগাড়ি থাকল না। বাবুলের জন্য রাজার টুপি কিনে আনতে হবে, সুতরাং সতীশ ঘরের সব দরজা জানলা খুলে দিল। সে যে ক্রীতদাস এ সংসারে তা আর মনে থাকল না। সে বাবুলকে কাঁধে নিয়ে পাতাবাহারের গাছটার পাশে দাঁড়িয়ে ভোরের সূর্য দেখতে দেখতে বলল, সামনের দিকটাকে আমরা পূর্বদিক বলি, ডানদিক দক্ষিণ, পেছনের দিকে সূর্য অস্ত যায় বলে পশ্চিম এবং বাঁদিকে তুমি যত দূরেই চলে যাও না উত্তর দিক হবে। সতীশ ছেলেকে কাঁধে নিয়ে ভোরবেলায় আজ কী ভেবে দিক নির্ণয় শেখাতে থাকল।"

একটা কাল্পনিক রাজার টুপিকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করে ব্যক্তিজীবনের

সংকটকে সর্বকালের সব মানুষের সঙ্কট ও মুক্তির পর্যায়ে উত্তরিত করানোর মধ্যে যেমন এ গল্পের রস সার্থকতাটি লুকিয়ে আছে তেমনি আছে লেখকের শিল্পীসত্তার মুন্সিয়ানাটিও।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় তার এক শ্রেণির গল্পের বিষয়বস্তুর কেন্দ্রে রেখেছেন সমাজ পতিত, নিছক দরিদ্র মানুষের অসীমান্তিক বেঁচে থাকার ইচ্ছে বাসনাকে। এসব মানুষ নিছক বেঁচে থাকার জন্যই যেন সমাজরূপ প্রতিষ্ঠানের নিয়ম কানুনগুলিকে নিজেদের মতো করে পাল্টে নেয়। এই পাল্টে নেওয়ার ঘটনাটি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে হতদরিদ্র মানুষগুলোর লাইফফোর্স তথা জীবনীশক্তির সঙ্গে তাদের বেঁচে থাকার লড়াইকে মিশিয়ে দেওয়ার কারণে। যদিও লড়াই-এ শোষক শোষিতের তথাকথিত শ্রেণিগত পরিচয় খুব একটা বড়ো হয় না। বড়ো হয় জাগতিক নিয়মটাই। অতীনের 'পোকামাকড়েও খায়, বাঁচে' গল্পটি এই ধারার গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি।

গল্প বিষয়ে প্রবেশ করলে দেখি নিতান্ত হা-অন্ন এক পরিবারের তিন সদস্য, ছেলে আকাল তার বৌ নয়না এবং আকালের অতি বৃদ্ধা মা, ধান কাটার মরশুমে লাটুবাবুর জমি থেকে ধান চুরি করতে গেছে। যদিও আকালের মা এ কাজকে চুরি বলতে রাজি নয়। কারণ যে জমি থেকে তারা ধান চুরি করছে, সেটি একদা তাদেরই সম্পত্তি ছিলো এবং যেটাকে লাটুবাবু নানান ছলা কলায় হস্তগত করেছে। বুড়ির ও আকালের কথায় :

"আর মা ও জমিন আর তুর লয়।

একশবার আমার। রেতের বেলা লিয়েছি ত কী হয়েছে। লাটুবাবু তুর কাছ থেকে ফন্দি ফিকির কইরে জমিঠো লিয়ে লিল। আমার জমি থেকে আমি লিব, কার ক্ষেমতা কত দেখি।"

গাঢ় শীতের রাতে আকাল ও নয়নার ধানের বোঝা মাথায় করে ঘরে ফেরার সাফল্য এবং ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে আকালের মায়ের মৃত্যুজনিত ব্যর্থতার টানাপোড়েনে গল্পসত্য সার্থকতা পেয়েছে। এই টানা-পোড়েনের মাঝখানে মাঠ জাগালদার মংলু এবং তামাম জগতের পাহারাদার ফকির সাহেবের বাস্তবতা এবং দার্শনিকতা যুক্ত হয়ে নিছক ধানচুরির ঘটনাকে অনবদ্য গল্প হতে সাহায্য করেছে। মুলত মংলু এবং ফকির সাহেবের দু-ধরনের জীবনবোধের মাঝখানে পড়ে আকালরা চুরি হেতু অপরাধবোধকে জাগতিক নিয়মের প্রেক্ষিতে অপসারিত করেছে। গল্পে দেখি :

"মাঠ থেকে কাগে বসে শস্য খায়, পোকা-মাকড়ে খায়, কীটপতঙ্গ খায়—তিন মনুষ্য তার লগে যোগ দিয়েছে, দোষের না।"

পোকা-মাকড়ের—প্রায় বেঁচে থাকা মানুষ যেন পোকা-মাকড় হয়ে বুঝি নিচ্ছে

বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের ভাগ। পোকা-মাকড় যেমন একাজে অপরাধ বোধ করে না তেমনি করে না আকালদের পরিবারও। নিতান্ত চুরির ঘটনাকে এই জাগতিক সত্যের মানদণ্ডে মান্যতা দানের মাধ্যমেই গল্প বিষয়ে এক ধরনের উড়ান এনেছেন গল্পকার। সেই উড়ান আবার তৃতীয় মাত্রায় উত্তরিত হয়েছে চুরির ঘটনাটিকে লাইফফোর্স তথা জীবনীশক্তির রসদ হিসাবে ব্যবহার করার মুন্সিয়ানায়। গল্পে দেখি :

"আকাল ফের চেষ্টা করল। বলল, ইটু গরম হতে দে। নালে মরে যাব। দ্যাখ হাত দু-খান। বলে আবার জোরে আঁকড়ে ধরল। নয়নাও কেমন গরম হয়ে গেল। শরীর দু-জনেই গরম। শীতের কামড় আর দাঁত বসাচ্ছে না। দু-জনে খানিকবাদে আলগা হয়ে গেল।"

অর্থাৎ মামুলি ধান চুরির ঘটনা থেকে দার্শনিকতায় পৌঁছানো অতঃপর তার সঙ্গে জাগতিক সত্যের মেলবন্ধন ঘটিয়ে তাকে দরিদ্র মানুষের বেঁচে থাকার জীবনী-শক্তিতে উত্তরিত করানোর যে প্রক্রিয়া এ গল্পে নিহিতার্থকে ঘনিয়ে তুলেছে, তাই গল্পটিকে রসময় করে তুলেছে। আকাল-নয়না যেন ধান চুরিতেই সফল হয়নি, সফল হয়েছে লাইফফোর্সের মহার্ঘ্য উষ্ণতা চুরি করে বেঁচে থাকার কাজেও।

এ পর্যায়ে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ গল্প 'কাল-ভুজঙ্গ'। গল্পটির বিষয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রচণ্ড খরার দিনে হা-অন্ন মানুষ বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহের জন্য সম্মিলিত পারিবারিক চুরির কাজকে জাগতিক সত্যের প্রেক্ষিতে বৈধ বলে গণ্য করছে। চিরদিনের শোষিত ভূমিহীন মানুষ নিশি, তার স্ত্রী সোনামণি ও দুই মেয়ে অঙ্গি-বঙ্গি জাগতিক নিয়মের দোহাই দিয়েই সরকারী বীজতলা থেকে ধান চুরি করার কাজে লিপ্ত হয়েছে। প্রায় অনাহারে সারাদিন কাটিয়ে দেওয়ার পর রাত্রে কচুসেদ্ধ খেয়ে সামান্য উজ্জীবিত পরিবারটি রাতের অন্ধকারে মাঠে নেমে গেছে। মাঠ পাহারায় তখন অতন্দ্র থেকে নিরবচ্ছিন্ন ঘন্টা বাজিয়ে যাচ্ছে সোনামণির দেহে যে যৌবন-ধান আছে তার প্রতি আসক্ত ধূর্ত শশী। পাহারা ঘন্টার চোখ রাঙানিতে এবং যৌবন-বীজ রক্ষায় সন্ত্রস্ত সোনামণিরা সরীসৃপের মতো বুকে হেঁটে একসময় বীজতলায় পৌঁছায়। তারপর শুরু হয় পাখির মতো একটা একটা করে কাদা-জল ছেনে ধান খুটে নেওয়ার পালা। তারই ফাঁকে শুরু হয় নিশির অতীত স্মৃতিচারণা। ইঁদুরের চালা টুঁড়ে বিষাক্ত কাল কেউটের নাগাল এড়িয়ে অঙ্গি-বঙ্গিকে নিয়ে সে কেমন করে ধান সংগ্রহ করত সেকথা মনে করে নিশি শিহরিত হয়। এদিকে কাদাযুক্ত ধান কোঁচড়ে রাখতে রাখতে তা ভারি হয়ে যাওয়ায় প্রয়োজনে লজ্জা নিবারণের সামান্য অবলম্বনটুকুও খুলে ফেলে নিশি তাতে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় অন্ন রাখতে থাকে। ওদিকে তাদের কাজের বাধা স্বরূপ পাহারা ঘন্টা বাজাতে

থাকায় সোনামণির সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে শশীর উপর। সোনামণি তাই একটু উচ্চগ্রামেই শশীকে গালিগালাজ করতে থাকে। এ সূত্রেই শশী সচকিত হয় এবং চোর ধরার লক্ষ্যে বীজতলার দিকে ছুটে আসতে থাকে। বিপদ সংকেত পেয়ে নিশি ও তার দুই মেয়ে সংগৃহীত ধান মাথায় নিয়ে পালিয়ে যায়। যদিও ধানবোঝাই কাপড়ের পুটুলি অতিরিক্ত ভারী হওয়ার কারণে সোনামণি পালাতে পারে না। সে যেন ফাঁদে পড়ে গেছে। আর তার সামনে কাল-ভুজঙ্গসম শশী তার যৌবন লুঠ করতে উদ্যত। অতঃপর শুরু হয় পিচ্ছিল কাদায় মাখামাখি এক বিবস্ত্র নারীর আত্মরক্ষার এবং কাল-ভুজঙ্গরূপী এক পুরুষের আক্রমণাত্মক ছোবল বসানোর লড়াই। শেষতক কাল-ভুজঙ্গ যখন প্রায় সাপটে ফেলে নারীকে গিলবার মতো অবস্থায় পৌঁছে গেছে ঠিক তখনই অন্ন-বীজরূপী নারী পাল্টা ভুজঙ্গী হয়ে কালসাপটিকে মেরে ফেলেছে। গল্পে দেখি :

"সোনামণি জবাব দিল না। মরা গোসাপের মত চিত হয়ে পড়ে থাকল। কারণ এতটুকু শক্তি আর সোনামণির অবশিষ্ট ছিল না। সামান্য যেটুকু শক্তি সে শুধু বিলাপের জন্য, সে নিচে পড়ে বিলাপ করতে থাকল, হাঁ রে নিশি, তুই আমারে ফাঁদে ফেলে চলে গ্যালি। হ্যাঁ রে নিশি আমার সোনার ধান্য চুরি যায় রে!

শশী বলল, 'সোনার ধান্য আমার'।

সোনামণি বলল, 'সোনার ধান্য আমার। তু আমার সোনার ধান্য চুরি করে লিচ্ছিস।' বলেই হক করে শশীর গলাটা কামড়ে ধরল। ভালমানুষের ছা শশী মুরগীর মত, জবাই করা মুরগীর মত উঠে দাঁড়াল। দু-তিনটে বড় লাফ দিল কাদায় ভুঁইয়ে, পাগলের মত দুহাত উপরে তুলে ঘুরে ঘুরে শেষে এক আলিসান ভুজঙ্গের মত লুটিয়ে পড়ল। সোনামণি, সামান্য এক প্রাণ-পাখি শশীর মত দানবের, যে আকালের ঘন্টা বাজাত প্রাণ হরণ করে চলে গেল।"

আসলে সোনামণির লড়াই শুধু নিজ যৌবন বীজ রক্ষার লড়াই নয়, অপরিসীম দারিদ্রের জাঁতাকল থেকে মুক্তি পাওয়ার লড়াইও বটে। এ লড়াই নিশি-সোনামণির মতো হাজার মানুষ দেয় এবং সে লড়াই-এর পদ্ধতিকে (এক্ষেত্রে চুরি) কখনোই অন্যায় বা অপরাধ বলে মনে করে না। এ গল্পে মনুষ্যেতর প্রাণী পক্ষীকুলের ধান খুঁটে খাওয়ার ঘটনাকে অধিকার হিসাবে মান্যতা দিয়ে সোনামণি-নিশিরা নিজেদের বেঁচে-থাকাথাকিকেও অধিকার বলে মনে করেছে :

"টিনটা ঝনঝন করে বাজছে। আকালের ঘন্টা বাজাচ্ছে শশী। ঘন্টাটা ক্রমাগত বেজে চলেছে। শশী কি টের পেল—পাখ-পাখালি উড়ে এসে বসেছে।... নিশি এবার চোখ মেলে তাকাল এবং খপ করে হাতটা ধরে ফেলল সোনামণির। তারপর ভুঁয়ের ভিতর, কাদা জমির ভিতর নেমে গেল। ওরা প্রায় চারটা পাখির মত খুঁটে খুঁটে যেন ধান খেতে থাকল। খুঁটে খুঁটে খুব সন্তর্পণে—আলগোছে হাত বাড়িয়ে তুলে আনল ধান। একটা ধান, দুটো ধান, একসঙ্গে

পাঁচটো সাতটা ধান তুলতে পারছে না। পাঁচটা সাতটা ধান তুলতে গেলে এক মুঠো কাদা উঠে আসছে। জ্যোৎস্না প্রায় মরে আসছিল। ওরা ধানের চেয়ে কাদা তুলে ফেলছিল বেশি। শশী খামারে বলে দড়ি টানছে ত টানছেই। এক মুহূর্তের জন্য থামছে না। থামলেই ওরা চারটা পাখি ভুঁইয়ের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।"

পাখির উপমায় এইভাবে নিজেদের চুরিকর্মকে মান্যতা দেওয়ার কথা গল্পটিতে ধ্রুবপদের মতো বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। এবং বারবার ব্যবহৃত এই জাগতিক নিয়ম মানদণ্ড হয়ে পাখিসম মানুষগুলোর আচরণকে অধিকারের পর্যায়ে উত্তরিত করেছে। এই উত্তরণ এতটাই মুন্সিয়ানার সঙ্গে গল্পে সংগঠিত হয়েছে যে কখনোই তাকে আরোপিত বলে মনে হয় না। গল্পটির রসসার্থকতা এ সূত্রেই এসেছে।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসের একটা তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিষয় এবং বিষয়ীর মধ্যে খুব সহজ একধরনের একাত্মতা নির্মাণ, যে নির্মাণের আভ্যন্তর মাধ্যম হিসেবে নিরন্তর কাজ করে যায় অপরিসীম মায়া। মায়াধৃত বিষয়-বিষয়ীর এই একাত্মতার চলচ্চিত্রটি উন্মেষিত হয় জগৎ জীবনের উপর লেখকের দরদের সূত্রে। জীবন ও জগতকে অতীন যথার্থ অর্থেই দরদরূপ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে ফেলে প্রত্যক্ষ করেন। —এই ধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ গল্প হল 'চীনেমাটির পুতুল'।

গল্পটির বিষয় বিশ্লেষণে জানা যায়—গল্পটি স্ত্রীর মৃত্যুর পর চূড়ান্তরূপে নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়া এক বৃদ্ধের একাকীত্বের চূড়ান্তে পৌঁছে গিয়ে তার বিনষ্টির অতলান্তে হারিয়ে যাওয়ার কথা। শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ এবং আধুনিক জীবন ধারণের সূত্র মেনে প্রিয় নাতিকে নিয়ে ছেলে-বৌমা পৃথক ফ্ল্যাটে উঠে যাওয়ার পর শুরু হয়েছে বৃদ্ধের নিঃসঙ্গতা বোধের দিনলিপি। একদা নিশ্চিন্ত আশ্রয় হিসেবে প্রায় পাণ্ডববর্জিত জায়গায় ঘর বেঁধেছিল বৃদ্ধ নীলরতন বসু। সেই নির্জন জায়গা তার চোখের সামনেই জনবসতিতে পূর্ণ হয়ে গেলেও তার ঘরটি হয়ে গেছে নির্জন থেকে নির্জনতর একটি আবাসভূমি। সেই আবাসভূমিকেই অপরিসীম দরদ দিয়ে, মায়া দিয়ে, স্মৃতিচারণের সূত্রে সরগরম করে রাখতে চেয়েছিল নীলরতন। স্ত্রী যামিনীর কথা, ছেলে-ছোট মেয়ের ডাক্তার হওয়ার কথা, নাতি বাপ্পার দুষ্টুমি ও চঞ্চলতার কথা, নিজ জীবনের ঐতিহ্যে ও মূল্যবোধে ঘেরা উত্তরণের কথা দিয়ে নিজের শূন্য গৃহটাকে ভরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে নীলরতন। যদিও শেষ রক্ষা হয়নি। একাকীত্ব থেকে নিঃসঙ্গতার ভয়ঙ্করতায় এবং সেখান থেকে মৃত্যুর চরমতম পরিণতিতে পৌঁছে যাওয়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়তে হয় তাকে—একাকীত্ব থেকে নিঃসঙ্গতা এবং নিঃসঙ্গতা থেকে মৃত্যুতে পৌঁছানোর একমুখী ধারাপ্রবাহ যদি গল্পটির বিষয় হয় তবে সেই মৃত্যুস্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে

আত্মীয় পরিজনের প্রতি, একান্ত আশ্রয় বাসগৃহটির প্রতি অপরিসীম মায়ার দৃষ্টি ক্ষেপণে উল্টো যাত্রায় দাঁড়িয়ে থাকা বৃদ্ধ নীলরতন হল বিষয়ী। বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে যে ভাগবত দ্বান্দ্বিকতা গল্পে প্রাথমিকভাবে রয়েছে তা একাত্মতায় পৌঁছে গেছে লেখকের দরদী জীবনদর্শনের সূত্রেই। কথক নীলরতনের দাদুর মৃত্যুদৃশ্য সেই দরদী জীবনদর্শনের প্রতিফলক হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটিকে প্রাসঙ্গিক উদাহরণের সাহায্যে এইভাবে স্পষ্ট করা যেতে পারে :

একাকীত্ব থেকে নিঃসঙ্গতা, নিঃসঙ্গতা থেকে মৃত্যুমুখী বিষয়ের গতি :

(১) "শেষ রাতের দিকে এইসব বাড়ির জানালায় বেশ একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে যায়। পাখা চালাতে হয় না। তিনি নিজে অন্তত ঘুম ভাঙলে পাখা বন্ধ করে দেন। পাখার আওয়াজে তাঁর মনে হয় তিনি বিভ্রমে ভুগছেন। পাখাটা বন্ধ করে দিলে চরাচরের গোপন সত্য ধরতে পারবেন তিনি—কিন্তু কে গায়, কোথায় গায়, গানের অস্পষ্ট শব্দমালায় হতচকিত হয়ে নিদারুণ বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যান। তখন নিজেই মনে করে নেন, আসলে কেউ তাঁকে সতর্ক করে দিচ্ছে—নিজের একাকীত্বে এত বিচলিত কেন? সারাজীবন খড়কুটো সংগ্রহ করেছ, এখন তোমার ছুটি। তোমার অপেক্ষায় কেউ আর বসে নেই।"

(২) "সেই পাখির বাসার মতো, নিরন্তর ঝড় বাদলায় খড়কুটো সংগ্রহ করা—বাসা তৈরি করা। ডিম ফুটলে ছানা-পোনার আহার সংগ্রহ করা। তারপর তাদের উড়ে যাওয়া। পাখির কোনো নিঃশব্দ বেদনা থাকে না। মানুষের কেন যে থাকে।"

(৩) "লক্ষ্মণ এসে দেখল সদর বন্ধ। অন্যদিন খোলা থাকে। সকালে বুড়োকর্তার জলখাবার, দুপুরের খাবার করে দিয়ে যেতে হয়। সন্ধ্যায় এসে আর এক প্রস্থ কাজ। রাত্রে ডাক্তারবাবুর ফ্ল্যাট পাহারা।

সদর খোলা নেই কেন। বুড়োমানুষটা বারান্দাতেও নেই। সে বেল টিপল। লোডশেডিং হতে পারে। সে কড়া নাড়ল। একবার, দু'বার। পরে জোরে, খুব জোরে। দরজাটা আজ কেউ খুলে দিল না।

দরজা ভাঙলে দেখা গেল সিঁড়ি ধরে নেমে আসার পথে তিনি দুহাত বিছিয়ে পড়ে আছেন। স্ট্রোক, অথবা দুর্ঘটনা। সবাই দেখল হাতের মধ্যে কিছু একটা আছে। কী ওটা! হাত দিতেই ছোট টের পেল, মানুষের বুড়ো আঙুলের হাড়। মানুষের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটিকে সোজা রাখে হাড়টা। সে, হাড়টা গোপনে বাবার হাত থেকে তুলে নিল। কঙ্কালের হাড়টা সব বাড়িতেই শেষ পর্যন্ত কেন যে থেকে যায়!"

জীবন ও জগত সম্পর্কে বিষয়ীর অপরিসীম মায়া :

(১) "সকালে বাপ্পা এসে দুষ্টুমি করত। তা করবে। না করলে বাড়িটা বাড়ি বলে মনে হবে কী করে! চশমাটা নিয়ে দৌড়াত। দু-হাতে ভর করে চশমা চোখে দিয়ে বিছানায় উবু হয়ে শুত। কখনো তাঁর বাঁধান দাঁত লুকিয়ে মজা করত। সকালবেলাতে প্রায় দাদু নাতি এই নিয়ে ওপর নিচ ছোটাছুটি চলত।"

(২) "এমনি আশ্বিনে তাঁর বড় পুত্রের জন্ম। এমনি শেষ রাতে তিনি আজকের মতো

উদ্বেগে পায়চারি করছিলেন। কান্না—কোথাও তিনি নবজাতকের কান্না শুনতে পান। দু'হাত দুমড়ে মুচড়ে বলছে, আমি এসেছি। আমি খাব। আমার জায়গা চাই।"

(৩) "সেই নিরাপত্তাবোধের অভাবই তাঁর বোধহয় সহায় ছিল শেষ পর্যন্ত। একটা জমি, বাড়িঘর, এবং ছাদের নিচে আশ্রয় পাবার জন্য কী না অমানুষিক পরিশ্রম গেছে তাঁর। কী না ব্যাকুলতা।"

দরদপূর্ণ জীবনদর্শনের মাধ্যমে বিষয়-বিষয়ীর মধ্যে একাত্মতা :

(১) "এক অন্ধকার থেকে অন্য কোনো অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার আগে ডানা ঝাপটানো। ঘোড়ার পায়ের শব্দ কোথাও। কবিরাজ এসে দেখেছিল, বড় জেঠিমা, সোনা জেঠিমা হেঁসেলে। সিংবাড়ির অন্নদা কুয়ো থেকে জল তুলছে। দাদুর ইহলোক ত্যাগের আগেকার ছবিটা কেমন ঝুলে থাকল কিছুক্ষণ চোখের উপর। হরিনাম সংকীর্তন, নাপিতবাড়ির হরকুমার খোলে চাঁটি মারছে। করতাল বাজাচ্ছিল গৌর সরকার। দাদু সাদা চাদর গায়ে সব শুনছিলেন, আর মাঝে মাঝে বলছিলেন, সবার খাওয়া হল। যেন কত সোজা একটা রাস্তায় রওনা হয়েছেন। বর বেশে কোথাও যাত্রা। সবার খাওয়া হলেই পালকিতে চড়ে বসা। দুই পুরুষ আগেকার এমন মৃত্যুর ছবি এই শেষ রাতে জানালায় দাঁড়িয়ে তিনি মনে করতে পারছিলেন। সঙ্গে অভ্যাস বশে কাজ করে যাওয়া। সব ঘড়িগুলোতেই আগে দম দিতেন। এখন একটাতে এসে ঠেকেছে। হাতে নিয়ে দুবার চাবি ঘোরালেন, তারপরই মনে হল, হাতটা তাঁর অসাড় লাগছে। ঘড়ি মিলিয়ে এ-বাড়িতে আজ আর কারো স্নান আহার করার দরকার নেই। নীল রঙের বাসে তুলে দেবার জন্য কারো হাত ধরে আজ হাঁটতে হবে না। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। চাবি দিতে ভুলে গেলেন। ঘড়িটা হাফ দম খেয়ে বিছানায় পড়ে থাকল।"

(২) "জানালা খুললে কিছু গাছপালা নজরে আসে। সামনে পাকা রাস্তা। ছিমছাম সব কিছু। সামনে বড় স্কুলবাড়ি। স্কুলবাড়ির মাঠটায় কেউ দাঁড়িয়ে গাইছে না তো! না সেখানে কেউ নেই। গানের কোনো শব্দ স্পষ্ট নয়। অদ্ভুত এক ব্যঞ্জনা সেই সুরের। যেন বলে যায় কেউ, এক অন্ধকার থেকে, আর এক অন্ধকারে যাত্রা।

আসলে বয়স হলে মানুষের বুঝি এমনই হয়। তিনি ভয় পাচ্ছেন। এক অন্ধকার থেকে আর এক অন্ধকারে যাত্রা কেন?"

(৩) "এককাল, প্রকৃতি, তার উদাস মাঠ, বিদ্যালয়, এককালে বাবা-মার গ্রাসাচ্ছাদন, ভাই-বোনেদের বড় করা—সোজা কথায় কর্তালী করার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করা এবং পরে যামিনী, পুত্রকন্যা সব নিয়ে আবার ঠেলে উজানে নৌকা নিয়ে যাওয়া—সারাজীবন একজন মাঝি আর নৌকার সম্পর্কে যেমন থাকে আর কি!"

জীবন সম্পর্কে নীলরতন বসুর এই দরদপূর্ণ দার্শনিক দৃষ্টি বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যেকার বৈপরীত্যকে ঘুচিয়ে একাত্মতার পথে হাঁটিয়েছে। এই কারণে ভোগবাদ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদজাত যে বিচ্ছিন্নতা তার সংসারকে এবং তাকে নিঃসঙ্গ করেছে সেটিকে নীলরতন বসু তিক্ততার পরিবর্তে প্রসন্নতার দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছেন বলেই সময়জাত এই নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে কোনো ক্ষোভ তিনি উগরে দেননি। সবকিছুকে

জাগতিক প্রসন্নতায় শিল্প করে তোলার পিছনে এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নীলরতন বসুর স্রষ্টা অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দরদ ও মায়ার স্পর্শটি বড় রকমে কাজ করেছে। তার ফলেই নিতান্ত পরিচিত বিষয়ের এ গল্পটি স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে।

'শেষ দেখা' এই পর্যায়ের আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ গল্প। এ গল্পে বিষয় হিসেবে অঙ্কিত হয়েছে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র পেশায় লেখক সুরথ চরিত্রের বাবার হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া মৃত্যু। বাবা থাকতেন দূর-মফঃস্বল শহরে, সুরথেরা রাজধানী শহর কোলকাতায়। এই মৃত্যু সংবাদ পেয়ে স্ত্রী নিভা ও পুত্র নয়নকে নিয়ে সুরথ গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে। সারারাতব্যাপী বাসযাত্রার মধ্যেই পিতাকে নিয়ে সুরথের ভাবনা চিন্তার পরতগুলি উন্মোচিত হয়েছে। সহজ সরল আনন্দে দিনাতিপাত করা অশীতিপর বাবার ইচ্ছা ছিল অনায়াসে নব্বই বছর বেঁচে থাকার। সেই কারণে নিতান্তই স্বাভাবিকভাবেই তিনি চলাফেরা করতেন। এহেন বাবার মনে গত সাক্ষাতে সুরথ মৃত্যুচিন্তার বীজ বপন করে দেয়। এরপর দিন দশেকের মধ্যেই বাবা মারা যায়।—সংক্ষেপে এটাই হল গল্পটির বিষয়। এই বিষয় বিবৃত হয়েছে বিষয়ী সুরথের মানস ভাবনার সূত্রে। সুরথ 'বিষয়ী সুরথ' একটা সময় বাবার মৃত্যুর সঙ্গে একাত্মীভূত হয়ে পড়েছে বাবার স্থলে। বাবার মৃতদেহের স্থলে, এ সূত্রেই সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত দেখেছে। শুধু তাই নয়, একধাপ পিছিয়ে বিষয়ী সুরথ বিষয় মৃত্যু ভাবনার সূত্রে ঠাকুরদার মৃত্যুও যেমন প্রত্যক্ষ করেছে তেমনি তা অধোগতি নিয়ে একধাপ এগিয়ে তার সন্তানের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। গল্পে বিষয়-বিষয়ীর এমন একাত্মীভূত হওয়ার চিত্রটি এইভাবে বর্ণিত :

"সুরথ তখন দেখল সহসা লণ্ঠন উঠোন থেকে কে তুলে নিয়ে গেল। আবার কেউ আর একটা লণ্ঠন এনে বসিয়ে রাখছে। উঠোন খালি। বাবা নেই। মা নেই। লণ্ঠনের পাশে সুরথ নিজে শুয়ে আছে। সারা শরীর সাদা চাদরে ঢাকা। পাশে নয়ন, পায়ের কাছে নিভা এবং এই একই গাছপালা মাঠ। পরিজন বেষ্টিত নিজের মৃতদেহ সুরথ দেখতে পেল উঠোনে পড়ে আছে। সে প্রচণ্ড রকমের নাড়া খেল ভিতরে। অনেকদিন আগে, সেই শৈশবে সে বাবার পাশে দাঁড়িয়েছিল, উঠোনে ঠাকুরদা শুয়ে আছেন। অনেক দিন পরে বাবা শুয়ে আছেন, সে নয়নকে নিয়ে পাশে। এবারে তার পালা। সে নড়তে পারছিল না। শীতের রাতেও তার ঘাম হচ্ছিল। বাবা তার জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে একটু বেশি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।"

সুরথের এমন ভাবনাই তাকে শুধু বিষয়ীর আসনে না রেখে বিষয়ের কেন্দ্রেও অধিষ্ঠিত করেছে। এই একাত্মীকরণ করানো হয়েছে বিষয়-বিষয়ীর মধ্যেকার অপরিসীম দরদের প্রেক্ষিতে। গল্পে, সদর্থেই, দরদরূপ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে ফেলে বিষয়-বিষীর আন্তঃসম্পর্কটিকে আবিষ্কার করা হয়েছে। গল্পে দেখি :

(১) *"বাবা বোধহয় ইচ্ছে মৃত্যুর বলেই জীবনের পাট সাত দিনের মধ্যে সাঙ্গ করে*

ফেললেন। ছেলের কথাতে বাবার হুঁশ ফিরে এসেছিল। তাই তো পৃথিবীতে অনেকদিন থাকা হয়ে গেল। জীর্ণ বটবৃক্ষের মতো বেঁচে আর লাভ! বরং জায়গা সাফ করে দিলে, নতুন গাছপালা গজাবে। নতুন সবুজ পৃথিবীর কথা ভেবে বাবা ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন।"

(২) "গাড়িতে উঠে পড়েছি। তোমার মা থাকলেন। তাঁকে দেখ। সব দিয়ে গেলাম। তোমারাও সব দিয়ে যাবে। মানুষের এই ধারা সুরথ। দুঃখ কর না।"

(৩) "বাবাকে সাদা চাদরে ঢেকে রাখা হয়েছে। মা পায়ের কাছে বসে আছেন। কেমন বিবর্ণ মুখ মা'র। যেন একটা বড় রথ চালিয়ে বাবা শেষ বেলায়, রথটার দায়িত্ব সবার ঘাড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছেন।"

বিষয় এবং বিষয়ী দুপক্ষেই খুব সহজ স্বাভাবিক কিন্তু অপরিসীম দরদ আছে বলেই মৃত্যুজনিত বিচ্ছিন্নতাকেও এজাতীয় দার্শনিক চিন্তা চেতনার মধ্য দিয়ে নিতান্ত স্বাভাবিকত্বে মণ্ডিত করেছেন গল্পকার। জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পর্বটির এজাতীয় রসময় পরিসমাপ্তি স্বয়ং গল্পকারের মুন্সিয়ানাকেই উচ্চকিত করে। গল্প বয়ণের এ কৌশল অতীনের সহজাত যা তাকে তার সমসাময়িক লেখকদের থেকে স্বতন্ত্র করেছে।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশ কিছু গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয় হয়েছে দেশভাগ, তার ট্রাজেডি কিম্বা তদ্‌জনিত বিচ্ছিন্নতা। এসব গল্পে একই সঙ্গে লেখকের মমত্ব এবং নিরপেক্ষতা গল্প বিষয়ে অন্বিত হয়ে এজাতীয় অন্যান্য গল্প থেকে অতীনের গল্পগুলিকে স্বতন্ত্র করেছে। দেশভাগের অনিবার্য ফলশ্রুতি কিছু মানুষের জীবনে যে শূন্যতা ও হাহাকার ডেকে এনেছিল তার চিত্রণে কখনো একপেশে কোনো মতাদর্শতে আটকে থাকেননি গল্পশিল্পী অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। এসব ক্ষেত্রে অনন্য একধরনের নৈর্ব্যক্তিক এবং মমত্বযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে গল্পরস সৃজনে উপাদান-উপকরণ হিসেবে লেখক গ্রহণ করেছেন। ফলে গল্পগুলি একইসঙ্গে বিশেষ কালের ফাঁদে পড়া কিছু মানুষের মর্মছবির সত্যচিত্র যেমন হয়ে উঠেছে তেমনি কালগর্ভে ঘূর্ণমান তিক্ততার চলচ্ছবির প্রশমিত শিল্পকার্য হিসেবেও পরিগণিত হয়েছে। —তাঁর 'বাতাসী' এই শ্রেণির গল্পের সার্থক উদাহরণ।

বাতাসী দেশভাগ এবং তারই অব্যবহিত ফলশ্রুতি মুক্তিযুদ্ধের শিকার এক অসহায় নারী। মুক্তিযুদ্ধকালীন চলা 'রায়ট'-এর শিকারও সে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষ প্রভাবে তার স্বামী সাধুচরণ তখন নিরুদ্দেশ। ফলে অন্যান্য 'সংখ্যালঘু' হিন্দুদের সঙ্গে নিবারণের হাত ধরে আর নিতান্তই ছোট্ট মেয়ে টগরকে কোলে নিয়ে এপার বাংলায় চলে আসে। প্রায় অনাথের মতো দিশাহীন ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এক সহৃদয় পরিবারের দাক্ষিণ্যে তাদেরই ভিটের এককোণে কোনো রকমে আশ্রয়

পেয়ে যায় সে। পেশা অবধারিতভাবেই হয় ভিক্ষাবৃত্তি। ওপার বাংলার অত্যাচারিত জীবনের কথাকে কথকতার মতো বলে গৃহস্থের সহানুভূতি আদায় করে নেওয়ার ব্যাপারকে প্রায় শিল্পের পর্যায়ে উত্তরিত করিয়েছে বাতাসী। গল্পে দেখি :

(১) "নিবারণ মার আঁচলের ফাঁক থেকে জাদুকরের লাঠির মত সহসা মুখ বের করে বলল, মাইনসে কয়, আমার বাবারে কাইটা ফ্যালাইছে।"

(২) "একটা পরিচিতি কামরাঙা গাছ—বাতাসী সেখানে দাঁড়াল। একদা এই গাছ ওকে মৃত ডাল দিয়ে সাহায্য করত সুতরাং আজও দেখল সঙ্গে কোন মৃত ডাল কিংবা পাকা কামরাঙা ঝুলছে কিনা। অথবা কখনও কয়েতবেলের আচার খাবার জন্য জিলা বোর্ডের সদর রাস্তায়, আমীনকে—বলা নেই কওয়া নেই, এক কোঁচড় শাক তুলে দিয়েছিল। মিষ্টি কথা, সেই যাদুকরের লাঠির মত টগর আঁচলের তলা থেকে বের হয়ে বলেছে, মাইনসে কয় বাবারে কাইটা ফ্যালাইছে। যেন একটা ভেল্কি-ভিক্ষার জন্য বাতাসী সকলকে টগরের সাহায্যে এই ভেল্কি দেখাচ্ছিল। এবং জীবনধারণের জন্য এই ভেল্কি মানুষের প্রয়োজন। এজন্য রাতে বাতাসী মোটা কাঁথায় শুয়ে নির্বিঘ্নে ঘুমোতে পারত, কোন অনুশোচনা থাকত না।"

(৩) "তখন পরিবারের লোকজন দেশের খবর এবং সেই মাঠঘাটের খবর নিচ্ছে, আর বাতাসী কথকঠাকুরের মত বলছে মাঠঘাটের খবর আর কি কমু! এবং এভাবে সে যুদ্ধ জয় করে চলেছে। ওকে দেখলেই সকলের সেইসব মাঠের ছবি দেখার ইচ্ছা—এমন একটা দেশ যার পাখ-পাখালি, মাঠ এবং শস্য প্রাণের চেয়েও মহৎ।"

বাতাসীর এই চিত্র কোনো ব্যক্তিগত বাতাসীর নয়, সদর্থে হাজার হাজার বাতাসীরই। এপারে চলে আসা নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর অন্বেষণের সূত্রে সে নতুন করে বসতি সুখের সন্ধান করতে থাকে। এই সন্ধানে যেমন অত্যাচারিত স্মৃতিকে সে রসদ হিসেবে গ্রহণ করেছে তেমনি অনবদ্য নিরপেক্ষ একটি দৃষ্টিভঙ্গিও পোষণ করেছে। গল্পে দেখি যারা বাতাসীদের কেটে ফেলেছে সে সম্প্রদায়েরই একজন অনন্য মমতায় তাকে নিরাপদে এ বাংলায় পৌঁছে দিয়েছে :

"সীমান্ত অতিক্রম করার সময় সবই আনন্দজনক। সেই একই মানুষ—তারা হাল চাষ করছে; পাখিরা উড়ছিল—কোথাও কোন বিষণ্ণতা ছিল না, না রোদে, না মাঠে, এমন কি মানুষের ভিতরেও নয় জমিতে বীজ বোনার সময়। সীমানার দু'দিকে সেই এক ঝোপজঙ্গল এবং এ-পারের পাখ-পাখালিরা অন্য ধারে উড়ে যাচ্ছে এবং সেই অশ্বত্থ গাছ নদী পার হলে, অথবা সেই এক বৃদ্ধ, আব্বাসের মত ঘোলা চোখে সকল কিছু সামলাচ্ছে। আব্বাস বলেছিল ডোলের ভিতরে লুকাইয়া পড় মা। তর পোলারে একটা তফন পরাইয়া দ্যা। আর বাতাসী সীমানা অতিক্রম করার সময় ভেবেছিল, এখানে কোথাও না কোথাও বৃদ্ধ আব্বাসের দেখা পাওয়া যাবে।"

বাতাসী গল্পের এবং তার স্রষ্টারও মুন্সিয়ানা এই চিত্রের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কারণ দেশভাগ মানুষের সামনে আর্থ-সামাজিক বিপদ ডেকে আনলেও

দুপার বাংলার মানুষের মমত্বপূর্ণ ব্যবহার সে কষ্টকে ভুলিয়েও দিয়েছে। 'বাতাসী' গল্পের কেন্দ্রীয় সমস্যাটি এই কারণে বাতাসীর কাছে তার স্বামী ফিরে আসার পরও বিষয়ান্তরে ঘনীভূত হয়েছে। সেখানে বাতাসী-সাধুচরণই মনের সবখানি জায়গা জুড়ে বিরাজ করেছে বাতাসীর ভিক্ষা না করা কিংবা অব্যাহত রাখাকে নিয়েই। সাধুচরণ চাইছে না বাতাসী ভিক্ষা করুক আর বাতাসী সে বৃত্তিতেই স্থিতু থাকতে চাইছে। গল্প-সমস্যার এই কেন্দ্রচ্যুতির ঘটনাই প্রমাণ করে দেশভাগ বাঙালি জীবনে চরম অভিঘাত হানলেও তাকে বেশিরভাগ বাঙালিই শেষ পর্যন্ত প্রশম দৃষ্টিতেই গ্রহণ করেছে। —গল্পসত্যের এমন পরিণতি গল্পটিকে এবং তার স্রষ্টাকে স্বতন্ত্র করেছে।

দেশভাগ ও তদ্‌জনিত ট্রাজেডির আর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প হলো 'গ্রহান্তর'। কালের অবধারিত পরিণতি হিসেবে দেশভাগের ধাক্কায় একদা অনেক মানুষকে বাস্তুচ্যুত হয়ে পূর্ব পাকিস্তান তথা ওপার বাংলা ছেড়ে এপারে চলে আসতে হয়েছে। এই চলে আসা চরম বেদনার হলেও কালক্রমে তা প্রশমিত হয়ে বাস্তুচ্যুত মানুষকে স্থিতিশীল জীবনও দিয়েছিল। 'গ্রহান্তর' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সত্যেন তেমনই একজন মানুষ। এহেন সত্যেনের কাছে, এখনো ওপারে থাকা, ভুজঙ্গকাকা ও তার মেয়ে শোভা হঠাৎ করে এসেই হাজির হয়েছে। চলে আসার সময় ভুজঙ্গকাকার কাছেই সত্যেনের বাবা কাকারা জলের দরে নিজেদের ভিটে বিক্রি করে এসেছিল। এরমধ্যেই পার হয়ে গেছে বিশ-বাইশ বছর। শোভারা তবু দেশ ছেড়ে, ভিটে ছেড়ে এপারে আসেনি। আসা হয়নি শোভার কারণেই। সেই কারণটি মূলত সত্যেনের প্রতি তার কিশোরী বেলাকার প্রেম যা আঁকড়ে শোভা আমৃত্যু বেঁচে থাকতে চায়। গল্পে দেখি :

(ক) "মুহূর্তে আমার মধ্যে কী যেন ঘটে গেল। বাড়িঘর, পুকুর, গাছপালা, গোপাট, সামনের শস্যক্ষেত্র, স্কুলবাড়ি সব এক লহমায় ভেসে উঠল চোখে। নিরন্তর সুষমার মধ্যে, এই মেয়েটির পাশে আমি বেড়ে উঠেছিলাম। গাছপালার মধ্যে, স্কুলের রাস্তায়, পুকুরে সাঁতরাবার সময় শোভা আমার সঙ্গী। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে যাবে তখন, আকাশে উড়োজাহাজ ঝাঁকে ঝাঁকে—গাঁয়ের ছোটরা মাঠে নেমে গেছি, আর সেই উড়োজাহাজ দেখতে দেখতে বিস্ময়ে যখন হতবাক, তখন এই মেয়েটি হাত টেনে বলত, ঠাকুর বাড়ি যাইবা না, সন্ধ্যা হইয়া গ্যাছে।"

(খ) "শোভা নেমে আসার সময় বলল, আমি কিন্তু তোমার ঠাকুরদার মাঠে এখনও প্রদীপ জ্বালি। ধূপ ধুনো দি। কাঁসার ঘন্টা বাজাই।"

দেশভাগ শোভার কাছে থেকে সত্যেনকে কেড়ে নিল কিন্তু সত্যেনের স্পর্শযুক্ত ভূমি-প্রান্তর কিম্বা গাছপালাকে কেড়ে নিতে পারেনি। অবিবাহিত শোভা সেই স্মৃতি নিয়ে যেন একটা টিলার উপর আমৃত্যু দাঁড়িয়ে থাকবে। —দীর্ঘদিন বাদে শোভাকে

দেখে সত্যেনের এমনই মনে হয়েছে। গল্প থেকেই প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধার করা যায় :

"আর যখন গয়না নৌকা ছেড়ে দিল, পালে হাওয়া লেগেছে, তখন দেখতে পাচ্ছিলাম, গাছপালার ছায়ায় এক বালিকা দৌড়ে যাচ্ছে, সেই বালিকা শেষবারের মতো আমাদের দেখার জন্য দালানবাড়ি পার হয়ে দাসের টিলায় উঠে দাঁড়িয়ে আছে।

আজ আবার দীর্ঘদিন পর মনে হল, শোভা সেই টিলাতেই দাঁড়িয়ে আছে। তাকে সেখান থেকে নামানো যাবে না। সেই টিলায় ওঠার আর ক্ষমতা আমার নেই। শোভা সত্যি বড় দূরের। বড় কাছের। আমি এক গ্রহে, শোভা অন্য গ্রহে। যে যার নিজের গ্রহে বেঁচে থেকে জীবন ভোগ করছে।"

দেশভাগের ট্রাজেডি এ গল্পে শোভার টিলার উপরে স্থিতু থাকা ও সত্যেনের সে টিলায় উঠতে অপরাগ হওয়ার সূত্রে প্রতীকায়িত হয়েছে। হাজার প্রতিকূলতার মধ্যে যারা দেশে থাকে তারা পাহাড়োপরি ওঠার সাফল্যে আলোকিত থাকে আর যারা বাস্তুচ্যুত হয়ে অন্যত্র বসত গড়ে তারা সে সৌভাগ্যের অধিকারী হয় না। শোভার সঙ্গে সত্যেনের তফাৎ ততটাই। এই তফাৎ তাদের মানস বিচ্ছেদকেই সূচিত করে। টিলার প্রতীকই এজাতীয় অনেক গল্প থেকে 'গ্রহান্তর'কে স্বতন্ত্র করেছে।

আলোচ্য গল্পগুলির বাইরেও অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরো অনেকগুলি গল্প রয়েছে যেগুলি শুধু বাংলা সাহিত্যের নয় বিশ্ব সাহিত্যেরও অনন্য সম্পদ হওয়ার দাবী রাখে। সেই গল্পগুলি হল 'বয়স সাতাশি', 'ইহলোক', 'একান্ত ব্যক্তিগত', 'বৃষ্টির আগে', 'উষ্ণ প্রস্রবণ', 'মণিমালা', 'একহাত গণ্ডারের ছবি', 'ভুখা মানুষের কোন পাপ নেই', 'এক লণ্ঠনওয়ালার গল্প', 'আজ আমার সম্বর্ধনা', 'সাম্প্রদায়িক', 'দেবী নিধন পালা', 'শ্লীল অশ্লীল', 'কঠিন হ য ব র ল', 'দক্ষ সাঁতারু', 'আত্ম সম্মান', 'এক বর্ষার গল্প', 'গ্রেট ক্যালকাটা শো', 'যথাযথ মৃত্যু', 'রাস্তার ছেলে', 'জীবন সত্য', 'হেঁসোতে ধার ঠিক আছে' ইত্যাদি।

এইসব গল্পগুলি পাঠে অতীন-গল্পের আরো কিছু মাত্রা কারো পাঠে ধরা দিতেই পারে। আলোচকের ব্যক্তিগত পাঠ-সীমাবদ্ধতার কারণে সেগুলি অনালোচিত থেকে গেছে।

তিন

অতঃপর অতীন গল্পের শিল্পরূপ বিষয়ে দু-একটি কথা বলা যেতে পারে। শিল্পী অতীন সহজ প্রাণের আনন্দের উপাসক। কখনোই কোনো রকম তত্ত্বকথার প্রেক্ষিতে জীবন পর্যালোচনার পক্ষপাতী নন তিনি। কখনোই সামাজিক-রাজনৈতিক

আন্দোলনের নিরিখটিকে ব্যবহার করাও পক্ষে তিনি থাকেন না। তাঁর মত, এসব গল্পকে ভার করে যা শিল্পরূপের পক্ষে হানিকর। এজন্যই গল্পকে শিল্প করে তোলার কাজে সহজ সুরের সাধনাতেই মগ্ন থাকেন। সেকারণেই তাঁর গল্পের বিষয় তা যতই গুরুগম্ভীর হোক না কেনো সর্বত্রই সহজ স্বতঃস্ফূর্ত রূপ নির্মাণের মধ্য দিয়েই বাণীমূর্তি পায় আর খেলাচ্ছলে খেলা যেমনভাবে একসময় লীলাতে পৌঁছায়, তেমনভাবেই অতীনের গল্পের জাগতিক রূপ লিখনের কোনো এক পর্যায়ে কসমিক্ মহারূপ লাভ করে। এই রূপান্তর আসে অত্যন্ত সহজেই।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের শিল্পরূপের দ্বিতীয় মাত্রার মর্মমূলে নিয়তই রসসঞ্চার করে শিল্প-মায়া নির্মাণের সহজাত প্রবণতা। এ মায়া একই সঙ্গে গল্পের বিষয়ে এবং চরিত্রে প্রতিবিম্বিত হয়। লেখার সঙ্গে লেখকের, লেখকের সঙ্গে চরিত্রের মধ্যেকার মায়া শিল্প বয়ণের কৌশলেই পাঠকেও সঞ্চারিত হয়। ফলে তার গল্প পাঠ করলে পাঠকচিত্তও মায়াময় হয়ে ওঠে যা শিল্পরূপের মহার্ঘ্য জগতেরই সম্পদ।

সদর্থে বাংলা সাহিত্যে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাভাবিক শিল্পরূপের কারিগর। যার পূর্বাভাস কেবলমাত্র বিভূতিভূষণের মধ্যেই পাওয়া যায়। জীবনকে একই সঙ্গে স্থানিক রেখে বিচিত্র উড়ানের মাধ্যমে বিশ্ব মানুষ করে তোলার নিপুণ কারিগর হিসেবে বিভূতিভূষণীয় ধারার একজন সার্থক গল্পশিল্পী হলেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বানান অপরিবর্তিত।

শুভশ্রী : ৫০ বর্ষ, ২০১১-১২ সংখ্যায় প্রকাশিত ও লেখকের অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পবিশ্ব

তপোধীর ভট্টাচার্য

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় মানে নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে। সেই কবে, প্রথম যৌবনের মন-কেমন-করা দিনগুলিতে পড়েছিলাম আর পড়তে-পড়তে আবিষ্ট হয়েছিলাম। আজও ঐ আবেশের স্মৃতি ভালো-লাগার বোধকে পুনরুজ্জীবিত করে। কিন্তু পাঠ-স্মৃতি কী দুরতিক্রম্য প্রতিবন্ধকও? নইলে অতীনের পঞ্চাশটি গল্প পড়ার ঋদ্ধ আনন্দ সত্ত্বেও অনিবার্যভাবে কেন নিজের অতীতে ফিরে গেছি? ভাবছি নীলকণ্ঠ পাখির মায়াবী পালকের কথা!

গল্পকার অতীন কী তবে সূক্ষ্মভাবে নিজের ম্যাগনাম ওপাসের বিচ্ছুরণে ফিরে যেতে চান বার বার। তাঁর গল্পবিশ্বকে কী তাহলে বলব উপন্যাসবিশ্বের প্রসারিত ছায়া! কিন্তু ছোটগল্পের মতো শিল্প-মাধ্যমকে স্বতন্ত্র, সার্বভৌম ও আত্মদীপ্ত ভাবব না কেন? আসলে লেখকের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকেরও কখনও কখনও আত্মবিনির্মাণ করতে হয়, প্রয়োজনবোধে দাঁড়াতে হয় নিজের মুগ্ধতার বিপ্রতীপে। ধ্রুপদী উপন্যাসের হীরকদীপ্তিকে মান্যতা দিয়েও ছোটগল্পের অণু-পরিসর থেকে জীবনের চকিত ঝলক গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বাধা হওয়ার কথা নয়। সমান্তরালতার প্রত্যয় যেমন জীবনে তেমনই নন্দনেও মৌল সঞ্চালক হতে পারে, হয়ে থাকে।

তাই অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় মহৎ উপন্যাস-সৌধের স্থপতি হয়েও ছোটগল্পের সূক্ষ্ম কারুকৃতির রূপদক্ষ শিল্পী হতে পারেন অনায়াসে। অলৌকিক জলযান ও ঈশ্বরের বাগান-এর সমান্তরালভাবে লিখতে পারেন 'বয়স সাতাশি', 'দেবী নিধন পালা', 'আরোগ্য', 'কারাবালি', 'ফুলের টব'-এর মতো ছোটগল্প। অতীনের বিচিত্র উচ্চাবচতাময় জীবনের বৃত্তান্ত এমন যে তাঁর অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার অফুরান। তাই তার গল্পবিশ্ব ও গল্পবীক্ষায় দেখা যায় অমেয় প্রাচুর্যের সংকেত। জীবনকে কতভাবে যে সম্বোধন করেছেন তিনি, তার ইয়ত্তা নেই। বস্তুত সম্বোধ্যমানতার প্রক্রিয়া অতীনের প্রতিবেদনগুলিতে যেন নিঃসীম ও নতুন নতুন আরম্ভের প্রেরণায় বিধুর।

ছোটগল্পের কীর্তিমান শিল্পী বিমল কর অতীনের 'পঞ্চাশটি গল্প'-এর ভূমিকায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা লিখেছেন। সেদিকে এবার মনোযোগী হওয়া যেতে পারে:

'জীবন হল অনেকটা সাদা ব্লটিং পেপারের মতন। তার ধর্মই হল কালির দাগ শুষে নেওয়া। আমাদের ছোট বড় নানান অভিজ্ঞতাকে জীবন যে কোথায় কতটুকু শুষে নেয়, বা

কী ছাঁদে তার বিচিত্র অস্পষ্ট ছাপ থেকে যায়—বলা মুশকিল। তবে এ কথা তো সত্যি মানুষের মনের গঠন, তার সচেতনতা, মানসিক ঝোঁক, স্বভাব—এই অভিজ্ঞতার কম-বেশি প্রভাব ও চাপে গড়ে ওঠে। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প পড়লে অনুভব করা যায়—তিনি না পলাতক, না উদাসীন। তাঁর চরিত্রগত গুণটিই হল মমতা, সমবেদনা, উদ্বিগ্নতা নিয়ে এই সমাজ ও সংসারকে দেখা। মানবিক বোধই যে অতীনের লেখার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ—তা অস্বীকার করা যায় না।'

এই কথাগুলি পড়তে মনে আসে শেক্সপীয়ার-কথিত 'milk of human kindness' (The Merchant of Venice)-এর প্রসঙ্গ। এই বিরল গুণটি ছিল বলে অতীনের প্রতিটি সার্থক পাঠকৃতি সামগ্রিকভাবে চিহ্নায়িত। আর, বস্তুবিশ্বের গ্রন্থনা স্বতশ্চল অনুভববিশ্বে পরিণত। অস্তিত্বের নানা অলিন্দে যত অন্ধকারই থাকুক, অতীনের দ্রষ্টা চক্ষু মানবিক আলোর উদ্‌ভাসন খুঁজে নিয়েছে। তাঁর লিখনশৈলীতে তাই নিরীক্ষার প্রকট অভিব্যক্তি তত গুরুত্বপূর্ণ নয়; মানুষের সারাৎসার খুঁজে পাওয়া আর সম্বোধ্যমানতার অবিরল প্রক্রিয়া থেকে গল্পত্বের নির্মাণই মুখ্য। আরও একবার ফিরে যেতে পারি বিমল করের বয়ানে :

'অনেক লেখক আছেন যাঁরা গল্পের গঠনে অত্যন্ত দক্ষ, যতটা পারেন সাবেকি রীতিনীতি মেনে গল্প লেখেন, লেখার মধ্যে একটা ঝকঝকে ভাব থাকে, হয়তো খানিকটা নাটকীয়তা। অতীনের লেখার ধরনটাই আলাদা। তার কোনও নির্দিষ্ট ছক নেই, মাপজোক করে হিসেব মিলিয়ে গল্প লেখার ধাত তাঁর নয়। প্রায় সব লেখাই স্বতঃস্ফূর্ত, ভেতরের তাগিদেই নিজের মতন করে গড়ে উঠেছে। কোনও কোনও সময় মনে হয়, অতীন বুঝি গল্পের পটুয়া। নিজের মতন করে আঁকেন, নিজের মনের পছন্দসই রং ব্যবহার করেন—যার উজ্জ্বলতা প্রখর নয় অথচ স্নিগ্ধ ও লাবণ্যময়। আর বলা বাহুল্য এর একটা দেশজ রূপ ও আকর্ষণ রয়েছে।'

'গল্পের পটুয়া'—চমৎকার এই অভিব্যক্তি এবং যথাযথ। যাকে দেশজ রূপ ও আকর্ষণ বলেছেন বিমল, তাকে আমরা বলব প্রাকৃতায়ন ও উত্তরায়ণ মনস্কতা। এই বৈশিষ্ট্য যে অতীনকে সহযাত্রীদের থেকে আলাদা করেছে এই নয় শুধু, উৎকেন্দ্রিক ও অবক্ষয়ী আধুনিকতার প্রতিস্পর্ধীও করে তুলেছে। সাধারণত আমরা যদিও দৃষ্টান্ত বেছে নিই, অতীনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কার্যকরী হবে না। কেননা তাহলে প্রায় সমস্ত ছোটগল্পের নাম উল্লেখ করতে হয়। গল্পকার স্বয়ং সংক্ষেপে জানিয়েছিলেন : *'গল্পগুলির মধ্যে যেমন মানবিক সম্পর্ক এবং সংকটের কথা আছে, তেমনি আছে দয়াহীন দিশাহীন সমাজের কথা।'* হয়তো বা কেউ কেউ ভাববে, সার্থক ছোটগল্প আদ্যন্ত সময়ের কথকতা আর সমাজের বহুস্বরিক বাচন। অতএব স্বতন্ত্রভাবে কেন-ই বা মনে করিয়ে দেবে এ কথা। কিন্তু গল্প যাঁর কাছে পটকথা, তিনি সমাজ থেকে তুলে-নেওয়া এক গণ্ডুষ জল যে সমাজকেই ফিরিয়ে দিচ্ছেন আবার—তা মনে

রাখেন সর্বদা, বিমল কর প্রাগুক্ত বয়ানে লিখেছেন :

'সামান্য মনোযোগ দিয়ে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা পড়লে মনে হবে, বর্তমান সময় ও সমাজ-সংসারের মধ্যে থেকেও মানুষটি প্রায়শই যেন ব্যথিত ক্ষুব্ধ। যে মানসিক সহনশীলতা, স্বপ্নে সুখী স্বভাব, সমবেদনা, ঔদার্য তাঁর বাল্য কৈশোর যৌবনের মনকে গড়ে তুলেছিল—তার অস্তিত্ব কেমন করে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব! অথচ সেই অতীত পরিবেশ সময় আজ বিগত। এখনকার মানুষ অনেক বেশি আত্মপর, বাস্তব বিষয়ে বিচক্ষণ। কখনও কখনও দায়মুক্ত হবার জন্যে তৎপর। এসব তাঁর পছন্দ নয়, স্বীকার করে নিতেও পারেন না। ফলে যে বেদনা বোধ করেন তা প্রকাশ করাও যায় না। একমাত্র লেখাতেই অতীনের সেই দুঃখবোধ ধরা পড়ে।

অতীনের হাতে প্রকৃতি যতটা জীবন্ত হয়ে ধরা দেয়—ততটাই সৌন্দর্যময় হয়ে, স্বাভাবিক রূপ-রং নিয়ে। এক-এক সময়ে সেই প্রকৃতি শুধু চোখের মধ্যে থাকে না, ঘ্রাণময় হয়ে ওঠে। বিভুতিভুষণের লেখার সঙ্গে এখানে তাঁর লেখার একটা সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। তবে এই সাদৃশ্যকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন নেই। খানিকটা এলোমেলো ভাঙাচোরা ভাষায় কোনও একটি ছবি বা আবেগকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে অতীন কখনও কখনও প্রায় দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেন হয়তো কিন্তু শেষ পর্যন্ত কখন যেন সেই অস্পষ্টতা একটি আসাধারণ 'ইমপ্রেশান' তৈরি করে, ফেলে যায় পাঠকের মনে ছাপ। সন্দেহ নেই, এসব তাঁর অন্তর থেকে আসে চাতুর্য থেকে নয়।'

যাকে 'এলোমেলো ভাঙাচোরা ভাষা' বলেছেন বিমল, তা আসলে নব্য পাঠকৃতির উপযোগী নতুন বাক্‌প্রকরণ। বয়ান ও অন্তর্বয়ন নিয়ে সাম্প্রতিককালে যেসব নতুন ভাবনার কথা জেনেছি আমরা, তাদের নিরিখে বুঝি, সময়-সমাজ-আবেগ -অনুভূতি এককথায় জীবন ও জগতে ব্যক্ত সমস্ত চিরাচরিত মানবিক সম্পর্ক তিনি বিনির্মাণ করতে চাইছেন। যত প্রকাশ্য আকরণ রয়েছে, তাদের আড়ালে প্রচ্ছন্ন গভীর আকরণগুলি আবিষ্কার করাই তাঁর অন্বিষ্ট। তাই ভাষার প্রচলিত সংহিতা থেকে সরে যেতে হয়েছে তাঁকে। সম্পর্কের ভেতরকার আলো-আঁধারি প্রকাশ করতে চান বলে ভাষার ইশারাধর্মিতা জানাতে চেয়েছেন। 'গল্প বলছি, শোনো' তাঁর ধরন নয়, কাহিনীর আরোপিত মায়া বা চাতুর্য দিয়ে নয়—আখ্যানের অন্তর্বৃত শক্তি ও লাবণ্য দিয়ে সংবেদনশীল পাঠকের মন ছুঁয়ে যেতে চান তিনি। তিনি সম্ভাবনাকেই বাস্তব করে তুলতে চান, কিংবা বলা যায়, সম্বোধ্যমানতাকে গল্পত্বের আশ্রয় করে তোলাই তাঁর অভিপ্রায়। পাঠকৃতি-তত্ত্ববিদ জন ফ্রো তাঁর 'Intertextuality and on tology' প্রবন্ধে যেসব চিন্তাসূত্র উপস্থাপিত করেছেন, তাদের সাহায্যে অতীনের বয়ানের বিশেষত্ব যথার্থভাবে বুঝে নিতে পারি :

'The concept of intertextuality requires that we understand the concept of text not as a self-contained structure but as differential and historicl. Texts are shaped not by an immanent time but by the play of

disvergent temporalities. Texts are therefore not structures of presence but traces and tracings of otherness'. (১৯৯৩ : ৪৫)

ভিন্ন-ভিন্ন অণু-সময়ের সঞ্চরণে এবং অপরতার উপস্থিত ও অনুপস্থিত পরিসরের ব্যঞ্জনায় যে দ্বিবাচনিক আবহ গড়ে ওঠে, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পবিশ্ব ও গল্পবীক্ষা তাতে নিঃশ্বাস নেয়। দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে যে বিপুল সম্ভাব্য পরিসরের উপকূলরেখা রয়েছে, সেই গভীরতর আকরণের বার্তা বয়ে আনে তাঁর বয়ান।

দুই

প্রত্যেক পাঠকেরই নিজস্ব পছন্দের এলাকা থাকে আর সেই অনুযায়ী বারবার পড়ার জন্যে বাছাই কবিতা বা বাছাই ছোটগল্পের একটি ছোট্ট তালিকা করে নেন। এই তালিকার আগে 'শ্রেষ্ঠ' বিশেষণটি জুড়ে দেওয়া যায়, সব সময় যায়ও না আবার। বিশেষজ্ঞদের সূক্ষ্ম বিচার আর সাধারণ পড়ুয়ার ভালো-লাগার বোধ মেলে না সর্বদা। ইদানীং যেহেতু পাঠকের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছি, পাঠকের মধ্যেও নানা ধরনের শ্রেণি-বিভাজন করে নিচ্ছি--পাঠকৃতি হয়ে উঠছে উৎসব-মঞ্চ। সেখানে একেকজন পড়ুয়া একেকভাবে (আসলে নিজের যোগ্যতা-প্রস্তুতি-যথাপ্রাপ্ত অবস্থান অনুযায়ী) যোগ দিয়ে উৎসবের আনন্দ শুষে নিচ্ছেন, মননের মধু সংগ্রহ করছেন। অতীনের গল্পবিশ্ব পরিক্রমা করতে গিয়ে এই কথাগুলি বিশেষভাবে মনে এল। এই ভাবনাও জাগল, কী পড়লাম : কাহিনী না বিশিষ্ট উপস্থাপনা না মুহূর্ত-পরম্পরার উদ্ভাসন না কোনো-কোনো মানুষ-রতন। অথবা এদের সংশ্লেষণ থেকে বিচ্ছুরিত কিছু সঞ্চরমান অনুভূতি? এমনও মনে হতে পারে যে প্রতিভসত্তাবাদী (phenomenologist)-দের মতে অতীন জীববিশ্বের (life-world) কথকতা করেছেন যেখানে মানুষ ও নিসর্গ অন্যোন্য-সম্পৃক্ত! অস্তিত্বের কোষে-কোষে যেসব স্বপ্ন ও প্রকল্পনা, মুগ্ধতা ও আবেশ, যন্ত্রণা ও বিষাদ, বাস্তব ও অধিবাস্তব সঞ্চরমান ছায়াতপের পরম্পরা তৈরি করে চলেছে—সেদিকে তর্জনি সংকেত করতে চান অতীন।

জীবনের আশ্চর্য বিন্যাসে-প্রতিবিন্যাসে কীভাবে প্রচ্ছন্ন রয়েছে গল্পত্ব, তার সন্ধানও যেন অতীনের আরেক নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজ। এই খোঁজায় নতুন-নতুন আরম্ভ আছে শুধু, শেষ নেই। চূড়ান্তহীন এই প্রয়াসের বার্তা নম্র, প্রায়-নীরব, আত্মমগ্ন উচ্চারণে ঘোষণা করে তাঁর ছোটগল্পের বয়ানগুলি। আলো-আঁধারির গ্রন্থনায়, বাস্তবের অজস্র ক্ষুদ্রতা-নীচতা-মালিন্যের অভিব্যক্তিতে, সম্পর্কের অন্তবর্তী

ধূসরতা ও রিক্ততায় জীবনের মহিমা খোঁজেন তিনি। তবে সেই জীবন সভ্যতা-গর্বী সংস্কৃতি-গর্বী নিসর্গ-বিচ্ছিন্ন মানুষের নয়; যে জীবন ফড়িঙের দোয়েলের শালিখের উদ্ভিদের মাটির আকাশের সঙ্গে গ্রথিত—সেই জীবনের মর্মমূলে প্রচ্ছন্ন আস্তিত্বিক মাধুর্য তিনি ছোটগল্পের নিজস্ব ভাষায় বিবৃত করেন। যেমন 'বয়স সাতাশি' গল্পের চারুবালা যেন নিসর্গপ্রতীকী অস্তিত্ব; নিসর্গের মতো প্রাচীন তিনি। অতি-সংলগ্ন নিসর্গকে বর্তমান-জীবী মানুষ যেমন উপেক্ষা করে অপ্রয়োজনীয় উপস্থিতি বলে গণ্য করে—তেমনই দীর্ঘায়িত চারুবালাও তাঁর পুত্র-কন্যা আর উত্তর-প্রজন্মের কাছে মনোযোগের বাইরে।

তবু জীবন কখনও একবাচনিক হয় না বলে সোমনাথের মতো কেউ একজন থাকে যে মানুষের মতো পাশে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। গল্পত্বও গড়ে ওঠে চারুবালার সঙ্গে ছলনা করতে গিয়ে সোমনাথের চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠায়। তবে অতীন এই বিন্দুতে থেমে থাকেন না, এগিয়ে যান আরও একটু যেখানে সাতাশি বছরের বৃদ্ধা কীটপতঙ্গের আওয়াজ শোনেন, গাছ—পাখপাখালি—প্রজাপতি—মৃত আত্মার সাথে কথা বলেন। মানুষের সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়ে চারুবালা 'পাখি প্রজাপতি আকাশ দেখতে দেখতে অবোধ বালিকার মতো মাঝে মাঝে কেমন মুগ্ধ হয়ে যান'—এভাবে গল্পের বয়ান শেষ হয় যখন, বুঝে নিই, এই পাঠকৃতির অন্তর্বয়নই মুখ্য।

'ছেঁড়া পাজামা' গল্পের রাধামোহনবাবুও এমন এক বৃদ্ধ, সংসারে যিনি মোটামুটি বাতিল হয়ে গিয়েছেন। রিপুকর্ম ছাড়া তাঁর আর কোনও কাজ নেই সংসারে। তাঁর স্ত্রী সুরমা হাসপাতালে গুরুতর অসুস্থ। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর সংসার ধনে জনে পূর্ণ কিন্তু শূন্যতা তাঁকে গ্রাস করে। নানা অনুপুঙ্খের মধ্য দিয়ে অতীন উচ্চ মধ্যবিত্ত সংসারের সেই বাস্তবতাকে ব্যক্ত করেছেন যেখানে প্রকরণ-সর্বস্বতার মধ্যে হারিয়ে গেছে মানবিক সম্পর্কের উত্তাপ। এই বয়ানে গল্পাংশ খুব কম; একটি প্রৌঢ় মানুষের সংযোগ-শূন্য অবস্থানের প্রতীতিই বড়ো। পড়তে পড়তে মনে হয়, ভাষার সাহায্যে ইম্প্রেশনিস্ট ছবির আদল ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

তবে গল্পত্ব রয়েছে একেবারে শেষে যেখানে ফুল হাতে নিয়ে সুরমার কাছে যাওয়ার সময় রাধামোহন দেখলেন, সুরমা তাঁর মুখ না দেখে পাজামাটা দেখছে। আর, ক্ষীণ ভাষায় যখন সুরমা বললেন 'ছেঁড়া পাজামাটা পরে এলে! আর কী পাজামা ছিল না!' —মুহূর্তে বুঝে নিই, রোগশয্যায় শুয়েও সুরমার অখণ্ড অভিনিবেশ রাধামোহনের প্রতি। অতি সংলগ্নতা সত্ত্বেও তিনি পরিবারের অন্য সদস্যদের নজরের বাইরে; কিন্তু সরমার চোখে সেই আলো যা প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যেও সব কিছুর সত্য-স্বরূপ দেখতে পায়। এরই নাম ভালোবাসা যা স্থূলতা ও তাৎক্ষণিকতায়

আকীর্ণ বাস্তবে, বহু বছরের দাম্পত্য জীবনের পরেও, ধ্রুবতারার মতো অনির্বাণ : 'কোনও এক মানুষীর মনে/কোনও এক মানুষের তরে/যে জিনিস বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে।' পাজামার আলাদা রঙ থাকুক বা না থাকুক, সুরমার সদা জাগ্রত চোখ বস্তুকে সংকেত বলে চিনে নেয় ঠিকই।

কত নতুন ধরনের গল্প লিখতে পারেন অতীন, 'গাছ ও তার প্রতিপক্ষ' তার একটি আশ্চর্য দৃষ্টান্ত। বক্তব্য নয়, অভিব্যক্তি যে ছোটগল্পের প্রাণ হতে পারে এবং বাস্তবও হয়ে উঠতে পারে প্রকল্পনার আধেয়—তা এখানে বারবার অনুভব করি। বিবরণের ছায়া ফেলে পরা-বিবরণ; মনে হয়, গল্পকার যেন বয়ানের গভীরে একটি মায়াবী দর্পণ লুকিয়ে রেখেছেন। তাতে প্রতিফলিত হয়ে বস্তুরূপ হয়ে উঠেছে রহস্যময়; ভাবতে ইচ্ছে করে, বাস্তবটাই কী অবভাস অথবা অবভাসই বাস্তব। লুসিয়েন ড্যালেনবাখ 'The mirror in the Text' বইতে আঁদ্রে জিদের বয়ানে যে লক্ষ করেছিলেন *'filtering of the facts through a highly individualized vision'* এবং *'each fact is seen through different lenses' (১৯৮৯ : ৩১)*। তা পুরোপুরি ভিন্ন প্রেক্ষিতের কথাকার অতীনের পাঠকৃতিতে সক্রিয় : এটা আমাদের ভাবায়। মানুষ ও নিসর্গের সূক্ষ্ম ও জটিল সমান্তরালতা যে গল্পত্বের আশ্রয়, তা বয়ানের প্রথম থেকে শেষ অবধি স্পষ্ট। ফলে পাঠকেরও প্রস্তুতি নিয়ে হয় সেরকম।

ধোঁয়াটে বাস্তবের গ্রন্থনা থেকে ব্যক্ত ও অব্যক্তের দ্বিরালাপ অনুসরণ করে যেতে হয়। সবচেয়ে বড়ো কথা, বাচনের অন্তর্বর্তী শব্দময় নৈঃশব্দ্যও পাঠ করতে হয়। বর্তমানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন স্মৃতির মগ্ন উদাসীন অন্তর্বয়নের প্রত্যাবর্তন আর ধ্রুপদী গানের সমে ফিরে আসার মতো কেন্দ্রীয় চিহ্নায়কের কাব্যিকতাময় ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ করতে হয়। নইলে এই গল্পের বিশেষত্ব পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে।

সলিল-সুধা-রত্না-বিনয়-পরমেষ্ঠী : প্রত্যেকেই বাস্তব পরিসরে থেকেও যেন দুষ্যন্তের ধাবমান রথের মতো বাস্তবের জমি থেকে একটুখানি উপরে উঠে গেছে। বিশেষত সুধা নিসর্গের মতো রহস্যময়ী যেন। বিশ-বাইশ বছর পরে তার সঙ্গে সলিলের দেখা হওয়াতে যে প্রগাঢ় নাট্য-সম্ভাবনা ছিল, গল্পকার তাকে আস্তিত্বিক প্রকল্পনায় (অর্থাৎ existential fantasy) রূপান্তরিত করেছেন। কেন্দ্রীয় চিহ্নায়কের দ্যোতনাগর্ভ গ্রন্থনা এই গল্পে মানব-পরিসরের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পাঠকৃতির শুরুতে পড়ি :

'গাছ, কিছু ফুল এবং তার সৌন্দর্য ছাড়া গাছের কিছু থাকেও না, ছায়া দেবে এমন কল্পনা করা যায় না, কারণ গাছটি ফুল গাছ এবং টগর ফুলের গাছ আর কতটুকু ছায়া দিতে পারে, তবে সলিল মিত্র জানেন গাছে ফুল থাকে, কীটও থাকে—মানুষের কীট এবং পাপ দুই

থাকে—তাঁর মধ্যে কীট এবং পাপ দুইই বাসা বেঁধেছে। তা না হলে দিন দিন গাছটা এত বড় প্রতিপক্ষ হয়ে উঠতে পারে না। সুধা, অর্থাৎ গাছের পৃষ্ঠপোষক এবং যিনি গাছটি এনে রোপণ করেছিলেন, রোপণ করার সময় সলিল না বলে পারেননি—গাছটা লাগালে, গাছ তো বড় হবে সুধা। ...সুধা গাছের গোড়ায় ঝারিতে জল দেওয়ার সময় শুধু বলেছিল, গাছ বড় হলে ফুল ফোটে।'

এ যে প্রণালীবদ্ধ আকল্প-বিন্যাস হিসাবে গল্পত্বের পরিস্ফুটনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য, তা বয়ানের যত গভীরে যাই অনুভব করি। সুধা যেন মূলত স্বপ্ন যা কেবল যৌবনেই দেখা চলে। তখন বাস্তবের ভেতরে সে স্বপ্নের পরিসর নির্মাণ করত; সলিলের সঙ্গে জ্যোৎস্নায় হেঁটে যাওয়া কিংবা কোনও নদীর চরে শুয়ে থাকার বাসনা ছিল তার। নদীর পাড়ে দু'জনে হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে চাইত অথবা নদীর জল ও গভীরতা মাপতে তলায় নেমে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে। কথকস্বরের মন্তব্য : *'অবশ্য অতল গহ্বরে যা কিছু সৌন্দর্য, বিনিময়ে সে শুধু হয়তো সামান্য ভালবাসা ভিক্ষা চেয়েছে।'* তখন কোনও আকাঙ্ক্ষার কথাই উচ্চারণ করত না সুধা কিন্তু স্বপ্ন-হননকারী বাস্তবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। কথকস্বরের মতে *'প্রবঞ্চক প্রসাধনের মতো সুধার মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা গড়ে উঠেছে।'* সলিল আসলে কবেকার সুধাকে সেভাবে মনেও রাখতে পারেননি কিন্তু বিশ/বাইশ বছর পরেও সুধার বাস্তবাতিযায়ী মন অক্ষুণ্ণ ছিল, তার প্রমাণ এই উচ্চারণ : *'যাক তবু যে শেষ বেলাতে তোমাকে রোজ দেখতে পাব। দেখতে দেখতে মরে যেতেও পারি একদিন।'* এই গল্পের বয়ানে গ্রন্থনাই মুখ্য; অন্তর্বয়নের ইশারা শুধু পাঠককে লক্ষ করতে হয়। গল্পকারও চান, পাঠক এই অন্তর্বৃত উপস্থাপনায় তাৎপর্য খুঁজুন : *'সুধা তার দেড় ফুটের সীমানায় একটি টগর ফুলের গাছ লাগাচ্ছে। গাছ বড় না হলে ফুল ফোটে না, সুধা কি তবে গাছ, বড় হলে ফুল ফোটে—ফুল তো ফোটার জন্য, ফুলের কী দোষ—অন্তরালে কোনও গোপন প্রতিবাদের ঝড়ে পড়ে গিয়ে গাছটা পুঁতে দিচ্ছে।'*

গল্পকার যে নিসর্গের সঙ্গে মানুষের আলোছায়াময় সম্পর্কের দ্যোতনাকে সমন্বিত করেছেন, তা ধারাবাহিকভাবে বুঝে নেওয়াটা খুব জরুরি। সামান্য যেটুকু কাহিনী সূত্র আছে, তার ক্রমবিকাশ আভাসিত হয়েছে ঐ টগরগাছ সম্পর্কিত প্রতিক্রিয়ার বিন্যাসে। অতীন গল্প-ভাষায় ছড়িয়ে দিয়েছেন মৃদু স্নিগ্ধ কাব্যিকতার মায়া : *'ফুল ফোটেও খুব। গাছটা যত বড় হচ্ছে, ফুল যত ফুটছে—সুধা তত যেন সজীব হয়ে উঠছে। আশ্চর্য স্নিগ্ধ সুষমায় সে যেন মুগ্ধ হয়ে আছে। সকালে গাছটা ফোটা ফুল নিয়ে একেবারে রাতের আকাশের মতো নক্ষত্রখচিত হয়ে থাকে।'* সলিলের সুধা সম্পর্কিত লঘু স্মৃতি, বর্তমানের সঙ্গে তাঁর বৈপরীত্য, রত্না-বিনয়-চাঁদনি -পরমেষ্ঠীকে কেন্দ্র করে

গড়ে-ওঠা ঈষৎ নাটকীয়তা যেন পাঠকৃতির বিভিন্ন কোরক। এরই মধ্যে গ্রথিত রয়েছে সময়ের সঞ্চরণও : *'এক দু বছরে গাছটা বেশ ডালপালা মেলে দিল।' 'গাছটা গলির সৌন্দর্য হয়ে গেলো।'* কিন্তু সময় একই রকম থাকে না। তাই বিনয় ও সুধার অন্যরকম সম্পর্ক উন্মোচিত হয়।

ইতিমধ্যে রত্নার পক্ষে গাছটা ক্রমেই আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠায় সে গাছটা ছেঁটে দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। ঠিক এই প্রসঙ্গে সলিল সম্পর্কে বয়ানে আশ্চর্য উপস্থাপনা লক্ষ্য করি : *'সকালে সবুজ পাতায় আর সাদা ছোট ছোট ফুলে গাছটা ঢেকে থাকলে কখনও কেন যে মনে হয় তিনিই গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ফুলগুলো সব প্রজাপতি হয়ে তার গায়ে বসে আছে। তাকে ঢেকে দিয়েছে।'* কিন্তু ঠিক তারপরই যেন বয়ানের রৈখিকতা ভেঙে দিয়ে, গাছ নিয়ে রত্না ও সুধার মধ্যে সংঘর্ষ বেধে গেছে। পাঠকৃতির মেজাজও পাল্টে গেছে হঠাৎ। হট্টগোলের মধ্যে বিনয় প্রায় উন্মাদের মতো দা দিয়ে গাছের কাণ্ড দু'ভাগ করে ফেলেছে। সলিল জেনেছে নির্বাসিতা সুধা এখন বনদুর্গা।

গল্পের শেষে সুধা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে আর সমাপ্তিসূচক অন্তিম অনুচ্ছেদে গল্পকার পাঠককে কেন্দ্রীয় চিহ্নায়কের কাছে ফিরিয়ে এনেছেন। গাছটার পচা গুঁড়ি থেকে একটা কিশলয় উন্মুখ হয়ে সলিলকে দেখছে—এই বাক্যে আসলে ধরা পড়েছে সুধার দৃষ্টি-বিষয়ক স্মৃতি। গাছটি শেষ হয়ে যায়নি, কিশলয়টি ক্রমশ বড় হচ্ছে : চিহ্নায়িত এই বাচন বুঝিয়ে দেয়, ভালোবাসার সৌরভ সত্তায় চির সংলগ্ন। অতএব নিজস্ব দার্শনিকতায় সমাপ্তিবিহীন উপসংহার ঘোষণা করেন অতীন : *'কিশলয় তো কীটের খবর জানে না। পাপেরও না। তার দোষ কোথায়। সে তার নিয়ম মতো বড়ো হবে; ফুলও দেবে। কীট তার নিজের মতো ওড়াউড়ি করবে, ফুলে বসবে। দংশনে জর্জরিত হবে ফুলের বাহার। কীটেরও দোষ নেই, ফুলেরও পাপ থাকে না। তারা যে তাদের সংহারক।'*

তিন

পাঠতত্ত্ববিদ জেরোম জে. ম্যাকগান মন্তব্য করেছেন যে নিবিষ্ট পাঠকের, *'pursuit of meaning involves an activity of ceaseless metaphoric producction. These metaphoric constructs are the readers insights into the meaning he desire.' (The Textual Condition : 1991 : 6)*। এই কথাগুলির যৌক্তিকতা 'গাছ ও তার প্রতিপক্ষ' গল্পের নিবিড় পাঠ থেকে স্পষ্ট হয়েছে, এমন আশা করা যায়। অতীনের অধিকাংশ সার্থক গল্পের বয়ানে ঐ নিরবচ্ছিন্ন চিহ্নায়ন প্রকরণের নির্মিতি দেখতে পাই। যেখানে এই প্রক্রিয়ার উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে কম, সেখানেও বাস্তব ও অবভাসের মধ্যে সেতু তৈরির সচেতন চেষ্টা রয়েছে। যেমন 'রাজার টুপি'। সতীশ-সুরমা-বাবুল অস্তিত্বের তিনটে অন্যোন্য-সম্পৃক্ত অথচ

পরস্পর-ভিন্ন মাত্রার প্রতিনিধি। বারবার শিশুর জগতের অনুপুঙ্খ বয়স্কদের জটিল পৃথিবীতে ঘাইহরিণের মতো ঢুকে যায়। যখনই বাবুলের কথা লিখেছেন গল্পকার, তাঁর ভাষা অনিবার্যভাবে কাব্যিক ও চিহ্নায়ক-খচিত হয়ে গেছে। অতীনের দ্রষ্টা চক্ষুতে ধরা পড়ে বাস্তবাতিযায়ী উত্তরণের সংকেত, যা সতীশ-সুরমার বয়স্ক পৃথিবীর চোরাবালিতে হারিয়ে যায়।

তবু ঐ সংকেতগুলিকে লক্ষ করতে হয় আমাদের : 'জলের মতো রং ছিল সেদিন আকাশের'—এই প্রারম্ভিক বাক্যে 'সেদিন' কিন্তু বিশেষ-কোনো দিন নয়; রুগ্ন উৎকেন্দ্রিক অবস্থানে এ আসলে প্রতিদিন। এতে একমাত্র পরিচ্ছন্ন সতেজ স্নিগ্ধ অস্তিত্ব বাবুলের : 'যেন দূরের কোনও মাঠে বৃষ্টিপাতের পর সামান্য জোৎস্নায় ছোট্ট শিশু দুহাত তুলে ছুটছে।' কিংবা 'ভোর হলে সূর্য আপন মহিমায় যেমন আকাশে উঠে আসে, এই বাবুল, ছোট্ট বাবুল সেইরকম দাপাদাপি করে এই সংসার ভরে তুলেছিল।' বাবার কাছে তার রাজার টুপি কিনে দেওয়ার বায়না গল্পকারের নিপুণ লেখনশৈলীতে বহুস্বরিক তাৎপর্যবহ হয়ে উঠেছে। এর বিপ্রতীপে সতীশের স্নায়ু-টানটান অবস্থান, নিরাপত্তাবোধের অভাব, অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা তাকে কাপুরুষ ও অমানুষ করে দেয়। সে নিজস্ব বাস্তবের ভেতরে অন্ধকার বিবর খুঁড়তে-খুঁড়তে ঐ প্রক্রিয়া দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তবু বিবরণ নয়, কেন্দ্রীয় চিহ্নায়কের বিচ্ছুরণে গল্পত্বের প্রতিষ্ঠা যে জীবনের অভিপ্রায়—তা বুঝতে পারি এইসব বিশিষ্ট অভিব্যক্তিতে :

'এখন শুধু কানে কারখানার ঘন্টা পেটানোর শব্দ ভেসে আসে। কে যেন অন্ধকারে লাল বলের মতো এক অগ্নিগোলক ঝুলিয়ে রেখেছে এবং কারা যেন মাথায় রাজার টুপি পরবে বলে ক্রমান্বয়ে ঘন্টা পিটিয়ে যাচ্ছে।'

'ফলে কারখানার দৃশ্য চোখের উপর ভেসে উঠলেই মনে হয়, এক বড় অগ্নিগোলক, অতিক্রম করতে পারলেই মাথায় রাজার টুপি। সতীশ বারবার প্রাণপণ চেষ্টা করেও সেই অগ্নিগোলক অতিক্রম করতে পারছে না।'

এই বয়ানে আরও লক্ষনীয় অন্তর্বয়ন হিসেবে শৈশবের রূপকথার চূর্ণক ব্যবহার। যেন টুকরো-সময় ও টুকরো-পরিসরের ওপর সঞ্চরমান ছায়া ফেলে যায় গভীর-ব্যাপ্ত মহাসময় আর মহাপরিসরের গ্রন্থনা। যেন ইঙ্গিত দিতে চায় বাস্তবের গভীরে রূপকের অধিষ্ঠান; তাই চলমান জীবনের বিপ্রতীপতায় গল্পকারের অভিনিবেশ এত প্রখর। রূপকথার চূর্ণক থেকে উদ্ভূত হয় যখন সাম্প্রতিক অর্জিত জীবনের রূপকল্প, মনে পড়ে যায় রণজিৎ দাশের অসামান্য কিছু কবিতা পঙ্‌ক্তি। যেমন :

'বস্তুত সতীশ এখন নিরালম্ব মানুষের মতো। সংসারের অন্ধকারে এক কালো ঘোড়া আছে, তাতে চড়ে নিরন্তর ডাইনি-বুড়িটা মাঠ পার হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে যেমন হয়—কোনও

দুঃখের ছবি, আর্তের কষ্ট আর নিরাপত্তাবিহীন জীবিকা দেখলে যেমন হয়, সংসারে পাখি ওড়ে না। মরুভূমির মতো মাঠ শুধু সামনে আর এক উট—দীর্ঘ পথবাহী নদী নালা বিহীন মাঠে অনবরত উট ছুটছে। সতীশ তেমনি নিজেকে কীসের আশায় ছুটতে দেখল। কারা যেন পেছনে তাড়া করছে। ফুটপাথের বাসিন্দা, অনাহারে মৃত বালকের ছবি এবং সেই কুষ্ঠরুগি।'

এই বয়ানের মুখোমুখি হই যখন, মনে হয়, এ আসলে পরাবয়নের ছায়ায় লালিত যেখানে বাস্তবের ভেতরে প্রকল্পনার বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। পৃথিবী-বিখ্যাত নিবন্ধ 'structure, sign and play'-তে দেরিদা যে শাব্দিক প্রকরণকে 'rupture' বলেছেন, অতীনের গল্প ভাষায় তা ঘটে যেতে দেখি। তিনি অবচেতন-নিষ্ণাত চিহ্নায়কগুলিকে যেভাবে গদ্যে ব্যবহার করেছেন, কবিতায় রণজিৎ সেই প্রযোগরীতিকে তাঁর শিল্পিত শীর্ষবিন্দুতে নিয়ে গেছেন। যেমন :

'ধাইবুড়ি, ফেরিঘাট, সূর্যাস্ত, রোশনচৌকি, রাত্রির গম্বুজ / যেটুকু বাস্তব, সেও রূপকের বাস্তবতা—তোমার নির্দেশে / কাকতাড়ুয়ার মতো দৃশ্যমান, শূন্যতার আনাচে-কানাচে।' (আগুন ও জলের কবিতা)

এই গল্পে সতীশও বিবেকের দংশন ভুলতে শূন্যতার আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায়। নানা ধরনের পরস্পর-বিরোধী ভাবনার আবর্তে পড়ে নিজের মধ্যে দেখতে পায় 'ভাঙা রেলগাড়ি'র ছবি। তার ছেলের খেলনা চিহ্নায়িত হয়ে যায় বারবার যখন সে পুঁজিবাদী অর্থনীতির যুক্তিশৃঙ্খলায় স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে নিজের ভেতরকার মানবিক পরিসরকে মুছে ফেলে। বাড়ি ফিরে ছেলেকে সতীশ যে নির্মমভাবে মারে, তা তার বন্ধ্যা ক্রোধ-ক্ষোভ-আত্মগ্লানির তির্যক অভিব্যক্তি।

কিন্তু অতীন এই বিন্দুতে পাঠকৃতির সমাপ্তি ঘোষণা করতে পারেন না যে এতেই তাঁর জীবনবীক্ষায় বিশিষ্টতা স্পষ্ট। সতীশ যখন একান্তে নিজের মুখোমুখি, ধরণী শান্ত এবং স্থির, আরো একবার ফিরে আসে কেন্দ্রীয় চিহ্নায়ক। 'রামের মাথায় রাজার টুপি, রাবণের মাথায় কাক'। শুভ ও অশুভের মধ্যে দোলায়িত সতীশের উপস্থাপনায় গল্পভাষা আবার ইশারাময় :

'কেবল দেখলে বাইরে বাবুলের রেলগাড়িটা সাদা জ্যোৎস্নায় পড়ে আছে। বর্ষাকালের বৃষ্টি—এই আসে এই যায়, এই সাদা জ্যোৎস্না এই অন্ধকার। বাবুলের রেলগাড়িতে সে যেন এখন একা বসে আছে। কেউ নেই। সকলে ওকে এক বড় মাঠে ফেলে কোন এক অজ্ঞাত স্টেশনে নেমে গেছে। সে শুধু ইঞ্জিনটা নিয়ে মাঠের ভিতর ভূতের মতো রেলগাড়ি হয়ে গেছে।'

অর্থাৎ গল্পকার এমন এক মানুষের ছবি আঁকেন যে ক্ষয়িত সময়ের পরিধিতে দাঁড়িয়ে অবসন্নবোধ করে কিন্তু আত্ম-সমর্পণ করে না। বাস্তব তাকে কীটের মতো

কুরে-কুরে খায়; তাই প্রকল্পনার সাহায্যে বাস্তবের মধ্যে নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো অলিন্দ তৈরি করে সে। অতএব অন্তিম অনুচ্ছেদে বয়ান সরে গেল পেছনে, পরাবয়ন হলো সম্মুখায়িত :

'ভোরে ঘুম থেকে উঠলে সে আর রেলগাড়ি থাকল না। বাবুলের জন্য বাজার থেকে টুপি কিনে আনতে হবে, সুতরাং সতীশ ঘরের সব দরজা জানলা খুলে দিল। সে যে ক্রীতদাস এ সংসারে তা আর মনে থাকল না। সে বাবুলকে কাঁধে নিয়ে পাতাবাহারের গাছটার পাশে দাঁড়িয়ে ভোরের সূর্য দেখতে-দেখতে ...আজ কী ভেবে দিক্ নির্ণয় শেখাতে থাকল।'

এখানে প্রতিটি চিহ্নায়ক উত্তরণের দ্যোতক স্থির দিক্ নির্ণয়ের চেতনায় পৌঁছানোর বার্তাবহ। মানুষের এবং নাচনে ক্ষয়ের পাণ্ডুরতা থাকতে পারে, কিন্তু তার ভেতরকার মানব-সত্তার সামূহিক বাচনে ক্ষয় নেই। যে-কোনো বিন্দু থেকে তাই ঘুরে দাঁড়ানো যায়, দিক্ভ্রান্তি থেকে ফিরে আসা যায় শৈশবের অমলিন ভোরের স্পর্শ নিয়ে-আসা নতুন দিক্ নির্ণয় দেখার প্রক্রিয়ায়।

সারল্যের লাবণ্যে মোহময় শৈশব যেন রূপকথার স্বপ্নরাজ্য। সেই রাজ্যের কথকতায় কত স্বচ্ছন্দ অতীন, তার দৃষ্টান্ত পাচ্ছি 'বদনের অমৃতফল' গল্পে। তবে সেই সঙ্গে বুঝে নিচ্ছি তাঁর গল্পবিশ্ব সম্পর্কে এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও; তাঁর প্রতিটি প্রধান রচনার অভিজ্ঞান হলো পার্থক্য-প্রতীতি। এই বৈশিষ্ট্য ইদানীংকার গল্পকারদের মধ্যে খুব বেশি করে দেখা যায় না। কেননা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁরা নিজেদেরই অনুকরণ করেন। তাই কখন যেন বৈচিত্র্যের অভাবে বৃত্তবন্দিত্বের দুর্লক্ষণ প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু অতীনের প্রতিবেদন এই নিরিখে আলাদাভাবে চোখে পড়ার মতো। কেননা তাঁর গল্পত্ব সন্ধান এবং বয়ানের স্তর থেকে স্তরান্তরে পৌঁছনোর ধরন ভিন্ন-ভিন্ন। গল্পগুলি পাশাপাশি পড়লে বিষয়টি প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে।

ধরা যাক 'সাদা অ্যাম্বুলেন্স' ও 'কাফের'। প্রথমোক্ত গল্পে প্রৌঢ় গৃহভৃত্য সুবলকে উপলক্ষ করে মহানাগরিক মরুপ্রান্তরের চরম নিষ্ঠুরতার বহুরৈখিক বৃত্তান্ত উপস্থাপিত হয়েছে। একদিকে ঐশ্বর্য-প্রাচুর্য-সুখের অতিরেক কিন্তু তাতে মনুষ্যত্ব অপ্রাসঙ্গিক। গৃহপালিত কুকুরের চেয়ে অনেক নীচে বহু বছর ধরে পরিচর্যাকারী গৃহভৃত্যের অবস্থান। অন্যদিকে সুবলের জলবসন্ত হওয়া মাত্র পলকের মধ্যে নাগরিক মানুষদের সুখী অবয়ব ভেদ করে ভয়াবহ হিংস্রতার গোপন বাঘনখগুলি বেরিয়ে আসে। সুবল আক্ষরিক অর্থেই রাস্তায় গাছের নীচে আশ্রয় নেয়। সেই মুহূর্ত থেকে সুবল হয়ে ওঠে অসুখে আক্রান্ত সভ্যতার প্রতীক। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে দুটি পথ-বালক অবশিষ্ট মনুষ্যত্বের চিহ্নায়ক হয়ে তার কাছাকাছি এসে পড়ে। নানা অনুপুঙ্খের মধ্য দিয়ে চলমান জীবনের বিভিন্ন মুখোশের প্রত্নুনা পেশ করেছেন গল্পকার।

তারই মধ্যে দেখতে পাই, স্বাস্থ্য-পরিষেবার চূড়ান্ত নির্মাণবয়ান ঘটে গেছে। অ্যাম্বুলেন্স এসে সুবলকে নিয়ে যায়। কিন্তু হাসপাতালে জল বসন্তের জন্য কোথাও নির্দিষ্ট পরিসর নেই বলে তাকে আবার নিমগাছের নীচে রেখে পালিয়ে যায়। গল্পকারের চোখে পড়ে সমাজ ও সভ্যতা জুড়ে তিক্ত শ্লেষের আয়োজন। আবার ঠিক এই বিন্দুতে পৌঁছে অতীনের গল্পবীক্ষার প্রভাবে বয়ান বাস্তবের মধ্যে প্রচ্ছন্ন প্রকল্পনার পরিসর খুঁজে নেয়। বাচন হয়ে ওঠে চিহ্নায়িত : দিন মানে পৃথিবীর জায়গা বদল করে নাও এমন কী, তখন মনে হয়, সাদা অ্যাম্বুলেন্সের যাতায়াতও বাস্তবে নিবদ্ধ নেই, তা সংকেতগর্ভ :

'গরীবের অসুখ হতে নেই। অসুখ হলে হাসপাতালে জায়গা থাকে না, বার বার একটা অ্যাম্বুলেন্স ওকে নিয়ে কপট আরোগ্য কামনায় ছোটাছুটি করে।'

পাঠকৃতির শেষে গল্পবস্তু স্পষ্টত বাস্তবাতিযায়ী। সুবল ও তার সঙ্গি দুটি পথবালক তখন যেন অধিবাস্তবের সূত্রধার। আর, অন্তিম অনুচ্ছেদে বাস্তবের ধূসর দিগন্ত সরে গেছে অনেক দূরে। প্রথাসিদ্ধ উপসংহার একে বলা যায়। কেননা কাহিনীর আকরণ পুরোপুরি বিনির্মিত হয়ে গেছে :

'এইভাবে যবে হাজার লক্ষ মানুষের হাহাকার সমস্ত রাজপথ দীর্ণ করবে তখন এক অলিখিত চুক্তি হবে—আর সাদা অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে ঘোরাফেরা করবেন না। এবার ভিতরে ঢুকে পড়ুন। এবং রক্তের ভেতর যে রং খেলা করে বেড়াচ্ছে অস্বচ্ছ আলোতে তাকে দেখে ঘাবড়ে যাবেন না। নিয়ম মাফিক আমাদের জানা আছে সূর্য পূর্বদিকে ওঠে এবং পশ্চিমে অস্ত যায়।'

শুধু উপন্যাসে নয়, ছোটগল্পেও যে সময়ের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন আবশ্যিক, তার দৃষ্টান্ত 'কাফের'। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষিতে মানুষের বিপন্নতা ও মানবিক মহিমা নিয়ে বেশ কিছু সার্থক গল্প রচিত হয়েছে। 'কাফের' এই তালিকায় আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বিশেষত গুজরাট—পরবর্তী ভারতবর্ষে বাঙালি তার দাঙ্গা-কলঙ্কিত অতীত থেকে এরকম কিছু তিমির-হননের বার্তা নিয়ে আসতে পারে। হাসিম-জাবিদা-পরাণ-কিরণীকে উপলক্ষ করে যে-বয়ান রচিত হয়েছে, তা বাঙালির ইতিহাসে হিংস্রতম কৃষ্ণবিবরের প্রতিনিধিত্ব করছে। হত্যা যখন মহামারীর তাণ্ডবে রূপান্তরিত, মানুষ হয়ে আর্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ছবি খুব বিরল। কিন্তু এই গল্পে দেখি, মানুষের ভয়ানক দুর্দিনে কীভাবে অত্যন্ত সাধারণ দুটি মানুষ মানবতার সম্মান বাঁচানোর চেষ্টা করেছে—তা-ই গল্পকারের প্রধান উপজীব্য। তাঁর দ্রষ্টা চক্ষুতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে এই বার্তা : 'যেন হাসিম এখন যথার্থই তীর্থযাত্রায় বের হয়ে পড়েছে, মক্কা-মদিনা যাচ্ছে, মানুষের ভালোবাসার স্থান, যেখানে মানুষে মানুষে

কোনও বিভেদ থাকে না।' এই বার্তার বিচ্ছুরণ আজকের ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক। দাঙ্গাবাজদের কবল থেকে বন্ধু পরাণকে বাঁচাতে হাসিম যখন আপ্রাণ চেষ্টা করে এবং সাহস যোগায়, কথকস্বরের উচ্চারণ তখন যেন পাঠকৃতির সীমানা ও সময়ের গতি ছাড়িয়ে হয়ে ওঠে চিরকালীন মানবতার স্বর :

'যেমন পিতা পুত্রকে বলছে—দেখো, দূরে বাতিঘর দেখা যাচ্ছে, আমরা আর একটু সাঁতার কাটতে পারলেই সেই বাতিঘর পাব। আলো, খাদ্য এবং তাপ পাব। অথবা দেখো জন, আকাশের নক্ষত্র দেখো, তোমার মা বাড়িতে আমাদের দুজনের প্রতীক্ষাতে বসে আছেন, আর একটু সঁতার কাটতে পারলেই আমরা এই ভয়ংকর সমুদ্র অতিক্রম করে চলে যেতে পারব। জাহাজডুবি মানুষপুত্রকে যেন উদ্বুদ্ধ করছে। হাসিম পরাণকে প্রেরণা দিচ্ছে—আর একটু যেতে পারলেই সেই বাতিঘর, বাতিঘরে আমাদের পৌঁছোতে হবেই।'

মনে হয় না কী গুজরাটের সাম্প্রতিক পৈশাচিক মুষলপর্বের পরে জাগ্রত বিবেক মহাশ্বেতা দেবী—অরুন্ধতী রায়দের আজকের বাচনের প্রাক্‌কথন শুনছি।

'যথাযথ মৃত্যু' আরও একটি মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ, তবে ভিন্নগোত্রীয়, ছোটগল্প। এর বয়ান শ্রেণি-বিভক্ত সমাজের চরম অসাম্য ও নিষ্ঠুরতায় আধারিত। তবে গল্পকার তাঁর সেলাইয়ের সুতো খুব সতর্কভাবে লুকিয়ে রেখেছেন। এ-প্রসঙ্গে পাঠতত্ত্বের একটি বিখ্যাত সূত্র স্মরণ করা যায় : *'Readings—like the texts which stand before them—are materially and socially defined. The readings... are structured philosphically—and historically actuated— as writings?' (জেরাম জে. ম্যাকগান : প্রাগুক্ত : ৮)* এই নিরিখে বলা যায়, শীতের দুঃসহ ঠাণ্ডা সইতে সইতে রাত দুটোয় রুগ্ন ও জীর্ণ শরীর নিয়ে বয়স্ক রিক্সাচালক বখের আলি যে আট আনা উপার্জন করার জন্যে ক্রমশ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়—এই বৃত্তান্তের চিহ্নায়িত উপস্থাপনার রাজনৈতিক অর্থনীতি নিবিড় পাঠের যোগ্য।

রাত দুটোর পরে শীতের ঘন অন্ধকারে পুরনো জীর্ণ রিক্সা চালিয়ে যাকে রোজগার করতে হয়, তার অস্তিত্ব আসলে অস্তিত্বহীনতার দ্যোতক। রিক্সার সওয়ারি বৃদ্ধ মহাজনের সমস্ত অবয়বে দীর্ঘদিনের চুরির অভ্যাস ব্যক্ত হতে দেখেছেন গল্পকার। এমনকী দর কষাকষি করে বৃদ্ধ রিক্সা-চালককে প্রতারিত করতে তার বাধে না। এই নিবন্ধে ইতিমধ্যে দেখেছি, অতীনের কাছে কাহিনী বহির্বৃত আকরণ মাত্র; তাঁর গল্পত্ব সন্ধান ব্যক্ত হয় বহুস্বরিক বাস্তবের বিশেষ উপস্থাপনায়। অতএব বখের আলির সঙ্গে বৃদ্ধ মহাজনের কথোপকথনও নানা অনুষঙ্গের জন্যে মূল্যবান। এর সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে কথকস্বরের ভাষ্যকার-সুলভ উপস্থিতি। যেমন : 'দিনে

শরীরে যন্ত্রণা নিয়ে, ক্ষুধার যন্ত্রণা নিয়ে বস্তির একপাশে ছোট্ট চালাঘরটায়—নর্দমার পাশে আলি ছেঁড়া কাঁথার নীচে কাতরায়।' সে আবার সামন্ততান্ত্রিক অতীতের প্রতিনিধি; বিকারগ্রস্ত বাণিজ্য-পুঁজির প্রতীক মহাজনকে সেই অতীতের গল্প শোনায়।

এই গল্প বলাটা বখের আলির আত্মরক্ষার কৃৎকৌশল; কিন্তু তা মৃত্যুপথযাত্রীর রক্তে উত্তাপ সৃষ্টি করতে পারে না। শীতের অন্ধকারে নক্ষত্র ও আকাশ দেখতে দেখতে তার জীবনীশক্তি ক্রমশ ফুরিয়ে যায়। জীবন্ত মৃতদেহ হয়ে তার রিক্সা চালিয়ে যাওয়া ও মহাজনের অহেতুক ভয় পাওয়া : এখানেই গল্পত্ব আভাসিত হয়েছে। বয়ানের শেষে শীতে জমে-যাওয়া মৃত বখের আলির হাত থেকে মহাজন যখন 'কর্তব্যনিষ্ঠ অর্থবিদদের মতো সব টাকা পয়সা ক'টা তুলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অন্ধকারে মিশে যায়'—বাচনের বহুস্বর থেকে সর্বাধিক প্রকট হয়ে ওঠে শ্লেষ। এবং এই শ্লেষই বয়ানকে নিবিড় পাঠের যোগ্য করে তোলে।

'গ্রেট ক্যালকাটা শো'-এর নামে শ্লেষ খুব একটা চাপা নেই। কিন্তু এর বয়ান যখন পড়া শেষ হয় লক্ষ করি, শ্লেষ রূপান্তরিত হয়ে গেছে অনন্বয়-জনিত যন্ত্রণার বোধে। আর বাবার হাত ধরে বিদ্যাসাগরের কলকাতায় আসার বৃত্তান্ত এবং সেই পৌঁছানোর পথরেখা প্রতিবেদনের কেন্দ্রীয় চিহ্নায়ক ছোট গ্রাম পলাশপুর থেকে বাবা অবিনাশের সঙ্গে কলকাতায় এসে ছোট্ট ছেলে বকুল ঐ রূপকায়িত পথটি খুঁজতে থাকে। অবিনাশের নিকট-আত্মীয় ধনবান সুদেবের বাড়িতে গিয়ে জীবনের বিপ্রতীপ ছবি দেখতে পায় বকুল। আবার বকুলের চোখে ধরা পড়ে রাঙা জেঠুর প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতা; সুদেবকে সে তার বিস্মৃত অতীত ও স্বপ্নের জগৎ ফিরিয়ে দেয়। বিদ্যাসাগরের পথরেখা তার মধ্যে ঝিলিক দিয়ে যায়। বস্তুত এই গল্পে কাহিনী নেই তেমন; নাগরিক জীবনের নিষ্ঠুরতা থেকে পালিয়ে যেতে চায় বকুল, এমন কী তার বাবার মধ্যেও সে সম্ভাব্য জল্লাদের ছবি দেখতে পায়। গল্পহীন গল্পের দূরাগত আভাস ফুটে ওঠে যেন। দিকবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে বকুল শহর থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে ছুটতে থাকে যখন, বয়ানের অন্তিম বাক্যে গল্পকার আলতোভাবে ফিরিয়ে আনেন গল্প নামে নিহিত শ্লেষের ছোঁয়া : 'কথিত আছে, বিদ্যাসাগর মশাই এই পথে পিতার হাত ধরে কলকাতায় এসেছিলেন।'

'পোকামাকড়েও খায়, বাঁচে' অতীনের ব্যাপ্ত জীবনবীক্ষার আরেকটি শৈল্পিক নিদর্শন। ভূমিহীন সর্বহারা মানুষের নিরালোক পরিসরে তাঁর সন্ধান অপরাজেয় জীবনের স্পন্দন অনুভব করার জন্যে। গল্পকার মনে রেখেছেন, ছোটগল্পের প্রতিবেদনে সামাজিক ইতিহাসের বিপুল প্রেক্ষিতকে ইঙ্গিতের অণুবাচনে ধরতে হয়। আকালের বাপ অতিকষ্টে সঞ্চয় করে দু'বিঘা ধানের জমি করেছিল; কিন্তু

পেটের দায়ে আকাল সেই জমি লাটুবাবুর কাছে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছিল। আর, তারপর আকাল এবং তার মা ও স্ত্রী নিজের প্রাক্তন জমির ফসল থেকে দু'চারটে দানা চুরি করে কখনও সখনও। এ তো আকালের বৃত্তান্ত নয় কেবল, শ্রেণি-শোষণ-নির্ভর সামাজিক ইতিহাসের জ্বলন্ত বাস্তব। এবং এখানেই গল্পত্ব। শীতে কাঁপতে-কাঁপতে ক্ষুৎপীড়িত তিনটে মানুষ জমি থেকে সামান্য ধান চুরি করে। আধিপত্যবাদ নির্মিত নীতিবোধ কত অবাস্তব এবং প্রান্তিকায়িত জীবনের অপচয়ে কত ট্র্যাজিক কারুণ্য—অতীন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে দেখিয়েছেন। সেই সঙ্গে আপন প্রবণতা অনুযায়ী বাচনে যুক্ত করছেন বহুস্বর : 'চারপাশে ফসলের মাঠ, গভীর অন্ধকার। আকাশে অজস্র নক্ষত্র জ্বলছে। কীটপতঙ্গের আওয়াজ সর্বত্র। ...ভাতের কথা মনে হতেই বুড়ির ভিতরে কেমন প্রাণের সঞ্চার হল।' ক্ষুৎপীড়িত সর্বহারাজনেরা আসলে কীটপতঙ্গের চেয়েও নীচু স্তরে রয়েছে শ্রেণিবিক্ষত সমাজে, এই বার্তার সঙ্গে-সঙ্গে সঞ্চারিত হয় ট্র্যাজিক শ্লেষও। কেননা বয়ানের শেষে দেখি, বুড়ি শীতের প্রকোপে আর জাগালদারের তরাসে ফসলের মাঠে মরে যায়—ভাত খাওয়া তার আর হয়ে ওঠে না।

রূপকথার 'লালকমল নীলকমল' গল্পের 'কে জাগে' প্রশ্নটির চমৎকার বিনির্মিত প্রয়োগ দেখি এখানে। নতুন বাস্তবতায় লালকমলেরা আর জাগে না; বরং প্রহর জাগে শ্রেণি-শোষকের প্রতিভূ রাক্ষস-খোক্কসেরা। তারা প্রাণ হরণ করে; লাটুবাবুরা ধান-জমির সঙ্গে নয়নাদেরও গ্রাস করতে তৈরি। এই সমাজে ফকিরকেও দু-আঁটি ধান চুরি করতে হয়। আগেই লিখেছি, অতীনের গল্পবিশ্বে অন্তর্বয়ন খুব গুরুত্বপূর্ণ। রূপকথার অনুষঙ্গের বিনির্মাণ বাস্তব মানুষের অসহায়তাকে প্রকট করেছে আরও : *'জোনাকি পোকারা জ্বলছে। ওড়াউড়ি করছে কীটপতঙ্গ। পাকা ধানের গন্ধে মাঠ ভরে গেছে কীটপতঙ্গে। পাখিরা ওড়ে। বুড়ির মনে হল, কীটপতঙ্গ খায়, পাখ-পাখালি খায়। মাঠের ধান পোকামাকড়ে খায়, তারা তো মানুষের আপোগণ্ড। তারা খাবে না কী করে হয়।'* জীবন সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক ও দার্শনিক যে-বয়ান পেশ করতে পারতেন, অতীন তা গল্পের নিজস্ব ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এও খুব তাৎপর্যপূর্ণ যে একদিকে আকালের মা উত্তাপের অভাবে ফসলের মাঠে মরে যায়, অন্যদিকে আকাল ও নয়না উত্তাপের খোঁজে শরীরে শরীর মিলিয়ে দেয়। ওরা আসলে প্রজনন বাঁচিয়ে রাখে; জীবনের বৃত্ত সচল থাকে এভাবে। এবং ওরা ধানের ছড়াগুলি মাচানের নিচে বস্তায় ঢেকে রাখতে ভোলে না। কেননা এটাই বাস্তব।

'সময়োচিত নিবেদন' রচনাকুশলতার অনন্য দৃষ্টান্ত। কোনো এক অপরিচিত মানুষের শ্রাদ্ধা[illegible] ধরে বয়ান যেভাবে স্তরের পর স্তর পেরিয়ে

শোভনা-কেন্দ্রিক অতীতে পৌঁছেছে (আসলে পৌঁছেছে নারী-পুরুষের জটিল দুরধিগম্য সম্পর্কের গোলকধাঁধায়)—তা অনবদ্য। 'স্মৃতির অভ্যন্তরে থাকে আশ্চর্য সব মুগ্ধ বিস্ময়'—এই উচ্চারণও সম্ভবত সব সত্য বলে না, কিছু কিছু অনুক্ত রেখে দেয়। নইলে উপসংহারে বয়ান পরাবাস্তবের চিহ্নায়ন-প্রকরণ গ্রহণ করত না, মানুষও হতাশায় অপমানে ক্ষতবিক্ষত হয়ে দেখত না সে 'একটি ভগ্ন সাঁকোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে!' আরও একবার রণজিৎ দাশের কবিতার পঙ্‌ক্তি মনে আসে। 'প্রকৃত নিজের কাছে যাওয়া এক অকল্পনীয় অন্তর্ঘাত' (সুড়ঙ্গ)। স্মৃতি তাই গোপনে তৈরি করে চলে এক 'পালটা প্রতারণার জাল'। লুপ্ত সময়ে ফিরে যেতে পারে না কেউ। 'ভাঙা সাঁকে'র চিহ্নায়ক তাই অমোঘ।

'ইহলোক' যেন সম্পূর্ণ প্রতিবেদন নয়, চলমান লিখন-প্রক্রিয়ার খসড়া। মধ্যবিত্ত বর্গের জীবনবৃত্ত, অন্তঃসলিলা আবেগ, সম্পর্কের লাবণ্য ও বহমানতা উত্তম পুরুষে বিধৃত কথকস্বরের বয়ানে ব্যক্ত হয়েছে। এবং এখানেও অতীন বাস্তব পরিসরের মধ্যে প্রকল্পনায় নিষ্ণাত চিহ্নায়কের অস্তিত্ব খুঁজে নিয়েছেন। যেন এছাড়া তাঁর ছোটগল্প পূর্ণ হয়ে ওঠে না।

বাস্তবের ছিমছাম পরিসরেও কীভাবে প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে বিনির্মাণের রহস্যময় প্রবণতা এবং তার ফলে নিঃশব্দে অবস্থানের মেরু বদল ঘটে যায়, তার উপস্থাপনা লক্ষ করি 'বয়স' গল্পে। যামিনীবাবু ও নির্মলবাবুর জীবনে প্রচ্ছন্ন অন্ধবিন্দু নানা উপলক্ষে হঠাৎ যখন প্রকট হয়ে পড়ে, অভ্যস্ত ছন্দ লয় বদলে যায়। বয়স নামক অনিবার্য সত্যের প্রভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার গভীরে কোথাও বাসা বেঁধে থাকে অপ্রতিষ্ঠা। আসলে সত্তাকে রূপান্তরিত করে অপর পরিসরগুলির দৃশ্য ও অদৃশ্য চাপ। যামিনীবাবু ও নির্মলবাবুর ক্ষেত্রে এটাই ঘটেছে দু'রকমভাবে। গল্পকারের বয়ানে বিভূতিভূষণের বিখ্যাত ছোটগল্প 'রামতারণ চাটুজ্যে—অথর'-এর দূরাগত ছায়া পড়েছে যেন। তবে অতীনের ছোটগল্পে বাস্তবাস্তবর্তী রহস্যের গোধূলি-বলয় বেশি অভিনিবেশ দাবি করে।

মধ্যবিত্তবর্গের ভেতরকার শূন্যাতয়নের অভিব্যক্তির পাশাপাশি 'আগুন জ্বালাবার গল্প'কে মনে হয় কৃষ্ণ মহাদেশের কথকতা। হরিমতি ও হরিশ : এই দুটি মানুষ আসলে মানবসত্তার অপভ্রংশ। এদের অন্তেবাসী বললেও কিছুই বলা হয় না। কেননা এদের অবস্থান বলে কিছু নেই। একজন ভিখারিণী ও অন্যজন পাগল। এই বয়ানে গল্পত্ব রয়েছে উপস্থাপনার ধরনে। ভাঙা অস্তিত্ব নিয়ে দুটি অন্ধকারের প্রাণীও আগুন খোঁজে। এই পাঠকৃতিতেও রূপকথার সূক্ষ্ম অনুষঙ্গ দিয়ে অন্তর্বয়ন রচনা করেছেন গল্পকার। এই রচনার শক্তিতেই গল্পের শেষ পর্যন্ত বাস্তবের গণ্ডি

পেরিয়ে যায়।

এই গল্পে কুশীলবেরা যেন ছায়াবৃত আর দুয়ে মিলে আসলে এক। অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক পরিসরের কথকতায় 'স্বপ্নবৎ' গল্পে অজস্র পাত্র-পাত্রীর ভিড়। বস্তুত একে কতটা ছোটগল্প বলব আর কতখানি বলব পরিকল্পিত কোনো ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত অদিরূপ : তা নির্ণয় করা শক্ত। পিতৃতান্ত্রিক অচলায়তনের ঘনঘোর অন্ধকারে কিছু কিছু আকল্প পুনরাবৃত্ত হয়। লুপ্ত সময়ের এই কথকতায় মনে হয়, বুঝি বা অজস্র গোপন কোটর-পূর্ণ অতীতের জাদুঘরে ঢুকে পড়েছি। সংস্কার-জন্মমৃত্যু ধারা-যৌনতা : সব কিছু মিলিয়ে দুর্ভেদ্য অন্ধকারের বিন্যাস। অতীনের অভিজ্ঞতা ও কল্পনার প্রাচুর্য আমাদের বিস্মিত ও আবিষ্ট করে।

পাঁচ

এক বাচনিকতার নিরেট রুদ্ধতা ও নির্মনন সন্ত্রাসের প্রতি যে তর্জনি সংকেত করেন গল্পকার, এই তো প্রাপ্তি আমাদের। কেননা এই বিন্দু থেকেই শুরু হতে পারে দ্বিবাচনিকতায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রক্রিয়া সন্ধান। এই খোঁজ অতীনের মধ্যে নিয়ত উপস্থিত বলে ছোটগল্পের নতুন-নতুন প্রকরণ উদ্ভাসিত হতে দেখি। এ আসলে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন আত্ম-বিনির্মাণেরও ঘোষণা। নইলে 'আবাদ' ও 'দেবীনিধন পালা' একই গল্পকার লেখেন কী করে এই বিমূঢ় প্রশ্নের উত্তর পাওয়া শক্ত। অতীনের প্রতিটি পাঠকৃতি প্রকৃতপক্ষে এক স্বয়ং সম্পূর্ণ জগতের নির্মাণ। দ্বিতীয়োক্ত গল্পের আধার ও আধেয় সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি; বহুস্বরিক বাস্তবের উপস্থাপনা এমন যে রহস্য আলাদাভাবে খুঁজতে হয় না। কিংবা প্রকল্পনার জন্যেও আলাদা পরিসরের প্রয়োজন হয় না। নিটোল কাহিনীর মধ্যে কীভাবে পরতে-পরতে মিশে থাকে মায়া, তা অনুভব করি বারবার।

আবার, আত্মবিনির্মাণ করতে গিয়ে কখনও কখনও নিজের খেলায় মেতে ওঠেন গল্পকার। যেন নিজেকে বিভাজিত করে দ্বিরালাপের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। 'আজ আমার সংবর্ধনা' তেমনই এক রচনা যার বাস্তবের খাঁজে-খাঁজে মিশে আছে আত্মবিদারক শ্লেষ। গান যেভাবে সমে ফিরে আসে, বয়ানে পুনরাবৃত্ত হয়েছে এই ধ্রুবপদ : 'আজ আমার সংবর্ধনা।' তবে এই গল্পটিকেও [illegible] যায় ছোটগল্পের খসড়া।

'তায়েবকাকার নসিব' পড়তে-পড়তে মনে আসে শিলেটের লোককবি বাউল আবদুল করিমের বিশেষ জনপ্রিয় একটি গানের কিছু পঙ্‌ক্তি যার মধ্যে মর্মরিত হয় দেশভাগজনিত [illegible] দীর্ঘশ্বাস

'আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম
গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান
মিলিয়া বাউলা গান ভাটু গান গাইতাম।'

সাম্প্রাদায়িক সম্প্রীতি বিষয়ে অজস্র বাগাড়ম্বর করেও যেখানে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে চিরস্থায়ী 'আমরা' এবং 'ওরা'র বিভাজন মুছে ফেলা যায় না, ছোটগল্পের নিজস্ব ভাষায় সহজ ও সাবলীলভাবে সেই ঈপ্সিত সংযোগের বয়ান নির্মাণ করেছেন অতীন। অথচ কোথাও তিনি একটিবারের জন্যেও গল্পটির পরাপাঠ সম্পর্কে স্পষ্ট ইশারা করেননি। দেশ-বিভাজন ও বাস্তুচ্যুতি তায়েবকাকার মতো মানুষদের চিরকালের মতো অতীতের মহাফেজখানায় নির্বাসন দিয়েছে—এই কথাই প্রতিকারহীন ক্ষোভের সঙ্গে মনে আসে। গ্রাম-বাংলায় সম্প্রীতির শেকড় যে সামাজিক অস্তিত্বের বহু গভীরে প্রোথিত ছিল, তারই বিবরণ শিল্পিত সংযমের সঙ্গে দিয়েছেন গল্পকার।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় যখন রিক্ততা ও গ্লানির কথা লেখেন, তখনও তাঁর সংবেদনশীলতা আর মানবিক বোধের উত্তাপ জেগে থাকে। তাই মানুষের পরাজয় আর ভেঙে পড়ার মধ্যেও আশ্চর্য দক্ষতায় তিনি আস্তিত্বিক প্রাচুর্যের সংকেত দিতে পারেন। হ্যাঁ, এই প্রাচুর্য পৌর সমাজের ভাঙচুর, লোভী শোষকের নির্লজ্জ পীড়ন, পারিবারিক বৃত্তে প্রকট নীচতা-অসূয়া-আত্মকেন্দ্রিকতা সত্ত্বেও সত্য। অন্তর্ভেদী চোখের আলোয় এই সত্যের কত রকম বিচ্ছুরণ দেখতে পান অতীন, তার চমৎকার নিদর্শন হিসেবে গণ্য করতে পারি 'রাজ গোপালের আত্মচরিত', 'আরোগ্য', 'বোকালোক', 'কাল-ভুজঙ্গ', 'মানুষের ব্যাভিচার', 'জীবন-সত্য', 'শ্লীল-অশ্লীল', 'বাতাসী', 'জীবন নিয়ে খেলা', 'ভুখা মানুষের কোন পাপ নাই', 'চোরাবালি', 'অন্নপূর্ণা', 'বেঁচে থাকা', 'সাম্প্রদায়িক', 'কঠিন হযরলব', 'আউড়ি বাউড়ি', 'অবাস্তব গল্প'—এইসব পাঠকৃতিকে, এই নিবন্ধের অন্যত্র যেমন লিখেছি, প্রতিটি ছোটগল্প পার্থক্য-প্রতীতিতে উজ্জ্বল। ভেবে অবাক হই, এত আশ্চর্য বৈচিত্র্য জীবনের ভেতরে মজুত আছে, অথচ যাদের দিকে আমরা তাকিয়ে থাকি শুধু দেখি না কিছুই, সেইসব কোন্ যাদুশক্তিতে উন্মোচিত করেন তিনি? অবিরল ঝর্ণাধারার মতো জীবনের উপেক্ষিত ব্রাত্য পরিসর থেকে কীভাবে উঠে আসে অস্তিত্বের মধু! যেন যাদুসম্রাট পি. সি. সরকারের সেই সর্বজনপরিচিত ধ্রুবপদতুল্য খেলা 'ওয়াটার অফ ইণ্ডিয়া' পুনরাবৃত্ত হচ্ছে—এরকম মনে হয়! ভৃঙ্গার থেকে যত ঢেলে নিই না কেন জল, ফুরোয় না কিছুতেই। অতীনও যাদু সম্রাটের মতো ফিরে-ফিরে আসেন সেই নিরুচ্চার ধ্রুবপদের উচ্চারণে : জীবনের প্রতিটি রন্ধ্রপথ আর গোলকধাঁধার প্রতিটি প্রবেশবিন্দু অহরহ আলোকিত হচ্ছে মানুষের অম্লান অক্ষয় মহিমায়। গল্পকার তিনিই যাঁর দ্রষ্টা-চক্ষুতে উদ্ভাসিত

হয়ে ওঠে সমস্ত গভীর গোপন। কিংবা, সমস্ত অতিব্যক্ত পরিসর থেকেও উঠে আসে এই বার্তা : কোথায় রয়ে গেছে অনাবিষ্কৃত অনুভবের মধু।

প্রতিটি বয়ানে রয়েছে যাবতীয় অবক্ষয়ী প্রবণতার বিপ্রতীপে যাওয়ার দুর্মর আকাঙ্ক্ষা, রয়েছে প্রাকৃতায়ণ ও উত্তরায়ণমনস্কতা। জীবনের পুঞ্জীভূত অপচয় ও অন্তর্ঘাতের আবর্ত স্বীকার করলেও অতীন কখনও চূড়ান্ত পরাভব ও মানুষের মুছে যাওয়া স্বীকার করেন না। এই দিক দিয়ে তিনি আর্নেস্ট হেমিংওয়ের সেই প্রসিদ্ধ প্রত্যয়-দীপ্ত উচ্চারণের সমর্থক : মানুষ হারতে পারে কখনও কখনও কিন্তু চিরদিনের মতো পর্যুদস্ত হয় না। তাই 'সাম্প্রদায়িক' গল্পের বয়ানে পাই অডেন-কথিত 'memorable speech'-এর উদ্‌ভাসন : 'কিছুই ফ্যালনা নয়—যে যার মতো বাঁচে। সব বাঁচাই বড় আনন্দের।' গল্পকারের জীবনবীক্ষার সঞ্চালক যেহেতু এই মৌল বোধ, বাস্তবের মধ্যেই তিনি খুঁজে পান সমান্তরাল রহস্যের পরিসর আর দ্বিবাচনিকতার নিরবচ্ছিন্ন প্রকরণ। সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলি কখনও প্রকাশ্য কখনও প্রচ্ছন্ন; কিন্তু এদের চাপে জীবনে জটিলতার অন্ত নেই। তবু যত দুরধিগম্য হোক, তার সৌন্দর্যের খোঁজে অতীন অক্লান্ত। স্তর থেকে স্তরান্তরে যাওয়ার পথরেখা পুনর্নির্ণয় করার জন্যে ছোটগল্প নামক শিল্প মাধ্যমকে ব্যবহার করেছেন তিনি। হয়তো বা নিরন্তর নবায়মান সম্বোধ্যমানতার সূত্রায়ণ করতে গিয়ে তিনি আমাদের মনে করিয়েছেন রোলাবার্তের সেই প্রসিদ্ধ প্রশ্নচ্ছলে মীমাংসায় পৌঁছানোর ইঙ্গিত :

'Isn't story telling alwdys a way of searching for ones origin, speaking one's conflicts with the law, entering into the dilectic of tenderness and hatred'? (The Pleasure of the Text : 47)

বানান অপরিবর্তিত।

'এবং মুশায়েরা' পত্রিকার শারদ ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত ও লেখকের অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত।

মৃত্যু এবং জীবনের মহিমা : অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি গল্প

বীরেন শাসমল

তাঁর সামনে বিস্তৃত জীবনভূমি; আছে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্পদ। আর আছে আটপৌরে, কখনো কাঁচা, অজস্র জীবন-কথার ভাঁড়ার। তা থেকে তিনি বেছে নেন অপেক্ষাকৃত আবেগঘন, ছোট ছোট মানবিক শব্দ। প্রার্থিত শব্দকে দু'তিনবার উল্টে পাল্টে, বাজিয়ে ব্যবহার ক'রে তাদের সবটুকু চমৎকারিত্ব নিংড়ে দেন বাক্যে। আবার কখনও শব্দ দিয়ে বাক্যের অংশ নির্মাণ ক'রে, পর পর কমা বসিয়ে শব্দকে নাটকীয়তার তুঙ্গে তুলে নিয়ে গিয়ে পাঠকের স্নায়ুকে চাঙ্গা করে দেন। বিশেষণ ব্যবহারেও তাঁর আছে কিছু 'অতিরিক্ত' শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা। দু'বার তিনবার বিশেষণ-বাচক শব্দকে প্রায় ঘাড় ধরে বসিয়ে দিয়ে চরিত্রের কোন বিশেষ আবেগীয় বৈশিষ্ট্যের ওপর—তার পারিপার্শ্বের অভিঘাতে তার প্রতিক্রিয়ার ওপর জোর দেন, যাতে মুহূর্তেই তৈরী হয়ে যায় অবধারিত একটি 'সিচ্যুয়েশন'। জীবনযাপনের অনুপুঙ্খ বর্ণনায় তিনি অকৃপণ। ডিটেইল বা অনুপুঙ্খের স্তূপকে পাঠকের ওপর চাপিয়ে দিলেও পাঠক তা ভারী বলে ফেলে দিতে পারে না কারণ ডিটেইল তখন 'চরিত্র' হয়ে উঠেছে। চরিত্রের পারিপার্শ্ব বর্ণনা করেন বিশ্বস্ত ভঙ্গিতে। তার জীবনপ্রণালী থেকে জন্মানো শব্দকণার যাবতীয় সৌন্দর্যকে তিনি দক্ষ স্বর্ণকারের মত গেঁথে দেন যাতে চরিত্রটি জীবন্ত এবং শ্রীহীনতায়ও শ্রীময় হয়ে উঠতে পারে। চরিত্রগুলি সিচ্যুয়েশনে সেঁটে গেলে তাদের খণ্ডবিশ্বে তারা নিজেদের কাজগুলি করে যায়। এবার তাঁর কাজ শেষ। এভাবেই তৈরী হয় অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পবিশ্ব। ছাঁচ মানেন না; ক্রাফ্‌টের ব্যাকরণেরও ধার ধারেন না। এক ধরনের রোমান্টিক বোহেমিয়ানিজ্‌ম কাজ করে যায় তাঁর বিবৃতিতে, মাঝে মাঝে বিবৃতির ছলনায় উড়িয়ে দেন, লুপ্ত করে দেন দেশকালের ভৌগোলিক সীমা, তখন গল্পবিশ্বও হয়ে ওঠে এক অলৌকিক মহাবিশ্ব। সমুদ্রের মত দিক্‌চিহ্নহীন। কিন্তু পাঠক সেই বিশ্ব পরিক্রমায় জলযানে যেতেও আপত্তি করেন না। কেননা তাঁর গল্পযাত্রা অলৌকিক হয়েও লৌকিক। এবং একশো ভাগ মানবিক। স্বভাব-বোহেমিয়ান অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প সম্পর্কে বর্ষীয়ান খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক বিমল করের মন্তব্যটি উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না।

"অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প পড়লে অনুভব করা যায়—তিনি না পলাতক, না উদাসীন।

তাঁর চরিত্রগত গুণটিই হল মমতা, সমবেদনা, উদ্বিগ্নতা নিয়ে এই সমাজ ও সংসারকে দেখা। মানবিক বোধই যে অতীনের লেখার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ—তা অস্বীকার করা যায় না। অন্তত আমার ধারণায়।

অনেক লেখক আছেন যাঁরা গল্পের গঠনে অত্যন্ত দক্ষ, যতটা পারেন সাবেকি রীতিনীতি মেনে গল্প লেখেন, লেখার মধ্যে একটা ঝকমকে ভাব থাকে, হয়তো খানিকটা নাটকীয়তা, অতীনের লেখার ধরনটাই আলাদা। তার কোন নির্দিষ্ট ছক নেই, মাপজোক ক'রে হিসেব মিলিয়ে গল্প লেখার ধাত তাঁর নয়। প্রায় সব লেখাই স্বতঃস্ফূর্ত, ভেতরের তাগিদেই নিজের মতন ক'রে গড়ে উঠেছে। কোনও কোনও সময় মনে হয়, অতীন বুঝি গল্পের পটুয়া..." (আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পঞ্চাশটি গল্পের ভূমিকা, ১০.১১.১৯৯৮)

বোধহয় আঙ্গিক হিসেবে ছোটগল্পের নিজের দেহেই রয়েছে এক অপরিমেয়তা। কোন সংজ্ঞায়ই একে ঠিকমত সংজ্ঞায়িত করা যায় না। এর ব্যাপ্তি বিপুল, সম্ভাবনা অসীম। বৈচিত্র্যে অনন্ত। কিন্তু ছোটগল্পকারের দায় অনেক। জীবনকথা অনন্ত, তাই অনন্ত 'কথাবৈচিত্র্যের' মধ্যে দিয়ে, অনন্ত 'আঙ্গিক বৈচিত্র্যের' ছাপ রেখেই এগোতে হবে তাঁকে। স্বভাব-পটুয়া হলেও তাঁর সৃষ্ট পটগুলি পট হচ্ছে কিনা এ জিজ্ঞাসাও স্রষ্টাকে বারবার তাড়না দেয়। পাঠক মুখ ফিরিয়ে নেবে কিনা—বোধহয় অবচেতনেও এ সংশয় কাজ করে। এই জন্যেই বিষয়-বৈচিত্র্যের কথা বলতে গিয়ে H.E.BATES তাঁর 'The Modern Short Story' নামের পুরনো বইতেও লিখে রেখে গেছেন কিছু মূল্যবান কথা :

"...the short story can be anything the author decides it shall be; it can be anything from the death of a horse to a young girl's first love-affair, from the static sketch without plot to the swiftly moving machine of bold action and climax, from the prose poem, painted rather than written, to the pieces of straight reportage in which style, colour and elaboraton have no place, from the piece which catches like a cobweb the light subtle iridesence of emotions that can never he captured or measured to the solid tale in which all emotion, all action, all re-action is measured, fixed, pulled, glazed and FINISHED LIKE A WELL-BUILT HOUSE, with three coats of shining and enduring point. In that INFINITE FLEXIBILITY, indeed lies the reason why the short story has never been adequately defined..." (বড়ো হরফ আলোচকের)

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পও ঠিক '(is) anything the author decides', কিন্তু তিনি কখনোই এই ধারণার দ্বারা বোধহয় প্রভাবিত নন যে তাঁর গল্প 'Finished like a Well-Built House' হবে। কোন কোন স্থপতি যেমন ভাঙাচোরা 'স্ট্রাকটার' রেখে দিয়েও তার মধ্যে স্বাভাবিক শিল্প-সুষমার আভাষ দিয়ে দেন, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'তেমনি-যেমন-যেখানে-আছে-তেমনই-ছেড়ে-দাও' এই

মনোভাবের পোষক। তাঁর মতে এইটেই সৌন্দর্য। এইটেই আমার গল্প—প্রবহমান, জীবনময়। এর থেকে যদি কোন মহিমা বিচ্ছুরিত হয়, তো হোক।

আলোচনার সুবিধের জন্য আমি মাত্র দুটি গল্পকে বেছে নিচ্ছি। অনেক কম বয়সে পড়েছিলাম তাঁর গল্প 'পোকামাকড়েও খায়, বাঁচে'। শারদীয় প্রতিক্ষণে বেরিয়েছিল। আর একটি গল্প 'রাজা গোপালের আত্মচরিত', শারদীয় 'এক্ষণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'পোকামাকড়েও খায়, বাঁচে' গল্পটি আমাকে 'হন্ট' করেছিল বলা যায়। গল্পটি অনেক আগের লেখা। সাল তারিখের হিসেব না পেলেও প্রতিবেশ বলে দেয় স্বাধীনতা-পরবর্তী জমিদার-জোতদার-ভূস্বামী-মহাজন অধ্যুষিত পশ্চিম বাঙ্‌লার (বা সমগ্র বাঙ্‌লার) ভূমি সম্পর্কের সংবাদ। মাটি এবং মাটি-সংলগ্ন/সংক্রান্ত বহু গল্প বাঙ্‌লা সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করেছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গল্পগুলির ('হারাণের নাতজামাই', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী', বা ছিন্নমূল জীবনের আদিম জীবনতৃষ্ণার আলেখ্য 'প্রাগৈতিহাসিক') পটভূমি এক হলেও জীবন প্রণালী-সমাজ-আর্থ-রাজনৈতিক বাস্তবতার অস্থিরতা, ভূমির গর্ভগৃহে বিদ্রোহের আগুন নিয়ে সেইসব গল্পের নির্মাণকলায় আলাদা মাত্রা। সময়ের ট্রিটমেন্ট আলাদা ব্যঞ্জনা যোগ করেছে কৃষি-সম্পর্কের শরীর-বৃত্তে। মানিকের গল্পগুলি যেমন অস্থিরতার, বিদ্রোহের এবং আগামী ঝড়ের পূর্বাভাসের গল্প; অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প গুলি 'স্থিরতা' এবং অসহায় আত্মসমর্পণের গল্প বা পরাজয়ের গল্প; এর সুরই হল শান্ত, ঘটনাহীন এবং দুঃখময়। যদিও দুঃখবাদ নয়, নির্মল মানবিকতার চোরা স্রোত এসব গল্পের প্রাণকেন্দ্রে ফল্গুধারার মত বয়ে চলেছে। বিদ্রোহ আছে, প্রতিবাদও আছে কিন্তু তা একেবারে ভেতরের। মাটির ওপরে কৃষকের যে অধিকারবোধ সেই অধিকারবোধের হাত ধরে স্বাভাবিক স্বতোৎসারিত প্রতিবাদও যেন সংলগ্ন হয়ে আছে এই সব গল্পে, তবে কিছুটা নিরুচ্চার।

দ্বিতীয় গল্পটির নির্বাচন কেন করলাম? এর আঙ্গিকটি আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। অতীত ইতিহাস এবং বর্তমানের মিলনে এটি একটি শ্রম-সম্পর্কের গল্প। বাঙ্‌লার স্বাধীনতা-পরবর্তী জীবনের দুই স্তম্ভ শ্রমিক এবং কৃষক কী বিচিত্র শোষণের ভেতর দিয়ে এগিয়েছে সে সব এখন ইতিহাস। দুর্ভিক্ষ-দেশভাগ-দাঙ্গা-ভূমিহীন কৃষক-কর্মহীন শ্রমিকের মর্মবেদনায় বাঙ্‌লার সাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীত-রাজনীতির আঙিনা মুখর হয়েছে বারবার। বন্ধ কারখানার শ্রমিকের মৃত্যু আকছার হয়েছে; এখনও নতুনতর সমাজ বাস্তবতায় ঘটে চলেছে তা। এই জীবনের গ্লানি, দুঃখ, লাঞ্ছনা নিয়ে গল্প উপন্যাসের ইমারতটিও আমাদের কম মজবুত নয়। তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ই ভরে দিয়েছেন অনেকটা। এর আগে বিভূতিভূষণের 'অনতিক্রম্য'

মানবিকতা আমাদের চারপাশের ক্লিন্ন জীবনকে নতুন চোখে দেখতে শিখিয়েছে। কিন্তু বিভূতিভূষণের মানবতাবাদী বিশাল অট্টালিকার সামনে দাঁড়িয়ে নতুন ক'রে মানবিকতার বাসস্থান তৈরী করার কাজটি খুব কঠিন। তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচিত্র শক্তির মাঝখানে দাঁড়িয়ে, মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্তির বিপরীতে দাঁড়িয়ে, আলো জ্বালানোর কাজটি আরও কঠিন। মুগ্ধতা নয়, পুনঃপাঠে এবং নতুনতর বিশ্লেষণে আমার মনে হয়েছে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকৃত্রিম মানবিকতার স্নিগ্ধ আলো, পরাভবী মানুষের মহিমাকে সূর্যালোকে আরও উদ্ভাসের রঙে এঁকে দেওয়ার সহজ ক্ষমতাই অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর জায়গা স্বতন্ত্র করেছে। 'পোকামাকড়েও খায়, বাঁচে' এবং 'রাজা গোপালের আত্মচরিত' এই দুটি গল্পে অতীনদা 'ভূমি' এবং 'শ্রম' সম্পর্ককে ভিন্ন উদ্ভাসনে উজ্জ্বল করেছেন, আবিষ্কার করেছেন মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে। দুটি গল্পেরই উপজীব্য দুটি মৃত্যু। কিন্তু দুটিতেই আশ্চর্যজনকভাবে মৃত্যুর মহিমাকে খর্ব করে উঠে দাঁড়িয়েছে জীবনের গৌরব। প্রথমটিতে যেমন প্রকৃতিগতভাবে আকালের মা তার নিজের জমিতে দাঁড়িয়ে, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও দাবী করেছে তার বেঁচে থাকার অধিকার, দ্বিতীয়টিতে তাঁত-শ্রমিক গোপালও তার চারপাশের নিরন্ন মানুষের হাত ধরে তাদের সুখ-ছিনিয়ে-নেওয়া জীবন-বন্ধক-নেওয়া পলাতক মালিকের তৈরী করা 'মৃত্যুর' ঝুঁটি ধরে নেড়ে দিয়ে দাবী করেছে বেঁচে থাকার অধিকার। এই দুটি মৃত্যু যেন জীবনের অধিক।

'পোকামাকড়েও খায়, বাঁচে' গল্পটি আকাল, তার বুড়ি মা এবং আকালের বৌ নয়না—বিপরীতে লাটুবাবু, তার জাগালদার আর অসদুপায়ে অর্জিত তার 'জায়দাদের' গল্প। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল এ গল্পের কোন ক্লাইম্যাক্স নেই। এক সংগুপ্ত দার্শনিকতায় জীবন এবং মৃত্যুকে পাশাপাশি দেখিয়েছেন লেখক। যেন এভাবেই চলছে আবহমান কাল। কালচক্র। আকালের বাবা অনেক কষ্ট করে দু'বিঘে ধানী জমি করেছিল। আকাল পেটের দায়ে সেই জমি বিক্রি ক'রে দেয় লাটুবাবুর কাছে। অভাবী বিক্রি। লাটুবাবু জলের দরে তা কিনে নেয়, তারপর আকালের পরিবার জমিহীন হল। উঞ্ছবৃত্তি করল। তার বৌ নয়না ধানভাঙার কঠোর পরিশ্রম ক'রেও পেট ভরাতে পারল না। অনাহারের কামড় সহ্য করতে না পেরে নয়না তুষের, কুঁড়োর ভেতরে লুকিয়ে চাল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল। কাজটি গেল তার। গল্পটি শুরু হচ্ছে মাঠময় সোনালী ফসলের (যা আজ আর আকালের মা'র নয়, তাদের নয়) বর্ণনা দিয়ে। সামান্য বর্ণনা : চারপাশে ফসলের মাঠ, গভীর অন্ধকার আকাশে অজস্র নক্ষত্র জ্বলছে। কীট পতঙ্গের আওয়াজ। এই 'কীট পতঙ্গের আওয়াজ'

এমন অমোঘ তিনটি শব্দ যে তিনি ব্যবহার করেছেন—সমগ্র বিশ্ব- পরিমণ্ডলের পাকা ফসলের সুঘ্রাণে, খাদ্যের গন্ধে যেন বিশ্বচরাচরের প্রাণীকুল মায় কীটপতঙ্গ জেগে উঠেছে, তবে মনুষ্যই বা জেগে উঠবে না কেন? প্রকৃতিলোকের এই অপার করুণা থেকে অসংখ্য মানুষ বঞ্চিত হবে কেন? এমন একটি দাবী মাটি থেকে উঠছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে চরাচরময়। যাই হোক, অন্ধকার রাতে আকাল, আকালের মা এবং আকালের বৌ নয়না, তাদের নিজেদের জমি থেকে (এখন মালিকানাসূত্রে লাটুবাবুর) ধান চুরি করতে নেমেছে। তিনজনের কাছে তিনরকম মানে এই চুরির। কিন্তু সবচেয়ে দৃঢ় মানবিক দাবীটি বুড়ির। জমি বেচে দিলেও জমির সঙ্গে মানবিক সম্পর্কটি খোয়া যায়নি। যায়নি অধিকারবোধ। তার জোরে সে 'সোয়ামীর ভূখণ্ড' থেকে ধান চুরির মধ্যে কোন অপরাধ দেখতে পায় না। শীতের রাতে ফসলের বোঝা বইতে গিয়ে দুজন—আকাল এবং তার বৌ লাটুবাবুর জাগালদারের (পাহারাদার) নাগাল পেরিয়ে চলে গেল ঘরে। কিন্তু বুড়ি পারল না। বয়সের ভারে ন্যুব্জ বুড়ি, জাগালদারের লাঠির খোঁচা খেয়েও প্রতিরোধ করতে গিয়ে মারা গেল। যদিও এই মৃত্যুটি গল্পকার রহস্যের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন। জাগালদারের জবানীতে, গল্পের শেষে আমরা তার সংবাদটুকু পাই। মৃত্যুর সময়টিকে অন্ধকারে রেখে দেওয়ার কারণটিও শিল্পীর এক নিরাসক্ত জীবনদৃষ্টির ফল। ঠিক ঐ সময়ে জীবনের প্রয়োজনেই যেন আকাল-নয়না জীবন ঘষে আগুন জ্বালাবার ক্রিয়ায় ব্যস্ত। এক আপাতশান্ত জীবনচক্রের মধ্যে যেমন আছে meek surrender তেমনি আছে সবকিছুকে তুচ্ছ ক'রে জীবনকে অনন্ত সঞ্চরমান শক্তি হিসাবে জীইয়ে রাখার কৌশল। এ গল্পের সাধারণ পাঠের বাইরেও রয়েছে আর-এক পাঠ। যে পাঠে জীবন হয়ে ওঠে মহিমময় আলো—এক নূতন মাত্রার দিব্য বিভা। আধুনিক সমালোচক যাকে বলেন 'aesthetic plurality' বা 'নান্দনিক বহুস্বরতা', তা যেন এই গল্প আমাদের দেয়।

আগেই বলেছি ছোট ছোট শব্দ ব্যবহার, ছোট ছোট বাক্য, ছোট ছোট প্যারাগ্রাফ তৈরী ক'রে অনেকখানি জীবন গুঁজে দিয়েছেন লেখক এ গল্পে। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যান্য অনেক গল্পেই কোথাও কোথাও 'অতি' কথনে অক্রান্ত হয়েছেন কিন্তু এ গল্পের প্যারাগ্রাফ রচনায় তিনি ঈর্ষণীয় সংযমের পরিচয় রেখেছেন :

"...পরের জমি—ফসলের মাঠে এবারে মা লক্ষ্মীর বড় কৃপা। পাকা গন্ধে চরাচর ম-ম করছে। কেমন মাতাল ক'রে দিচ্ছিল বুড়িকে। সারা শীতকালটাই এই ধানের সুঘ্রাণে বুড়ি বড় মাতাল ছিল। মাঠের ধারে এসে বুড়ি চুপচাপ বসে থেকেছে। ওই তো জমিটা, ওই তো সেই দো-ফসলী জমি। মানুষটার চাষ-আবাদ সব মনে পড়ত। মাছ মারিয়ে আকালের বাপ, কত

কষ্টে সঞ্চয় ক'রে দু'বিঘে ধানী জমি করেছিল। আকাল পেটের দায়ে জমি বিক্‌রি কইরে দিলে লাটুবাবুর কাছে। ফসলের মাঠে মা লক্ষ্মীর অনন্ত কৃপার কথা ভেবে মানুষটার কথা ভেবে তার চোখে জল আসত..."

ক'টি বাক্যে একটি পশ্চাদপটের ইতিহাস রচিত হল। কোন কৃত্রিমতা নেই, অড়ষ্ট হয়ে হোঁচট খেয়ে, আরোপিত কোন কিছুকে আশ্রয় ক'রে বুড়িকে তৈরী করা হয়নি। বুড়ি এই মাঠের সঙ্গে, এই অন্ধকার রাতের নক্ষত্রজ্বলা আকাশের নীচে, মাঠের পোকামাকড়ের সঙ্গে যেন খাপ খেয়ে যায়। জোনাকি পোকারা জ্বলছে। ওড়াওড়ি করছে কীটপতঙ্গ। পাকা ধানের গন্ধে মাঠ ভরে গেছে কীটপতঙ্গে। পাখিরা ওড়ে। বুড়ির মনে হল, কীটপতঙ্গ খায়, পাখপাখালি খায়, মাঠের ধান পোকামাকড়ে খায়। তারা তো মানুষের অপোগণ্ড। তারা খাবে না কী ক'রে হয়! চুরি করা মহাপাপ মনে থাকে না বুড়ির।

মনে রাখার মত এখানে শব্দদ্বিত্বের ব্যবহার—'কীটপতঙ্গ', 'পাখপাখালি', 'পোকামাকড়', তাদের ওড়াওড়ি—এগুলি সব নরম শব্দ, বুড়ির মনের এসময়ের অনুভবের মতন নরম। বুড়ি অসহায়ভাবে নিজেকে পোকামাকড়ের পর্যায়েও নামিয়ে এনেছে একমুঠো ভাতের জন্য। অতীনদার এই দেখার 'দ্বিতীয় নয়নটি' আমার কাছে মূল্যবান।

শস্যভরা মাঠের প্রতিবেশ রচনায় অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় শুধুমাত্র প্রকৃতিকেই ব্যবহার করেননি; করেছেন রূপকথার গল্প, প্রবাদ-প্রবচনের মত বাক্যাংশ এবং লৌকিকতার ওপরে অলৌকিতার পোষাক পরানোর কাজটিও।

"কী বুল্‌লি! বুড়ি কানটা আকালের মুখের কাছে নিয়ে গেল।
শুনতে পেছিস না!
কী শুনব?
কে হাঁকছে।
কী হাঁকছে?
কে জাগে?
এখন অন্ধকার মাঠ শুধু, আর দুরে জাগালদারের হাঁক, কে জাগে?
আমি জাগি।
লাটুবাবুর জাগালদার জাগে।
রাক্ষসের ভাই খোক্কস জাগে।"

ভূমি-হারানো কৃষকের চরম সর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে এই সত্যটি উচ্চারণ করতে অতীনদা কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাঝে যাননি; কোন শ্লোগান দেননি। কৌশলে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে অদ্ভুত এক artistic detachment-এর পরিচয়

দিলেন। তাঁর যা কিছু কাজ তা করে দিলেন এক ফকিরসাব। আকালকে দেখলেই তাঁর এক কথা : শালা তুর সব যাবে। জাল গেছে জমি গেছে, এবারে লাটুবাবু তোর বিবিকে খাবে। আল্লার গজবে পড়ে গেছিস। মজা হল আল্লার গজবে পড়ে ফকিরও যে দু'আঁটি ধান বেমালুম নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়, উর্ধ্বনেত্র হয়ে ভাবে ...মাঠ থেকে কাগে বগে শস্য খায়, পোকামাকড়ে খায়, কীটপতঙ্গে খায়—তিন মনুষ্য তার লগে যোগ দিয়েছে, দোষের না—এই রূঢ় সত্যটুকু লেখক অবলীলাক্রমে পাঠকের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। পাঠক বয়ে নিয়ে যেতে কুণ্ঠাবোধ করে না। তারপর রাত ভোর হয়; মৃত্যু এবং জন্ম সূচিত হয়ে ওঠে নিজস্ব নিয়মে।

কিন্তু এই শেষ অংশে এসে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শিল্পীসত্তার ওপরে অবিচার ক'রে বসেন। লেখকের যে স্বাভাবিকতায় আকালের মা জাগালদারের 'মংলু'কে 'গোলামের বাচ্চা' বলতে সাহস অর্জন করেছিল, যে নয়না তার নিজের শরীর দিয়ে পর্যন্ত মংলুকে প্রলুব্ধ ক'রে পিছিয়ে-পড়া, ধানের-আঁটি-মাথায় বৃদ্ধা শাউড়িকে বাঁচাবার দুঃসাহস দেখাবার কথা ভাবতে পেরেছিল, যে স্বাভাবিক ছবিতে মৃত আকালের মাকে মাঠ সমেত অতিলৌকিক রহস্যময়তার উঁচু স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন লেখক—এতটুকু কষ্টকল্পনা বা অরোপের হাত না ধরেই—সেই স্বাভাবিকতাকে তিনি নিজের হাতে হত্যা করলেন হঠাৎ ক'রে মন্তব্য করার লোভ সামলাতে না পেরে। সে কথায় আমরা পরে আসছি। আগে সাধারণ মৃত্যুকে কেমন যাদুদণ্ডের প্রভাবে অসাধারণত্বে অন্বিত করেন লেখক, দেখা যাক :

"এই সুমার মাঠ তার সামনে অতিকায় এক কাল-রহস্য হয়ে গেছে। কীটপতঙ্গের আওয়াজ শুধু। আর পোকামাকড় হেঁটে বেড়ায়। এক বুড়ি ধানের আঁটি বুকে নিয়ে সোয়ামির ভূখণ্ডে শুয়ে আছে। অকাতরে আকাশ দেখছে। পলক ফেলছে না।"

কিন্তু শেষ পাঁচটি বাক্যে শিল্পী অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় যেন নিজেকেই খুন ক'রে বসলেন। তাঁর আর কোন কিছু বলার দরকার ছিল না। ...পোকামাকড়ে খায়, খেয়ে বাঁচে... এ পর্যন্ত শিল্পীর কাজ। তাঁর কাজ শেষ। কিন্তু হঠাৎই তিনি হয়ে উঠলেন অপ্রয়োজনীয় Comentator.

"...প্রজনন বাঁচিয়ে রাখে। আকাল তার বউ প্রজনন বাঁচিয়ে রাখার নিমিত্ত সকাল হলে ধানের ছড়াগুলো মাচানের নীচে ঢুকিয়ে বস্তায় ঢেকে রাখল।" ...এই "প্রজনন বাঁচিয়ে রাখার নিমিত্ত" শিল্পীর যে নিজেকে বিযুক্ত রাখার প্রয়োজন ছিল।

বাংলার মাৎস্যন্যায় যখন চলছিল তখন (ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে) জনগণ সামান্য গোপালকে রাজা বানিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছিল। সেই থেকে পালবংশের

সূত্রপাত। একটা যুগের শুরু। 'রাজা গোপালের আত্মচরিত' গল্পের গোপাল একজন নিরন্ন তাঁতশিল্পী। লড়াকু, তেজী, স্বভাব-নেতৃত্বের শক্তি সাহস এবং স্বার্থহীনতার গুণে যথার্থ একজন 'রাজা'—কিন্তু মুকুটহীন। ইতিহাসের গোপাল পাল বংশের প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল একটি কালসঙ্গমে। বর্তমানের গোপালের সামনে সংখ্যাহীন দরিদ্র, হতোদ্যম ভাঙা মন ও স্বাস্থ্যের প্রজা। তাদের মালিক রাজা ধীরাপদ তাদের প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা মেরে দিয়ে পালিয়েছে। মিল বন্ধ, চিম্নিতে ধোঁয়া ওঠার আশায় এইসব ধুঁকতে-থাকা মানুষেরা বসে আছে। *"বলির পাঁঠার মত এইসব মানুষেরা রক্ত দিয়ে ধীরাপদকে গাড়ি বাড়ি এবং মহল্লার পর মহল্লা বসিয়ে দিয়েছে।"* গোপাল এইসব মানুষের কাছে রাজা। যদিও রাজত্ব সে চায়নি।

এই গোপালের শ্রমিক তাঁতশিল্পী পরিচয়টিকে লেখক কী অসামান্য দক্ষতায় শুধুমাত্র ডিটেইলের সাহায্যে নিয়ে এঁকে দিয়েছেন ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। উদ্ধৃতি অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

"গোপাল শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখেছিল। সুন্দর হলঘর। কাচের দেওয়াল। সাদা প্লাস্টিকের ছাদ। ছাদের নীচে সাদা রঙের আলোর স্টিক। মানুষগুলো চেনা চেনা মনে হচ্ছে। সারি সারি তাঁত। কাপড়ে মিহি সুতোর ফুল তুলছে গোপাল। মানুষগুলো চেনা চেনা মনে হচ্ছে—সোনার মাকুতে রুপোর ববিন, মানুষগুলো চেনা চেনা মনে হচ্ছে—শানার ও-পাশে দু'সারি 'ব'; 'ব'-এর ভিতরে ফুলগুলি অথবা ফুলেরা নেচে নেচে যেন শানা অতিক্রম ক'রে দপ্তির এপাশে এসে গেল, সব ফুল হয়ে গেল, মুক্তোর মত সেই ফুল কাপড়ের গায়ে গায়ে লেগে গেল। সোনার মাকু রুপোর ববিন নড়ছে, গড়াচ্ছে, আর মুক্তোর ফুল কাপড়ের গায়ে ফুটে উঠছে। সেই ফুলের ভিতর গোপাল মুখ রেখে দেখল চেনা চেনা মানুষগুলো তখন ওকে বাহবা দিচ্ছে—আহা গোপাল, তুমি গোপাল, নক্‌শিপাড় শাড়ি বানালে, তুমি গোপাল ঘন্টায় ঘন্টায় কত নক্‌শিপাড় শাড়ি বানালে, তুমি গোপাল কত উদয়াস্ত শ্রম ক'রে নকশি কাঁথার মাঠের মত অথবা সুন্দর নীল আকাশের মত, কখনও নদীর মত, পাহাড় পর্বতে ছবি আঁকার মত শাড়ি বানালে... আহা গোপাল, তোমাকে আমরা রাজা বানাব।"

যন্ত্র কেমন জীবন বা জীবনের প্রতীকী সত্তা হয়ে উঠেছে এই আশ্চর্য অনুচ্ছেদটি পড়লে মনে হয়। গল্পের শুরুতে আছে স্বপ্নের জীবন। মানুষগুলো চেনা চেনা। 'সোনার মাকু', 'রুপোর ববিন', 'মিহি সুতোর ফুল', 'নাচছে', 'নড়ছে', 'গড়াচ্ছে'—জীবনের ওম্ মাখা যন্ত্র কেমন করে 'চরিত্র' হয়ে ওঠে—এগুলি তার সার্থক উদাহরণ। গতিসূচক শব্দগুলি নিখুঁত নির্বাচনের ফল। অতি-সতর্ক শিল্পী যেন আরেক মাকুতে এমন শব্দফুল তুলেছেন। ভেতরে ভেতরে কোথাও যেন তীব্র হাহাকার লুকিয়ে রেখে দিয়েছেন তিনি। তারপরের অনুচ্ছেদে বিপরীতধর্মী শব্দ সংযোজন ক'রে পরিবেশের ম[illegible] দিলেন [illegible] এবং জীবনের বৈপরীত্য। হাহাকার যা ভেতরে

ছিল তা এক লহমায় সামনে এসে দাঁড়াল। কিন্তু প্রকট হল না। চতুর শিল্পীর এই চালাকিটুকু তারিফ করার মত। পরের অনুচ্ছেদটি পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক। এখানে 'বড় অন্ধকার', 'তীক্ষ্ণ শীত'। গভীর রাতে এই পথে ইতিহাস এবং বর্তমানের সীমারেখা ঘুচিয়ে দিলেন লেখক। লোককথার সিরাজউদ্দৌল্লা নাকি এই পথে পলাশীর প্রান্তর থেকে মুর্শিদাবাদে ফিরে গেছেন... শনের চাল, চালের নীচে গোপালের মত কত গরীব মানুষ রাজা হবার স্বপ্ন দেখেছে।

"এবং সেই গোপাল সহসা স্বপ্নে চিৎকার করে উঠল।

নীহারকণা, বউ, গোপালের পাশে শুয়ে থেকে প্রথম গোপালের চিৎকার শুনে ভেবেছিল ঘরের কোথাও আগুন, সুতরাং নীহারকণা উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি কী খুঁজতে গিয়ে দেখল—চারিদিকে হিমের মত ঠাণ্ডা শীত.. কোথাও আগুন নেই। সে স্বামীর স্বপ্নের কথা ভেবে তাকে ডেকে তুলল, কোথাও আগুন নেই।"

"কোথাও আগুন নেই" এই তিন শব্দের বাক্যাংশ বা পূর্ণ বাক্য-ই যেন এই গল্পের ধ্রুপদ। গোপাল চারিদিকের অন্ধকার হাতড়ে এই 'আগুন' খুঁজছে। 'আগুন' শব্দটি বেঁচে থাকার দ্যোতক। 'হিমকণা', 'হিম', 'তীক্ষ্ণ শীত' মৃত্যুর দূত। মানুষ আগুন জ্বালিয়ে একদিন সভ্যতার দরজা খুলে দিলে 'অগ্নিই' তার দিক পাল্টে দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যু বা ক্ষয়ের থেকে জীবনের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে তার মুখ। 'অগ্নি' যেন মন্ত্র—বেঁচে থাকার, জীবনের চলমানতার। এই আগুন পুড়িয়ে ছাই করে দেয় আবার সচল প্রাণবান বেগবান রাখে। আগুন সাহস শক্তি, লড়াইয়ের মূলধারা এখানে। এতগুলি চেনা চেনা মানুষের উদরাগ্নি আর জ্বলছে না, তাদের বাড়িতে আগুনই জ্বলছে না আর। তারা ক্রমাগত হিম হয়ে ঢলে পড়ছে, আর তাদের রাজা গোপাল, তাদের জন্য আগুন খুঁজছে—স্বপ্নে জাগরণে, শ্লোগানে দর্শনে ছবিতে বক্তৃতায়। তাদের আগুন চুরি করে নিয়ে গেছে ধীরাপদ নামের দেবতা। গোপাল প্রমিথিউস নয়, তবু তার সামান্য চরিত্রের গায়ে অসামান্য সব নকশা এঁকে দিয়েছেন লেখক। এই গল্পেও শব্দদ্বিত্বের ব্যবহারে লেখক এক ধরনের আবেগীয় সংহতি আনার চেষ্টা করেছেন, যদিও কোথাও তা অতিরিক্ত হয়ে দেখা দিয়েছে।

"গোপাল, সামান্য গোপাল", "ধীরাপদ, অসৎ মানুষ ধীরাপদ", "মিলের এক নম্বর তাঁতী গোপাল, শক্ত গোপাল", "গোপাল, কৈশোরের গোপাল" ইত্যাদি।

"ধীরাপদ, অসৎ মানুষ ধীরাপদ"—লেখকের এই মন্তব্য, কোন চরিত্রের সংলাপ নয়, একটি বড় দুর্বলতা। লেখক এমন লোভকে অনায়াসে এড়িয়ে যেতে পারতেন। "ধীরাপদ নামক বস্তুটির"—এই বাক্যটিও তাঁর দুর্বলতার আর এক উদাহরণ। বিশেষ ক'রে এই গল্পে সামান্য গোপালের মৃত্যুকে লেখক যেখানে ব্যঞ্জনায়, গৌরবে

গৌরবান্বিত করতে পেরেছেন। শুধু তাই নয়, গোপালের স্বপ্নের বিবরণে লেখক একটি অবিস্মরণীয় অনুচ্ছেদ উপহার দিয়েছেন পাঠকদের :

"...স্বপ্ন একেবারে মিথ্যে হয় না। সুতরাং মনে মনে গোপাল মিলের সিটি শোনার জন্য আর একবার কান পাতল। কত আর দূর মিলের চিমনি, রাতে এই শব্দ হলে, মিলের ভোঁ বাজলে—বিশ্বচরাচর কেঁপে ওঠে, কলিজার ভিতর দ্রুত রক্ত সঞ্চালন হয়—গোপাল তখন বসে থাকতে পারে না, সে হাতে লণ্ঠন নিয়ে অন্ধকার পথে বের হয়ে পড়ে। সামনে সব গাছ বড় বড় শিরীষের গাছ, পাতার অন্ধকারে তখন কোনও পাখির ডাক অথবা দূরে দূরে হুইসল, বোধহয় কলকাতাগামী এক ট্রেন আসে আর যায়, গোপাল নিজেকে সেই ট্রেনের মত আসা যাওয়ার সামিল ভেবে অন্ধকারের ভিতর হেসে উঠত। বউ নীহারকণা, দুই শিশুসন্তানের মুখ বড় করুণ—সে আর পারছে না, কারণ মিলের সিটি আর বাজছে না, সে অনেকক্ষণ কান পেতে থেকেও মিলের সিটি বাজতে শুনল না।"

গোপালের রাজকীয় দারিদ্র্যের সংসারের ছবিটি লেখক পরম মমতায় এঁকেছেন। সংসারের ছবির পরে তার লড়াইয়ের ক্ষেত্র ইউনিয়ন অফিসে যাওয়া, নৈরাশ্যপীড়িত সভ্যদের চাঙ্গা করার জন্য মরিয়া চেষ্টা, বিশ্বাসঘাতক দালালদের তালিকা তৈরীর জন্য তার দৃঢ় নির্দেশ, তার এবং তার চারপাশে চেনা মানুষদের ছবি তৈরীতে লেখকের একটি দুটি অসামান্য বাক্যের ব্যবহার "পেটের নীচে ধীরাপদর শক্ত কামড়", "ধীরাপদর শক্ত কামড় ওদের প্রায় উন্মাদ ক'রে তুলেছে"—এগুলি এ গল্পের কাছ থেকে বড় প্রাপ্তি। সবচেয়ে মর্মান্তিক হল গোপাল যখন তার স্বপ্নের কথাটা বলে সবাইকে উত্তেজিত করে তোলার চেষ্টা করছে তখনই সে দেখল *"সকলেই প্রায় অফিস থেকে নেমে যাচ্ছে। সে চীৎকার ক'রে উঠল, কারা যেন আমাদের আগুনে পুড়িয়ে মারছে"।*

'আগুন' শব্দটি বহুমাত্রিক ব্যবহারে সামান্য-অসামান্য লোকরাজা গোপালের জীবন বহু-কৌণিক হয়ে উঠেছে। যে গল্প শুরু হয়েছিল জীবনের উষ্ণ ছবি দিয়ে, সূর্যস্বপ্নে জীবনের আলোকিত স্বপ্নে, গতির স্বপ্নে যে গল্পটি এমন চমৎকার অনুপুঙ্খ দিয়ে আমাদের নাড়িয়ে দিয়েছিল, সেই গল্প শেষ হচ্ছে এভাবে—বিপরীত একটি ছবিতে, যথার্থ এক ট্র্যাজিক হিরোর শব্দময় পতনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে :

"...মাঠে ধীরাপদ সূর্য বগলে নিয়ে ছুটছে, সকলের আলো চুরি করে চলে যাচ্ছে ধীরাপদ, পেছনে হাজার হাজার মানুষ গোপালের মত। ওরা ধীরাপদকে ধরার জন্য ছুটছে... গোপাল অন্যসময় হলে বুঝি বলত, কারণ গোপাল সবসময় নাটক দিয়ে কথা আরম্ভ করে, বলত, ছোটো ছোটো। যতক্ষণ সূর্যকে কেড়ে নিতে না পারছ ততক্ষণ ছোটো, পাহাড় পর্বত অথবা সমুদ্রে চলে যাও। সূর্যকে তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসতেই হবে। কোন মানুষকেই আর আমরা সূর্য বগলে নিয়ে চলে যেতে দেব না। কিন্তু বলতে পারল না। কেবল দেখতে পেল... সুন্দর হলঘর, কাচের দেওয়াল। সাদা প্লাস্টিকের ছাদ, ছাদের নীচে সাদা রঙের

আলোক স্টিক। সোনার মাকুতে রুপোর ববিন। কাপড়ের জমিনে সব সাদা রঙের মুক্তোর নক্ষত্র ফুটে আছে। গোপাল খুঁটে খুঁটে নক্ষত্রগুলো তুলে নিয়ে যেতে চাইল। টেবিলের ওপর নখ বসে যাচ্ছে। সে তার নক্ষত্র জীবনের মূল্যবান নক্ষত্র আর কোথাও ফেলে যাবে না—কিন্তু হায় গোপাল, সামান্য গোপাল টেবিলটা আঁচড়ে কামড়ে ভেঙে দিতে চাইল, কিন্তু তাও পারল না, সে আর্তনাদ করে এবার ভেঙে পড়ল—আমার সূর্য দেখো ধীরাপদ চুরি করে নিয়ে যায়। সে বিলাপ করতে থাকল।"

সামান্য, অসামান্য গোপালের এই মৃত্যু জীবনেরই এক মহিমময় প্রকাশ। এখানেই লেখক সার্থক।

বানান অপরিবর্তিত।

দরবারী সাহিত্য, মাঘ ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত ও লেখকের অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত।

দুটি মৃত্যু : দুই শিল্পী

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

মৃত্যুর উপস্থাপন এক দুরূহ পরীক্ষা। চরিত্রের মৃত্যুদৃশ্য অঙ্কনে কথাসাহিত্যিকের জাত বোঝা যায়, মানসিকতা চেনা যায়। বিধাতার মতো নির্মম, উদাসীন ও ন্যায়মুক্ত নন বলেই, সৃষ্টচরিত্রের মৃত্যু বিশেষ ভাবে তার স্রষ্টাকেই চিনিয়ে দেয়। সাহিত্যে মৃত্যুর এই নিপুণ বিশ্লেষণ লেখকের মানচিত্রের নিখুঁত প্রতিরূপ উপস্থিত করতে পারে আমাদের সামনে। সেই বিশদ আলোচনার অবকাশ আপাতত নেই, আমরা অন্য একটি উপভোগ্য ও আকর্ষণীয় প্রসঙ্গ এখানে স্মরণ করতে চাই।

'মৃত্যু অমৃত করে দান'—রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে বলেছিলেন, মৃত্যু সেখানে আরাধ্য দেবতার মতো সুন্দর। 'আমি মৃত্যুর চেয়ে বড়ো' এ কথা বলে মৃত্যুকে অস্বীকার করে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ। কিন্তু মৃত্যুকে বরণ করে নেবার আরো এক গভীর গোপন মনস্তত্ব আছে, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই মৃত্যুঞ্জয় হয়ে ওঠা—মরণের শূন্যে স্মরণীয় বেঁচে থাকা। না, শহীদ হয়ে নয়, নিজের অতিমানবত্ব প্রমাণের মধ্য দিয়ে। নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা, ভীষ্মের মতো ইচ্ছামৃত্যুর অধিকারী প্রমাণ করে, নিজেকে অতিমানবীয় প্রজ্ঞাবান বা পীর পয়গম্বরে পরিণত করার দুটি অসামান্য সাহিত্যিক বৃত্তান্ত আমরা পাই। একটি দেখিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পুতুলনাচের ইতিকথা'-য়, অন্যটি অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে। প্রসঙ্গ দুটি পাশাপাশি উপস্থিত করলেই মূল ঘটনায় সাহিত্যিক সৌন্দর্য এবং দুই ঔপন্যাসিকের শিল্পস্বভাবের সাদৃশ্য ও পার্থক্য বোঝা যাবে।

'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসে এই ইচ্ছামৃত্যুর দাবীদার যাদবপণ্ডিত। পরিচয় দিতে গিয়ে, লেখক বলেছেন, 'বিদ্যা যাদবের বেশি নয়, পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি তাহার নাই, ধার্মিক ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়াই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।' অর্থাৎ তিনি সিদ্ধপুরুষ হিসেবেই পরিচিত, তিনি 'নিজে কিছু স্বীকারও করেন না, প্রতিবাদও করেন না।' কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞান ব্যাপারটাকেই যে তিনি নস্যাৎ করে দিতে চান, তা আমরা দেখেছি। অ্যালোপ্যাথি শাস্ত্রকেও তিনি আমল দিতে চান না, কবিরাজী শাস্ত্রকেও নয়। তিনি মানেন সূর্যবিজ্ঞান। বিজ্ঞানের উন্নতিতেই অ্যালোপ্যাথ বিদ্যার এতো উন্নতি, একথা জানালে তিনি বলেন, 'সূর্যবিজ্ঞান না জানা সব একালের ডাক্তার, তেমনি সব কবিরাজ—দৃষ্টিহীন অন্ধ সব। গাছের পাতায় রস নিংড়ে ওষুধ

করলে, গাছের পাতায় ওষুধের গুণ এলো কোথা থেকে? সূর্যবিজ্ঞান যে জানে সে শেকড়-পাতা খোঁজে না শশী, একখানি আতশ কাচের জোরে সূর্যরশ্মিকে তেজস্কর ওষুধে পরিণত করে রোগীর দেহে নিক্ষেপ করে—মুহূর্তে নিরাময়।'

এই যাদবপণ্ডিত হঠাৎ রটিয়ে দেন রথযাত্রার দিন তাঁর মৃত্যু হবে, অর্থাৎ তিনি মৃত্যুবরণ করবেন। শশী অস্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিল কী হতে চলেছে, নিজের অতিমানবত্ব প্রমাণের জন্যই যে ঘটা করে এই মৃত্যুদিন ঘোষণা এটা বুঝেই সে তাঁকে নিবৃত্ত করার অনেক চেষ্টা করেছিল। একবার বলেছিল, 'মনের জোরে আপনি তো মরার দিন পিছিয়েও দিতে পারেন?' এর উত্তরে যাদবের প্রতিক্রিয়া 'লোক হাসবে শশী, টিটকারি দেবে' থেকে মনে হয় শশীর অনুমান অসত্য নয়। আর একবার শশী চেষ্টা করেছিল, যখন সে প্রস্তাব দেয়, এই গ্রামে মৃত্যুবরণ না করে তাঁকে পুরী বা অন্য কোন তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে আহ্বান করতে। নিহিত তাৎপর্য বুঝতে পেরে যাদবপণ্ডিত চটে যান, বলেন, 'আমার সঙ্গে তুমি পরিহাস করছ শশী, ঠাট্টা জুড়েছ। আমি ভণ্ডামি করছি ভেবে নিয়েছ না?'

শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণের অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়ায় এইরকম—রথযাত্রার দিন দুটি পাশাপাশি শয্যা, যাদবপণ্ডিত এবং তাঁর স্ত্রী পাগলদিদি শায়িত, সমস্ত গ্রামের লোক ভেঙে পড়েছে যুগলমরণ দেখতে, মেয়েদের হাতে তেল-সিঁদুর। কিন্তু ইচ্ছামৃত্যুর রকমটা কী ধরনের! 'এগারোটার পর হইতে দুজনেই ধীরে ধীরে নিস্তেজ ও নিদ্রাতুর হইয়া... যাদবের মুখ ঢাকিয়া গিয়াছিল চটচটে ঘামে তার কালিমায়, চোখের তারাদুটি সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছিল। ...সকলে বলিল সমাধি। পাগলাদিদি মারা গেলেন ঘন্টাখানেক পরে, ...যাদবের শেষ নিঃশ্বাস পড়িল গোধূলিবেলায়।'

স্পষ্ট আফিমের ক্রিয়ায় মারা যাওয়া মানুষটা পেয়ে গেলেন মহামানবের সম্মান, এই সম্মান নিয়েই জেগে রইলেন গ্রামের প্রতিটি মানুষের মনে, জেগে থাকবেন প্রায় কিংবদন্তী হয়ে!

প্রায় এই একই উদ্দেশ্য নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে উপন্যাসের ফকিরসাব চরিত্র। না, যাদবপণ্ডিতের মতো মৃত্যুকে আহ্বান করা নয়, আসল মৃত্যুকে ব্যবহার করা, ভবিষ্যতে ভাবমূর্তি যাতে অক্ষুণ্ণ থেকে যায় তার জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করে যাওয়া।

এ চেষ্টা প্রথম থেকেই অবশ্য করে এসেছে মানুষটা। 'শোনা যায় কোন এক হত্যার দায়ে এই মানুষ তার ঘর ছেড়েছিল। বিটি-বেটাদের ছেড়ে, জমি-বাড়ি, গোলা এবং পুকুরের পাড়ে অর্জুন গাছ, ধানের গোলাতে পাখি উড়ে বেড়াত, সেই মানুষ, খুনের দায় এড়াতে বরিশালের ভোলা অঞ্চল থেকে হেঁটে পাড়ি দিয়েছিল...

অস্তানাসাবের দরগাতে এক রাতে রাত যাপন।... তারপর মানুষটা আর খুনী মানুষ থাকল না। ফকির মানুষ বনে গেল।'

এরপর সে যে পীর পয়গম্বর জাতীয় একটা ভাবমূর্তি গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল, তার জোটন বিবিই সে কথা বলছে—'পীর বনে যাবার লোভে মানুষটা সকলের চোখে ভিন্ন-ভিন্ন অলৌকিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া দেখতে ভালোবাসে।' এই অলৌকিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার জন্য ফকিরসাব দিন-রাত উপায় উদ্ভাবন করেন। আর ইন্তেকালের সময় মানুষের চোখে নিজের খেলা দেখান। রাতের বেলা গাছের মাথায় আগুন জ্বালিয়ে বসে থাকতেন। '...কবরখানায় মৃত মানুষ এলেই ফকিরসাবের কেরামতি বেড়ে যায়। কালো আলখাল্লাতে পা পর্যন্ত ঢেকে, গলায় লাল নীল হলুদ রঙের রসুনগোটার মতো বড়-বড় পাথর ঝুলিয়ে, চোখে কালো সুর্মা টেনে এবং মাথায় ফেটি বেঁধে মনে হয় তখন এক পীর এসে গেছে। ...যারা কবর দিতে এল, দেখল এক মুসকিলাসান লম্ফ হাতে নিয়ে বনের ভিতর কে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লোকগুলি ভয়ে কাঠ হয়ে গেলে বনের ভিতর থেকে মুসকিলাসানের লম্ফ নিয়ে সহসা উদয়। মনে হবে তিনি যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এসেছেন।'

অবশ্যই এসব তিনি প্রাথমিকভাবে করতেন জীবিকা নির্বাহের জন্য। এ ছাড়া উপার্জনের অন্য কোনো পথ তো তাঁর ছিল না। কিন্তু আরো সুক্ষ্মভাবে যে তাঁর কামনা ছিল অমরত্বের, সে কথা বোঝা যায় তাঁর নিজের ইন্তেকালে। মালতীকে উদ্ধার করার পর ভাই নরেন দাসের কাছে তাকে ফেরৎ দিতে এসেছিলেন তিনি। অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে যখন মুশকিল-আসানের ভঙ্গিতে তাকে ফিরিয়ে দেন তখন ওলাওঠার প্রতিক্রিয়ায় তিনি অস্থির হয়ে পড়েছেন। ঘন ঘন মলমূত্রে কাপড় ভেসে যাচ্ছিল। অথচ জোটনকেও কিছু বলেননি, যদিও দুর্গন্ধে জোটনের বোঝার বাকিও কিছু পড়েনি, ফকিরসাব বুঝতে পারছিলেন, এরপর আর কথা বার হবে না তাঁর মুখ দিয়ে, তাই বললেন—'বিবি, আমার প্রাণপাত হইতাছে। আমারে আপনি রাইত থাকতে দরগাতে তুইলা দিয়েন। সকাল হইলে হাউহাউ কইরা কাইদেন না। আলিপুরা খবর দিবেন, ফকিরসাবের রাইতে ইন্তেকাল হইল।...

—রাইত কয়টায় কমু?

—রাইত দুই প্রহর শেষ না হইতে।

—তখন ত আপনি দাসের বাড়িতে আছিলেন।

—আপনের এত কথায় কাম কি বিবি। বলেই মানুষটার কথা বুঝি একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।'

আসলে পীরের পরিচয় নিয়েই যে মানুষটা বেঁচে থাকতে চান, মৃত্যুর পরেও—

নিজেকে অমর করে রাখবার বাসনাতেই যে মৃত্যুটাকে তিনি ব্যবহার করতে চাইছেন, মৃত্যুটাকে প্রায় ইচ্ছামৃত্যুর চেহারা দিতে চাইছেন, সে কথা জোটন বুঝতে পেরেছে। শেষ ইচ্ছার অমর্যাদা সে করেনি—'রাইতে মানুষটা নিজের ভিতর ডুব দিল। এই বয়স পর্যন্ত মানুষটার কোন রোগ-শোক জরা ছিল না। শেষ বয়সের এই জরাকে প্রশ্রয় দিতে নেই। কিছুই হয়নি, জোটন তাকে ধুয়ে পাখলে একেবারে নতুন মানুষ করে ফেলল। শরীরে কোন মল-মূত্র গন্ধ থাকতে দিল না। ওলাওঠাতে প্রাণ গেছে বুঝতে দিল না, যেন এইবেলা জোটনের খসম, আপনে পীর বইনা গ্যালেন ফকিরসাব।'

অবশ্যই এগুলি এক ধরনের মিথ্যাচারণ। যাদবপণ্ডিতও সত্যকে অস্বীকার করেছেন। ফকিরসাবও নিজেকে উজ্জ্বল চিরউজ্জ্বল করে তোলার জন্য মিথ্যা বলেছেন। কথাটা ব্যাখ্যা করেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—'সত্যি মিথ্যায় জড়ানো জগৎ। মিথ্যারও মহত্ত্ব আছে। হাজার হাজার মানুষকে পাগল করিয়া দিতে পারে মিথ্যার মোহ। চিরকালের জন্য সত্য হইয়াও থাকিতে পারে মিথ্যা। যারা যাদব ও পাগলদিদির পদধূলি মাথায় তুলিয়া ধন্য হইয়াছিল, তাদের মধ্যে কে দুজনের মৃত্যুরহস্য অনুমান করিতে পারিবে? চিরদিনের জন্য এ ঘটনা মনে গাঁথা হইয়া রহিল, এক অপূর্ব অপার্থিব দৃশ্যের স্মৃতি।'

এই 'অপূর্ব অপার্থিব' দৃশ্যের ইঙ্গিত অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ও দিয়েছিলেন—'যারা আউস ধান কাটিতে এদিকে আসবে নৌকো নিয়ে তারা দেখবে জোটন গাছের নিচে এক মরা মানুষ নিয়ে জেগে আছে।' অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেননি, কিন্তু আমরা আন্দাজ করতে পারি ফকিরসাবের এই দরগা হয়তো বহুদিন বেঁচে থাকবে পীর বা মুশকিল-আসানের দরগা হিসাবে।

অদ্ভুত এই মনস্তত্ত্ব এবং অদ্ভুত মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকার, মানুষের মনে মহত্ত্বের অক্ষয় স্মৃতিতে অম্লান হয়ে থাকবার এই প্রবণতা। বিস্ময়বিমূঢ় চিত্তে ফকিরসাবের মতোই বলতে ইচ্ছা করে—'জন্মমৃত্যুর মতো এই বেঁচে থাকাও অলৌকিক ঘটনা।'

বানান অপরিবর্তিত।

দরবারী সাহিত্য, মাঘ ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত ও লেখকের অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত।

শংসাপত্র : সুরমা চৌধুরী মেমোরিয়াল ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ইন লিটারেচার/জার্নালিজম ২০০৮

সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার ২০০১ নিচ্ছেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুজের চোখে অগ্রজ

লিখেছেন

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়   সাধন চট্টোপাধ্যায়   সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

[illegible] ইসলাম

অতীনদার সঙ্গে দ্বিরালাপ

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

শৈশবে যে-শিশু হেঁটে বেড়ায় গ্রামবাংলার বিস্তীর্ণ চরাচরে, তার পৃথিবী হয়ে ওঠে বিশাল থেকে বিশালতর। তার চোখে আকাশ হয়ে ওঠে নীলিমা, ধানবন হয়ে ওঠে সবুজ পট, বিচিত্র গাছগাছালির জগৎ হয়ে ওঠে এক আশ্চর্য রূপকথা। কৈশোরে সেই পৃথিবী হয়ে ওঠে আরও সম্পদশালী।

কখনও বা মনে হয় গ্রামজীবন একজন লেখকের কাছে আশীর্বাদ।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা পড়লে তাঁর সম্পর্কে ঠিক এমনটাই ধারণা গড়ে ওঠে পাঠকের। অন্তত 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' পড়ার পর।

বাংলা সাহিত্যের কিছু কিছু উপন্যাস আছে যা অবশেষে পর্যবসিত হয় মিথ-এ। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' দিয়ে শুরু এই মিথের, তারপর বাংলা উপন্যাসের দীর্ঘ দেড়শো বছরের ইতিহাসে বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ পেরিয়ে ইদানিংকালের ঔপন্যাসিকদের অজস্র সৃষ্টির মধ্যে মাত্র কয়েকটি উপন্যাস পেয়েছে এই মিথের মর্যাদা। তাদের মধ্যে, নির্দ্বিধায় বলা যায়, একটি 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'। যে-উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল প্রায় পাঁচ দশক আগে, এই দীর্ঘ সময়ের কষ্টিপাথরে ঘষে প্রমাণিত হয়েছে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসটি সর্বজনপঠিত একটি ক্লাসিক উপন্যাস।

সর্বজনপঠিত উপন্যাস হলেই যে মিথ হবে, ক্লাসিকের মর্যাদা পাবে তা নয়। যে-উপন্যাস একই সঙ্গে পাঠক ও সমালোচক উভয়েরই প্রশংসা পায়, যে-উপন্যাস পাঠকের মনে বেঁচে থাকে দীর্ঘ চার দশক পরেও, যে-উপন্যাস মানুষের মনন নিয়ে রচিত অথচ বেস্টসেলার হয়নি, সেই উপন্যাসই হয় মিথ।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় এই উপন্যাসের মাধ্যমেই। সম্ভবত গত শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষ, সত্তরের শুরু। সে সময় তাঁর ছোটোগল্প যেখানেই প্রকাশিত হত, সবই পড়ে ফেলেছি একে-একে। 'সাপ্তাহিক অমৃত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'। আমি আশৈশব গ্রন্থকীট, যে-বই হাতে পাই, পড়ি গোগ্রাসে, সেরকমই পড়তে শুরু করেছিলাম এই উপন্যাসটি।

সোনা নামের প্রোটাগনিস্ট তখন যেন আমারই শৈশব-কৈশোরের ছায়া, তার মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি নিজেকেই, সোনা তো আমারই ছোটোবেলা! পরে উপলব্ধি করেছিলাম সোনা আসলে লেখক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়েরই প্রতিবিম্ব।

উপন্যাসটি পড়তে গিয়ে মনে হয়েছিল তার প্রথম কয়েকটি কিস্তি ছোটোগল্প হিসেবে যেন পড়েছি অন্য পত্রিকায়। তাতে অবশ্য উপন্যাসের রস আহরণ করতে অসুবিধা হয়নি বিন্দুমাত্র। উপন্যাসের প্রতিটি কিস্তি শুষে নিতে শুরু করেছিলাম স্মৃতির কুলুঙ্গিতে। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। উপন্যাস শেষ হলে মনে হল আর একবার পড়ি গোড়া থেকে। 'অমৃত' পত্রিকার রাশি বিক্রমপুরে পাঠানোর আগে উপন্যাসটির কিস্তিগুলো কেটে নিয়ে আবার পড়ে ফেলি। পড়লাম তৃতীয়বারও। তারপর বাঁধিয়ে বইয়ের র‍্যাকে রেখেছিলাম এই সেদিন পর্যন্ত। তারপর কতবার পড়েছি উপন্যাসটি তা লেখাজোখা নেই।

উপন্যাসের পরতে পরতে বর্ণিত হয়েছে ওপার আর এপার বাংলার এক মায়াময় ছবি। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই বলেছেন দেশভাগ না হলে এই উপন্যাস তিনি লিখতে পারতেন না! তাঁর জ্যাঠামশাই ছিলেন পুরোহিত। ব্রাহ্মণ পরিবার। তাঁদের বংশের পেশাই ছিল পুরোহিতগিরি করা। সেই পরিবারকে কেন্দ্র করে তাঁর এই উপন্যাস।

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের পরিবারের জ্যেষ্ঠপুত্র মণীন্দ্র, তিনি বেশ অস্থিরমস্তিষ্ক, এলাকায় পাগল বলেই তাঁকে জানে সবাই। পরিবারের যিনি মেজো, তিনি ধনকর্তা, তাঁর উপরই ন্যস্ত পরিবারের দায়িত্ব। যিনি সেজো, তাঁর পুত্রের নাম সোনা, সেই বালক সোনার চোখ দিয়েই দেখা এই উপন্যাসের ঘটনাবলি। মণীন্দ্র মানুষটি ভারী অদ্ভুত। তিনি কথা বলেন খুব কম, যত্রতত্র ঘুরে বেড়ান বোহেমিয়ানদের মতো। মাঝেমধ্যে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে একটা অপ্রচলিত শব্দ, 'গ্যানচোরেৎ শালা'। শব্দটির মানে কেউ জানে না, কিন্তু ধনকর্তা শব্দটা বলতে থাকেন কোনও এক নীলকণ্ঠ পাখির উদ্দেশে। কবে নাকি একটি নীলকণ্ঠ পাখি উড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেই নীলকণ্ঠ পাখি আর কোনও দিন ফিরে আসেনি তাঁর কাছে। নীলকণ্ঠ পাখি আসলে সুসময়ের প্রতীক। তারই উদ্দেশে বারংবার উচ্চারিত হয় ওই অদ্ভুত শব্দটা,

'গ্যানচোরেৎ শালা'।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত ছিলেন ওপার বাংলায়। ঠিক একই রকমভাবে সোনা নামে কেন্দ্রীয় চরিত্রটির ওপার বাংলায় বড়ো হওয়ার দিনগুলি বর্ণিত হয়েছে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে।

তারপর ছিন্নমূল হয়ে চলে আসেন এপার বাংলায়। তখনও 'ঈশ্বরের বাগান' বা 'মানুষের ঘরবাড়ি' লেখার কথা ভাবেননি। পরবর্তীকালে গৌরকিশোর ঘোষের 'প্রেম নেই' উপন্যাস পড়ে উৎসাহিত হয়ে লিখেছেন 'মানুষের ঘরবাড়ি'। সোনার চোখ দিয়ে বর্ণিত হয়েছে ওপার বাংলার শিকড় ছিঁড়ে এপারে পত্তন গড়ার এক দীর্ঘ ইতিহাস।

তবে ইতিহাসের জন্য এ গ্রন্থ পড়ার প্রয়োজন নেই। বইয়ের আশ্চর্য সম্পদ লিখনভঙ্গিমা ও ভাষাবিন্যাস।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়েছিল যখন তিনি 'যুগান্তর' পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। 'যুগান্তর' অফিসে যেতাম ব্যাগে গল্প নিয়ে, সম্পাদক প্রফুল্ল রায়ের হাতে লেখাটি দিয়ে, গল্প করে তখনই ফিরে আসিনি কখনও। কখনও অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কখনও শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের টেবিলের সামনে বসতাম দু-পাঁচ মিনিট। কোনও প্রয়োজনে তা নয়, তাঁদের লেখার একনিষ্ঠ পাঠক হিসেবে অগ্রজ লেখকের কাছ থেকে এটুকু সময় ছিল অনুজ লেখকের দাবি।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই মিতভাষী, কিন্তু নিজের কথা বলতে বললে বলতেন বহুক্ষণ ধরে। তাঁর জীবনের ওঠাপড়া, বহরমপুরের জীবনযাত্রা, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা, কলকাতায় পত্তন গড়ার কথা বলতেন অকপটে। কীভাবে মুর্শিদাবাদের দিনযাপনে ইতি টেনে চলে এসেছিলেন কলকাতায়, কীভাবে একটু-একটু করে খুঁজে পেয়েছিলেন পায়ের তলার মাটি তা বলতেন নিবিষ্ট হয়ে।

সিরাজদার সঙ্গে বন্ধুত্ব তাঁর লেখকজীবনের একটা বড়ো বাঁক। ষাটের দশকের শুরুতে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সিরাজদার। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় তখন থাকতেন বহরমপুরে, রেললাইনের ওপারে। সিরাজদা এপারে, কান্দি মহকুমার খোসবাসপুরে। দুজনে সাইকেলে আসতেন দুদিক থেকে, দেখা হত সাধন চৌধুরির 'অবসর' পত্রিকার অফিসে। সিরাজদা তখন লিখতেন 'ইবলিশ' ছদ্মনামে।

কলকাতায় এসে শুরু করেছিলেন এক নতুন জীবন।

অনেকদিন পরে একবার তাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল পাঠককূলের প্রিয় উপন্যাস 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' বিষয়ে। জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাঁর কয়েকটি ছোটোগল্প কেন উপন্যাসটির এক-একটি পরিচ্ছদ হয়ে গিয়েছিল। তাতে তিনি জানিয়েছিলেন উপন্যাসের বিষয়টি বহুদিন ধরে উথলে উঠছিল তাঁর মাথার ভিতর। পর পর আটটি ছোটোগল্প লেখার পর তৎকালীন 'অমৃত'-সম্পাদক মণীন্দ্র রায় তাঁকে অনুরোধ

করেছিলেন একটি ধারাবাহিক উপন্যাস লেখার জন্য। সম্পাদককে নির্ভয়ে জানিয়েছিলেন তাঁর লেখা এই আটটি ছোটোগল্পই মূল উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু। এগুলি তাঁর জীবনধারার এক-একটি খণ্ডাংশ। এই আটটি ছোটোগল্প যদি উপন্যাসের আটটি পরিচ্ছেদ হিসাবে সম্পাদক ছাপতে রাজি হন, তবেই লিখবেন ধারাবাহিক।

মণীন্দ্র রায় তদ্দণ্ডে জানিয়েছিলেন তিনি রাজি। তার পরের মাস থেকে বেরোতে শুরু করল 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'। আর বলা যায় এক উপন্যাসেই লেখক ভিনি ভিডি ভিসি। বাংলা সাহিত্যে এলেন, দেখলেন, জয় করলেন।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন খুব লড়াকু জীবন, একই সঙ্গে খুব বৈচিত্র্যপূর্ণ, হঠাৎ জাহাজের খালাসি হয়ে সমুদ্রগামী হওয়ায় তাঁর জাবনধারাই হয়ে গিয়েছিল বিপরীত ছকের। সেই জীবনকাহিনি ধরা দিয়েছিল তাঁর পরের উপন্যাস 'অলৌকিক জলযান'এ। সমুদ্রকেন্দ্রিক জীবনের উপর রচিত সেই উপন্যাসও বেশ সাড়া জাগিয়েছিল পাঠকমহলে।

একজন ঔপন্যাসিকের সৃষ্টির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় লেখককে। কিংবা বলা যায় কোনও উপন্যাস একজন লেখকের আত্মজীবনীর অংশ। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস অন্তত তাই। তাঁর প্রধান উপন্যাস 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'র পরবর্তী দু-খণ্ড 'ঈশ্বরের বাগান' ও 'মানুষের ঘরবাড়ি'ও লেখকের নিজের সৃষ্ট প্রতিবিম্ব সোনাকে নিয়েই গড়ে তুলেছেন এক বিশাল পৃথিবী। কথাপ্রসঙ্গে অতীনদা একদিন বলেছিলেন নিজেকে নিয়ে পৃথিবীর কোনও লেখক দেড় হাজার পৃষ্ঠার উপন্যাস নিশ্চয় লেখেননি!

আস্তে আস্তে তিনি অনেকগুলি দশক পেরিয়ে এসেছেন জীবনের। ধারাপাতের ভাষায় এখন অশীতিপর। কিছুদিন আগে পর্যন্ত লিখেছেন বহু পত্রিকায়। সম্প্রতি একটু অশক্ত হয়ে পড়েছেন, লেখালিখিতে পড়েছে ভাটা। দেখা হলে আলোচনা হয় নানা বিষয়ে। সাম্প্রতিক লেখালিখি, দেশকাল—নানা বিষয়ে তাঁর উৎসাহ। অন্য লেখকদের সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশে তিনি অকুতোভয়। আলোচনা প্রসঙ্গে যে কোনও লেখকের প্রসঙ্গই উঠত না কেন, তিনি অকপটে বলেন তাঁর লেখা পছন্দ করেন কি করেন না! তবে নিজের লেখার বিষয় নিয়েই বলতে ভালোবাসেন বেশি।

উপরোক্ত ট্রিলজি ছাড়া আরও বহু, গল্প-উপন্যাস লিখেছেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, তার অনেকগুলি পাঠকপ্রিয় হওয়ার পরেও তিনি আজও 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'র স্রষ্টা হিসেবেই খ্যাত। জীবনের প্রথম বড়ো উপন্যাস, সেখানে তিনি নিজেকে ঢেলে দিয়েছিলেন উজাড় করে। মানুষের শৈশব-কৈশোর জীবনের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ, সেই সম্পদকে যিনি রূপান্তরিত করতে পারেন প্রকৃত ঐশ্বর্যে, তিনিই হয়ে ওঠেন একজন বড়ো মাপের লেখক।

প্রসঙ্গ : অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সাধন চট্টোপাধ্যায়

চার-সাড়ে চার দশক পুরনো কথা। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির গগনে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ স্তিমিত। বাঙালি মধ্যবিত্ত রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রযন্ত্রের হাড়মাস গুঁড়িয়ে দেওয়ার বিপুল বিক্রম জেনে ফেলেছে। মনের মধ্যে আহত মানবতার হতাশা, অন্যধারে স্বপ্নভঙ্গের ধিকি ধিকি উত্তাপ। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে প্রবল তখন ভিয়েতনাম যুদ্ধ। ভিয়েতকং জিতে চলেছে, মার্কিন শক্তির পরাজয় নির্ধারিত। সে-টুকুই তখন র‍্যাডিক্যাল বাঙালি মধ্যবিত্তের চেতনায় কিছু প্রশমন।

আমি সাহিত্যচর্চায় তরুণ, অতিতরুণই বলা চলে। যেহেতু ষাট-সত্তরের বিদ্রোহী আবহাওয়ায় পুষ্ট হয়েছি, প্রতিবাদ-দ্রোহ সহজাত। খাদ্য আন্দোলনের প্রত্যক্ষ তাপ থেকেই তো সাহিত্য করতে আসা; মোটা দাগের বিপ্লবী সাহিত্য-প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্য নিয়ে একটা ভাবনা মনের মধ্যে সর্বদা জ্যান্ত হয়ে থাকত। এ নিয়ে কারণে অকারণে বিপক্ষের সঙ্গে তক্ক করা ছিল অভ্যাস। যেন 'বিপ্লবী' সাহিত্যকে এ-ভাবেই ভোটে জিতিয়ে দেয়া যায়।

তো, যে মফঃস্বল শহরটিতে থাকি, কিছু সাংস্কৃতিক কর্মী (তাদের মধ্যে দু-একজন লিট্‌ল ম্যাগাজিন বার করত) সাহিত্য সভার আয়োজন করে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে এনেছিল প্রধান অতিথি হিসেবে। বক্তৃতার বিষয় আজ মনে নেই—সম্ভবত বাংলা সাহিত্য বিষয়ক কিছু। আয়োজকরাও তরুণ, কিন্তু উগ্র বাম নয়, শিল্পসাহিত্যে মূলধারার লেখালেখি পছন্দ করে, ভক্তও বটে তাঁদের। আমাদের কাছাকাছি শহরের সমরেশ বসু তখন সাহিত্যের উত্তমকুমার। বাম শিবির ছেড়ে অনেক আগেই তিনি বৃহৎ একটি পত্রিকা-গোষ্ঠীর নিকট-অবস্থানে। জলঅচল না

হলেও, তখন দেশ-আনন্দবাজার ও যুগান্তর-অমৃতের মধ্যে গোপন খুনসুটি চলত। বহু বিখ্যাত লেখকের গায়ে কোনো হাউসের স্ট্যাম্প মারা থাকত তো অন্যদের অন্য শিবিরের। কিছু লেখকের লেখা উভয় শিবিরেই দেখা যেত। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সেই-দলের। মূলত যুগান্তর-অমৃতে লেখালেখি করলেও ছুৎমার্গতা ছিল না। দেশ-সম্পাদক সাগরময় ঘোষ ছিলেন 'জহুরি'—তাঁর স্নেহচ্ছায়া ছিল অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর। ১৯৫৬ সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর, সম্ভবত উল্টোরথ পত্রিকা 'মানিক স্মৃতি পুরস্কার' নামে তৎকালীন তরুণ লেখকদের মধ্যে পাণ্ডুলিপি-উপন্যাসের প্রতিযোগিতা করেছিল। বিচারে প্রথম হয়েছিলেন মতি নন্দী, দ্বিতীয় পূর্ণেন্দু পত্রী এবং তৃতীয় অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসটি পরবর্তী কালে 'সমুদ্রমানুষ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। বিদগ্ধ মহলে, এই উপন্যাস প্রতিযোগিতা যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল। পরবর্তীতে তিনজনই বাংলা সাহিত্যে খ্যাতিমান।

আমাদের শহরে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় যখন আসেন, সম্ভবত অমৃত পত্রিকায় 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' ধারাবাহিক প্রকাশিত, বই আকারেও প্রকাশক ছেপে দিয়েছে সম্ভবত। সঠিক তথ্যটি আজ আমার মনে নেই। প্রসঙ্গটি টানলাম বোঝাতে যে, যখন তিনি প্রধান অতিথি হয়ে আসেন এখানে, সমরেশ বসু, বিমল কর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়দের মতো গ্ল্যামারাস না হলেও বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে অতীন বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছেন।

তো, যারা সাহিত্য সভার আয়োজন করেছিল, তাদের মানসিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে আমার সাযুজ্য না থাকলেও, অল্পবয়সেই শিক্ষকতায় যোগ দিয়ে, সংস্কৃতিবান ছেলেপুলেদের সমীহ কুড়োতাম; তাই আমাকেও ঐ-সভায় কিছু বলবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রধান অতিথি বলার পরই, আমার পালা ছিল সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে কিছু বলার। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতার বিষয় আজ আর মনে নেই, নিশ্চয়ই প্রেম-ভালোবাসা মানবিক কিছু গুণাবলীর প্রসঙ্গ সাম্প্রতিক গল্প-উপন্যাসে কীভাবে তিনি প্রকাশ করছেন—এটাই হবে। আমার সামান্য প্রতিবেদনের প্রসঙ্গও ভুলে গেছি আজ। তবে তারুণ্যের বশে, ভিয়েতনামে মার্কিনী সৈন্যদের নিশ্চিত পরাজয়ে এবং স্বদেশে পুলিশ ও রাষ্ট্র নিষ্পেশনের ধিকিধিকি ক্ষোভে, প্রধান অতিথিকে খোঁচা এবং 'বিপ্লবী সাহিত্যের' পক্ষ নিয়ে বেসামাল কিছু মন্তব্য যে ছিল—হলফ করে বলতে পারি। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চেই ছিলেন, কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাননি। এমনকি, আমার সম্পর্কে কোনো কৌতূহলও ছিল না। অনুষ্ঠান শেষে কর্মকর্তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কিছু কথাবার্তায় কানে এসেছিল, ভিয়েতকংরা সারা দিনভর লড়াই

করলেও, তারা প্রেম করে, নারীদের চুমু খায়, সন্তান উৎপাদন করে। তাও তো তাদের জীবনেরই অঙ্গ—অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়েব মন্তব্য।

যুক্তিগুলো তখন আমার কাছে চমকপ্রদ ও যথেষ্ট মনে হয়নি।

এরপর সূর্যের উদয়াস্তে বহু ক্যালেন্ডারের পাতা খসে গেছে। করুণা প্রকাশনীতে যাতায়াতের সুবাদে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছি। বুঝলাম অকিঞ্চিৎকর অতীত ঘটনাটি তাঁর স্মরণেই নেই, এমনকি আবছা অস্পষ্টও আমার সেদিনের পরিচিতি ওর স্মৃতি তুলে আনতে পারেনি। নতুনভাবে আমি তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হলাম। তখন আমারও গল্প এবং উপন্যাস সমগ্র যেখান থেকে প্রকাশিত, অতীনদার 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' কিংবা 'ঈশ্বরের বাগান' ঐ প্রতিষ্ঠানের বেস্টসেলিং বই। আমিও কাণ্ডজ্ঞানে কিছুটা পরিণত হয়েছি, আর অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় নানা পুরস্কার ও অধিক জনস্বীকৃতি পেয়ে বার্ধক্যে পৌঁছে গেছেন। খুবই সহজ-সরল-আলাভোলা স্বভাবের মানুষ। দেশ ভাগ হওয়ায় হাজার হাজার ভাগ্যবিপর্যস্ত পরিবারের মধ্যে উনিও আছেন। ক্ষত যেন জীবনব্যাপি তাঁর কাছে বিস্মরণের নয়। এপারে উঠেছিলেন মুর্শিদাবাদে। ভয়ঙ্কর দারিদ্র্য। অন্নসংগ্রহের জন্য জাহাজের খালাসি হিসেবে নেমে পড়তে হয়েছিল জীবন সংগ্রামে। একদিকে ব্যাপারটা যেমন ব্যক্তি-বিপন্নতা, অন্য দিকে বাঙালি পাঠকের কাছে আশীর্বাদ। 'সমুদ্র মানুষ', 'অলৌকিক জলযানে'র মতো উপন্যাস আমাদের মুগ্ধ করেছে। তাঁর লিখিত ট্রিলজি—'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', 'ঈশ্বরের বাগান', 'মানুষের ঘরবাড়ি'—দেশভাগের বিক্ষোভ, বেদনার ট্র্যাজিক দলিল হয়ে আছে। দেশভাগ নিছক একটি প্রজন্মের ভিটে হারানো, প্রাণনাশ, অগ্নিসংযোগ বা নারীবিভৎসার কাহিনি নয়, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাঙালিকে এ-ক্ষত বয়ে চলতে হবে; কারণ একটা Value-Systemকেই দেশভাগ উৎপাটিত করে দিয়েছে। যখনই নতুন নতুন প্রজন্ম আত্মপরিচয়ের ইতিহাস খুঁজতে আসবে, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের কাছে ঋণ গ্রহণ ছাড়া উপায় কোথায়?

মানুষ হিসেবেও দেখেছি, যা সত্য ভাবেন, সোজা বলে দেন। কোনো Diplomacy-র ধার ধারেন না। কোনো অন্যায় তাঁর যুক্তিবিচারে ধরা পড়লে, সোজাসাপটা বলে দেন। স্থান-কাল-পাত্র বিচার করেন না।

মাঝেমধ্যে করুণা প্রকাশনীর আড্ডায় কচিৎ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হয়। ঢোলা ফুলপ্যান্ট আর লম্বা একটা পাঞ্জাবী। নস্যি নেন। রসবোধটি প্রখর। বর্তমানে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আমার প্রতিবেশী। অতীনদার মতো সন্তানটিও খুব হিসেবি ও বৈষয়িক নয়। আপনভোলা। মাঝেমধ্যে কবিতা লিখে আমার কাছে আসে। উচ্চ প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনিয়ার হয়েও স্বেচ্ছাবসর নিয়ে, নির্বিঘ্নে নিরালায় জীবনযাপন

করছে। অতীনদার সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে, ছেলের প্রসঙ্গে লেটেস্ট খোঁজ-খবর নেন আমার কাছে।

বর্তমানে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় শারীরিক ভাবে মজবুত নন। লেখালেখির ব্যাপারেও তেমন উৎসাহ দেখান না। 'কলেজস্ট্রীট' পত্রিকায় একটি ধারাবাহিক বেরুচ্ছে, একপাতা বা বড় জোর দেড়পাতা কিস্তি। উপন্যাসের কিস্তি হিসেবে খুবই অমিত। বামবাবুকে বললে শুনি, ওইটুকু লেখানোও কষ্টকর হয়ে পড়েছে। নিয়মিত লেখা কিংবা লেখা নিয়ে আলোচনাতেও আগ্রহ নেই। অনেকটা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছেন। কোনো অনুরোধ এলে করুণা প্রকাশনীর কর্ণধার বামবাবু গিয়ে আড্ডা মেরে আসেন।

অনেক সম্মান পুরস্কার পেয়েছেন, ভবিষ্যতে হয়তো পাবেনও—দীর্ঘায়ু হলে। একটি উপন্যাস লিখে, জাতীয় স্নায়ুতন্ত্রকে স্পর্শ করা বাংলা সাহিত্যে বেশি নেই—বিশেষ করে আধুনিক কালে। দেশভাগের বেদনা জাতির চেতনায় যতদিন জাগরুক, নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজ পড়বেই। দেশভাগ নিয়ে গভীর চর্চা ও বিস্তৃত ইতিহাস নির্মাণ সবে বহুমাত্রিকভাবে শুরু হয়েছে---অর্ধ শতাব্দী জুড়ে চলবেই—অন্তত। আমাদের পারস্পরিক অপরিচয়ের অকিঞ্চিৎকর স্মৃতি দিয়ে শুরু করেছিলাম। নিশ্চয়ই আমরা কেউই পূর্বতন ভাবনা-চিন্তার সংকীর্ণতর অবস্থানে নেই। টের পাই, দেশভাগ ও মানবতন্ত্রের ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু সৃষ্টি অপরিহার্য হয়ে উঠছে। তিনি তাঁর নিঃসঙ্গতা কটিয়ে উঠুন---এই প্রার্থনা করব।

সারল্যের ভাষ্যকার

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

বোধহয় তিরিশ বত্রিশ বছর হয়ে গেল 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' প্রথম খণ্ড হাতে এসেছিল। তখন কলেজে পড়ি। কোনও এক সহপাঠী দিয়েছিল পড়তে। আমাদের মধ্যে বই পড়ার চল ছিল খুব। আধুনিক বাংলা সাহিত্য, বিদেশি সাহিত্যের বাংলা, ইংরেজি অনুবাদ পড়ছি, তুমুল আলোচনা করছি নিজেদের মধ্যে। বন্ধুটি 'নীলকণ্ঠ...' দিয়ে বলেছিল, এটা আগে পড়। তারপর বড় বড় আলোচনা করবি। বিশ্বমানের এরকম বাংলা সাহিত্য খুব কমই আছে।

মোক্ষম কথা বলেছিল আমার সেই বন্ধু। 'নীলকণ্ঠ...' পড়তে পড়তে অদ্ভুত একটা ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছিলাম তো বটেই, দুই বাংলার কাহিনিতে ঢুকে গিয়ে নিজের বাঙালি সত্ত্বাটা প্রকাণ্ড আকার নিয়েছিল। ১৯৬১ তে জন্মেছি, বাঙালির ভৌগোলিক সীমানা, জীবনচর্চার ব্যাপ্তি, বৈচিত্র্য সম্বন্ধে তেমন ধারণা ছিল না। বাঙালি সত্ত্বার সেই প্রকাণ্ডতা আজও বহন করে চলি আমি। এতটুকু ক্ষয় ধরেনি।

প্রথম পাঠের পর থেকে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা পেলেই পড়তাম। অন্যান্য প্রিয় সাহিত্যিকদের মতো তিনিও আমার অত্যন্ত পছন্দের হয়ে গিয়েছিলেন। একটা কথা এখানে স্বীকার করে নেওয়া ভাল, ওঁর লেখা সহজে পাওয়া যেত না। বড় হাউসে বেশি লেখেননি। বইয়ের প্রকাশক মাঝারি ক্ষমতার।

আমি যে কখনও লেখালেখি করব, এমন বাসনা কোনও কালেই ছিল না আমার। সাহিত্য পড়তাম, পড়ার নেশাতেই। পাকেচক্রে লেখালেখিতে চলে এলাম। একটু বয়সকালে। কোনও এক সাহিত্য পরিমণ্ডলে প্রথম চাক্ষুষ করেছিলাম অতীন

বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অবাক হয়েছিলাম বেশ। একেবারেই সাদামাটা উপস্থিতি। আরও একটু নির্দিষ্ট করে বললে, কেমন যেন অগোছালো ভাব। কথাবার্তাও মেপেজুকে বলছিলেন না। উনি যে একজন বিশিষ্ট মানুষ, এখনই চল্লিশ বছরের উপর সাহিত্যজগতে আছেন, দেখে বোঝার উপায় নেই। ওঁকে নিয়ে কৌতূহল হয়েছিল খুব, নিবিড়ভাবে আলাপ করার সাহস হয়নি। এটা আমার স্বভাব বৈশিষ্ট্য, প্রিয় লেখক-শিল্পীর কাছাকাছি যেতে পারি না। কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে পড়ি। মনে হয় আমি কি সত্যিই ওঁর ক্ষমতাটা উপলব্ধি করতে পেরেছি? সামনে গিয়ে কী বলতে, কী বলে বসব! উনি বিরক্ত হবেন।

প্রথম দেখায় সৌজন্যমূলক আলাপ হয়েছিল। বলেছিলেন, ও তুমিই সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়! এখন তো খুব লেখালেখি করছ... আরও দু'এক কথা হয়েছিল। তারপর বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে, উনি মুখ মনে রাখতে পারেননি। এখানে একটা জিনিস লক্ষণীয়, সামান্য খ্যাতিমানরাও স্তাবক পরিবৃত হয়ে থাকতে ভালবাসেন। বেছে নেন অনুরাগীদের। আমি যে ওর লেখার মুগ্ধ পাঠক প্রথম আলাপে জানিয়েছিলাম। উনি আমার নামটা মনে রাখলেও (যেহেতু নিয়মিত লেখা ছাপা হয়) মুখটা ভুলে গিয়েছিলেন। স্তাবকের ঘেরাটোপে কোনও আগ্রহ নেই ওঁর। তাই উনি বেশ খানিকটা নিঃসঙ্গ। এই নিঃসঙ্গতার আবহ পরখ করেছিলাম একটি নামী পত্রিকার হয়ে তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে। সেটা ছিল আমার দ্বিতীয় আলাপচারিতা, প্রথমটার ছ'সাত বছর পর। ২০১২ সাল। তখন ওঁর বয়স বিরাশি। চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই। অন্তত দশ বছর কম লাগে।

কলকাতার কেষ্টপুরের বড়রাস্তা ছেড়ে খানিকটা গলি ধরে হেঁটে ওঁর দোতলা বাড়ি। একতলায় বসেছিলাম দু'জনে। অনাড়ম্বর অন্দরসজ্জা। তবে খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তার ক'দিন আগে বড় অঙ্কের একটা পুরস্কার পেয়েছেন, যার সামান্য জৌলুসও ওই ঘরটায় কিংবা ওঁর হাবেভাবে নেই। নিঝুম বাড়ি। পরিবারের আর কোনও সদস্যের সাড়া পাইনি। বউদি দোতলায় ছিলেন, বয়স হয়েছে, সিঁড়ি ওঠা নামা করতে কষ্ট হয় বলেই বোধহয় আলাপ হল না। কাজের মহিলা জল-মিষ্টি দিয়েছিল। বাড়ির কর্তা ওর সঙ্গে ওপার বাংলার টানে কথা বলছিলেন।

শিল্প-সাহিত্যের পরিমণ্ডলে একটা বেশ মজার ব্যাপার চালু আছে, অগ্রজ বয়সে যতই বড় হোক, অনুজ শিল্পী-সাহিত্যিক তাঁকে দাদা সম্বোধনে ডাকার অধিকার পেয়ে যায়। এতে সম্পর্কটা অনেক সহজ হয়ে আসে। অবলীলায় যে কোনও প্রশ্ন করা যায়। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বয়সে আমার চেয়ে অনেকটাই বড়, তবু জিজ্ঞাসা করতে দ্বিধা হয়নি, [illegible], এটা কি পাঠককে

টানার কৌশল? অথচ আরও কত কৌশলই তো আছে, যা আপনি আখ্যানে ব্যবহার করেন না। উত্তরে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, মানে অতীনদা বলেছিলেন, যৌনতার প্রসঙ্গ আমার লেখনীতে আসে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। কাউকে প্রলুব্ধ করার জন্য নয়। সুদীর্ঘ জীবন ধরে আমি অনুভব করেছি, এই যে মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে আছে, তার কারণ এর মধ্যে নারী আছে। যদি নারী না থাকত, তাহলে এই সমাজ, রাজনীতি, শিল্পসৃষ্টি কিছুই থাকত না। নারীর থাকাটা তাই এত মূল্যবান। আর এর কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে যৌনজীবন। ...অতীনদা মনে করেন, যৌনতাই প্রাণ, যৌনতাই সৃষ্টির উৎস, যৌনতাই ঈশ্বর। যৌনতা অতীনদার কাছে ভোগের বস্তু নয়। ...কথাগুলো যতটা গুছিয়ে লিখলাম, অতীনদা এভাবে বলেন না। যেভাবে বলেন, সেটা লেখায় প্রকাশ করা অসম্ভব। গদ্যও লেখেন নিজস্ব কথা বলার ঢঙে, আপাত এলোমেলো, কিন্তু কিছুতেই অপ্রাসঙ্গিক নয়। অকপট, তবে মোটেই অগভীর নয়। ওঁকে উপলব্ধি করতে মেধা লাগে। আর অদ্ভুত কাব্যিক মেজাজ ওঁর গদ্যে। যার জন্য ওঁর যে কোনও লেখা এপিকের মাত্রা পেয়ে যায়। ওঁর গদ্যভঙ্গি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গ বলেছিলেন, আমি খুব সাধারণ গদ্যে বাক্য লিখতে পারি না। আমার ভেতর একটা এলোমেলো ব্যাপার আছে। এগুলোই হয়তো এক ধরনের কাব্যের রূপ নেয়। কাব্য হিসাবে আমি লিখছি না, অথচ হয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের আমল থেকে যে চালু গদ্য চলে চলে আসছে, সেটা আমি কিছুতেই লিখতে পারি না। একটা দরখাস্তও গুছিয়ে লিখতে পারি না আমি। ...কথাগুলো সহজভাবেই বলেছিলেন, বিনয়ের মোড়ক ছিল না। তবু আমার বিশ্বাস অতীনদা মনে মনে নিজের এলোমেলো গদ্যটাকে প্রশ্রয় দেন। নিগড়ে বাঁধতে চান না। নিজের গদ্যের মধ্যে কবিতার সুবাস পান। তাঁর অন্তরে একজন কবি বসবাস করে।

অতীনদার গল্প-উপন্যাস পড়া শুরু করলেই বোঝা যায়, কোনও ছক বা পরিকল্পনা করে লিখতে বসেননি। ভাবনা মাথায় যেমন যেমন আসছে, লিখে যাচ্ছেন। লেখাটা আকর্ষণীয় করার বাড়তি কোনও প্রয়াস নেই। এই উদাসীনতাই আখ্যানটির আঁকে বাঁকে ম্যাজিক সৃষ্টি করে, স্পর্শ করে শিল্পের শীর্ষবিন্দু। এ ব্যাপারে একজন পাঠক অতীনদাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, আপনি গল্পের ছাঁচ মানেন না, ক্রাফটের ব্যাকরণের ধার ধারেন না। এক আশ্চর্য রোম্যান্টিক বোহেমিয়ানিজম কাজ করে যায় আপনার লেখায়। আপনার বিবৃতি সমুদ্রের মতো দিক্‌চিহ্নহীন। ...অতীনদা মনে করেছেন, হবে হয়তো! ভদ্রলোকের ব্যাখ্যাটা পছন্দ হয়েছিল। তাই ওঁর গল্পসমগ্রের ব্লার্বে ওই মূল্যায়নটাই ছাপতে দিয়েছিলেন। নিজের মূল্যায়ন নিজে করার [illegible] করতে চাননি।

আমিও ওই পাঠকের সঙ্গে সহমত। অতীনদার রচনায় সমুদ্রের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো আছে। অদ্ভুত একটা ধাঁধা তৈরি করে ফেলেন। কিছুতেই নির্মাণ কৌশলটাকে আবিষ্কার করা যায় না। সমুদ্রের প্রভাব পড়বেইবা না কেন? দেশভাগের কারণে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিলেন এপারে। পরিবারে আর্থিক অনটন। এদিকে ওঁর পিতা উদ্বাস্তু পরিবার পিছু সরকারি সাহায্য কুড়ি টাকা ক্যাশ ডোল কিছুতেই নেবেন না। বিনা পরিশ্রমে কোনও টাকা নিতে তিনি রাজি নন। চোখের সামনে নিজের লোকেদের অনাহার অতীনদা সহ্য করতে পারেননি। কোলবয়ের কাজ নিয়ে জাহাজে উঠে পড়লেন। কতদিন ছিলেন জাহাজে, ঠিকঠাক হিসেব দিতে পারেন না। বলেন, সমুদ্রের মাঝে দিন রাত গুলিয়ে যেত। ঋতু টের পেতাম না। যত দূর দৃষ্টি যায় উত্তাল জলরাশি, বিপুল আলস্য আসত শরীরে। দিনের হিসেব করতে ইচ্ছে হত না। কখনও সখনও আপার ডেকে টাঙানো নোটিস বোর্ড থেকে জেনে আসতাম আজ কত তারিখ। বেশ কয়েকবার সমুদ্রঝড়, সাইক্লোনে পড়েছি। ঝড় থামলে, বেঁচে যে আছি, বিশ্বাস করতেই অনেকক্ষণ কেটে যেত। আমাদের জাহাজটাও ছিল জোড়াতালি দেওয়া। তরুণ অবস্থায় জাহাজে উঠেছিলাম, ফিরলাম পূর্ণ যুবক হয়ে।... নানান দেশে, বন্দরে ঘুরেছেন। শ্রীলঙ্কা, ইস্ট আফ্রিকার ডারবান, কেপটাউন। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল, আর্জেন্তিনায় বুয়েনস এয়ারেস, তারপর পেরু আরও অনেক জায়গায়। সেই দফার সফর শেষে ফেরার পর বাড়ির লোক, বন্ধু-বান্ধব আর অতীনদাকে সমুদ্রে পাড়ি দিতে দেননি। বন্ধুদের অনুরোধে সমুদ্রের অভিজ্ঞতা নিয়ে অতীনদার প্রথম গল্প, কার্ডিফের রাজপথ। ওয়েলস-এর বন্দর শহরের উপর লেখা।

অতীনদার অতীত অস্থিরতায় ভরা। বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন বেশ কয়েকবার। বিভিন্ন ধরনের কাজ করেছেন। কখনও ট্রাক ক্লিনার, তাঁত বোনার কাজ, জাহাজের কোলবয়ের কথা তো আগেই বলেছি। শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা... আরও কত কী। ...এ ব্যাপারে যখন জিজ্ঞেস করেছি, এত অস্থিরতা কেন? ...উনি গম্ভীরভাবে বলতেই পারতেন, শিল্পী মাত্রই অস্থির প্রকৃতির। আত্মপ্রকাশের অস্থিরতা সব সময় তার মধ্যে কাজ করবে। ...বলেননি। আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো বলেছেন, এই অস্থিরতার কারণ আর কিছুই নয়, সংসারের অভাব। যে করে হোক রোজগার করতে হবে। টাকা পাঠাতে হবে বাবাকে। বাড়ি থেকে দূরে যেতে দিত না। তাই পালাতে হত।

এভাবে পালানো এবং বিভিন্ন ধরনের পেশার সুবাদে অতীনদার অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার পূর্ণ হয়েছে। অজস্র ভাল ভাল গল্প উপন্যাস আমরা পেয়েছি। অলৌকিক

জলযান, ঈশ্বরের বাগান, দেবী মহিমা, মানুষের ঘরবাড়ি, নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে, দুই ভারতবর্ষ আরও অনেক। 'মানুষের ঘরবাড়ি' উপন্যাসে আমরা পাই এপারে এসে অতীনদার পরিবারের জীবনসংগ্রাম। বাবা, জ্যাঠা কাশিমবাজার রাজাদের থেকে বানজেটিয়ার জঙ্গলের পঁচিশ বিঘা কিনে নিয়েছিলেন। শোনা যেত সেই জঙ্গলে বাঘ-ভাল্লুকের বাস আছে। জঙ্গল সাফ করে চাষ হবে, ঘর তুলতে হবে। অতীনদার পরিবার লেগে পড়েছিলেন সেই কাজে।

জাহাজের অভিজ্ঞতা থেকে অলৌকিক জলযান। নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে আছে ওপার বাংলার গল্প, অতীনদার শৈশব। লিখেছিলেন বেশ কিছু উপন্যাস লেখার পর। জিজ্ঞেস করেছিলাম প্রথম জীবনের গল্প এত পরে লিখলেন কেন? উত্তরে বলেছিলেন, নিরপেক্ষ হতে সময় লেগেছিল আমার। বাধ্য হয়ে দেশত্যাগের জন্য অন্যান্য উদ্বাস্তুদের মতো আমিও মুসলিমদের দায়ী করতাম। ...এই বিবৃতিতে বোঝা যায় আপাত এলোমেলো স্বভাবের মানুষটা সাহিত্যসৃষ্টির ব্যাপারে কতটা দায়িত্ব সচেতন। সাহিত্য তো সমাজের দলিল। পক্ষপাত সেখানে কখনওই কাম্য নয়।

এবার অতীনদার কয়েকটি অকপট স্বীকারোক্তির কথা বলি, ইন্টারভিউয়ের শুরুতেই উনি নিজের জন্ম সালটা শুধরে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমার সব বইয়ে জন্মসাল দেওয়া আছে ১৯৩৪। ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফর্ম ভরার সময় গণ্ডগোলটা করেছিলেন আমার সোনা জ্যাঠামশাই। এপারে আসার সময় যে কোনও ভাবে হোক আমার কুষ্টিটা চলে এসেছিল মায়ের বাক্স-প্যাঁটরায়। আর তা থেকেই জানলাম, আমি জন্মেছি ১৩৩৭, ২২ কার্তিক। ইংরেজিতে ১৯৩০, ৬ নভেম্বর। সার্টিফিকেটের বয়স আর সংশোধন করা হয়নি। ...এর কারণে চাকরি জীবনে গ্রেস পেয়েছিলেন সেটাও বলে নিয়েছিলেন।

সাক্ষাৎকারে একটু ট্যারাবাঁকা প্রশ্ন করতে হয়। তাহলে ব্যাপারটা বেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম, এত লিখতে হল কেন? ...কোনও ভনিতা না করে বলে দিলেন, অর্থকষ্ট। অর্থকষ্টই আমার লেখার অনুপ্রেরণা। বড় কাগজ থেকে লেখার ডাক বেশি আসেনি। ছোট কাগজে অনেক লিখে উপার্জন করতে হয়েছে। ...জানতে চেয়েছিলাম, বড় কাগজ থেকে লেখার ডাক না পাওয়ার কারণ?

বলেছিলেন, এর জন্য দায়ী আমার চরিত্রটা। কী বলব, একটু বোকা বোকা, অপরিশীলিত। কোথায় কী বলতে হয় জানি না। যেখানে সেখানে যা ইচ্ছে বলে দিই। সবাই মনে করে, ও একটা গেঁয়ো। ও আবার কী লিখবে। এরকম একটা ভাবনা বোধহয় বড় কাগজের কর্তৃপক্ষদের মধ্যেও ছিল।

ডিপ্লোম্যাসি ব্যাপারটা সত্যিই অতীনদার ভিতর নেই। ইন্টারভিউটা প্রথম

সারির কাগজে ছাপা হবে জেনেও বলেছিলেন, সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারটা অনেক জুনিয়াররা পাওয়ার পর আমি পেয়েছি। হয়তো পেতামই না। সুনীল (গঙ্গোপাধ্যায়) সাহিত্য অকাদেমির সভাপতি হওয়াতে পেলাম। ...এই স্বীকারোক্তিতে ওঁর অকাদেমির পুরস্কার প্রাপ্তির গুরুত্ব যে অনেকটা কমে গেল, খেয়ালই করলেন না।

ওঁর অকপটতার আর একটা উদাহরণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কেমন লাগে জানতে চেয়েছিলাম। উত্তর ছিল, 'পদ্মা নদীর মাঝি' ছাড়া আমার আর কিছুই তেমন উঁচুদরের মনে হয় না। কিছু ভাল গল্প যেমন লিখেছেন, অজস্র খারাপও লিখেছেন। পার্টি এবং বামপন্থীরা তাঁকে বড় বেশি মাথায় তুলেছে। ওঁকে মহান বানাতে গিয়ে তারাশঙ্কর, বিভূতিকে অবহেলা করা হয়েছে সে সময়।

অতীনদার মূল্যায়নের সঙ্গে আমি পুরোপুরি সহমত নই। বামপন্থীরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য কী করেছে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি যথেষ্ট বড় মাপের লেখক বলেই মনে করি। সে কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলাম অতীনদাকে। উনি তর্কে যাননি। অন্যের মতামতকে যথাযথ গুরুত্ব দেন।

রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে ওঁর মতামত, উপন্যাস তেমন ভাল লাগে না। ডায়লগ পোরশন বড্ড পোশাকি। রবীন্দ্রনাথের গান অসাধারণ লাগে।

তারাশঙ্করকে বড় লেখক মনে করেন। তবু ওঁর লেখায় কাহিনি এবং ঘটনার ঝোঁক বেশি বলে মনে হয় অতীনদার। বিদেশি সাহিত্যিকদের নিয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন, ইন্টেলেকচুয়ালদের মুখে হামেশাই কামু, কাফকা, আরও সব লাতিন আমেরিকান লেখকদের নাম শুনি। আমি পড়ে দেখেছি, এঁদের নিয়ে কী এত ওদের স্ফূর্তি, কেন এত প্রশংসা বুঝি না। আরে, ওদের জীবনযাপন, ভাবনা, বিবেচনা তো আমাদের দেশের জল-মাটির সঙ্গে মেলে না। আমাদের জীবনধারা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ওদের মতো নয়। ওরকমভাবে লিখলে আমাদের চলবে কেন? এই যে ওঁরা বলেন স্যুররিয়ালিজম, এ তো আমাদের রামায়ণ-মহাভারত থেকে চলে আসছে।

অতীনদাকে খেয়াল করিয়ে দিই, আপনার লেখাতেও এর দৃষ্টান্ত কিছু কম নেই। অতীনদা বলেন, আছে, আমি বুঝে লিখিনি। যেমন যেমন চিন্তা মাথায় এসেছে, লিখেছি।

অতীনদার প্রিয় সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'বুড়ো আংলা' পড়ে উনি যতটা অভিভূত হয়েছেন, আর কোনও লেখা পড়ে অতটা হননি। এরপর আছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'পথের পাঁচালী' অসাধারণ লাগে অতীনদার। পছন্দ করেন বিমল করের লেখা, রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসুর কালকূটের গদ্য। সমরেশ

বসুর স্বনামের গদ্য অতীনদার ততটা পছন্দ নয়। মনে করেন ওই গদ্যরীতিতে সমরেশ বসু নিজের প্রতি অবিচার করেছেন।

বিমল কর সম্বন্ধে অতীনদা বলেছেন, সমসাময়িকরা প্রায় সকলেই বিমলদাকে ঘিরে আড্ডা মারতাম, লেখালেখির এক ধরনের উত্তাপ পেতাম। বারাবরই বিমলদার লেখার অনুরাগী আমি। গদ্যে ওঁর পরিমিতি, সিম্বলিক এফেক্ট আমায় ভীষণ টানত। আমাদের মধ্যে অনেকেরই গোড়ার দিককার লেখায় বিমলদার গদ্যভঙ্গির প্রভাব ছিল। আশ্চর্যভাবে আমার ছিল না। আমি প্রায় ওঁর ভিন্ন মেরু থেকে লিখতাম। উনি কিন্তু আমার লেখা খুবই পছন্দ করতেন। দরকার মতোন সাজেশন দিতেন। বিমলদার প্রেশারেই আমি দেশ-এর মতো নামী পত্রিকায় অত কটা গল্প লিখতে পেরেছি।

গল্পের প্রসঙ্গ এসে যাওয়াতে প্রশ্ন করেছিলাম, অজস্র গল্প লিখেছেন আপনি। বাংলার অনেক বিখ্যাত গল্পকারের চেয়েও বেশি। তবু ঔপন্যাসিক হিসেবেই আপনার খ্যাতি বা পরিচিতি। এমন হল কেন?

অতীনদা বলেছিলেন, চটক, চমক, আর কী বলে, মোচড়। এ সবে আমি বিশ্বাস করি না। যাঁদের গল্পে এইসব আছে, জনপ্রিয় হয় বটে, গল্পটা কিন্তু ওখানেই শেষ হয়ে যায়। আমি মনে করি যেসব গল্পে অতি নাটকীয়তা থাকে, তাতে সাহিত্যের মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায়।

সমসাময়িক লেখক বন্ধুদের সঙ্গে অতীনদার সম্পর্ক বরাবরই বেশ মধুর। সাটুই স্কুলে অতীনদা হেডমাস্টার ছিলেন। কাছেই ছিল হিজলের বিল। মাইলের পর মাইল। বিলের ওপারে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গ্রাম। সিরাজদা সাটুইয়ে চলে আসতেন। দুই বন্ধুতে আড্ডা হত। তারপর দু'জনেই চলে এলেন কলকাতায়। সিরাজদা বোধহয় একবছর পর। আলাপ হল শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গেও আলাপ হল, তবে সুনীলদা কফি হাউসে কবিদের টেবিলে বসতেন। সঙ্গে থাকতেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'দেশ'-র প্রথম গল্প পড়ে অতীনদা যেচে আলাপ করেন। তারপর খুবই বন্ধুত্ব হয়ে যায়। শীর্ষেন্দুদার মেসে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা মারতেন।

মতি নন্দীর সঙ্গেও গভীর সখ্য ছিল। মতিদার বাড়ি যেতেন। পুত্রবৎসল ছিলেন মতিদার মা, অতীনদাকে নিজের ছেলের মতোই দেখতেন। মতিদা গ্রাম থেকে আসা অতীনদাকে কলকাতা চিনিয়েছেন। চলন্ত ট্রামে কীভাবে নামতে হয়, উঠতে হয় শিখিয়েছেন। আবার এই মতিদা সম্বন্ধে অবলীলায় অতীন বলেছেন,

মতি কফি হাউসে বিশেষ আসত না। খুব দাম্ভিক ছিল তো।

বন্ধু দিব্যেন্দু পালিতের লেখার প্রশংসা করার পর বলেছেন, বড্ড চেপে মেপে টুইস্ট করে কথা বলে। এটাই হয়তো শহুরে স্মার্টনেস। আমি এটা রপ্ত করতে পারিনি। বড্ড কৃত্রিম মনে হয়। এর জন্য এক ধরনের অভিনয় দক্ষতা লাগে।

দীর্ঘ আলাপচারিতায় বুঝেছি অতীনদার কোনও রাখঢাক ব্যাপার নেই। এখনও যেন একজন কিশোর, যে সমাজের নিয়ম কানুনগুলো ঠিকঠাক শিখে উঠতে পারেনি। অতীনদা নিজে এক জায়গায় বলেছেন, যে কোনও লেখকের কাছে নিজের কৈশোর কালটা ভীষণ জরুরি। যার যত সেটা জাগ্রত, লেখাও তত জীবন্ত হয়।

অতীনদার কৈশোর সদা জাগ্রত। স্মৃতির সরণি বেয়ে মুহূর্তের মধ্যে চলে যেতে পারেন ওপার বাংলায় কাটিয়ে আসা কিশোর বয়সে। যা এখন তাঁর কাছে স্বপ্নের মতো মনে হয়। বলে ওঠেন, অদ্ভুত স্নিগ্ধ প্রকৃতি। পুকুর, নদী, খাল, বিল, চাষের জমি। ডাঙা আর জল যেন সমান সমান। আমাদের কুকুর, বেড়াল, ছাগল, গরু সবার একটা করে নাম। এখনও চোখ বুজলে গোটা অঞ্চলটা আমি দেখতে পাই। তরমুজ খেত, সোনালি বালির চর, পুকুরপাড়ে নিমগাছ, নোনা-ধরা ইটের প্রাচীন মসজিদ...

ছোটবেলার একটা ঘটনার কথা বলেছিলেন অতীনদা। রাত হয়তো আটটা-ন'টা, অতীনদার মা ঘুম থেকে ডেকে তুললেন ওঁকে। বললেন, ওঠ, তোর ঠাকুরদা মারা গেছেন। ঠাকুরদার সাহচর্য অতীনদার তেমন ছিল না। দেখতেন, খাটে বসে উনি সারাদিন কাশছেন। মায়ের ডেকে দেওয়াতে বারান্দায় এসে দেখলেন, ঠাকুরদাকে খাটসুদ্ধ উঠোনে শোওয়ানো হয়েছে। শীতের রাত। তখন ঘরের মধ্যে মৃত্যু পরিবারের পক্ষে অমঙ্গল মানা হত। উঠোনেই ঠাকুরদা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। ওঁকে দাহ করতে নিয়ে যাওয়া হল। অতীনদার বাড়ির সামনেই পুকুরের ওপারে বড়সড় অর্জুন গাছের নীচে দাহ হবে। তখনকার দিনে শ্মশানের তেমন চল ছিল না। ইতিমধ্যে অতীনদাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শোরগোল পড়ে গেল। এদিকে ঠাকুরদার কাজ সম্পন্ন করতে হবে। ওঁকে তুলতে গিয়ে দেখা গেল, অতীনদা ঠাকুরদাকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে আছেন। কখন ফাঁকতালে ঢুকে গেছেন ঠাকুরদার লেপের তলায়।

ওই যে এক অপার সারল্যে অতীনদা মৃত্যুকে জড়িয়ে শুয়েছিলেন, আমার কেন জানি মনে হয় তার প্রভাব আজও তিনি বয়ে চলেছেন। তাই তিনি হয়তো এত অকপট। খোলা মনের মানুষ।

প্রতিপক্ষ : অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

অমর মিত্র

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি প্রথম পড়ি অধুনালুপ্ত 'এক্ষণ' পত্রিকায়, 'সাদা অ্যাম্বুলেন্স'। তা প্রায় বছর চল্লিশ আগের কথা। সেই গল্প আমাকে আজও আবিষ্ট করে রেখেছে। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', 'মানুষের ঘরবাড়ি', 'অলৌকিক জলযান', 'ঈশ্বরের বাগান'-এর লেখক অতীন মানুষের কষ্টকর জীবনের কথা যেভাবে বলেন, তা মনের ভিতরে দাগ রেখে যায়। তাঁর 'সাদা অ্যাম্বুলেন্স' গল্পটি ছিল এক কিশোর ভৃত্যের। তার গায়ে মায়ের দয়া বেরিয়েছে, তাকে তার প্রভু-বাড়ির লোকজন রাস্তায় একটি গাছতলায় রেখে যায়। সে ছিল মানুষের নিষ্ঠুরতার গল্প। নিরুপায়তার গল্প। অতীন 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' ও 'মানুষের ঘরবাড়ি' লিখে চিরায়ত হয়ে গেছেন। তাঁর গল্পে পাই মানুষের নিষ্ঠুরতা, মানুষের ভালবাসা, জীবনের অনিশ্চয়তা এমনি নানান অনুভূতির কথা যা কিনা মনে ছাপ রেখে যায় দীর্ঘস্থায়ী।

অতীন কৈশোর অতিক্রান্ত বয়সে জাহাজিয়া হয়ে বহু দেশ ঘুরেছেন। তিনি ছিলেন সামান্য নাবিক। জাহাজের কোলবয়। সেই অভিজ্ঞতা তাঁর নানা গল্প ও উপন্যাসে এসেছে। আমার মনে পড়ে যাচ্ছে বহুদিন আগে পড়া সেই কৃশকায় উপন্যাস 'নগ্ন ঈশ্বর'-এর কথা। দেশভাগ, এপারে এসে শৈশব আর কৈশোরের নানা বঞ্চনা, দুঃখ দারিদ্র তার গল্পের বিষয় যেমন, তেমনি মানুষের আদিমতা, নারী ও পুরুষের প্রেম ও বিরহের কথা তিনি লেখেন অনেক গভীর থেকে। তাঁর গল্পে অসীম বৈচিত্র। আমার মনে পড়ে যাচ্ছে 'চিনেমাটির পুতুল', 'নদী নারী নির্জনতা', 'টিনের বাক্স, সমুদ্রে অশরীরী'... এমন কত গল্পের কথা।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি জাহাজের গল্প শোনাই এখন। গল্পটির নাম 'প্রতিপক্ষ'। এই গল্পের প্রধান চরিত্র সুকোমল কৈশোরে ছিল জাহাজের কোলবয়। এখন সে পঞ্চাশ পার। জীবনে প্রতিষ্ঠিত। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে বড় সংসার। সময় ১৯৮৬, বিশ্ব ফুটবলে মারাদোনার আবির্ভাব। এই মানুষটি আর্জেন্টিনার সমর্থক। এই সুকোমল তাঁর কৈশোরে জাহাজিয়া হয়ে বুয়েনস এয়ারস্ বন্দরে গিয়েছিল। অতীন কী সুন্দর বর্ণনা করেন সমুদ্রপথের। কলকাতা থেকে পাটের গাঁট, কিছু কাঠ আর হেরন পাখি নিয়ে মালবাহী জাহাজ কলম্বো বন্দর থেকে রসদ নিয়ে চলল ইস্ট আফ্রিকার উপকূল বরাবর। দাঁড়িয়েছে লরেঞ্জো মারকুইসে। সেখানে মাল খালাস করে ডারবান-কেপটাউন হয়ে সোজা দক্ষিণ আমেরিকা। সমুদ্র পথে মন্টিভিডিও এবং স্যান্টিসে মাল খালাস করে আর্জেন্টিনার বুয়েনস এয়ারস্। অতীনের সমুদ্র পথে আমারও ভাসা হয়। কল্পনার দুয়ার যেন খুলে যায়। কী নিবিড় বর্ণনা তাঁর। জাহাজের ডেক থেকে কুয়াশায় ঢাকা শহর। খুব ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে জাহাজিয়ারা। সুকোমল অবাক হয়ে দেখছে কুয়াশার ভিতর থেকে ক্রমশ ফুটে ওঠা শহর। জাহাজের বুড়ো সারেং তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিল, একা যেন রাস্তায় পা না দেয় সে। শহরের ভুলভুলাইয়াতে সে হারিয়ে যাবে। কেউ তার কথা বুঝবে না। জেটি থেকে নেমে দাঁড়ালেই শহর। বড় বড় রাস্তা, ঘরবাড়ি, ফুলের বাগান আর ফুলের মতো সব নর নারী। সে যেন দেব-দেবীদেরই দেশ।

গল্প আরম্ভ হয় বিশ্বকাপ ফুটবলে আর্জেন্তিনা ও ক্যামেরুনের খেলার দিন থেকে। সকাল থেকে খেলা দেখার আয়োজন আরম্ভ হয় সুকোমলের। ঘরটিকে যেন পবিত্র মন্দির করে তোলে সে। বিছানার চাদর বদলায়, টেবিল পরিষ্কার করে, কাচের আলমারি থেকে বই বের করে ঝাড়ন দিয়ে পরিষ্কার করে আবার গুছিয়ে রাখে। যেন ঘরে অতিথি আসবে কেউ। ছেলেমেয়েরা অবাক। বাবা আর্জিন্তিনার অসম্ভব সমর্থক। খেলার দিন সকাল থেকে সুকোমল সেই চিঠিগুলো খুঁজছে। চিঠির কথা তার স্ত্রী অমিতা জানে। কোলবয় সুকোমলকে একটি গরম কোট আর প্যান্ট দিয়েছিল বাটলার সোলেমান। পরিবর্তে তার হিসেবের খাতা লিখে দিত সে। সেকেন্ড হ্যান্ড মারকেট থেকে একটি ফেল্ট-ক্যাপও কিনে নিয়েছিল সে। বুয়েনস এয়ারসের ঠাণ্ডায় বেরোতেই পারত না সে মলিন জাহাজি পোশাকে। দরিদ্র বাবা মায়ের সন্তান। জাহাজে বসে, বন্দরের শহরের পার্কে বসে সে দেশের কথা, গ্রামের কথা, ভাই বোনের কথা, তার সাইকেলটির কথা ভাবত। অচেনা সেই বুয়েনস এয়ারস্ শহরে সে সোজা রাস্তায় হাঁটত। পার্কের ধারে দাঁড়িয়ে দেবকন্যার মতো তরুণীদের উল্লাস আর অচেনা ভাষা শুনত। একদিন পথ হারিয়ে ফেলে

সে। তার ইংরিজি তো কেউ বুঝবে না। কী করে জাহাজে ফিরবে সে? ভুলভুলাইয়ায় পড়ে সে কেঁদে ফেলেছিল। তাকে ফেলে রেখে জাহাজ যদি ছেড়ে যায় বন্দর? পৃথিবীর এক পিঠে তার দেশ, সে আছে অন্য পিঠে। তখন এক বয়স্কা মহিলা তাকে উদ্ধার করে জাহাজে পৌঁছে দেন। তিনি ইংরিজি জানতেন। এরপর সেই দয়াশীলা রমণী তাঁর মেয়ে এলসাকে পাঠান জাহাজে সেই গান্ধীর দেশের সুন্দর সেলর যুবকটিকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতে। তাকে ভাল লেগেছিল তাঁর। সেই মহিলার কন্যা ষোল বছরের এলসার সঙ্গে তার বন্ধুতা, তা থেকে প্রেম হয়। এলসা তাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। তার সঙ্গে সে সেই শহরে ঘুরে বেড়াত। জনপ্রিয় অভিনেত্রী ইভা পেরনের সমাধি, পার্ক, সমুদ্রতট। এলসা বলে যেত তার মায়ের কথা। মায়ের বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। সে বলত নিজের গ্রাম নদীর কথা। এলসাদের বাড়িতে ট্যাঙ্গো নাচ হত। এলসা তার প্রেমে পড়েছিল। তার মা বলেছিল তাকে থেকে যেতে। তার তো ওই একটি মেয়ে। যা আছে জীবন চলে যাবে। সেলর থাকেনি। কেন থাকেনি—তার মা, বাবা, ভাই, বোন, গ্রাম, নদী ছেড়ে বিদেশে থাকবে কী করে? তার মুখের দিকে চেয়ে আছে কতগুলো মুখ। তার পাঠানো টাকার জন্য অপেক্ষা করে থাকে তারা। সে ফিরে এসেছিল। সঙ্গে এলসার ছবি আর চিঠি। সেই ছবি সে সমুদ্রে বিসর্জন দিয়েছিল। চিঠিগুলো রেখে দিয়েছিল এতকাল। খেলার সময় সে আর্জেন্তিনা, এলসার দেশের জন্য উদ্বেগে ভোগে। খেলার দিন চিঠিগুলি ছুঁয়ে থাকে। এ এক অদ্ভুত প্রেমের গল্প। আর পড়তে পড়তে মনে হয় এই গল্প ১৯৯০-এর বিশ্বকাপ। যে বিশ্বকাপে মারাদোনাকে ক্ষতবিক্ষত করে নিজের খেলা খেলতে দেয়নি প্রতিপক্ষ। সে নিজেই যেন সেই ব্যর্থ নায়ক হয়ে যায় মনে মনে।

সেই চিঠি তার স্ত্রী লুকিয়ে ফেলে। চিঠিগুলি তো তারও প্রতিপক্ষ। স্বামীর সেই প্রথম যৌবনের প্রেমকে সম্মান দিয়েও সে এলসা অথবা আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ। যে কোনও গল্পই লেখার গুণে হয়ে ওঠে শিল্প। অতীন তাঁর লেখার গুণেই আমাকে আবিষ্ট করেন। দরিদ্র সেলর, আর সেই রূপকথার দেশ, জাহাজিয়াদের খুঁটিনাটি, মায়াতে ভরে যায় মন। তিনি সব সময়ই যেন নীলকণ্ঠ পাখি উড়িয়ে দেন শূন্যে।

একজন সমুদ্র-মানুষের গল্প

নীহারুল ইসলাম

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার প্রিয় লেখক। উপন্যাসিক হিসাবে খ্যাতি পেলেও আমার চোখে তিনি মূলত একজন সার্থক গল্পকার। তিনি আমার প্রিয় লেখক হওয়ার পিছনে এটাও একটা কারণ। কোথায় যেন তিনি বলেছিলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস লেখার অভিজ্ঞতার কথা। একটার পর একটা গল্প জুড়ে নাকি তৈরি হয়েছিল তাঁর সেই উপন্যাস। আসলে তাঁর লেখা সব উপন্যাস, সব ছোটগল্পই তাঁর নিজের গল্প বা আমাদের গল্প। আমরা সেটা টের পাই, যখন তাঁর লেখা পড়ি। পড়ি বললে ভুল হবে, আমরা তাঁর লেখায় আমাদের জীবনের ছবি দেখি। তাঁর প্রিয় লেখক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন শব্দ দিয়ে ছবি আঁকতেন, তিনিও তাই, আমাদের জীবনযাপনের ছবি আঁকেন। তাঁর 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে বিবৃত আছে ঢাকার রাইনাদি সহ আশপাশের গ্রামের ছবি। জন্ম থেকে ম্যাট্রিকের টেস্ট পরীক্ষা পর্যন্ত যেখানে তিনি কাটিয়েছেন। শুধুই কি গ্রামের ছবি? মায়াময় গ্রামের সেসব মানুষজন, প্রকৃতিকে ভেসে উঠতে দেখি যখন আমরা তাঁর লেখা পড়ি। শুধু ভেসে উঠতেই দেখি না, অনুভব করি—মুগ্ধ হই। আতঙ্কে ভিটেমাটি ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে এপারে এসে কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে, সেই চিত্র আমরা দেখতে পাই তাঁর 'মানুষের ঘরবাড়ি' উপন্যাসে। মুর্শিদাবাদের বানজেটিয়ায় এসে তাঁর বাবা আর সোনাজ্যাঠা মিলে মাত্র পাঁচশ টাকায় কাসিমবাজারের রাজাদের পঁচিশ বিঘা জঙ্গল কিনে নতুন করে সেখানে বসত স্থাপন করেন। তখনও সাহিত্য তাঁর মাথায় নেই। যা আছে তা হল অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই আর অদম্য জেদ। সেই সঙ্গে আছে আত্মসম্মানবোধ। পরিবারের

অজান্তে তাই তাঁকে চলে যেতে হয় জাহাজে কোলবয়-এর কাজ নিয়ে। দেশবিদেশের বন্দরে বন্দরে ঘুরে ফিরে এসে ভর্তি হন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে। সেখানেই বন্ধুদের সাহচর্যে সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ। এবং সেইসব বন্ধুদের তাড়নায় জাহাজে ঘোরার অভিজ্ঞতা নিয়ে গল্প লেখা শুরু। প্রথম গল্প 'কার্ডিফের রাজপথ' বেরিয়েছিল বহরমপুরের 'অবসর' পত্রিকায় ১৯৫৬ সালে।

'গল্পসরণি' পত্রিকার সম্পাদক অমর দে—আমার অমরদার বারংবার তাগাদায় আমার প্রিয় গল্পকার অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে কী লিখব যখন ভাবছি, আমার চোখ পড়ল বইয়ের র‍্যাকে সাজানো তাঁর 'পঞ্চাশটি গল্প' সংকলনটির ওপর। যে বই সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছে। আবার পড়তে শুরু করলাম সেটি। আশ্চর্য সব গল্প! এই বইয়ের ভূমিকার বিমল কর বলেছেন, "... জীবন হল অনেকটা সাদা ব্লটিং পেপারের মতন। তার ধর্মই হল কালির দাগ শুষে নেওয়া। আমাদের ছোট বড় নানান অভিজ্ঞতাকে জীবন যে কোথায় কতটুকু শুষে নেয়, বা কী ছাঁদে তার অস্পষ্ট ছাপ থেকে যায়—বলা মুশকিল। তবে এ কথা সত্যি মানুষের মনের গঠন, তার সচেতনতা, মানসিক ঝোঁক, স্বভাব—এই অভিজ্ঞতার কম-বেশি প্রভাব ও চাপে গড়ে ওঠে। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প পড়লে অনুভব করা যায়—তিনি না পলাতক, না উদাসীন। তাঁর চরিত্রগত গুণটিই হল মমতা, সমবেদনা, উদ্বিগ্নতা নিয়ে এই সমাজ ও সংসারকে দেখা। মানবিক বোধই যে অতীনের লেখার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ—তা অস্বীকার করা যায় না। অন্তত আমার ধারণায়।"

শুধু বিমল করের ধারণা নয়, আমার নিজের ধারণায় আমিও ওই একই কথা বলছি। ধরা যাক তাঁর 'কাফের' গল্পটির কথা। আসুন এই গল্পটি নিজের মতো করে আমরা আরেকবার পড়ে দেখি অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুণগুলো এই গল্পটির মধ্যে খুঁজে পাই কিনা।

... নিশুতি রাত। চারপাশে গ্রামগুলো দাউ দাউ করে জ্বলছে। বাবুদের ঘোড়ার চিৎকারে পরাণ বুঝতে পারছে চারপাশে যে হত্যাকাণ্ড তা থেকে কেউ বাদ যাচ্ছে না। বউ কিরণী নিখোঁজ, তাকে খুঁজতে বেরিয়ে নিজেই ঘেরা খেয়ে সে লুকিয়ে পড়েছে মোত্রা ঘাসের জঙ্গলে। প্রাণ বাঁচতে চাইছে। ফিসফিস করে বউ কিরণীকে ডাকছে। কোনও উত্তর পাচ্ছে না। ওই অবস্থায় তার মনে পড়ছে বন্ধু হাসিমকে। হাসিমের বউ জাবিদাকেও ভুলে থাকছে না। হাজারও দুঃখ-কষ্টে যারা তাকে বার বার রক্ষা করেছে। আততায়ীরা যখন তাকে হত্যার জন্য ঘিরে ফেলেছে তখন ওদের কথা মনে করে সে নদীর জলে ভেসে পড়ছে। তারপর সাঁতার দিয়ে ডুবে ডুবে গিয়ে উঠছে বন্ধু হাসিমের বাড়িতে। বন্ধুকে বলছে: 'একটা তফন দ্যাও

আমারে হাসিম। আমি মুসলমানের মতো এক টুপি পইরা চইলা যামু।'

'কে কথা কয়?'

'আমি পরাইন্যা। আমারে বাঁচা তুই। যদি মারতে ইচ্ছা করে তবে ম্যাইরা ফ্যাল। আমি আর পারি না।'

পরাণ যাকে একথা বলেছে, সেই হাসিম-জাবিদার মতো মানুষেরাও তখন ওই ভয়ঙ্কর দাঙ্গায় কেমন একঘরে হয়ে আছে। কাউকে রক্ষার জন্য, মানুষ, প্রাণ, পাখি রক্ষার জন্য দলে দলে বের হয়ে যেতে পারছে না। এই বীভৎস ছবির ভেতর ওরা দরজা বন্ধ করে বসে আছে। ওদের চোখ জ্বলছে। কপাল ঘামছে। নৃশংস অত্যাচার কিংবা আর্তনাদ ওদের পাগল করে দিচ্ছে।

পরাণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে পড়ছে। ঘরে একটা লম্প জ্বলছে। আর তীব্র শীত তাড়ানোর জন্য আগুন। ওরা ফিসফিস করে কথা বলছে। যদিও মনে ভয়, যদি কেউ তাদের কথা শুনে ফেলে! সর্বত্র চর ঘুরে বেড়াচ্ছে! বাইরে অন্ধকার মাঠে কেউ চোঙা মুখে চিৎকার করে হত্যাকাণ্ডের বিবরণ দিচ্ছে! এতসব কিছুর ভেতর পরাণ আতঙ্কে ভুলভাল শুনছে। কিরণী যেন কোথাও ঝোপের ভেতরে বসে ওকে ডাকছে! এমন বর্ণনা পড়তে পড়তে আমি নিজেই কখন পরাণ হয়ে যাই, বুঝতে পারি না। আর আমি-পরাণ তীব্র শীতে কাঁপতে কাঁপতে সামনে বন্ধুর বউ জাবিদাকে বসে থাকতে দেখি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, 'কী কইতাছ বইন?' জাবিদা আমাকে সাহস জোগায়। বলে, 'আপনে আগুন পোহান। আমি আইতাছি।' বলে জাবিদা বেরিয়ে যায়। বাড়ি বাড়ি খোঁজখবর নেয়। আর জানতে পারে ইসমতালির পেটে সুপারির শলা ঢুকে গেছে। ওদের স্কুল বাড়িতে কিছু লোককে আশ্রয় দিয়েছিল ইসমতালি। তাঁদের বাঁচাতে গিয়ে ইসমতালি মাঠের ভেতর চিৎ হয়ে শুয়ে আশমানের তারা নক্ষত্র গুনছে। আর স্কুলে আগুন জ্বলছে।

আমি-পরাণ, আমি এতক্ষণে ঘটনাটা ধরতে পারি। ইসমতালি ওদের স্কুলে আশ্রয় দিয়েছিল, তারা সব পুড়ে মরেছে।

আমার ভয় হয়, তাহলে আমিও বুঝি ইসমতালির মতো হাসিমের বিপদ ডেকে আনছি! তাই হয়ত জাবিদাকে বলে উঠি, 'বইন আমি যাই। মাঠে নাইমা যাই।' কিন্তু হাসিম আমাকে যেতে দেয় না। দরজা আগলে দাঁড়ায়। বলে, 'যাইবা কই? মাঠে? আমি তো এখনও মরি নাই।'

এরপর হাসিম ও জাবিদা কীভাবে আমাকে বাঁচাবে তার প্রস্তুতি শুরু করে। তখন, টুপি তো বটেই আমার জন্য একটা পাতিল, যে পাতিলে মাথা ঢেকে আমি নদীর জলে ভেসে যাব। আর হাসিম তার কাঁধে নেবে বাঁশের লাঠি। যাতে বাঁধা

থাকবে চিড়া-গুড়। আমার খিদে পেলে মাঠের কোনও ঝোপে অথবা বন-বাদাড়ে আমাকে খেতে দেবে। তারপর নদীর জলে পাতিলের নীচে আমি। আর নদীর পাড়ের রাস্তায় হাসিম। পাতিলের নীচে নদীর জলে মাছের মতো সাঁতার কেটে আমাকে শহরে উঠতে হবে। আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে হাসিম।

বাবুদের ঘোড়াগুলোর চিৎকার আর শোনা যায় না। খালি মাঝে মাঝে ভীষণ ইতর ধ্বনি ভেসে আসে। নিরীহ নারী-পুরুষ আগুনে জ্বলছে। তার পোড়া স্যাঁতস্যাঁতে চামসে গন্ধ মাঠে ভেসে বেড়ায়। মাঠের ওপর শুধু অন্ধকার গম্বুজে সাদা পায়রা ওড়ে। জাবিদা লন্ঠন হাতে উঠোনের নীচে নেমে আসে। আমি-পরাণ সবার পেছনে। 'খুদা ভরসা' বলে হাসিম আমাকে নিয়ে জাবিদার চোখের সামনে থেকে যত অদৃশ্য হতে থাকে, আমি দেখি জাবিদার চিন্তা ততই বাড়ে। আহা কত ঘাস, কত পাখি, সবুজ গন্ধভরা মাঠ—সব পেছনে ফেলে চলে যাচ্ছে বন্ধু পরাণ! ওর কিরণী কোথায়? ওর সংসারের কী অবস্থা? মাটির চেয়ে প্রিয় কী আছে চাষি মানুষের? জাবিদার চোখের সামনে ভেসে উঠছে সব। সুখের দিন, দুঃখের দিন। তারপর যেদিন মোত্রা ঘাসের জঙ্গলে ছাগল নিতে এসে অজ্ঞান গিয়েছিল সে, দশ মাসের পোয়াতি ছিল, তাকে কোলে করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে হাসিমকে গালমন্দ করেছিল। সেই সব স্মৃতি ফেলে রেখে পরাণ চলে যাচ্ছে। আর ফিরবে না কোনওদিন। জাবিদার চোখে জল এসে যায়।

আমি জাবিদার চোখের সেই জল দেখতে দেখতে কখনও আগুনের ভেতর, কখনও নির্জন মাঠের অন্ধকার অতিক্রম করে ছুটে চলেছি হাসিমের সঙ্গে আমার পরাণকে বাঁচাতে। আমাদের মুখ ঢেকে রেখেছে অন্ধকার। আমার পরনে তফন, মাথায় টুপি। হাসিমের লাঠিতে ঝুলছে চিড়া-গুড়। আমি যখন চলতে পারব না, নদীর জলে তীব্র শীতের মধ্যে ঠান্ডা হয়ে যাব, আমাকে পাতিলের নীচে অথবা ডুব সাঁতার দিয়ে অনেকটা দূর এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে ওই চিড়া-গুড়। বন্ধুর বউ জাবিদা বইন যা পুঁটুলিতে বেঁধে দিয়েছে।

তবু আমি কাঁদছি। পাগলের মতো মাথা চাপড়ে কাঁদছি। বিকার বকছি, 'আমার বাইচা কী হইব হাসিম?' হাসিম কিন্তু আমাকে আশার কথা শোনাচ্ছে, কিরণী হয়ত তোর জন্যে গঞ্জে অপেক্ষা করছে!

এমন মিথ্যা আশ্বাসে আমি হাসিমের সঙ্গে সাঁকো পর্যন্ত আসি। এবার সাঁকো পেরোতে হবে। কিন্তু মসজিদের অন্ধকারে ক'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমি দেখতে পাই না, হাসিম দেখতে পায়। ওরা কারা হাসিম তা বুঝতে পারে না। অগত্যা সে মসজিদের দিকে না গিয়ে মাঠের দিকে নেমে যায়। তামাকের খেতে

হামাগুড়ি দিতে থাকে। কুয়াশার জলে তার শরীর ভিজে যায়। আমার কোনও খেয়াল নেই। অথচ হাসিম নতুন করে আমার নাম, আমার বাপের নাম ভাবে। কিংবা ভাবে, আমাকে বোবা নাচার মানুষ সাজিয়ে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। কিংবা, বাছুর সাজিয়ে গঞ্জের হাটে বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছি বলে বিপদের স্থানগুলো পার করে দেবে।

হাসিম আমাকে নিয়ে মাঠ, জমিন, শ্যাওড়া গাছের বন অতিক্রম করে হিজলের মাঠে এসে নামে। সোজা পথে নয়, বাঁকা পথে। ঘুরে ঘুরে। যেখানে খুন জখম কম হচ্ছে সেই পথ ধরে। কিছু মানুষের চিৎকার শোনা যায়। যারা রাতভর খুন জখমে লিপ্ত ছিল, তারা গ্রামে ফিরছে বোধহয়। ভয় পেয়ে হাসিম আমাকে নিয়ে ঝোপের ভেতর লুকিয়ে পড়ে। তারপর মানুষগুলো গ্রামে এসে ঢুকে পড়লে হাসিম আমাকে সঙ্গে করে বড় মাঠ ধরে ছুটতে শুরু করে। যদিও আমার কোনও হুঁশ নই। কিছু করার নেই। যা করার হাসিম করছে, আমার যাবতীয় দায়িত্ব এখন হাসিমের। বিশেষ করে আমাকে নিরাপদে গঞ্জে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব। তাই সে বিড়বিড় বকছে।

ওভাবেই গঞ্জ যখন আর তিন ক্রোশ দূরে, সামনে শুধু নদীর জল, দিনের আলো ফুটে উঠছে, হাসিম আমাকে জামবাটিতে চিড়া-গুড় খেতে দেয়। কারণ এরপর আমাকে পাতিল মাথায় নদীর জলে নামতে হবে। পাতিল হয়ে ভেসে যেতে হবে গঞ্জের উদ্দেশে। এছাড়া আমার আর কোনও উপায় নেই।

আমি পাতিল হয়ে ভেসে যাচ্ছি নদীর জলে। আর নদীর পাড় ধরে হেঁটে যাচ্ছে হাসিম। তার বিশ্বাস মতে সে যেন মক্কা-মদিনার পথে হাঁটছে। যেখানে মানুষে মানুষে কোনও বিভেদ নেই। হাসিমের ছায়াটা লম্বা হয়ে নদীর জলে পড়ছে। আর তার হাতে ধরা লাঠি থেকে ঘোড়ার খুরের মতো ঠক্ ঠক্ শব্দ উঠছে—এক দুই, নাকি ভয়! ভয়! যদিও ওই শব্দ শুনে আমার মনে হয় জলের নীচে নিশ্চয় কোনও পাতালপুরী আছে। যেখানে রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে ঠক্ ঠক্ করে ছুটে বেড়াচ্ছে। আমার কোনও ভয় করছে না। আমি কিরণীর স্বপ্ন দেখছি। ছোট মুখ কিরণী, বড় চোখ কিরণী, ছাগল-গোরু-পায়রা কিরণীর সব পুড়ে গেছে।

নদীর দু'পারে গ্রাম মাঠ ফসল। ঝোপে জঙ্গলে টুনি ফুলের লতা। সামনে মাঝের চরের শ্মশান। আমি আবার শুনছি এক দুই—ঠক্ ঠক্ শব্দ। আমি পাতিলে মাথা ঢেকে ঝিনুক খুঁজি, ঝিনুক নয়—কিরণীকে খুঁজি..., মুখে বলি, 'কিরণী, তুই কোনখানে আছস ক। আমি পরাণ তরে ফালাইয়া কই যামু?'

হাসিম পাড় থেকে চিৎকার করে আমাকে সাহস জোগাচ্ছে, 'আর বেশি দেরি নাই পরাইন্যা। ধামগড়ের কলের চিমনি দ্যাখা যাইতেছে। ওখানে তর কিরণীরে পাইবি।'

হাসিম আমাকে সাহস জোগালেও সে আবার মুশকিলে পড়ছে। নদীপাড়ের রাস্তায় ফাটল। ওকে খুব সাবধানে ফাটল পার হতে হচ্ছে। একটু ঘুরে অন্য পথ আছে। কিন্তু সেই পথে গেলে আমাকে নজরে রাখতে পারবে না। তার লাঠির শব্দ আমি শুনতে পাব না। তাই সে নদীপাড়ের পথ ছাড়ছে না।

নদীর খাড়া পাড়, নীচে সামান্য বালুমাটি। যখন ভয় নেই, যখন কোনও মানুষের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না তখন আমার আর কী করণীয়। আমি বিশ্রামের জন্য ঘাসের ভেতর বসে থেকে ওপারের মাঠে বসন্তের ফসল দেখি। যব গমের গাছ, পাশে বড় গ্রাম নাঙ্গলবন্দ। কামার কুমোর একঘরও নেই। তবে দেবদেবীর মন্দির আছে। মাটির মূর্তি, ভৈরব ঠাকুরের পূজা হয়, পাঁঠা বলি হয়, যদিও এখন আর কিছুই নেই। দেবদেবীর মূর্তি খড়ের গাদার মতো পড়ে আছে। গরীব চাষি মানুষেরা এসেছিল দেবীর গায়ে সোনার অলঙ্কার থাকলে তুলে নিতে। তখনই হঠাৎ হাসিমের লাঠির ঠক্ ঠক্ শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে আমারও ব্যাঙের মতো লাফ, আমি ব্যাঙের মতো জলের ভিতর ডুবে যাই।

আমার বিপদ কাটে। কিন্তু হাসিম? সে দেখে দুজন যুবককে। কলা গাছে সুপারির শলা বল্লমের মতো গেঁথে রেখেছে। ওরা বর্শার মতো দূরে সুপারির শলা নিক্ষেপ করছে। তখন ওদেরও চোখ পড়ে নদীর খাড়া পাড় ধরে এক মানুষকে পথ ফেলে বিপথে হেঁটে যেতে। ওরা জিজ্ঞাসা করে, 'যায় কোন মাইন্‌সে! কোনখানে যায়!' বলেই ওরা হাসিমকে ধরার জন্য যব খেতের ভিতর দিয়েই ছুটতে শুরু করে। হাসিম কী করবে ভেবে পায় না। পরাণের অর্থাৎ আমার পরিবর্তে বোবা হাসিম নিজেই বোবা হয়ে যায়। নাকি আমিই হাসিম হয়ে যাই! হ্যাঁ, আমিই হাসিম হয়ে যাই। আমি ভয় পাই। আমার চোখ উল্টে যায়। তবু ওরা মানুষের বিচিত্র সখের বশে আমার শরীরে খোঁচা মেরে জিজ্ঞেস করে, 'মিঞা, কই যাও?'

'নারায়নগঞ্জে যাই।' চোখ উল্টেই আমি-হাসিম উত্তর করি। আমি হাবাগোবা মানুষ। বেশি কথা না বলার জন্য নিজেই বিড়বিড় করে বকতে থাকি।

'তোমার নাম মিঞা?'

'মহম্মদ হাসিমালি। সাং নয়াপাড়া, ইসমতালি সেখ আমার চাচা।'

'পথেঘাটে লোক খুন হইতাছে। তোমার বেজায় সাহস, মিঞা।'

'আমি সেখের বাচ্চা। আমারে খুন করব কোন মাইন্‌সে।' বলেই আমি হাসিমালি চোখ সোজা করে, যেন আর দাঁড়াতে নেই, সোজা হেঁটে যাওয়া দরকার মনে করে থপ থপ করে লাঠিকে ঠক্ ঠক্ শব্দ তুলে হাঁটতে শুরু করি।

কিন্তু হায়! আমার আর এক অস্তিত্ব পরাণ তখন নদীতে ভেসে যায় পাতিল

মাথায় করে। যাতে তাকে কেউ দেখতে না পায়! কিন্তু কোথা থেকে একটা কাক উড়ে এসে বসে সেই পাতিলের ওপরেই। দু'জন লোকের চোখ পড়ে। তারা বলে, 'অ মিঞা, দ্যাখছনি পানিতে এক পাতিল ভাইস্যা যায়!'

আমার শরীর অসাড় হয়ে আসে। তবু আমি যেমন হাঁটার তেমনি হাঁটি, থপ থপ। থামলেই লোকগুলো টের পেয়ে যাবে। আমি গেরস্থ মানুষ, আমি এক নাচারি ব্যারামি মানুষ, আমি আমার পরাণকে নিয়ে যাচ্ছি শহরে। নির্বিঘ্নে আমার পরাণ যাতে শহরে পৌঁছতে পারে তাই আমাকে ওদের গাজীর গান শোনাতে হয়। কিন্তু কে শোনে কার কথা। ওরা শলা হাতে পাতিলের দিকে নেমে যাচ্ছে, আমি আর পারি না, চিৎকার করে উঠি, 'অ মিঞা ভাই, পাতিল তোমার হাওয়ায় ভাইস্যা যায়।'

'হাওয়া কোনখানে দ্যাখতাছ মিঞা!'

আমি আর গাজীর গান শোনাতে পারি না, আদাব দিয়ে ওদের কাছ থেকে বিদায় নেব ভাবি। তার আগে বলে ফেলি, 'অঃ মিঞা ভাই, কন দেখি কন দেখি চন্দে সূর্যে তফাত কী? কন দেখি গম যবে তফাত কী, মাটিতে ফসল ফলে, অঃ মিঞা, কার লাগি! কোন সে মানুষ আছে তিন ভুবন ফসলের রস দেয়—অঃ মিঞা, দৌড়ান ক্যান, আল্লা বুঝি আপনেগ জ্বালায় সব হাওয়া গিল্যা ফ্যালাইছে।'

ওরা আমার কথা শোনে না, ওরা পাতিলটার পাশে গিয়ে পাতিলটাকে লক্ষ্য করে হাতের শলাটা জোর ছুঁড়ে দেয়। আর শলাটা পাতিল ফুটো করে পরাণের ব্রহ্মতালু ভেদ করে। পরাণ জল ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে। তার মুখে পিঠে রক্ত ফোয়ারা! নাকি আমার মুখে পিঠে? বুঝতে পারি না, তখন আমি হাসিম হয়ে পালানোর চেষ্টা করি। তবুও ওরা আমাকে ছাড়ে না, 'কাফের যায়।' 'ওই দ্যাখ কাফের যাইত্যাছে। দ্যাখ এক কাফের যায়, যব গম খেতের ভিতর দিয়া এক কাফের যায়। সন্ধ্যা হয় হয়, যব গম খেতের ভিতর এক কাফের ছুইটা যায়।' বলতে বলতে আমাকে তাড়া করে। আমি টের পাই, আর কিছুক্ষণ, ওদের হাতের শলা এসে ঢুকবে আমার পেটে আর আমি এক আলিসান ভুজঙ্গ হয়ে পড়ে থাকব ফাঁকা মাঠে ভেতর।

এই হলেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁর আঁকা চরিত্র, প্রকৃতি হয়ে পাঠক নিজেকে অনুধাবন করেন। অনুধাবন না করে পাঠকের উপায় থাকে না। এর জন্য কোনও কৌশল অবলম্বন করতে হয় না আমার প্রিয় গল্পকারকে। তিনি তাঁর এক আশ্চর্য তাড়না থেকে নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে লিখতে বসেন। সেই লেখা শৈল্পিক গুণে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। আমরা গর্বিত হই।

তাঁকে আমার প্রণাম!

প্রকাশকের চোখে অতীন

লিখেছেন

সবিতেন্দ্রনাথ রায় বামাচরণ মুখোপাধ্যায় বাদল বসু
সুধাংশুশেখর দে

অতীন একজন সৎ লেখক

সবিতেন্দ্রনাথ রায়

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বাস্তু হিসেবে এ-দেশে চলে আসেন। যত দূর শুনেছি ওঁর বাবা বহরমপুরে যজমানি করতেন। বাণীপুরে পি.জি.বি.টি. পড়ার সময় একটি মেয়ের সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক হয় এবং পরে বিয়ে হয়।

অতীনবাবু নাবিকের কাজ করেছেন। বহু জায়গায়, বহু দেশে ঘুরেছেন, সেখানে তাঁর বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমি ওঁর একটা অভিজ্ঞতার কথা জানি। সেটা হল—সেখানে নিউ ইয়ার্স ডে বা অন্য অনুষ্ঠানে কেক খেতে দেওয়া হয়। সবাইকে কেক খেতে দেওয়া হয়েছে। কেউ জিজ্ঞাসা করেছে—কেকের মধ্যে একটা গিনি পেয়েছ? মানে, একটা গিনি পাওয়া গেছে? সোনার গিনি। অতীনবাবু তো বলছেন—আমি চেপে গেলাম। আমি তো গিনি পেয়েছি। সবার চোখের সামনে সেটা বার করি কী করে? আমি খেয়ে ফেলেছি। (হাসি) যাই হোক, সে-সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

জাহাজে যেতে গেলে অনেক সময় ইলিউসন হয়। সে-সব কথা অতীনবাবু 'অলৌকিক জলযান' ইত্যাদি বইয়ে লিখেছেন। আর 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', 'ঈশ্বরের বাগান' ইত্যাদি বইয়ে তিনি নিজেকেই খোঁজার চেষ্টা করেছেন। সেই করতে করতে তিনি আজ এখানে এসে পৌঁছেছেন।

আগে মিত্র-ঘোষের কাউন্টারে লেখকদের আড্ডা হতো। সেই আড্ডায় বিভিন্ন লেখক আসতেন। সিনিয়র লেখকরা যেমন আসতেন, প্রফুল্ল রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি লেখকরাও আসতেন। সেই আড্ডার মাধ্যমেই অতীনবাবুর

সঙ্গে মিত্র-ঘোষের যোগাযোগ। সিনিয়র লেখকরা সবাই অতীনবাবুকে স্নেহ করতেন।

অতীনবাবু খুব সরল মানুষ। ওঁর কথার মধ্যে পূর্ববঙ্গের কথার একটা টান আছে। সেই টানেই তিনি কথা বলতেন। আর আত্মীয়-স্বজনদের উপরও ওঁর খুব টান ছিল। বাড়ির লোকেরা পছন্দ করুক বা না-করুক, আত্মীয়-স্বজনদের অর্থ দিয়ে হোক বা অন্যভাবে সাহায্য করতেন।

লেখক হিসাবে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারে সৎ, কোনও রকম ঘোরপ্যাঁচ নেই। অনেকটা বিভূতিভূষণের ধরনের। দেখো, আমি এই রকমের মানুষ, এই রকমভাবে এসেছি—তাতে তোমাদের আমাকে পছন্দ হলে নাও বা না-নাও, আমার কোনও দুঃখ থাকবে না।

আমাদের প্রকাশনা থেকে অতীনবাবুর চারটে বই প্রকাশিত হয়েছে, তারপর আর কোনও বই হয়নি। পাঠক যদি অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনে রাখেন, ওঁর 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', 'অলৌকিক জলযান'—এইসব বইয়ের জন্যই ওঁকে মনে রাখবেন।

অতীন ছাড়া আমার গতি নেই...

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

আমি গ্রামের ছেলে। অভাবের সংসার। শৈশবে মা মারা যান। পিসিমার কাছে মানুষ হয়েছি। ১৯৫৬ সালে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে চাকরির খোঁজে ১৯৫৭ সালে কলকাতায় চলে আসি। ১৯৫৯ সালে ৫০০ টাকা ধার নিয়ে পাবলিকেশন করলাম পিসিমার নামে—করুণা প্রকাশনী। তখন আমার বয়স ২০/২১ বছর। পর পর সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, মহাশ্বেতা দেবী প্রভৃতি লেখকদের বই প্রকাশ করলাম। পরে শঙ্করনাথ রায়ের 'ভারতের সাধক' বইটির ৮ম থেকে ১৩-শ খণ্ড আমি প্রকাশ করেছি। তখন বছরে ৪/৫ খানা বই বের করতাম।

প্রায় চল্লিশ বছর হল টেমার লেনে এসেছি। এর আগে কলেজ স্ট্রিটে 'পান্থ পিয়াস' নামে একটি চায়ের দোকানের ভিতর দিকে একটি ছোট্ট ঘরে বই রাখতাম। পাবলিকেশন করার প্রথম দিকে আমি বই প্রকাশ করেছি আবার বইয়ের হকারিও করতাম। কলেজ স্ট্রিটে নিয়মিত বসতে পারি না। ওই ঘরে বই রাখি আর হকারি করি। সেই সময় অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বইয়ের দোকানে ম্যানেজারি তেন। 'মিত্রালয়' থেকে অতীনের তখন একটাই বই 'সমুদ্র মানুষ' প্রকাশিত হয়েছে। এর পর 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' প্রকাশিত হয়েছিল হ্যারিসন রোডে দোতলার ওপর একটা দোকান ছিল, দোকানের নাম ভুলে গেছি, সেখান থেকে। দেড়-দু-বছরের মধ্যে বইটা আউট অফ প্রিন্ট হয়ে গিয়েছিল। আমি অতীনকে বললাম—একটা বই দিন। অতীন বললেন—একটাই বই আছে। 'দুঃস্বপ্ন' নামে বইটা দিয়ে বললেন—টাকা

দিন। আমি তখন বোধহয় অতীনকে ১০০ টাকা দিয়েছিলাম। সেটা ছাপলাম। কিছু কিছু বিক্রি হল, তারপর আর ভালো বিক্রি হল না। আমিও ওঁকে আর পয়সা দিলাম না। এরপর উনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন না, আমিও ওঁর কাছে যেতাম না।

তারপর হঠাৎ একদিন বাসে অতীনের সঙ্গে দেখা। বললাম—কী, আর বই দিলেন না?

অতীন বললেন—না, আমি আর আপনাকে বই দেবো না। আপনি আমাকে ঘোরান, পয়সা দেন না।

বললাম—না, বই দিন। এখন আর ও-রকম হবে না।

বললেন—এখন আমার বই নেই।

বললাম—আছে। বই আছে একটা। সেই বইটা পড়ে আছে। ওটা আমাকে দিন।

উনি বললেন—কি বই?

বললাম—'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'—সেই দুই খণ্ডে বের করেছিলেন, সেটা আউট অফ প্রিন্ট হয়ে পড়ে আছে বহুকাল। কেউ তো ছাপে না। ওইটাই দিন আমাকে।

বললেন—ওটা ছাপবেন? নিয়ে নিন।

তা ওটা আমি ছাপলাম। বিক্রি হচ্ছে। টাকা দিতাম। তখনকার দিন তো, পয়সা-কড়ি বেশি নয়, ৫০-১০০ টাকা হয়তো দিতাম। কোনও মাসে ২০০ টাকা দিতাম।

তারপর একদিন বললাম—এটার যে সেকেন্ড পার্ট 'অলৌকিক জলযান'—ওটা যাদের কাছে আছে তারা তো বন্ধ করে দিয়েছে। ওটা আমাকে দিন না।

অতীন বললেন—ওটা যাদের কাছে আছে তাদের কাছ থেকে তো আপনাকে কিনতে হবে। যান, ওদের সঙ্গে কথা বলে কিনে আনুন।

তো আমি সরাসরি ওদের বাড়িতে গেলাম। 'শঙ্খ প্রকাশন'। বললাম—'অলৌকিক জলযান' তো আপনি বন্ধ করে দিয়েছেন। বইটা আমাকে দিন না।

বললেন—আমার কাছে রং, ফিল্ম—এসব আছে। এর পয়সা কে দেবে?

বললাম—আমি দেবো।

বললেন—ঠিক আছে। তা'হলে লেখকের সঙ্গে কথা বলে নিন। তবে এগুলো না নিলে আমি বই ছাড়বো না।

তো আমি ফিল্ম আর কভারের ছবিটা কিনে নিলাম। সেই ছবিটা বইয়ে আজও আছে।

অতীনকে এসে বললাম—আমাকে বই দিয়ে দিয়েছে।

অতীন বললেন—দিয়ে দিয়েছে? তাহ'লে ছাপুন।

দুটো পার্ট ছিল। ছাপলাম। বই চলছে। তারপর থার্ড পার্ট 'ঈশ্বরের বাগান' পার্ট পার্ট করে বেরোলো। এর মধ্যে ওঁর ছোটগল্পের বই প্রচুর করে যাচ্ছি। পয়সা-কড়িও দিয়ে যাচ্ছি, মাসে ৫০০ টাকা। ওঁর বড় ছেলে যখন দুর্গাপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে তখন ওঁকে আমি মাসে ১০০০ টাকা করে দিতে আরম্ভ করলাম।

প্রতি বছরই ওঁর বই ছেপে যাচ্ছি। তাছাড়া যেখানে ওঁর বই যা পাচ্ছি টেনে টেনে নিয়ে আসছি। ডবল ডিমাই সাইজের ছোটো ছোটো ওঁর অনেক বই বের হচ্ছে। এরমধ্যে হঠাৎ একদিন আনন্দ পাবলিশার্সের বাদলবাবু (বাদল বসু) ওঁকে ডেকে বললেন—আপনার এত ভালো বই অথচ এই রকম কুচ্ছিৎ প্রেডাকশন! আপনি আমাদের দিয়ে দিন, আমরা ভালো ক'রে করে দেবো।

অতীন আমাকে এসে বললেন—বাদলবাবু এই রকম বলছেন। ভালো প্রোডাকশন করবে। আপনি ছেড়ে দিন। ওঁকে দিয়ে দেবো।

বললাম—সে কী কথা! তাই হয় নাকি? কী প্রোডাকশন সেটা বলতে হবে তো। তাহ'লে আমিই সে-রকম করবো।

অতীন বললেন—তাহ'লে বাদলবাবুর কাছে যান।

বাদলবাবুর কাছে গেলাম। বললাম—আপনি এ-রকম বলেছেন?

বাদলবাবু বললেন—হ্যাঁ। ভালো ক'রে করুন না। রয়্যাল সাইজ।

আমি তো তখন রয়্যাল সাইজও জানি না। বললাম—কী কাগজ কেজিতে বলুন।

তখন বাদলবাবু বললেন—১১.৮ কেজি কাগজে রয়্যাল সাইজে করুন, ঠিক হবে।

তো প্রথম আমি 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' রয়্যাল সাইজে করলাম। বইটা ১১০০ ছাপলাম, ১১ মাসের মধ্যে বিক্রি হয়ে গেল। ঠিক ১১ মাসও লাগল না। আবার ১১০০ ছাপলাম, ৮/৯ মাসের মধ্যে বিক্রি হয়ে গেল। তখন ২২০০ করে ছাপতে লাগলাম।

এরপর অতীনের অন্যান্য সব বই রয়্যাল করতে থাকলাম। 'মানুষের ঘরবাড়ি' ডিমাইয়ে ছিল, সেটা রয়্যালে করলাম। 'অলৌকিক জলযান' দুটো পার্ট ছিল, দুটো মিলিয়ে রয়্যালে একটা পার্ট করলাম। 'ঈশ্বরের বাগান' চারটে পার্ট একসঙ্গে রয়্যালে একটা পার্ট করলাম—বিশাল বই, ৪০০ টাকা দাম হল তার। প্রত্যেকটা বই বিক্রি হতে আরম্ভ করল। বাদলবাবুর কৃপাতে আমার এখন রয়্যালের অনেক বই। রয়্যালের বইগুলো ভালো বিক্রি হয়, এই এখনও। এখন 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' বছরে ১৫০০/১৬০০ বিক্রি হয়। ২২০০ করে ছাপা, এক-দেড় বছরে শেষ হয়ে যায়।

অতীনের সঙ্গে এখন আমার সম্পর্কটা এমনই যে, অতীন ছাড়া আমার গতি নেই—আর আমি ছাড়া ওঁরও গতি নেই। ওঁর প্রায় সব বই-ই আমি করেছি। ওঁর উপন্যাসসমগ্র আট খণ্ডে বেরিয়েছে, নবম খণ্ডও শীঘ্র বেরোবে। চারটে গল্পসমগ্র বের করেছি। প্রতি বছরই ওঁর বই করি।

আমার সবচেয়ে প্রিয় লেখক অতীন। ওঁর বাড়ির সমস্ত খবর আমি জানি। অতীনও সব কথা আমাকে বলেন। আমার বাড়ির সব কথাও অতীন জানেন। আমি অতীনের প্রায় সব বইয়ের প্রকাশক। অতীনের কাছে কোনও বই চাইলে আমাকে দেবেনই। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও ওঁকে টলাতে পারবেন না। আমার ছেলে (বাচ্চু) ওঁর উপন্যাস 'জনগণ' অতীনের কাছে ছাপার জন্য চেয়েছে। মাঝে আনন্দ পাবলিশার্সের বাদল বসু অতীনকে বলেছিলেন—আপনি করুণাকে তো অনেক বই দিয়েছেন, 'জনগণ'টা আমাকে দিন। আমি ছাপবো। তো অতীন বাদলবাবুকে বলেছেন—না বাদলবাবু, আমি ওটা পারবো না। বাচ্চু (বামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র) বইটা চেয়েছে, ওকে দিতে হবে।

বাদলবাবু শুনে বিস্মিতভাবে বলেছিলেন—সে কী! আপনি তো ওখানে অনেক বই দিয়েছেন, আবার ওখানে দিতে যাবেন কেন?

অতীন বলেছেন—না। চেয়েছে ওরা, আমি কী করে না বলবো?

তারপর আমাকে ডেকে অতীন বললেন—আমাকে ২০,০০০ টাকা দিতে হবে বইটার জন্য।

বললাম—সে কী?

বললেন—২০,০০০ টাকা আমাকে দিতে হবে, না দিলে আমিও বই দেবো না।

বললাম—ঠিক আছে। ২০,০০০ টাকা আপনাকে দেবো।

ওঁকে আমি ২০,০০০ টাকা দিয়েছিলাম।

ভাই বলুন, দাদা বলুন, আত্মীয় বলুন—অতীন আমার তাই। নিজের বাড়ির লোকের মতো। আমি কোনও কথা বললে উনি কখনও না করেন না। আমার সঙ্গে ছাড়া উনি কোথাও যান না। আগে তো কলকাতা বই মেলায় গেলে আমাদের স্টলেই বসতেন। এখন বয়স হয়েছে।

যে দু'জন লেখক সম্পর্কে আমার দুর্বলতা আছে তাঁদের একজন অতীন, অপর জন প্রফুল্ল রায়। অতীন সব কথা পষ্টাপষ্টি বলে দেন। হয়তো সত্যিই বলছেন, কিন্তু সব সত্য তো প্রিয় হয় না। কিন্তু ওঁর মধ্যে কোনও প্যাঁচ-পয়জার নেই। উনি একজন খুবই ভালো মানুষ এবং খুব বড়ো মাপের লেখক। একথা তো সকলেই বলেন।

অতীন একজন মাটির মানুষ

বাদল বসু

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বইয়ের প্রকাশক হিসেবে আমার পরিচয় নয়। উনি যখন কাশিমবাজার রাজবাড়িতে থাকতেন আর একটা ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন তখনই উনি সাহিত্যিক ঠিকই—সেই সময় ময়দানে বা কে.সি. দাসে বিমল করের একটি আড্ডা ছিল, সেই আড্ডাতে অতীন যেতেন, সেইখান থেকে পরিচয় শুরু হয়। অতীন আমার থেকে বয়সে বড়ো।

ওঁর মূল প্রকাশক 'আনন্দ' নয়, 'করুণা প্রকাশনী'। করুণা প্রকাশনী অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটা জায়গায় ধরে আছে—এটা মোটামুটি ভালো, খারাপ বলবো না আমি। আমরা ওঁর কাছে বই চেয়েছিলাম—উনি প্রথমে আনন্দবাজার বা আনন্দমেলা পুজো সংখ্যায় লেখেন, তারপর আমরা বই করি।

ওঁকে আমি 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' থেকে সাহিত্যিক হিসেবে চিনি। কিন্তু তখনও আলাপ হয়নি। পরবর্তীকালে তো ওই বইটা ('নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে') একটা অন্য মাত্রায় চলে গেছে।

উনি সারা জীবন স্ট্রাগল করেছেন অনেক—সে কথা আমি নতুন আর কী বলবো। সারা জীবনটা ওঁর অত্যন্ত স্ট্রাগলের মধ্যে কেটেছে। বুড়ো বয়সে ওঁর সঙ্গে আমার একটা হৃদ্যতা হয়েছিল। উনি আমার বাড়িতে আসতেন, আমি ওঁর বাড়ি যেতাম। তবে আমি অসুস্থ হওয়ার পর... উনি আসেন মাঝে মাঝে, উনি আর বামাচরণ মুখোপাধ্যায়। যোগাযোগ আছে।

ওঁর 'পঞ্চাশটা গল্প' আমি প্রকাশ করেছিলাম। মোটামুটি ওর সব বই-ই আমি

প্রকাশক থাকার সময় 'আনন্দ' থেকে ছাপা হয়েছিল মনে হয়। তারপর তো আমি রিটায়ার করলাম।

মানুষ হিসাবে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারে একজন মাটির মানুষ। ওঁর মধ্যে কোনও প্যাঁচ-পোঁচ নেই। উনি স্ট্রেট কথাবার্তা বলেন, অমিও স্ট্রেট কথাবার্তা বলি। তবে ওঁকে যুক্তি দিয়ে কোনও কথা বললে মেনে নেন। ওঁর টাকাকড়ি এ-সব ব্যাপারে খুব একটা চাহিদা নেই। আমাদের ('আনন্দ') সঙ্গে অবশ্য সে সম্পর্ক নয়। আমরা এগ্রিমেন্ট করে নিয়ে স্টেটমেন্ট করে টাকা পাঠিয়ে দিই। অনেক জায়গাতে নানা রকম কথাবার্তা শুনেছি, কিন্তু ওঁর সঙ্গে আমাদের কোনও গণ্ডগোল হয়নি। এখন ফোনে বা বামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের খবর পাই।

আমি লেখক নই। লেখকদের মূল্যায়ন করারও লোক নই। কাজেই লেখক হিসেবে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যায়ন করার যোগ্যতা আমার নেই। তবে উনি একজন ভালো লেখক বলেই আমরা ওঁর বই ছেপেছি। ওঁর সঙ্গে অনেক আড্ডা মেরেছি, ওঁর সম্পর্কে অনেক ব্যক্তিগত স্মৃতি রয়ে গেছে আমার মনে।

বাদল বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এই রচনাটি লিখিত হয়, কিন্তু বড়ো দুঃখের বিষয় যে, এই পত্রিকা প্রকাশের আগেই তিনি আমাদের মর্মাহত ক'রে লোকান্তরিত হয়েছেন। তাঁকে আমাদের শ্রদ্ধা জানাই। —সম্পাদক।

এঁরা প্রকাশনা জগতের গৌরব

সুধাংশুশেখর দে

অতীনদার সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক দিনের। আমি ১৯৭০ সালের পর প্রকাশনা জগতে এসেছি। তার আগে কিশোর বয়সেই প্রকাশনা জগতের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়। স্কুলে পড়ার সময় ছুটিতে প্রতি বছর কলকাতায় চলে আসতাম বাবার কাছে। বাবার বইয়ের ব্যবসা ছিল। তখন দে বুক স্টল ছিল, দে বুক স্টোর ছিল। অতীনদাকে আমি পেয়েছি নব্বইয়ের দশকের কাছাকাছি সময়। আমরা একের পর এক অতীনদার বই প্রকাশ করতে পেরেছি। এখনও পর্যন্ত বোধহয় ১৪/১৫ খানা অতীনদার বই হয়েছে। অতীনদা একজন জনপ্রিয় সাহিত্যিক। সেই সময়ে যে ক-জন জনপ্রিয় সাহিত্যিক ছিলেন অতীনদা তাঁদের মধ্যে একজন। আমরা অতীনদার বই ভালো বিক্রি করতাম, এখনও ভালো বিক্রি করছি। আসলে এ-ধরনের জনপ্রিয় সাহিত্যিকের সংখ্যা এখন কমে যাচ্ছে। তাঁদের আমরা একে একে হারাচ্ছি। আমরা সমরেশ বসু, সন্তোষকুমার ঘোষ, পূর্ণেন্দু পত্রীকে হারিয়েছি; সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজকে হারালাম। প্রত্যক্ষভাবে এঁদের সঙ্গে আমার প্রকাশনা জগৎ গড়ে উঠেছিল। শুধু তো বইয়ের প্রকাশক হিসেবে এঁদের সঙ্গে আমার পরিচিতি ছিল না, এঁদের সঙ্গে আমার পারিবারিক সম্পর্ক তৈরী হয়ে যায়। সেই রকম অতীনদাও। মানুষ হিসেবে সত্যি খুবই সুন্দর। যখন দেখা হয় ছোটো ভাইয়ের মতো আমাকে জড়িয়ে ধরেন, আমি আদর খাই। সেই সঙ্গে অতীনদার কী বই বেরোচ্ছে, সামনের বছর কী বই বেরোবে সে-সব কথা হয়। অতীনদা বলেন—দাঁড়া, দাঁড়া তোর জন্যে একটা বই রেডি করছি। ঠিক এ-ভাবেই

অতীনদার একটার পর একটা বই বের করে গেছি।

এই বিখ্যাত সাহিত্যিক অতীনদার এখন বয়স হয়েছে। আস্তে আস্তে চলা-ফেরা কমিয়ে দিয়েছেন। এখন খুব কম দেখা হয়। তবু পয়লা বৈশাখের দিন সময় করে কলেজ স্ট্রিটে আমাদের এখানে একবার আসতেনই। এর কোনও ব্যতিক্রম ছিল না। আমাদের পয়লা বৈশাখের একটা খাতা আছে, সেখানে যে যা পারেন লিখে দিয়ে যান। সেই খাতায় অতীনদা অনেক বছর ধরে লিখে চলেছেন। অতীনদার সঙ্গে পয়লা বৈশাখের অনেক ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠেছে।

আমি সে-বার বললাম—অতীনদা, কলেজ স্কোয়ারে বইমেলা হচ্ছে, চলুন একবার ঘুরে যাই। যদিও উনি এখন অনেক মন্থর হয়ে গেছেন, হাঁটা-চলা অনেক কমিয়ে দিয়েছেন, তা সত্ত্বেও উনি চললেন। যখন যেখানেই বইমেলা হোক না কেন, যেতে বললে উনি কখনও না বলেননি। শত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তিনি বইমেলায় হাজির হয়ে যেতেন। কলকাতা বইমেলায় তিনি আমার দাদা করুণা প্রকাশনীর বামবাবুর (বামাচরণ মুখোপাধ্যায়) স্টলে বসে পাঠকদের বইয়ে সই দিতেন। পাঠকরা তাঁকে ছেঁকে ধরতেন সই নেওয়ার জন্য।

এই জনপ্রিয় লেখক ক্রমশ মন্থর হয়ে পড়েছেন। এঁরাই আমাদের প্রকাশনা জগতের গৌরব। 'আর কী লিখবো? দেখছো না আর লিখতে ভালো লাগছে না।' —ইদানিং অতীনদা এ-সব কথাও বলতে শুরু করেছেন। তা সত্ত্বেও বলবো এঁরা যা লিখে গেছেন, বাংলাসাহিত্যকে যা দিয়ে গেছেন—বাংলাসাহিত্যে এঁরা অমর হয়ে থাকবেন। বাংলাসাহিত্যকে এঁরা পরিপুষ্ট করে গেছেন। আমি তাঁর দীর্ঘ সুস্থ জীবন কামনা করি।

আর, অতীনদাকে নিয়ে আপনাদের পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা হচ্ছে জেনে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে, সেই আনন্দ আমি চেপে রাখতে পারছি না।

অতীনের মুখোমুখি

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন

অমর দে মুকুল গুহ সোমনাথ চক্রবর্তী
কল্যাণ মৈত্র

আত্মকথা : অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সাক্ষাৎকার : অমর দে

এই রচনাটিতে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা রেকর্ড করে লিখিত রূপ দেওয়া হয়েছে। যদিও স্মৃতি এখন মাঝে মধ্যেই অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করছে, তবু এই লেখা থেকে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের একটি রূপরেখা পাওয়া সম্ভব বলেই মনে হয়, যা পরবর্তীতে গবেষকদের কাজে এলে আমাদের থেকে বেশি আনন্দিত কেউ হবেন না। এই লেখাটির জন্য দিনের পর দিন যে দীর্ঘ সময় তিনি আমাদের দিয়েছেন, কোনও কৃতজ্ঞতা প্রকাশেই সেই ঋণ শোধ হওয়ার নয়। একই প্রশ্ন হয়তো বারে বারে করা হয়েছে, কিন্তু তাঁকে সেজন্য একবারও বিরক্ত বা অধৈর্য হতে দেখিনি। বাদল বসু ঠিকই বুঝেছেন ওঁকে—অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় একজন মাটির মানুষই। প্রথম সাক্ষাতেই উনি আমাকে বলেছেন—আমি কাউকে না বলতে পারি না। দীর্ঘ দিন ধরে তাঁর কাছে যাতায়াতের সুবাদে আমি এর যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। এই নির্লোভ, নিরহঙ্কার আর আত্মাভিমানহীন মানুষটিকে যত দেখেছি, ততই আশ্চর্য হয়েছি। আরও বিস্মিত হয়েছি কিছু অনুজ লেখকের এমন মানুষের প্রতিও বিদ্বেষ ও অসূয়া লক্ষ করে। প্রশ্নোত্তরের আকারে না রেখে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনকথা আত্মকথার আকারেই এখানে প্রকাশ করা হল। —সম্পাদক।

রাইনাদি... সম্মানদি...

একদম শুরুর জীবন মানে আমার ছেলেবেলা। আমার জন্ম ঢাকা জেলার অন্তর্গত আড়াই হাজার থানার রাইনাদি গ্রামে। শুনেছি আড়াই হাজার থানা এখন সাবডিভিসনাল টাউন হয়ে গেছে। আমার জন্ম ১৯৩০ সালে। বাবা অভিমন্যু বন্দ্যোপাধ্যায় ও মা লাবণ্যপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার ঠাকুরদার নাম ছিল মহীমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি ঠাকুরদার কাছেই বড়ো হয়েছি। তখন তিনি জীবিত ছিলেন।

আমার শৈশব খুব সুন্দর ছিল। আমরা তো গ্রামে মানুষ হয়েছি। গ্রাম মানে একেবারে নির্জলা গ্রাম। আমরা ছিলাম একান্নবর্তী পরিবার। গ্রামের বাড়িতে বাবা কাকা জ্যাঠারা সব একসঙ্গে থাকতেন। আমার দুই জ্যাঠামশাই ছিলেন। বড়ো জ্যাঠামশাই উন্মাদ ছিলেন। খুব পণ্ডিত ব্যক্তি, খুব পড়াশুনো, অথচ তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। তিনি নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলতেন। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে ওঁর চরিত্রটা এঁকেছি। দু'এক সময় তিনি আমাকে ধরে নিয়ে যেতেন। বাড়ি ফিরতে হয়তো দেরী হত। বাড়ির লোকেরা চিন্তা করত। বড়োজ্যাঠামশাই কিছুই করতেন না।

বাড়িতে থাকতেন। কোনও অসুবিধাও করতেন না। সকালে বেরিয়ে যেতেন, রাত্রিবেলা ফিরতেন। কোথায় কোথায় যে ঘুরে বেড়াতেন!

আমাদের গ্রামে মাত্র দুটো ব্রাহ্মণ পরিবার ছিল। আমরা কোনও গ্রামে গেলে সেই গ্রামের সবাই তটস্থ হয়ে পড়ত।

তখন হিন্দু-মুসলিমে সম্পর্ক ছিল মধুর। সম্পর্কটা কেমন ছিল আমি আমার উপন্যাসে যথাযথভাবে রাখার চেষ্টা করেছি। ব্রাহ্মণ বলে মুসলিমরা আমাদের ঠাকুর বলতেন। আমাদের জাতের শুচিতা নিয়ে ওরাই সন্ত্রস্ত থাকতেন। হয়তো কোনও মুসলিম বাড়িতে গেছি, আমাকে বসতে একটা পিঁড়ি বা জলচৌকি দিয়েছে, ওরাই নিজেদের মধ্যে বলছে—এই পিঁড়িটা ধোয়া আছে তো? যাতে আমাদের শুচিতা কোনওভাবে নষ্ট না হয়।

কোনও মুসলিম আমাদের ছুঁলে স্নান করতে হত। অথচ আমাদের বাড়িতে যে মুসলিম কাজ করতেন, তাঁর হাত ধরে বা কাঁধে চড়ে মাঠে গেছি, মাঠ থেকে বাড়ি ফিরে এসেছি, তখন কিন্তু স্নান করতে হত না। মানে কোনও মুসলিম বাড়ির লোক হয়ে গেলে তখন স্নান করতে হত না, কিন্তু বাইরের কোনও মুসলিম এলেন, তাঁকে ছুঁয়ে ফেললাম, তখন বলা হত—যাও, স্নান করে এস। কিন্তু যে মুসলিম মানুষটি আমাদের বাড়িতে রেগুলার আসেন, তাঁকে স্পর্শ করলে স্নান করতে হত না।

আমরা তো একান্নবর্তী পরিবার ছিলাম। আমি তখন একটু বড়ো, ক্লাস নাইন কি টেনে পড়ি, তখন আমাদের ভিন্ন করে দেওয়া হল। এর মূল কারণ আমার বাবার ছেলে-মেয়ের সংখ্যা বেশি, আমরা বেশি ভাই-বোন। এজন্য বাবার প্রতি কাকা-জ্যাঠাদের একটা অবহেলা ছিল। আমার এক কাকার বিয়ের পর নতুন কাকিমা এসে বললেন—আমরা আলাদা থাকব। আমার জ্যাঠামশাই বাবাকে বললেন—তুই নিজের ব্যবস্থা নিজে কর, আর কতদিন একসঙ্গে খাবি। কাজেই আমরা ভিন্ন হয়ে গেলাম।

আমাদের বাড়িতে অনেকে থাকতেন। আমার বাবা জমিদারবাড়িতে না—ঠিক জমিদার নয়, খুব বড়ো জোত-জমির মালিক ছিলেন তা নয়, ওরা বিভিন্ন জায়গায় অর্থ লগ্নি করতেন, বাবাকে সেই লগ্নির সুদের টাকা তুলতে যেতে হত। বাবার কাজটা অনেকটা ছিল গোমস্তার কাজের মতো ছিল। খাতকদের কাছে গিয়ে গিয়ে বাবাকে টাকা আদায় করতে হত। এই কাজে বাবার কোনও ছুটি-ছাটা ছিল না।

বাবার মালিক থাকতেন আমাদের গ্রাম থেকে দশ মাইল দূরে মুড়াপাড়া নামে এক গ্রামে। মুড়াপাড়া ছিল শীতলাক্ষ্য নদীর পাড়ে এক বিখ্যাত গ্রাম। সেখানে তারকবাবু, জগদীশবাবুরা ছিলেন খুব বড়ো জমিদার। তারকবাবুর একটা হাতি

ছিল। ওই অঞ্চলে হাতিটা খুব বিখ্যাত ছিল। হাতিটা শুধু একটা হাতিই ছিল না, ওর একটা পয়মন্ত ব্যাপারও ছিল। হাতিটার খোরাকের যখন টান পড়ত, মাহুত হাতিটাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। হাতি নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে ঘুরত। হাতিটা কারও বাড়ি গেলে, তারা হাতিটাকে চাল ডাল ইত্যাদি খেতে দিত। তিন-চার মাস হাতিটাকে ঘুরিয়ে মাহুত মুড়াপাড়ায় ফিরে আসত। এইভাবে হতিটার তিন-চার মাসের খোরাক হয়ে যেত। আমাদের বাড়িতে এলে মাহুত খুব সতর্ক থাকত। কারণ আমার জ্যাঠামশাই তারকবাবুর আর এক শরিকের কাছারিতে কাজ করতেন। কাছারির ক্যাশ সামলানোর কাজ। ফলে তাঁর একটা আলাদা সম্মান ছিল। জমিদারের কাছারির অন্যান্য কর্মীরা যেমন ওঁকে সম্ভ্রমের চোখে দেখত, জমিদার গিন্নিও ওঁকে ভয় পেতেন। অন্দর মহল থেকে হয়তো জমিদার গিন্নির নোট এল দুটো শাড়ি কেনার জন্য, আমার জ্যাঠামশাই বললেন,—না, এখন হবে না। বউঠানকে বলে দিবি পয়সা হলে শাড়ি আনা হবে। ওঁর অনুমতি ছাড়া কিছু হত না। উনি খুব বিশ্বাসী লোক ছিলেন।

বিশেষ করে দুর্গাপুজোর সময় আমরা মুড়াপাড়ায় যেতাম। আমরা বলতে আমাদের চার-পাঁচ ভাই। আমরা দু'ভাই, একজন পিসতুতো দাদা আর দু'জন জ্যেঠতুতো দাদা। তখন আমরা স্কুলে পড়ি, ফলে আমরাই যেতাম। পুজোর ক'দিন জমিদারদের কাছারিবাড়িতে থাকতাম। ওখানে আমরা আত্মীয়ের মতো থাকতাম।

মুড়াপাড়াতে অনেকগুলো জমিদার ছিল। আমার মনে আছে মুড়াপাড়ায় দীনেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একজন জমিদার ছিলেন। এছাড়া আশুবাবু, গোপালবাবু, নবকুমারবাবুরাও এক একজন জমিদার ছিলেন। বাবা নবকুমারবাবুর কাছে কাজ করতেন। নবকুমারবাবুরা চার শরিক ছিলেন। দুর্গাপুজোর সময় সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিন দিন প্রতিটি জমিদারবাড়িতে আমাদের আমন্ত্রণ থাকত। পুজোর সময় মুড়াপাড়ায় গেলে জমিদারদের যে শরিকের কাছে বাবা খেতেন, আমরাও সেখানে খেতাম।

জমিদারবাড়িতে মোষ বলি হত। বিশাল বিশাল মোষ। এক কোপে কেটে ফেলত। বলি দেখে আমার আতঙ্ক হত। যখনই মোষটাকে নিয়ে হাঁড়িকাঠে ফেলত—মোষটা জিভ বের করে দিয়ে ব্যা ব্যা করছে, আমরা তো ভয়ে চোখ বুজে আছি। যখন ঘ্যাচাত্ করে শব্দ হল তখন বুঝলাম—যাহ্ হয়ে গেছে। তখন তাকালাম। দেখলাম ধড়টা এক দিকে আর মুণ্ডুটা আর-এক দিকে পড়ে আছে। যার অধিকার মুণ্ডুটা তুলে মাথায় নিয়ে মায়ের কাছে রাখবে। মুণ্ডুটার ভীষণ ওজন, তুলতে পারে না, রক্তে শরীর ভেসে যাচ্ছে—নির্মম, নিষ্ঠুর। তখন আমরা 'মা! মা!' করছি, মায়ের আশীর্বাদ চাইছি। তখন ফাইভ কি সিক্সে পড়ি।

রাইনাদির বাড়িতে বড়োজ্যাঠামশাই আর আমার এক কাকা, তাঁকে দুলুকাকা বলে ডাকতাম, থাকতেন। দুলুকাকা হচ্ছেন বাবাদের পঞ্চম ভাই। আর সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে চাকরি-বাকরি করতেন।

আমাদের শৈশব খুবই ভালো ছিল। ছেলেবেলায় আমি দুরন্ত ছিলাম না, শান্ত স্বভাবেরই ছিলাম। আমার যেটুকু পড়াশোনা সেটা মায়ের চাপে হয়েছিল। মা লেখাপড়া জানতেন, চিঠি লিখতে পারতেন। রাইনাদির পাশের গ্রাম কলাগাছিয়ায় একটা মাইনর স্কুল ছিল। সেই স্কুলে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়ান হত। আমাদের বাড়িতে সেই স্কুলের হেড মাস্টারমশাই অনিল পাকড়াশি থাকতেন। সেই কলাগাছিয়া জুনিয়র হাইস্কুলে আমি ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছি। ওই স্কুলে পড়ার সময়কার একটা স্মৃতি আমার মনে আছে। স্কুল ছুটির পর একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস ফোর এই চারটে ক্লাসের ছাত্রদের নামতা পড়তে হত। নামতাগুলো আমাদের সুর করে পড়তে হত। এতে খুব মজা ছিল, আবার আনন্দও ছিল। এই সময়ে আমার ঠাকুমা মারা যান, ঠাকুরদা অনেক আগেই মারা গেছেন।

বাড়িতে আমাদের শাসনের মধ্যে থাকতে হত, অনেক নিয়ম পালন করতে হত। তবে বাড়িতে এক দুলুকাকাকে আর স্কুলে হেডমাস্টারমশাইকে ভয় করতাম। যেই কেউ বলত—ওঁরা আসছেন, অমনি হয়ে গেল। ওঁরা থাকলে মনে হত—জেলখানা। নিয়ম মেনে চলতে হবে। ভোর পাঁচটায় উঠতে হবে। ভোর পাঁচটায় না উঠলে হেডমাস্টারমশাই ডেকে বলতেন—এই ওঠ্। চল আমার সঙ্গে। উনি আমাদের নিয়ে মাঠে যেতেন। তখন পায়খানা পেচ্ছাপ সব তো মাঠে। যে ঘরে আমরা থাকতাম, বড়ো হয়েছি, সেটা ছিল টিনের দো-চালা ঘর—গরমের সময় যে কী রকম গরম তা অনুমান করাই যায়।

তবে আমাদের বাড়িতে পায়খানা ছিল—মেয়েদের ছিল, আমাদেরও ছিল। কিন্তু মাঠটাই আমাদের ভালো লাগত। আমাদের রাইনাদির বাড়ির তিনটে ভাগ। একটা অংশকে বলা হত বার-বাড়ি। ওখানে একটা বড়ো জায়গা ছিল—সেখানে হাডুডু, ব্যাডমিন্টন সব রকম খেলাই হত। ভিতর দিকে একটা বড়ো উঠোন, আর উঠোনের চারপাশে চারটে বড়ো ঘর—টিনেরই ঘর, চৌচালা। টিনের ঘরগুলোর পর আর একটা পোরসন ছিল, সেটা হল অন্দরমহল। সেখানে আমিষ ঘর আর নিরামিষ ঘর ছিল। ঠাকুমার নিরামিষ ঘরে আর আমিষ ঘরে আমাদের রান্না হত। বড়ো মাছ-টাছ এলে আমিষ ঘরে চলে যেত। তখনকার দিনে জলের খুব দুর্ভোগ ছিল। আমাদের অঞ্চলে তখন টিউবওয়েল দেখিনি। আমাদের বাড়িতে ইঁদারা ছিল—ঠিক ইঁদারা নয়, সিমেন্টের চাক বা বেড় বসিয়ে, হয়তো কুড়িটা চাক বসানো হল, কুয়ো তৈরি করা হত—তাতেই

অগাধ জল। দু'তিন হাত খোঁড়ার পরই জল উঠে যেত। খুবই ভালো, একেবারে নির্মল জল। ওই জলে ফিটকিরি দিয়ে খাওয়া হত।

হেড মাস্টারমশাই পুজোর ছুটি বা স্কুলের বিশেষ ছুটিতে বাড়ি যেতেন, তখন আমরা ছিলাম স্বাধীন। তখন কেউ আমাদের কিছু বলতে পারত না। কাউকে গ্রাহ্য করতাম না। তখন আমরা পুকুরে নামতাম। আমাদের বিশাল পুকুর ছিল। সেখানে স্নান করতাম। আমাদের স্নান মানে একটা যুদ্ধ। জলে ডুবে দিয়ে কে কতটা যেতে পারে, কে জলের নীচ থেকে মাটি তুলতে পারে, কে শাপলা ফুল তুলে আনতে পারে।

আমাদের বাড়ির কাছাকাছি কোনও নদী ছিল না। যদিও আমার লেখায় আমি একটা নদীর কথা বলি, শীতলাক্ষ্য নদী ছিল আমাদের বাড়ি থেকে দশ মাইল দূরে। আমাদের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে দুটো নদী—মেঘনা আর শীতলাক্ষ্য। আমাদের বাড়ি আর ঢাকা শহর, নদী দুটো দু'দিক দিয়ে গেছে। একদিকে মেঘনা আর একদিকে শীতলাক্ষ্য—আমাদের গ্রামটা মাঝামাঝি পড়ে গেছে। ঢাকা শহর থেকে আমাদের গ্রামের দূরত্ব বাইশ মাইল।

আমাদের দেশ—ছ'মাস জলের তলায়, ছ'মাস ডাঙা। বন্যা নয়, বৃষ্টি হলে জল বাড়ত, নিয়মিত জল বাড়ত—আমরা বলতাম বর্ষাকাল। জায়গাটা নীচু ছিল বোধহয়—কিন্তু আমাদের বাড়ির উঠোনে কখনও জল উঠতে দেখিনি, রাস্তা-ঘাটও ডুবত না। তবে মাঠ জলমগ্ন থাকত—যে দিকে তাকানো যায় জল আর জল। মাঠে ধান বুঁয়ে দিলেই ধানগাছ মাথা চাড়া দিয়ে উঠত, বৃষ্টি হত আর গাছ বাড়ত। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে যখন শীষ আসত, মাঠে ধান গাছ ঘন হয়ে উঠত। ও দেশে চাষ ছিল ধান আর পাট। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে পাট উঠে গেলে থাকত শুধু ধান।

বাবা দেশের বাড়িতেও পৌরোহিত্য করতেন। আমাদের দেশের বাড়িতেও বাবার অনেক যজমান ছিল। আমার ন'বছর বয়সে পৈতে হয়। আমার মনে আছে—লক্ষ্মীপুজোর সময় তো ঘরে ঘরে লক্ষ্মীপুজো হয়, অথচ এত পুরোহিত নেই। আমি, আমার বড়দা আর কাকা—এই চার-পাঁচ জন মিলে আমরা পুজো করতে বেরোতাম। বাবা বলেছিলেন—কিছু মনে না থাকলে গায়ত্রী জপ করে তুমি ফুল দিয়ে দেবে—পুজো হয়ে গেল। তুমি বামুনের ছেলে, তোমার আর কিছুর দরকার নেই। আমিও হয়তো দশবার গায়ত্রী পাঠ করলাম, তারপর ফুলটুল দিয়ে দিলাম। ওরা সব লক্ষ করেন। হয়তো বললেন—কর্তা, চক্ষুদান করলেন না তো? বললাম—ও হ্যাঁ, ভুলে গেছি। দাঁড়ান। আমি আবার বসলাম, চক্ষুদান করলাম।

এমনিতে এক সময় আমাদের অবস্থা ভালোই ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময় জ্যাঠামশাই বললেন—তোমাদের সংসার বুঝে নাও। কারণ আমি আর টাকা পাঠাতে

পারছি না। তখন জমিদারদের আদায়পত্র কমে গেছে। ফলে আমাদের সংসারে একটা আর্থিক বিভ্রাট তৈরী হয়েছিল। এছাড়া বাবার খুব শ্বশুরবাড়ি প্রীতি ছিল। বাবা মুড়াপাড়াতে যেখানে কাজ করতেন সেখান থেকে আসার পথে আমার মামাবাড়ি পড়ত। উনি যা উপার্জন করতেন, শালা শালী শ্বশুরকে ভালো খাইয়ে বাড়ি ফিরতেন। ভাইরা টাকা দিত আর দুলুকাকা সংসার সামলাতেন। কাকা বলতেন—আপনি টাকা না দিলে আমি কী করে সংসার চালাব? বাবা বলতেন—আচ্ছা, আচ্ছা। দেখছি, দেখছি। আমার সোনাজ্যাঠামশাই খুব ভালো মানুষ ছিলেন। তিনি বলতেন—ঠিক আছে, আমি ব্যবস্থা করছি। চিন্তা করিস না। সে একটা অন্য জীবন। এখন সেটা রূপকথার মতো মনে হয়।

আমার ছোটোঠাকুরদা, মানে বাবার কাকা, তিনি রাইনাদিতে আমাদের সঙ্গে থাকতেন না। সম্মানদিতে আমাদের আর একটা বাড়ি ছিল, তিনি সেখানে থাকতেন। ছোটোঠাকুরদা জানতে পারলেন যে, এই আর্থিক বিভ্রাটের ফলে বাবা আমাদের পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়েছেন। আমার আর আমার দাদার। বাবা বললেন—আমি কীভাবে পড়াব? আমার তো উপার্জন নেই সে-রকম, এদিকে আয় কমে গেছে। দাদা আর টাকা-পয়সা দিতে পারছে না।

তখন আমার দাদাকে মামাবাড়ি থেকে নিয়ে গেল। আমার মামাবাড়ি মনোহরদি গ্রামে। সেখানে দাদাকে স্কুলে ভর্তি করে দিল। আমার ছোটোঠাকুরদা আমাকে আর আমার এক জ্যেঠতুতো দাদাকে (বড়োজ্যাঠামশাইয়ের ছেলে উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়) সম্মানদির বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বললেন—তোরা এখানে পড়বি। ওখানে সম্পর্কে আমার এক ঠাকুমা থাকতেন। বাবার খুড়িমা। তাঁকে আমার নিজের ঠাকুমা বলেই মনে হত, কখনও নিজের নয় বলে মনে হয়নি। তিনি আমাদের যে যত্ন করতেন তার তুলনা নেই, ঠিক নিজের ঠাকুমার মতো। সম্মানদির বাড়িতে সেই সময় ঠাকুমার সঙ্গে আমার এক কাকীমাও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে থাকতেন। কলকাতার গ্রে স্ট্রিটে আমার এক কাকা থাকতেন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। হাতিবাগানে বোমা পড়েছিল। কাকা তখন কাকীমা আর তাঁর দুই মেয়ে এক ছেলেকে দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

সম্মানদি গেলাম। সেখানে গিয়ে পানাম স্কুলে—ওটার নাম হল জি.আর. ইনস্‌টিটিউট—সেখানে ক্লাস সিক্সে ভর্তি হলাম। ওখানকার সব গ্রামগুলোর নাম 'দি' দিয়ে। যেমন—মনোহরদি, বারোদি এই রকম। বারোদির জমিদার খুব বিখ্যাত। বারোদির ঘাটও খুব বিখ্যাত। লোকনাথ ব্রহ্মচারী বারোদিতে সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করে ওখানেই থেকে যান। আমার ঠাকুমা ওঁকে দেখেছিলেন। ওঁর নামে

জায়গাটার খুব খ্যাতি ছিল। লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম। আশ্রমটা খুব সুন্দর।

গ্রীষ্মের ছুটি, পুজোর ছুটিতে আমরা রাইনাদির বাড়িতে আসতাম। রাইনাদির কাছাকাছি দুটো হাইস্কুল ছিল—একটা সোনারগাঁয়ের পানাম হাইস্কুল আর একটা বারোদিতে। আমাদের বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব ছিল তিন-চার মাইল। আমাদের গ্রামের অমূল্য সেন ছিলেন পানাম স্কুলের মেম্বার। গ্রামে তাঁর বিশাল পাকা বাড়ি ছিল। তাঁর একটা ঘোড়াও ছিল। তিনি আমাদের বললেন—তোরা পানাম স্কুলে ভর্তি হবি। দুটি স্কুলের দূরত্ব আমাদের বাড়ি থেকে একই হলেও ওঁর জন্য আমাদের পানাম স্কুলে ভর্তি হতে হল। পানাম স্কুল এখনও আছে, খুব খ্যাতি হয়েছে স্কুলটার।

পানাম স্কুলে পড়ার সময় একটা ঘটনা ঘটেছিল। জায়গাটা গ্রাম তো। চারদিকে খুব জঙ্গল। সেই জঙ্গলে নানা রকম গাছ ছিল। সেই জঙ্গলে রসুনগোটা বলে একটা গাছ ছিল। বিশাল গাছ। সেই গাছের ডগায় একবার মৌমাছি বিরাট একটা চাক বেঁধেছিল। চাকে মধু জমেছে কী না সেদিকে আমাদের নজর থাকত। এর আবার যো আছে—পূর্ণিমার যো, অমুক যো, তখন ওখানে মধু হবে। চাকটার আবার ডাক আছে, যাদের ডাক আছে তারা তো ওটা আর আমাদের দেবে না। আমাদের মধ্যে নারায়ণ সবচেয়ে ডানপিটে ছিল। তার বাবা একজন ডাক্তার—পাশ করা ডাক্তার নয়, গ্রাম-বাংলায় যেমন হয়, হাতুড়ে ডাক্তার। কিন্তু তাঁর খুব পাশার ছিল। ওঁর উপর মানুষের খুব বিশ্বাস ছিল হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে। ওঁকে দেখাতে পারলে রোগ ভালো হয়ে যাবে। আর একজন বন্ধু ছিল তার নাম রসময়।

ওখানে আমাদের একটা দল ছিল। একদিন রাতের বেলা ওরা এসে আমাকে বলল—জানিস ভুলু। আমার ডাকনাম ভুলু। বলল—চাকটা হয়ে গেছে। মধু জমেছে। মৌমাছিরা এবার খেতে আরম্ভ করবে। তার আগে না নিলে আর মধু পাওয়া যাবে না, শুধু খোলটা পাওয়া যাবে। চাকটা গাছের যে ডালে হয়েছিল সেটা আবার নীচু। গাছটার বিশাল বিশাল ডাল, কিন্তু সেই ডালটা ঝুঁকে ছিল। আমরা দু'জন গোটা গায়ে কোরোসিন তেল মেখে আর কোমরে দড়ি বেঁধে গাছে উঠে চাকটা ভাঙলাম।

দেশভাগ... রিফিউজি জীবন...

কেন আমরা এ-দেশে এলাম, কেন ও-দেশ ত্যাগ করলাম, সেটা আমি আমার লেখায় লিখেছি। মুসলিমদের প্রতি হিন্দুদের প্রচণ্ড একটা অবজ্ঞা ছিল। সেই জন্যই দেশভাগ হল। আমাদের বাড়িতে যে মুসলিম কাজের লোক ছিল সে আমাদের বাড়িতে খেলো-দেলো ঠিক আছে, আমাকে বা আমার ভাই-বোনকে বা খুড়তুতো ভাই-বোনদের কোলে তুলে বেড়াতে গেল তখন চান করতে হত না। কিন্তু একজন বাইরের মুসলিম এসে যখন আমাদের ছুঁয়ে দিত, তখন চান করতে হত। তাতে

মুসলিমদের তো আঘাত লাগবেই। তখন মুসলিমদের মধ্যে লেখাপড়া চালু হয়ে গেছে, ওদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগছে। কাজেই ওরা অপমানিত বোধ তো করবেই। হিন্দুদের যে নিয়ম-কানুন-আচরণ ছিল... আগে মুসলিমরা আমাদের বৈঠকখানায় ঢুকতেই ভয় পেত, দেশভাগের পর দেখা গেল তারা অন্দরে ঢুকে যাচ্ছে। তাদের মনোভাবটা এরকমই যে আমরা এখন স্বাধীন। আসলে শুধু আমার বাবা-জ্যাঠারাই নয়, দেশভাগ হওয়ার ফলে হিন্দু মাত্রই ভয় পেয়েছিল। তারা ভেবেছিল পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিমদের আচরণ আর আগের মতো থাকবে না।

দেশভাগের সময় আমাদের অঞ্চলে কোনও গন্ডগোল বা ঘটনা ঘটেনি। বরং মুসলিমরাই বলেছিল—কোথায় যাবেন? কোথায় উঠবেন? কী খাবেন? আমার সোনাজ্যাঠামশাই (বাবাদের দ্বিতীয় ভাই) ছিলেন আমাদের পরিবারের গার্জেন। আমরা হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবার। আমাদের বাড়িতে অষ্টধাতুর নারায়ণ মূর্তি, শালগ্রাম শিলা আর পিতলের লক্ষ্মীজনার্দন ছিলেন। আমদের বড়ো ঠাকুরঘর ছিল। আমাদের জ্যাঠা-বাবা-কাকাদের লক্ষ্য ছিল বাড়ির গৃহদেবতাদের সবাইকে হিন্দুস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া। কারণ কেউ এঁদের অশুচি করে দিতে পারে এই ভয় তাঁদের ছিল।

সম্মানদি স্কুলে ক্লাস সিক্স থেকে টেন পর্যন্ত পাঁচ বছর পড়েছি। ক্লাস টেনে ওঠার পর দেশভাগ হয়ে গেল। দেশভাগের সময় আমাদের দেশে বর্ষাকাল ছিল। দেশভাগের পনেরো দিনের মাথায় আমার বাবা, জ্যাঠা, কাকারা বড়ো বড়ো নৌকায়, নৌকাগুলোকে গয়নার নৌকা বলা হত, জিনিসপত্র তুলে সোজা নারায়ণগঞ্জে চলে যান। সেখান থেকে সম্ভবত, আমার যতদূর মনে হয়, ওঁরা গোয়ালন্দ আসেন। গোয়ালন্দ থেকে ওঁরা এ-পারে চলে আসেন।

ওঁরা দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। আমাকে আর আমার জ্যেঠতুতো দাদাকে এ দেশে রেখে গেলেন। কারণ আমরা টেস্ট পরীক্ষা দেব। আমাদের বললেন—তোরা টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে চলে আসবি। কারণ এরপর আমরা প্রবেশিকা পরীক্ষা দেব। টেস্ট পরীক্ষা দিলে সব কাগজপত্র পাওয়া যাবে, কোথায় প্রবেশিকা পরীক্ষার সেন্টার পড়বে জানা যাবে। সেইজন্য আমরা সম্মানদিতে থেকে গেলাম। আমাদের সঙ্গে থাকলেন আমার এক ঠাকুমা (বাবার খুড়িমা) আর সন্ধ্যাপিসি। সন্ধ্যাপিসি আমাদের থেকে কিছু বড়ো।

এদেশে এসে বাবারা উঠলেন বহরমপুরে আমার মেজকাকা মহেন্দ্রনাথ ভৌমিকের কাছে। আসলে, ভৌমিকটা ছিল আমাদের পাওয়া উপাধি। বাবাদের আমল থেকে সেটা বন্দ্যোপাধ্যায় হল। আমরা মূলত বন্দ্যোপাধ্যায়। যেমন—সোনাজ্যাঠামশাই হলেন উপেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক। আমার আর এক কাকা রাজমোহন

বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন রেলের বড়ো অফিসার।

মেজোকাকা থাকতেন বহরমপুরের নতুনবাজারে একটা পুরনো দোতলা বাড়িতে। উনি দর্জির কাজ করতেন। তখন কংগ্রেসের খুব আধিপত্য। আমার মেজোকাকা কংগ্রেসি ছিলেন। মেজোকাকারও ওখানে খুব আধিপত্য ছিল। সবাই মেজোকাকাকে মাস্টারদা বলে ডাকতেন। বহরমপুরে সবাই ওঁকে চিনতেন। বহরমপুরের জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তখন মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারি ছিলেন। যে-দোকানটায় মেজোকাকা কাজ করতেন সেটাও ছিল জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের দোকান। দোকানটার নাম সম্ভবত ছিল 'খাদি বাংলা'। আমাদের পরিবারও কংগ্রেসি করত। তিনি মেজোকাকার খুব কাছের মানুষ ছিলেন। বহরমপুরে আমাদের জমিজমা কেনার ব্যবস্থা উনিই করেছিলেন।

এদেশে আসার সময় আমার জ্যাঠা-বাবা-কাকাদের পুঁজি ছিল বোধহয় কুড়ি-বাইশ হাজার টাকা। সবাই মিলে ওঁরা সেই টাকাটা নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। টাকাটা তাঁরা পেয়েছিলেন, জমি নয়, বাড়ি বিক্রি করে। আমাদের দেশে ইঁটের পাকা বাড়ি ছিল খুব কম, রেয়ার। বেশির ভাগ বাড়িই ছিল মুলিবাঁশের বেড়া আর টিনের চাল। জমি-জমা সব পরে বিক্রি হয়েছিল কী না সেটা আমি জানি না। বহরমপুরে এসে বাবা-জ্যাঠা সবাই মিলে কাশিমবাজার রাজাদের কাছ থেকে পাঁচশ' টাকায় পঁচিশ বিঘা জমি কেনেন। জায়গাটার নাম ছিল মণীন্দ্রনগর। পরে নাম হয় মণীন্দ্রনগর কলোনি। এখনও তাই-ই নাম আছে। কেনা মানে দলিললপত্র কিছু নেই, জায়গাটা বাবারা দখল করে বসেছিলেন। রাজারা মাসে মাসে একটা খাজনা নিতেন। সেই খাজনার কাগজটাই আমাদের ছিল। এছাড়া আর কোনও কাগজ ছিল না। জায়গাটা ছিল জঙ্গল, একেবারে গভীর জঙ্গল। বিশাল জনহীন প্রান্তরে অনেক আমগাছ, বেলগাছ, অর্জুনগাছ। আমরা রিফিউজি তো—তাই রাজবাড়ি থেকেও কিছু বলত না। ওই জঙ্গলে লোকজন একটু হবে, রাজবাড়ির জৌলুস বাড়বে, সেইজন্য ওঁরা আমাদের জায়গা দিয়েছিলেন। ওখানে তখনও কেউ বাড়ি করেনি, আমরাই প্রথম জঙ্গল সাফ করে বাড়ি করি।

মণীন্দ্রনগর কলোনি... মানুষের ঘরবাড়ি...

টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে আমি এ-দেশে চলে আসি। একাই। আমার জ্যেঠতুতো দাদা পরে এসেছিলেন।

দেশভাগের আগে আমি ঢাকা শহর দেখা , রেলগাড়ি দেখিনি, মোটরগাড়ি দেখিনি। আমরা এমন একটা গ্রামে বাস করতাম যেখানে পাকা রাস্তা ছিল না। যা

দেখেছি, এ-দেশে আসার পর।

আমার প্রবেশিকা পরীক্ষার সিট পড়েছিল বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে। সেটা ১৯৪৮ সাল। তিন মাস পরে রেজাল্ট আউট হল। দেখলাম আমি পাশ করিনি, কম্পার্টমেন্টাল পেয়েছি। বাবা বললেন—তুমি কম্পার্টমেন্টাল পেয়েছ। তো কাকাই সব করলেন। তিন মাস পরে কলকাতায় এসে কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা দিতে হল। সিট পড়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা হলে। পাশ করার পর সুরেন্দ্রনাথ কলেজে আই.কম. ভর্তি হলাম। কিন্তু পড়া হল না। টাকাকড়ির খুব টানাটানি। বাড়িতে তখন কেউ উপার্জনশীল ছিল না। আমাদের অবস্থা তখন এমনই শোচনীয় ছিল যে এ-বেলা খেলে ও-বেলা খাওয়া জুটত না।

বহরমপুরে আসার পর বাবা আর কী করবেন—তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, বাড়ি বাড়ি পৌরোহিত্য করতেন, যজমানি করতেন। কাকারাও যজমানি করতেন। আমাদের উপর মানুষের বিশ্বাস ছিল, পৌরোহিত্য করার একটা খ্যাতি ছিল। তার থেকে যা উপার্জন হত, তাতে আমাদের কোনওরকমভাবে চলত। আমি টিউশনি করতাম। আমার নিজের দাদা বোম্বাই চলে গেলেন, বলতেন—রেলে চাকরি করেন। কিন্তু তিনি কোনও টাকা পাঠাতেন না, বরং বাবাকেই মাঝে মাঝে টাকা পাঠাতে হত। দাদা ঠিক কি কাজ করতেন আমি জানি না, দাদার বিষয়টা আমারই কাছে রহস্যময় ছিল। আমাদের দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়া ছিলেন। খুব গরীব। বাবা বললেন—নিয়ে আসি। সবাই মিলে খাব। তার সঙ্গে দাদার বিয়ে দিয়ে দিলেন বাবা। বিয়ে হওয়ার পর দাদা আর বোম্বাইতে গেলেন না, বহরমপুরেই থেকে গেলেন।

ওই সময়টা আমাদের খুব কষ্টে গেছে। মনে আছে আমরা হয়তো সারাদিন না খেয়েই আছি। পৌরোহিত্য করেই বাবার যেটুকু আয় হত। মেজোকাকার মাধ্যমেও বাবা শ্রাদ্ধ ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে ডাক পেতেন। এই কাজগুলো বাবা খুব ভালো জানতেন। যত বড়ো কাজই হোক বাবা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতেন।

বাবা মণীন্দ্রনগরে বাড়ি তৈরী করলেন। তখন সরকার থেকে রিফিউজিদের ক্যাশ ডোল দেওয়া হত। কিন্তু আমাদের পরিবার সেটা নেয়নি। বাবা, জ্যাঠা, কাকা কেউ সেই ডোল নিলেন না। ওখানে তখন জঙ্গল ছিল। নাটাগোটার জঙ্গল। ওই গাছে ছোটো ছোটো গোটা হয় বলে আমরা বলতাম নাটাগোটা। গাছগুলোয় খোঁচা খোঁচা কাঁটা উঠতে থাকত। সেই জঙ্গল দু'একজন লোক নিয়ে আমরাই সাফ করলাম। সেখানেই আমাদের বাড়ি তৈরী হল। বাড়ি মানে ইঁটের বাড়ি নয়—আট-দশ খানা বাশ পুঁতে খলপার বেড়া। সরকার থেকে তখন দু'বান্ডিল করে টিনে দেওয়া হয়েছিল।

ওগুলো দিয়ে আচ্ছাদন হয়ে গেল। টিনের চাল। গরমের দিনে ওর মধ্যে প্রচণ্ড গরম। এই কাজে কাজটা যারা জানে সে-রকম দু'একজন লোক নেওয়া হয়েছিল, সেই সঙ্গে সাধ্যমতো আমারও হাত লাগিয়েছি।

গণরাজ

সেই সময় বহরমপুর থেকে কংগ্রেসের মুখপত্র 'গণরাজ' নামে একটা কাগজ বেরোত। তখন বোধহয় আমি সবে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেছি। আমি 'গণরাজ'-এর একজন কর্মী ছিলাম। প্রেস বয়ের কাজ করতাম। ওই কাগজের সঙ্গে রেজাউল করিম, কবি যতীন্দ্র বাগচি আরও কে কে সব যুক্ত ছিলেন। গণরাজে আমার কাজ ছিল যে লেখাগুলো আসত সেগুলো প্রেসে দিয়ে আসা, হেডিং করা আর প্রুফ-টুফ দেখে দেওয়া। প্রেসের কাজটুকুই আমাকে করতে হত, ডিস্ট্রিবিউসনের কোনও দায়িত্ব আমার ছিল না। না, গণরাজে আমি কিছু লিখিনি। তখনও আমি লেখার মধ্যে আসিনি।

নিরুদ্দেশযাত্রা

আমি তিনবার বাড়ি থেকে পালিয়েছিলাম। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বার আমি নিরুদ্দিষ্ট হই। ভালো না লাগলেই আমি বাড়ি থেকে পালাতাম। দুঃস্থ অবস্থা। বাড়িতে অভাব-অনটন। ভাই-বোনেরা খেতে পাচ্ছে না। বাবার ওই কষ্ট সহ্য করতে পারতাম না। আমরা রিফিউজি পরিবার তো। তখন সরকার থেকে পার-হেড কিছু টাকা ঋণ দিত। কিন্তু বাবার একটা গোঁ ছিল, কোনও সরকারি লোন নেবেন না। বলতেন—এই টাকা নেব, ঋণ শোধ করব কী করে? আমি ঋণী হয়ে মরব না। বাবা খুব ধার্মিক মানুষ ছিলেন।

এই অবস্থায় আমি বাউণ্ডুলের মতো ঘুরে একটা চাকরির খোঁজ করতাম। একবার দিল্লি যাওয়া মনস্থ করলাম। দিল্লি গিয়ে জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে দেখা করব। নেহরু তো শিশুদের খুব ভালোবাসতেন। ওঁকে বলব—আমি গরীব বাবার ছেলে, আমাকে একটা চাকরি দাও। তখন আমার মধ্যে একটা শিশুমন ছিল। ভাবতাম ওঁর কাছে গেলেই আমার চাকরি হয়ে যাবে। বাড়ি থেকে পালালাম। অবশ্য শেষ পর্যন্ত দিল্লি যেতে সাহসে কুলোয়নি। এলাহাবাদে নেমে পড়েছিলাম।

বেরিয়েছি যখন, তখন আমার কাছে উনিশ-কুড়ি টাকা ছিল। আর আমার কাছে মায়ের একটা সোনার আংটি ছিল, সেটা আমি পরতাম। সেটা নিয়েই বেরিয়ে পড়েছি। পরনে হাফ-প্যান্ট, হাফ-শার্ট। পায়ে জুতো নেই। যাওয়ার সময় আমি উইথ-আউট টিকিটে গিয়েছিলাম, সেটা আমার মনে আছে। চেকার লেগেছে পিছনে।

সে এই কম্পার্টমেন্টে এলে আমি ওই কম্পার্টমেন্টে যাচ্ছি, আবার সেখানে এলে আমি অন্য কম্পার্টমেন্টে চলে যাচ্ছি। দেখলাম এ-ভাবে আর বেশিদূর যেতে পারব না। এলাহাবাদে নেমে পড়লাম। প্রায় দু'দিন কিছু খাইনি। আমার খুব খিদে পেয়েছিল। তখন খরচপাতি বাদ দিয়ে আমার কাছে কিছু টাকা আছে আর সেই আংটিটা আছে। ঠিক করলাম আজ ভাত খাব, আংটিটা বিক্রি করে দেওয়া যাক। সেই আংটিটার কত দাম হবে জানি না, সেটা নিয়ে এলাহাবাদের এক স্বর্ণকারের দোকানে গেলাম। সম্ভবত সে বাঙালি ছিল। জিজ্ঞাসা করল—তুমি আংটিটা বিক্রি করে দিচ্ছ কেন? বললাম—আমার কাছে খাওয়ার পয়সা নেই। যাই হোক, ওজন-টোজন করে সে আমাকে তেইশ-চব্বিশ টাকা দিয়েছিল বোধহয়, সঠিক মনে নেই। সেই টাকা নিয়ে ভাতের সন্ধানে গেলাম।

এলাহাবাদে ভাত খাওয়ার খুব প্রবলেম। ভাত তো কেউ খায় না ওখানে। খোঁজাখুঁজি করলাম কোথায় ভাত পাওয়া যায়। এক জায়গায় ভাত পাওয়া গেল—সেদ্ধ ভাত আর সম্বার দেওয়া নয়, সেদ্ধ ডাল। কোনও সব্জি ছিল না। ওই দিয়েই কোনওরকমে খেয়ে নিলাম। ভাতের দাম কত নিয়েছিল আমার ঠিক মনে নেই। খেলাম। তারপর কোথায় যাব? যাওয়ার তো কোনও জায়গা নেই। তখন জ্যৈষ্ঠ মাস। প্রচণ্ড গরম। আমার খালি পা। রাস্তা দিয়ে হাঁটা যায় না। এলাহাবাদে 'আনন্দ ভবন' আছে, সেখানে নেহরু থাকতেন। 'আনন্দ ভবন' জায়গাটা ছিল বেশ ঠাণ্ডা। সেখানে আমি জল খেতে গেলাম। সেখানে একজন কেয়ার-টেকার ছিল। সে বলল—তুমি এখানে কেন? কোত্থেকে এসেছ? আমি বললাম—আমি কিছু করব না। এখানে একটু শুয়ে থাকব। কেয়ার-টেকার আমার চোখ-মুখ দেখে হয়তো কিছু বুঝেছিল, বলল—তুমি ও-পাশে গিয়ে শুয়ে পড়।

সে এক অমানুষিক ব্যাপার, এখন বলতেও ভয় লাগে। 'আনন্দ ভবন' ঘুরেও দেখিনি। দেখার কোনও উৎসাহও ছিল না। আমার প্রয়োজন ছিল একটা আশ্রয়ের। ওখানে কেউ আমার কথা বুঝতে পারত না। আমিও হিন্দি কথা একদম বুঝতে পারি না। ওটাই ছিল আমার সমস্যা। কম্যুনিকেশনের সমস্যা। 'আনন্দ ভবন'-এ শুয়ে থাকলাম। কিন্তু তখন খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। কোথায় যাব? কী করব? সব থেকে বড়ো কথা আমি তখন ছেলেমানুষ ছিলাম। জীবনে কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। মানুষ চিনি না। মনে একটা ভীতি জন্মাল। এখানে সবাইকে অপরিচিত মনে হয়। আর অপরিচিত মনে হলে ভয় লাগা তো স্বাভাবিক। মনে হল নিজের দেশে ফিরে যাই। খাই-না খাই নিজের দেশে গেলে আমি নিজের ভাষায় কথা বলতে পারব, নিজের সুখ-দুঃখের কথা খুলে বলতে পারব। 'আনন্দ ভবন'-এ আমি এক রাত

শুয়েছিলাম।

সেই ভেবে আমি এলাহাবাদ থেকে ফিরে এলাম। কী ট্রেনে মনে নেই, একজন বলল ট্রেনটা কলকাতা যাবে। সেই ট্রেনে উঠে বসলাম। তখন আমাকে উন্মাদই বলা চলে। ফিরে তো যাচ্ছি, কিন্তু কোথায় যাব? বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি, বহরমপুরে কী করে ফিরে যাই। ওই ট্রেন বর্ধমানে এসে থামতে আমি সেখানে নেমে পড়লাম।

বর্ধমানে নেমে পড়ার কারণ আমি শুনেছিলাম বর্ধমানে প্রচুর চাল হয় আর সস্তায় পাওয়া যায়। বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গে গ্র্যানারি, শস্যভাণ্ডার। আমার মনে হয়েছিল এখানে নামলে আমি পেট ভরে ভাত খেতে পাব। পশ্চিমবঙ্গের গ্র্যানারি যখন, তখন অন্নের কোনও অভাব হবে না। সেই প্রত্যাশায় আমি বর্ধমানে নেমে পড়লাম, ভাত খাওয়ার জন্য।

কিন্তু আমার সঙ্গে আর পয়সা কড়ি কিছু ছিল না। খেয়েছি, ট্রেনের টিকিট কেটেছি, খরচাপাতি হয়েছে। যখন বর্ধমান স্টেশনে নামলাম তখন সকাল, ন'টা দশটা হবে। নেমে স্টেশন থেকে রাস্তায় এলাম। রাস্তাটা সোজা চলে গেছে। সেই রাস্তাটাই এখনও আছে। রাস্তা দিয়ে কিছুটা এগোলে প্রথমে একটা ফুটবল মাঠ, টিনের বেড়া দেওয়া। খেলা-টেলা হত। তার ডানদিকে মল্লিক ভিলা। মল্লিক ভিলার বিপরীতে একটা গুরুদোয়ারা। ঘেরা বলে ফুটবল মাঠে ঢোকা গেল না। দেখলাম গুরুদোয়ারার কল থেকে জল পড়ছে। তখন জল খাওয়াটাও একটা বিশাল ব্যাপার ছিল। আমি ওই কলে জল খেলাম। তারপর দেখলাম মল্লিক ভিলা থেকে খুব স্মার্ট একটা মেয়ে বেরিয়ে স্কুলে যাচ্ছে। মেয়েটাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল—স্কুলে যখন যাচ্ছে, এই বাড়িতে কোনও পাপ নেই। আমারও বয়স কম। মেয়েটার প্রতি আমার একটা আকর্ষণ তৈরী হয়েছিল।

দেখলাম মল্লিক ভিলার দু'পাশে একজন মানুষ শোয়ার মতো লম্বা দুটো রোয়াক আছে। বাড়িটা একজন ডাক্তারের। বেশ বড়ো বাড়ি। সামনে একটা উঠোন। উঠোনে নানা রকম ফলের গাছ। বাড়িটার পিছন দিকেও অনেক গাছ ছিল। তার পাশেই একটা গ্যারেজ। সেখানে কখনও হয়তো ওদের গাড়ি-টাড়ি থাকত। বাড়িটা এক-তলা না দো-তলা ছিল তা এখন মনে নেই। অনেকদিন পরে আবার আমি ওই জায়গাটা দেখতে গিয়েছিলাম। গুরুদোয়ারাটা আছে, কিন্তু সেই বাড়িটা আর নেই। ভেঙে বড়ো বিল্ডিং হয়ে গেছে।

উঠোনটা পার হয়ে রোয়াক সমেত বাড়িটা। একটা নর্দমাও ছিল। সারাদিন ঘোরাঘুরি। খাওয়া দাওয়া নেই। আর কোথায় যাব? কী করব? কোথায় খাব? শরীর

আর চলে না। ভাবলাম এই রোয়াকেই বসে থাকি। সকাল হোক। তারপর ওই রোয়াকেই শুয়ে পড়েছি। তখন রাত আটটা-সাড়ে আটটা হবে। অজস্র মশা—বর্ধমানের মশা—আমাকে ছেঁকে ধরেছে, কিন্তু আমি ঘুমোচ্ছি। সেনস্‌লেসের মতো।

বাড়িটার গ্যারেজের মতো অংশে একজন মুসলিম ভদ্রলোক ভাড়া থাকতেন। তখন খুব পেট্রোল ব্ল্যাক হত। ওই ভদ্রলোক পেট্রোল ব্ল্যাক করে প্রচুর টাকা করেছিলেন। তারপর সেই ভদ্রলোকের নাম আমি ভুলে গেছি, তিনি কিন্তু আমাকে মনে রেখেছিলেন। আমি খ্যাতি লাভ করার পর তিনি বলেছিলেন— ও আমার কাছে ছিল। কিন্তু আমি তারপর ওর কোনও খোঁজ খবর রাখতে পারিনি। অনেকে বলেন আমার মধ্যে একটা মুসলিম প্রীতি আছে। এর কারণ আর কিছুই নয়, মুসলিমদের কাছে আমি যে সাহায্য পেয়েছি, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

পরদিন সকালে ঘুমের মধ্যে শুনছি একজন লোক আমাকে ডাকছেন— এই, ওঠ্ ওঠ্! এখানে শুয়ে আছিস কেন? ওঠ্! আমি ধড়মড় করে উঠে বসেছি। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক দেখলাম কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছেন। আসলে আমার চেহারার মধ্যে একটা আভিজাত্য আছে। জামা-কাপড়ও ভালো, খুব খারাপ নয়।

এ নয় যে ভদ্রলোক আমাকে কোনও উপকার করার জন্য ডেকেছেন। আসলে সকালবেলা উনি রকটাতে বসেন। ওখানে উনি বসবেন। উনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমি কী কর? এখানে শুয়ে আছ কেন? বললাম—আমি চাকরির খোঁজে এসেছি। কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। তাই এখানে শুয়ে আছি।

আমি যে পোশাক পরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি পরনে সেই পোশাক—হাফ-প্যান্ট আর হাফ-শার্ট। সঙ্গে কোন বাড়তি পোশাকও নেই। বেশ ক'দিন স্নান-টানও করা হয়নি। উনি বললেন—এখানে শুয়ে আছিস, মশা তো তোকে একেবারে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। ওঠ্। তারপর বললেন— তুই ছেলেমানুষ। এখানে শুয়ে আছিস। তোর কোনও ভয় লাগল না? বললাম—না, আমার ভয় করেনি। উনি বললেন—তোর গা থেকে এত দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে যে কাছে যাওয়া যাচ্ছে না। ক'দিন চান করিসনি? বললাম—পাঁচ-সাত দিন হল চান করিনি। তখন উনি বললেন—তোকে এখানে শুতে হবে না। আয় আমার সঙ্গে।

উনি লুঙি পরে ছিলেন। যে গ্যারেজটা উনি ভাড়া নিয়ে থাকতেন সেখানে আমাকে নিয়ে গেলেন। সেখানে দুটো ঘর ছিল। একটা ঘরে উনি থাকতেন, অন্য ঘরটাতে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে রাত্রে মদ্য পান করতেন। ঘরটাতে একটা তক্তাপোশ পাতা আর জামাকাপড় রাখার ব্যবস্থা ছিল। তিনি আমাকে ওঁর একটা লুঙি দিলেন,

জামা দিলেন আর সাবান দিলেন একটা। বললেন—যা, তুই গুরুদোয়ারা থেকে স্নান করে আয়। গায়ের জামা-প্যান্ট সব সাবান দিয়ে ভালো করে কেচে মেলে দে। বলে নিজেই আমাকে স্নানের জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন। তখন তো গরমকাল। চান-টান করে ফিরে এলাম। বললেন—মনে হচ্ছে তুই অনেকদিন খাসনি। বললাম—দু'দিন কিছু খাইনি। তখন বেলা এগারোটা-টেগারোটা বাজে। বললেন—চল, খাবি।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে যে খেলার মাঠটা ছিল, তার উত্তর দিকে একটা বাজার মতো আছে। সেখানে পাইস হোটেল আছে। দশ আনা মিল। সেখানে উনি আমাকে পাঁড়ের হোটেলে নিয়ে গেলেন। পাঁড়েজি মোটা মতোন। বসে হাতপাখা নেড়ে হাওয়া খাচ্ছে। খেতে বসেছি। আমি এত খাচ্ছিলাম যে আমার খাওয়া দেখে পাঁড়েজির হাতপাখা নাড়ার বেগ বেড়ে যাচ্ছিল। যত খাচ্ছি পাঁড়েজির হাতপাখার বেগ ততই বাড়ছে। আমি যে এত খেতে পারি তা নিজেও জানতাম না। খেতে খেতে ভাবছিলাম আমার খাওয়া দেখে পাঁড়েজি বিরক্ত হচ্ছে—কালকে যদি খেতে না দেয়!

দুপুরে তো খেলাম। সন্ধ্যাবেলা উনি আমাকে মিলের দাম দশ আনা দিয়ে বললেন—তুই পাঁড়ের দোকানে খেয়ে নিবি, আমার ফিরতে দেরি হবে। তারপর আমি তো খুব আশা নিয়ে খেতে গেছি, পাঁড়ে আমাকে দেখেই খেপে গেল। বলল—তুমি এখানে এসেছ কেন? বললাম—আমি এখানে খাব। পাঁড়ে বলল—নেহি, খানা নেহি হোগা।

সেই ভদ্রলোক রাত দশটায় একটু মত্ত অবস্থায় ফিরলেন। দেখলেন আমি বসে আছি। দেখে বললেন—আরে, তুই বসে আছিস! খেয়েছিস? বললাম—না, আমি খাইনি। আমাকে খাবার দেয়নি। উনি বিস্মিত হলেন—কেন? বললাম—বলেছে দশ আনায় তোমার মিল হবে না। বললেন—তুই বললি না কেন দশ আনায় যা পাওয়া যায় তাই দিন। তখন তো আমি একেবারে ছেলেমানুষ। ছেলেমানুষ এই সেন্সে যে এর আগে আমি বাড়ি থেকে কোথাও বেরোইনি। বললাম—আমার সাহস হল না। বললেন—কত চেয়েছে? বললাম—আমি তাও জানি না। কিছু বলেনি। বলেছে দশ আনায় তোমাকে এই মিল দেওয়া যাবে না।

শুনে ভদ্রলোক খুব রুষ্ট হয়ে উঠলেন। আমার তখন কত আর বয়েস, সবে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছি। উনি বললেন—চল আমার সঙ্গে। তখন ওই অঞ্চলে হিন্দি বাংলা দুটোই চলত। পাঁড়েজি সেই ভদ্রলোককে সাহেব বলে ডাকত। তিনি আমাকে সঙ্গে করে পাঁড়ের হোটেলে নিয়ে গেলেন। বললেন—পাঁড়েজি, আপনি এই ছেলেটাকে খেতে দেননি। পাঁড়ে তখন হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে বলল—নেহি, উও ইতনা খাতা হ্যায়, ইতনা খাতা যে দু'জনের খানা একাই খেয়ে নেয়। উসকো মিল

দেনে নেহি সকতা। ভদ্রলোক বললেন—ঠিক আছে, দিন ওকে খেতে। যা লাগে খরচ ধরে দেবেন, আমি দিয়ে দেব। কী আছে? মাছের মুড়োটা ওকে দেবেন। আর দই দেবেন। তারপর আমাকে বললেন—এই, তুই পেট ভরে খাবি। গলা অব্দি খাবি। তোর মিলের চার্জ ঠিক করা হবে। পরে তুই আবার বেশি খেতে আরম্ভ করলে তখন কে দেবে? খেয়ে প্রমাণ কর যে তুই এতটা খেতে পারিস।

ওঁর কথা শুনে আনন্দ পেলাম। আমি একেবারে চর্ব্য-চোষ্য করে খেলাম। খাওয়ার সময় ভদ্রলোক পাঁড়েজিকে ওয়ার্নিং দিয়ে গেলেন—ও যখন আসবে ওকে যেন দু'বেলা ভাত দেওয়া হয়। তা না হ'লে... যাই হোক, ভদ্রলোক ভয়-টয় দেখিয়ে গেলেন। তারপর পাঁড়েজি ভালো ব্যবহার করতে লাগল। আমার ওখানেই খাওয়ার ব্যবস্থা হল। মিলের চার্জ ঠিক হল চৌদ্দ আনা। তারপর থেকে আমি ভয়ে ভয়ে একটু কম খেতাম—যদি আবার বলে দেয় আর খাওয়া হবে না, তাহ'লে যেটুকু খাচ্ছিলাম তাও যাবে। পাঁড়েজি পরে আমাকে বলেছিল—আমার দশ আনা মিলই ভালো ছিল, চৌদ্দ আনাতে পোষাচ্ছে না। তখন তো ভয়ে কম খেতাম। আর এখন ভদ্রলোক আমাকে পেটভরে খেতে বলেছেন, আর আমিও আকণ্ঠ খেয়েছি। সেই খাওয়া দেখে পাঁড়েজি বলেছে—আমার দশ আনাই ভালো ছিল, চৌদ্দ আনায় আমার ঠকা হচ্ছে।

বর্ধমানে ওই ভদ্রলোকের কাছে আমি মাস তিনেক ছিলাম। ওঁর ট্রাকের ব্যবসা ছিল। কলিয়ারি থেকে কয়লা এনে বর্ধমানের বিভিন্ন চালকলে কয়লা সাপ্লাই দিতেন। ওঁর লোক কয়লা আনতে আসানসোল পেরিয়ে বিভিন্ন কোলিয়ারিতে যেত। খালাসি হিসাবে সেই ট্রাকে আমিও যেতাম। যত দূর মনে আছে বর্ধমান থেকে রওনা দিয়ে আমরা সন্ধ্যার মধ্যে কোলিয়ারিতে গিয়ে পৌঁছতাম। ট্রাকে যেতে আমার ভালো লাগত। জ্যোৎস্না রাতে কোলিয়ারির মধ্যে দিয়ে ট্রাক নিয়ে যাচ্ছি... বেশ ভালো লাগত। আমার কাজ ছিল ট্রাকে ঠিক মতো কয়লা নেওয়া হচ্ছে কী না, কেউ কয়লা চুরি করছে কী না—এসব দেখা। ট্রাকটার একটা মাপ ছিল। মালিক সব সময় নিজে আসতে পারতেন না। আমাকে উনি বিশ্বাস করতেন। ট্রাকে কত সি.এফটি কয়লা উঠছে সেটা ওরা মেজারমেন্ট করত, সেই মেজারমেন্ট ঠিক হচ্ছে কী না আমাকে দেখতে হত। ওই কোলিয়ারিতে যে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে সেখানেই আমরা খাওয়া-দাওয়া করতাম। ভাত, মুসুরির ডাল, আলুভাজা আর একটা তরকারি। মাছ-টাছ থাকত না।

যখন বর্ধমানে থাকতাম বসে বসে লোক দেখতাম। মল্লিক ভিলার উঠোনে দুটো পেয়ারা গাছ ছিল। সেই গাছে পাকা পেয়ারা থাকলে সেটা পেড়ে খেতাম।

আমি বসে থাকতাম, মল্লিক ভিলার মেয়েরা কখন বেরোবে, কখন যাবে, আমি তাদের দেখব। এগুলোর মধ্যে আমি আনন্দ খুঁজে পেতাম।

অনেক দিন বাড়ির বাইরে আছি। মা বাবা দুশ্চিন্তা করছেন। এদিকে প্রবেশিকা পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবার সময়ও হয়ে এসেছে। আমি বাড়িতে চিঠি লিখলাম যে, আমি ভালই আছি। একটা চাকরি খুঁজছি। এখানে একটা ডাক্তারের বাড়ি আছে। যাঁর কাছে আছি ভালো আছি। বাবা আমাকে জানালেন—যত অভাব-অনটনই হোক তুমি বাড়িতে চলে এস। তোমার মা পিসিমা রাতে ঘুমোতে পারে না। ডাল-ভাত যাই হোক আমাদের চলে যাবে। তোমাকে এত কষ্ট করে ঘুরতে হবে না। আর তুমি যোগাযোগ রেখো। আমি জানালাম—না বাবা, আমি কাজ খুঁজছি। যাঁর কাছে আছি, উনি বলেছেন আমাকে একটা কাজ করে দেবেন। কোলিয়ারিতে বা অন্য কোথাও। বললেই তো আর চাকরি পাওয়া যায় না। আমি সেই আশায় আছি। উত্তরে বাবা লিখলেন—তোমাকে চাকরি খুঁজতে হবে না। তুমি চলে এস।

বহরমপুরে আমার এক প্রাণের বন্ধু ছিল—প্রশান্তকান্তি সেনগুপ্ত। ওকে আমি খুব মান্য করতাম। প্রশান্তও আমাকে বলেছিল—এভাবে ঘুরে কিছু হয় না। অভাব সব মানুষের কম-বেশি আছে।

হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, ট্রাক ক্লিনারের কাজও আমাকে করতে হত বর্ধমানে থাকার সময়। ট্রাক পরিষ্কার করার কাজ। জল দিয়ে ট্রাক ধোওয়া, চাকায় কাদা-টাদা লেগে থাকত, সে-সব পরিষ্কার করতে হত। অর্থাৎ খালাসির কাজটা আমাকে করতে হত।

একদিন ওই মুসলমান ভদ্রলোককে বললাম—দাদা আমি বাড়ি ফিরে যাব। ওঁকে আমি দাদা বলে ডাকতাম। উনি অবাক হয়ে বললেন—তুই দেশে ফিরে যাবি? এই যে বললি পরীক্ষা দিবি। তবে কি পড়া বন্ধ করে দিবি? আমি বললাম—না, আমি বাড়ি ফিরে যাব। ওখানে গিয়ে পড়াশোনা করব। আসার সময় উনি আমাকে চল্লিশ টাকা দিলেন। ওই টাকা নিয়ে আমি বাড়ি চলে এলাম। আসলে প্রবেশিকা পরীক্ষার রেজাল্ট জানার জন্যই আমি বাড়ি ফিরে আসি।

এতদিন নিরুদ্দেশ থেকে বাড়ি ফেরার পর বন্ধুরা সবাই দেখা করতে এল। ওরা বলল—এভাবে ঘুরে কী হবে? কেবল সময় নষ্ট। বাবাও বললেন—আমাদের তো চলে যাচ্ছে কোনওরকমে। মানুষের দুর্দিন দুঃসময় একনাগাড়ে থাকে না। দুঃসময়ের পর সুসময় আসে। কাজেই তোমার মনটা স্থির করতে হবে। মাথা ঠান্ডা করে বাড়িতে থাক। আবার পড়াশোনা কর।

বেথর

মণীন্দ্রনগর কলোনীর আমাদের বাড়ি থেকে বহরমপুর শহরের দূরত্ব এক ক্রোশের মতো। আমাদের বাড়ির পাশেই একটা পুলিশ ট্রেনিং ক্যাম্প ছিল। বহরমপুর থেকে রিক্সা সেই ক্যাম্প পর্যন্ত আসত। সাধারণত সেখানে নেমে পুলিশ ক্যাম্পের মাঠ পেরিয়ে আমরা হেঁটে আমাদের পাড়াতে ঢুকতাম। নেপাল আর গোপাল আমাদের দু'জন প্রতিবেশী ছিল—তারা তাঁতের কাজ জানত। পূর্ববঙ্গে, আমরা যেখানে থাকতাম, সেখানে ঘরে ঘরে তাঁতের কাজ হত। আমাদের বাড়িতে তাঁত না থাকলেও আমার দুলুকাকা, যে কাকা ছিলেন ছোটোর বড়ো, তিনি তাঁতের ব্যবসা শুরু করেছিলেন। দুটো তাঁত বসিয়েছিলেন— সেখানে বোনা-টোনা হত। দেশের বাড়িতেই আমি শখ করে তাঁতের কাজ কিছুটা শিখেছিলাম। নেপাল গোপাল ছিল বিখ্যাত তাঁতী। ওরা একদিন আমাকে বলল—যাবেন নাকি ঠাকুর আমাদের সঙ্গে? আপনি তো তাঁতের কাজ জানেন। দেশের বাড়িতে শখ করে তাঁত বুনেছেন। ক'দিন শিখিয়ে নেবো, তারপর ঠিক পারবেন। ওরা সব সময় আমাকে আপনি আপনি করে বলত। ওদের কাছেই কিছুদিন তাঁতের কাজ শিখলাম।

হাওড়ায় বেথর বলে একটা জায়গা আছে, ওদের সঙ্গে আমি সেখানে চলে এলাম। তাঁতের মালিকের দশ-বারো খানা তাঁত ছিল। দশ-বারো জন তাঁতী কাজ করত। সেই তাঁতে ব্যান্ডেজের কাপড় বুনতে হবে। তাঁতের মালিক ব্যান্ডেজের কাপড় বিভিন্ন জায়গায় সাপ্লাই দিত। প্রতিদিন আট ঘন্টায় চল্লিশ গজ ব্যান্ডেজের কাপড় বুনতে হবে। ব্যান্ডেজের কাপড়—একটু ফাঁক ফাঁক হলেও কোনও অসুবিধা নেই। তারপর অসুবিধা যেটা হল, আমার হাত স্লো, প্রতিদিন যতটা কাপড় বোনার কথা সেই কোয়ান্টিটির কাপড় আমি বুনে উঠতে পারতাম না। কিছু দিন যা পারলাম দিলাম। যারা পাকা তাঁতী তারা পারত, কিন্তু আমি পারতাম না। ওরা তখন আমাকে বলল—ঠাকুর, আপনি এক কাজ করেন। আপনি আমাদের রান্নাটাই করেন। আমি বললাম—ঠিক আছে, তাই করব। আমি সকালে ওদের চা দিতাম। তারপর ভাত। আর যা যা করার করতাম। আমি রান্না করতে পারতাম। কারণ আমার বাবাকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ পরিবারে তখন একটা নিয়ম ছিল, যখন মেয়েদের পিরিয়ড চলে তারা অশৌচ অবস্থায় থাকে, তখন তাদের রান্না করা নিষেধ। মাকেও দেখেছি অশুচি হলেই মা ছোঁয়াছুঁটি বাঁচিয়ে আমাদের থেকে একটু আলাদা থাকতেন। সেই সময় আমাকে রান্না করতে হত। জেঠিমা কাকীমারা আমাকে বলতেন—তুই-ই রান্নাটা কর। এভাবেই আমি রান্নাটা শিখেছি।

বেথরে আমি দু-তিন মাস ছিলাম। বাবা বলেছিলেন—ওখানে থাকার দরকার

নেই, তুই চলে আয়। দেখা যাক কী করা যায়। বেথরে কাজ করে আমি একশ' কুড়ি টাকা পেয়েছিলাম। বাড়ি ফিরে সেই টাকা আমি বাবাকে দিলাম। বাবা বললেন—দেখ, এবার পরীক্ষা-টরীক্ষা দিতে পারিস কী না। আমার বন্ধু প্রশান্তও বলল—তুমি এসব না করে আবার কলেজে ভর্তি হয়ে যাও।

গ্রে স্ট্রিট... বরানগর... বেলেঘাটা...

আমি অ্যাকচুয়ালি ১৯৪৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে ১৯৫০ সালে আই.কম. পাশ করি। যখন বেলেঘাটায় পিসিমার কাছে থাকতাম তখন সুরেন্দ্রনাথ কলেজে আই.কম.-এ ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু ওখানে থেকে আমি আই.কম. পাশ করিনি। আসলে অভাবের জন্য ওই সময়টা আমি পড়াশোনা করার সুযোগ পাইনি। পরে প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে আমি আই.কম. পাশ করেছিলাম।

কলকাতায় গ্রে স্ট্রিট আছে, সেখানে মনমোহন বসু স্ট্রিটে আমার কাকা দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতেন। উনি একটা মাড়োয়ারি ফার্মে চাকরি করতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন হাতিবাগানে বোমা পড়ে, তিনি কাকীমা আর ছেলে-মেয়েদের দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কাকার দুই ছেলে, এক মেয়ে। কলকাতায় এলে আমি ওখানে উঠতাম। ওঁরা খুব যত্ন করে আমাকে রাখতেন।

আমার বড়োমামা থাকতেন বরানগরে। বরানগরটা গঙ্গার ধারে, একেবারে বস্তি এলাকা। বড়োমামার কাছে আমি কিছুদিন ছিলাম। আসলে তখন প্রাণপণে একটা চাকরি খুঁজছি। আমাদের গ্রামে শশী পাল বলে একজন ভদ্রলোক থাকতেন। তিনি ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসক্যাল ইন্সটিটিউটে হেড ক্লার্ক ছিলেন। ভেবেছিলাম ওঁর কাছে গেলে হয়তো একটা চাকরি হবে। সেই আশাতেই কলকাতা এসেছিলাম। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি।

বড়োমামার কাছে বরানগরে থাকার সময় আমি আলমবাজার জুট মিলে কাজ করেছিলাম, তবে বেশি দিন নয়। তখন আলমবাজার জুট মিলে লোক নিচ্ছিল। বড়ো জুট মিল। বড়োমামা বললেন—তুই এখানে এসে থাক। আমি জুট মিলে তাঁতের কাজ করতাম। আমাদের বাড়িতে যেহেতু তাঁতের কাজ হত, তাঁতের কাজ আমি কিছুটা জানতাম। পূর্ববঙ্গে আমাদের দেশের বাড়িতে শাড়ি বোনা হত। তবে জুট মিলেরটা হল মেক্যানিক্যাল ব্যাপার। তখন আমি আই.কম. পাশ করেছি। আলমবাজার জুট মিলে আমি চট বুনতাম। সেখানে চার-পাঁচ সপ্তাহের মতো কাজ করেছিলাম। ওখানে সপ্তাহ হিসাবে মাইনে—সপ্তাহে আঠারো কুড়ি টাকার মতো।

বরানগর বস্তি এলাকা তবে সেখানে একটা প্রেসবাস হয়তো দু-তিনটে করে

পরিবার বাস করত। খুব সঙিন অবস্থা। একটাই পায়খানা—সেখানেই সকলকে লাইন দিতে হত। সেখানে বড়োমামার বন্ধুস্থানীয় একজন ভদ্রলোক থাকতেন। তিনি সকালবেলা আমার মামা মামীমার সঙ্গে আড্ডা মারতে আসতেন। তিনি আমাকে বলতেন—তুই চল আমার সঙ্গে। মামা বললেন—যা না। তুই বসে আছিস—কী হবে বসে থেকে? সেই ভদ্রলোক বললেন—ধূপবাতি বিক্রি করলেও রোজ তিন-চার টাকা হয়। তখন তিন-চার টাকা অনেক টাকা। তাই ওঁর সঙ্গে ধূপবাতি বিক্রি করতে আরম্ভ করলাম। এদিকে দক্ষিণেশ্বর থেকে ওদিকে শ্যামবাজার —এই এরিয়াটা গঙ্গার ধারে ধারে আমরা কভার করতাম। আমার বড়োমামার বাড়িটাও ছিল গঙ্গার ধারে। যেখানে বরানগর বাজারটা ছিল—এখনও আছে নিশ্চয়ই, বড়ো বাজার—সেই বাজারের পিছনের দিকটাতে ছিল আমার মামার ঘর। মামা কাশীপুর গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন। অনেক দিন আমার আশা ছিল যে, ওখানে একটা কাজ হয়ে যাবে। মামাও খোঁজ নিয়ে আসতেন কোথায় কী ভাবে কাজ পাওয়া যায়। কিন্তু আমার কাজ হয়নি। সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি ধূপবাতি বিক্রি করতাম। উনিও করতেন, আমিও করতাম। যে ভাবেই হোক কিছু উপার্জন করা। উনি আমাকে কিছু টাকা-পয়সা দিতেন।

বেলেঘাটায় আমার এক পিসিমা থাকতেন। ওখানে আমার এক কাকাও থাকতেন। কাকার পাশেই পিসিমার বাড়ি ছিল। পিসি মানে সম্পর্কে আমার পিসি, বাবার এক খুড়তুতো বোন। আমাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন ছিল আর তাদের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমি পিসির দূর সম্পর্কের ভাইপো, কিন্তু উনি আমাকে নিজের ভাইপোর মতোই মনে করতেন। একদিন আমি এমনিই পিসির বাড়িতে বেড়াতে গেছি। পিসিমা জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় থাকছিস? বললাম—বড়োমামার কাছে। পিসিমা বললেন—তোকে মামার কাছে থাকতে হবে না, তুই আমার কাছে থাক। আমি পিসিমার কাছে থেকে গেলাম।

বোম্বাই... কলকাতা... হালিশহর... 'ভদ্রা' জাহাজ...

আবার বিরক্ত হয়ে নিরুদ্দিষ্ট হলাম। কোনও একটা স্থায়ী কাজ খুঁজে পাচ্ছি না। কোথায় যাই? আমাদের এক আত্মীয় থাকতেন বোম্বাইতে। তখন তো মুম্বাই হয়নি, বোম্বাই—সবাই বলত বোম্বাই। সম্পর্কে তিনি আমার দাদু হচ্ছেন। তাঁর নাম এখন আমি ভুলে গেছি। আমি একাই বোম্বাই গিয়েছিলাম। শুনেছিলাম তিনি ওখানে বড়ো চারি করেন। ওখানে গেলে আমার একটা কিছু হবে এরকম একটা ধারণা হয়েছিল। সেই আশায় চলে গিয়েছিলাম। সেখানে দু'দিন ছিলামও, কিন্তু

তাঁকে খুঁজে পাইনি। আমার কাছে একটা ঠিকানা ছিল, সেখানে গিয়ে দেখলাম কেউ থাকে না। কোনও কারণে ঠিকানায় একটা গন্ডগোল হয়েছিল। ওই যে রেলগাড়ি যায়, তার পাশে একটা ব্রীজ আছে—কী যেন নাম ব্রীজটার, সম্ভবত তিলক ব্রীজ, সেই ব্রীজটার নীচে একরাত কাটিয়েছিলাম। তারপর দেখলাম—ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছি না, খেতে পাচ্ছি না, খুব বিপজ্জনক পরিস্থিতি। ফিরে এলাম।

না, বহরমপুরে ফিরে যাইনি। কী করবো সেখানে গিয়ে? সেই অভাব, বাবার অপারগ অবস্থা। কলকাতায় ফিরে এলাম। ফিরে ফুটপাথে থাকার একটা আস্তানা জোগার করে নিলাম। শুনলাম হালিশহরে ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্সে লোক নিচ্ছে। সেখানে ঢুকে পড়লাম। মাসে ত্রিশ টাকা মাইনে।

একটা চাকরি খুঁজতে খুঁজতে আমি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে জুটেছি। খাওয়া নেই, থাকার জায়গা নেই, আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে গিয়ে ওঠা—আমার নিজেরই লজ্জা করতো। কলকাতায় চলে আসার পর আমার ওপর দিয়ে বড়ো ঝড় গেছে। কত রকম অসম্মান... অপমান... ওই ঝড়গুলো এখন আর মনে নেই, ভুলে গেছি। খুব কষ্ট করে আমাকে বড়ো হতে হয়েছে।

জাহাজে চাকরি করার আগে হালিশহরে আমাকে আড়াই মাসের একটা ট্রেনিং নিতে হয়েছিল। একটা বেসিক ক্যাম্প ট্রেনিং, আর একটা নেভি ট্রেনিং। আমি ছিলাম বেসিক ক্যাম্পে। ট্রেনিং নিলাম। তারপর আমাকে কেউ বলল—যা, জাহাজে লোক নিচ্ছে। 'ভদ্রা' জাহাজে ট্রেনি নেবে। রাইটার্স বিল্ডিংসে গিয়ে লাইন দে।

রাইটার্স বিল্ডিংসে গিয়ে দেখলাম এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের নীচের তলায় লম্বা লাইন পড়েছে। আমি তো লাইনে দাঁড়ালাম। সবাই বলল—তুমি লাইনে দাঁড়ালে কেন? তোমার হবে না। ওরা ঠিকই বলেছিল। এ লাইন শেষ হতে হতে রাত্রি হয়ে যাবে। আমি কী করি? তিনতলা থেকে লাইন সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচের তলা পর্যন্ত এসেছে। আমি হাঁটতে থাকলাম। ক্যাজুয়ালি হাঁটছি। একটু একটু করে সিঁড়ি ভেঙে উঠছি। এই করে করে একেবারে মাথায় চলে এলাম। এদিকে যারা আগে থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে তারা তো ঢুকতে দিচ্ছে না। আর আমি চেষ্টা করছি একটু জায়গা করে লাইনে ঢুকে পড়ার। একবার ঢুকে পড়লেই লাইন হয়ে গেল।

অধিক্রম মজুমদার নামে একজন অফিসার ট্রেনিদের রিক্রুট করছিলেন। লম্বা চওড়া জাঁদরেল চেহারা। দেখেই ভয় লাগে। তিনি ছিলেন এই রিক্রুমেন্টের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। তিনি আসছেন, লাইন ঠিক হচ্ছে। আমি আর একটু এগিয়ে গেলাম। তিনি এসে সকলের হাত টিপে টিপে দেখছেন। কয়লাওয়ালা তো—জাহাজে কয়লা দিতে হবে। আমি আবার ধুতি পাঞ্জাবি পরে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে

দেখলেনই না। রাইটার্স বিল্ডিংসে একটা বিল্ডিং থেকে আরেকটা বিল্ডিঙে যাওয়ার সেতু আছে, সেই সেতু দিয়ে আমরা যাচ্ছি। যাদের তিনি সিলেক্ট করছেন, তাদের একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। আর যাদের নিচ্ছেন না তারা ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকছে। আমাকে তো উনি নেননি। আমি কয়েকজনকে অতিক্রম করে টুক করে সেই ঘরে ঢুকে পড়লাম। ঘরে যারা ছিল তারা হই হই করে উঠল—এই, এই, তোমার তো হয়নি, তুমি তো দাঁড়াওনি ওখানে। আমি বললাম—অফিসার আমাকে সিলেক্ট করেছে। তোমাদের কি কোনও কাগজ দিয়েছে? ওরা বলল—না তো! বললাম—তবে? তোমাদেরও বের করে দেবে। সবাইকে বের করে দিয়ে আবার নতুন করে রিক্রুট করবে। শুনে ওরা ভয় পেয়ে চুপচাপ থেকে গেল। আমাকে আর কিছু বলল না।

এরপর ঘরের সকলকে একটা করে চিরকুট দেওয়া হল। বলল—তোমরা এই চিরকুট নিয়ে খিদিরপুরে ট্রেনিং শিপ ভদ্রায় চলে যাও। সেখানে গিয়ে এই চিরকুটটা দেখালেই তোমাদের নিয়ে নেবে। তারপর খিদিরপুরে গেলাম। ভদ্রা জাহাজটা আমি চিনতাম। এর আগে কী একটা ট্রেনিঙে ওই জাহাজে আমি গিয়েছিলাম। চিরকুটটা দেখে ওরা আমার নাম লিখে নিল।

খিদিরপুরেও এক ঝামেলা। সেখানে নানা রকম আদব-কায়দা আছে। ফল ইন—আমরা আগেই শিখেছি। ভলান্টিয়ার্স ট্রেনিঙে ড্রিল করার নিয়ম-কানুনটা শিখেছিলাম। যে পোশাক পরে গিয়েছিলাম, সেই পেশাকেই ফল ইন-এ দাঁড়ালাম। ভদ্রা জাহজের ইঞ্জিনিয়ার চ্যাটার্জীসাহেব ছিলেন খুব কড়া ধাতের মানুষ। ভীষণ জাঁদরেল ভদ্রলোক। কথায় কথায় থাপ্পড় কষাতেন। ফল ইন করার পর বলল—তুমহারা নাম কিয়া হ্যায়? বাংলায় কোনও কথা নেই, সব হিন্দি। নাম বললাম। সঙ্গে সঙ্গে ঠাস করে একটা চড়। আমি বুঝতে পারলাম না আমাকে কেন চড় মারল। চড় মেরে চ্যাটার্জীসাহেব বললেন—তুমি আদব কায়দা জানো না যে উপরঅলাদের সঙ্গে কথা বলার সময় স্যার বলতে হয়? বললাম—ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার।

যাই হোক, তখন আমার একটাই শখ ছিল—পেট ভরে ভাত খাওয়া। অনেক দিন খাই না, কোথাও থাকি না, কিছু করি না—ভ্যাগাবন্ডের মতো ঘুরে বেড়াই। জাহাজে ঢুকলে পেট ভরে খেতে পাব—এই ছিল আমার স্বপ্ন।

তারপর ভদ্রা জাহাজে তিন মাসের ট্রেনিং হল। জাহাজেই থাকতাম। জাহাজে প্রথম কাজ হল হোলিস্টোন। মানে হল সাদা পাথর দিয়ে জাহাজের ডেক ঘষা, ডেকটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। লোহার ডেক নয়। আগের অনেক জাহাজে কাঠের ডেক ছিল। সেটা পাথর দিয়ে ঘষতে হত। এছাড়াও অনেক কাজ আছে। কী ভাবে

মাস্তুল তোলে, মাস্তুল নামায়। দড়িদড়া কিভাবে বাঁধে। দড়ির গিঁট কত রকমের হয়—এমন সব নানান ট্রেনিং।

জাহাজে দুটো ডিপার্টমেন্ট—একটা ডেক, আর একটা ইঞ্জিন। আমার ট্রেনিং ছিল ইঞ্জিনে। কয়লা নিয়ে গিয়ে কী ভাবে বয়লারে পৌঁছে দিতে হয়—এই কাজটা আমাকে শিখতে হয়েছিল। সেই গরমের মধ্যে অন্যান্য সব কাজও করতে হত। সপ্তাহে একদিন বয়লার পরিষ্কার করতে হত। বয়লার খুলে, বয়লারের মধ্যে যে গালিগুলো আছে, সেগুলো পরিষ্কার করতে হত।

ট্রেনিঙের পর আমাদের 'নলি' দেওয়া হয়েছিল। নলি মানে একটা কন্টিনিউয়াস ডিসচার্জ সার্টিফিকেট বা সি.ডি.সি.—তাকে জাহাজিরা নলি বলে। শিপিং অফিস থেকে সেটা দিল। তাতে শিপিং অফিসের মাস্টারের সই আর সিল আছে। দিয়ে বলল—ওটা নিয়ে কাল থেকে লাইনে দাঁড়াবে। এবার জাহাজ এলে ওটা দেখিয়ে তুমি কাজ পাবে। ওই কাগজটা দেখলেই ওরা বুঝবে যে তুমি কাজ জানো। জাহাজে উঠে ছ'মাস, আট মাস, দশ মাস বা এক বছর কাজ করবে—আবার নেমে আসবে। সার্টিফিকেটটা তোমার কাছে থাকল। চাকরিটা কনট্রাক্টের চাকরি, টেম্পোরারি। বন্দরে কোনও জাহাজ এল, তারা শিপিং অফিসকে জানিয়ে দিল—এতজন খালাসি বা লোক নেব, আমরা ওই দিন ওই সময় যাব, আপনারা রিক্রুট করুন। তখন ব্যাংক লাইন, কুক লাইন—এরকম অনেকগুলো জাহাজ কোম্পানি ছিল। এরপর থেকে জাহাজ ধরার জন্য লাইনে দাঁড়াতে আরম্ভ করলাম।

তখন তো পিসিমার কাছে থাকতাম। বেলেঘাটায় জোড়ামন্দির আছে। তার পাশেই একটা গলিতে বস্তির মধ্যে পিসিমার একটা ঘর ছিল। সেখানে পিসিমা আর পিসেমশাই তাঁদের দুই ছেলে মেয়েকে নিয়ে থাকতেন। সেখান থেকে রোজ সকালে উঠে হাঁটতে হাঁটতে খিদিরপুরে গিয়ে লাইন দিতাম। এভাবে রোজ হেঁটে হেঁটে খিদিরপুরে এসে লাইনে দাঁড়াই। কিন্তু কাজ পাচ্ছি না। তখন আমার কম বয়স, ভালো করে দাড়ি-গোঁফও ওঠেনি। এ বাচ্চা ছেলে, একে নিলে হয়তো ফিট-টিট হয়ে যাবে, জাহাজে ঝামেলা হয়ে যাবে—সেই জন্য ওরা আমাকে নিত না। ও-ভাবে ক'মাস গেল মনে নেই—মাসের পর মাস যাচ্ছে কিন্তু কাজ [illegible] না। সেই সময় একজন বুড়ো সারেঙ আমাকে বললেন—আমি দেখছি সব। তুই অনেকদিন কাজ পাচ্ছিস না। আমিও জাহাজ ধরব। এবার আমার জাহাজ আসবে। তোকে সেই জাহাজে তুলে নেব। জানতে চাইলাম—আপনার কোন জাহাজ আসবে? বুড়ো সারেঙ বললেন—আমি সিওল ব্যাংক জাহাজে কাজ করি। সেই জাহাজে তোকে তুলে দেব। তুই চিন্তা করিস না। অফিস থেকে খবর করেছে আমার জাহাজ

আসছে। আমাদের হচ্ছে ব্যাংক লাইন। সেই ব্যাংক লাইনের জাহাজ হচ্ছে সিওল ব্যাংক। তোকে নিয়ে আমি সেই জাহাজে যাব।

১৯৫২ সালে আমি জাহাজে চাপলাম। এ হল কার্গো শিপের কাজ। কোল বয়ের কাজ করতাম। তখন স্টিম শিপ চলত। অয়েল শিপও ছিল। আমাদের সিওল ব্যাংক ছিল স্টিম শিপ। আমাকে কোল বয় হিসাবে ফায়ারম্যানের কাছে কয়লা পৌঁছে দিতে হত। চাকা লাগানো লোহার ছোট ছোট ঠেলা গাড়ি ছিল, তাকে বলা হত মেডিসিন কার। সেই মেডিসিন কারে করে কয়লা পৌঁছে দিতাম ফায়ারম্যানের কাছে। ফায়ারম্যান বয়লারে কয়লা ঢালত। আবার খালি গাড়ি নিয়ে গিয়ে কয়লা ভরে আনতে হত। এভাবে চলত ঘন্টার পর ঘন্টা। আমাদের কার্গোতে তিনটে বাংকার ছিল—সে বিশাল ব্যাপার, না দেখলে বোঝা যায় না। জাহাজও বিশাল, বাংকারও বিশাল। জাহাজে একটা ক্রশ বাংকার আর দুটো ডেক বাংকার ছিল। ডেকের দু'দিকে দুটো বাংকার আর বয়লার রুমে অ্যাটাচ্‌ড একটা বাংকার। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, আমি যখন শিপিং অফিসে লাইন দিচ্ছিলাম, আমাকে দেখে কেউ রিক্রুট করছিল না। তখন আমি ছিমছাপ, লম্বা, হ্যান্ডসাম একটা বাচ্চা ছেলে। সকলে এসে আমার হাত টিপে দেখে ছেড়ে দিচ্ছিল। বলছিল—এ পারবে না। কাজটা সত্যিই না পারার মতো। বুড়ো সারেঙ সাহায্য না করলে আমি জাহাজে উঠতে পারতাম না।

প্রত্যেক জাহাজ কোম্পানির নিজস্ব সারেঙ আছে। সে আবার দু'জন করে লোক নিতে পারে। যাই হোক, জাহাজ এলে সেই বুড়ো সারেঙ অফিসারকে বললেন—স্যার, এ আমার আদমি। সেই বুড়ো সারেঙ তার কোটায় আমাকে জাহাজে তুলে নিল। মাসে নব্বই টাকা মাইনে আর খাওয়া-খরচ কোম্পানির।

সমুদ্রযাত্রা

আমার তৃতীয় নিরুদ্দেশযাত্রা হল সমুদ্রে। সিওল ব্যাংকে উঠে পড়লাম। জাহাজটা কী নিয়ে যাবে, কোথায় যাবে কিছুই জানি না। জাহাজ খিদিরপুর ডক ছাড়ল। জাহাজ ভর্তি করে নেওয়া হয়েছিল পাটের গাঁট আর কিছু পাখি। অর্ধেক পাখি ঝড়েই মরে গেছিল। জাহাজটা কয়লায় চলত। আমি জাহাজের কোল বয় হিসাবে কাজ শুরু করলাম। আমার কাজ ছিল চাকাঅলা গাড়ি করে কয়লা ফায়ারম্যানের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ফায়ারম্যান সেই কয়লা বয়লারে ঢালত।

সিওল ব্যাংক জলে ভাসার পর প্রথম স্টপ ছিল কলম্বো। সেখানে জাহাজের রসদ নেওয়া হল। আফ্রিকায় লরেঞ্জো মারকুইস বলে একটা জায়গা ছিল—সেটার

এখন কী নাম হয়েছে জানি না, আমরা সেখানে গেলাম। লরেঞ্জো মারকুইস থেকে গেলাম ডারবানে। সেখানে পাখিগুলোকে নামালাম। ডারবানে আমরা সেখানে নোঙর করেছিলাম সেটা ছিল অফ-শোর বন্দর—সমুদ্রের মধ্যে বন্দর, দূরে শহরটা দেখা যায়।

ডারবান থেকে গেলাম বুয়েনস্ এয়ার্স-এ। খুব সুন্দর জায়গা। সেখানে জাহাজ খালি হল। জাহাজ নিয়ে গেলাম, যত দূর মনে হয়, ইংল্যান্ডের কার্ডিফ বন্দরে। জাহাজ সেখানে নোঙর করা হল। কার্ডিফে পৌঁছে জাহাজের কাপ্তান, চিফ অফিসার, ইঞ্জিনিয়ার—ওরা সব ও-দেশের লোক, সাহেব, সবাই নেমে গেল। তাদের বদলে কাপ্তান থেকে শুরু সমস্ত অফিসারদের নতুন সেট এল। কার্ডিফ থেকে আমরা নিউজিল্যান্ডে যাব। সম্ভবত আমরা কার্ডিফ থেকে ফসফেট নিয়ে পানামা চ্যানেল ক্রশ করে পেসিফিকে গিয়ে পড়লাম। এতক্ষণ আটলান্টিকে ছিলাম। পেসিফিক ধরে আমরা সোজা চলে গেলাম নিউজিল্যান্ডে। সেখানে বোধহয় মাল খালাস হল। সেখানে কোম্পানি নতুন কন্ট্রাক্ট করল। সেটা হচ্ছে—অস্ট্রেলিয়ার ওপরের দিকটাতে নানা দ্বীপ আছে, সেখান থেকে ফসফেট এনে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি, নিউ ক্যাসেল, ফ্রি ম্যান্টেল, নিউ ইংল্যান্ড ইত্যাদি পোর্টগুলোতে সাপ্লাই দেওয়া। ওই কাজটা আমরা চার-পাঁচ মাস করেছি। এইভাবে আমরা সারা পৃথিবী ঘুরেছি। এই করতে করতে প্রায় কুড়ি-বাইশ মাস হয়ে গেল। এরপর অস্ট্রেলিয়া থেকে কোথাও না থেমে খালি জাহাজ নিয়ে আমরা কলকাতায় ফিরলাম। একবারই আমি জাহাজে গেছি, এরপর আর জাহাজে যাইনি! আর যাওয়ারও আগ্রহ হয়নি।

জাহাজে ওঠার পর আমার সী-সিকনেশ হয়েছিল—একটু বমি বমি ভাব, খেতে পারতাম না। সেটা সাত-আট দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যায়। জাহাজি জীবনে যৌনতার যথেষ্ট সুযোগ ছিল, কিন্তু আমি কোনও যৌনতায় প্রবেশ করিনি। এ বিষয়ে আমার একটা ভীতি ছিল। ওই বুড়ো সারেঙ আমার গার্জেন ছিলেন, তিনি বলতেন—দেখ, কী রোগ বাঁধাবি, তারপর সারা জীবন ভুগবি। সেই আতঙ্কটা আমার মধ্যে ছিল। জাহাজে সারা পৃথিবীটা ঘুরে এসে আমার মনে হয়েছিল—পৃথিবীটা এত বড়ো! সেখানে আমি কত সামান্য মানুষ!

বলেছি জাহাজে কয়লা দিতাম। নব্বই টাকা মাইনে। সব টাকা তখন দেবে না। একের তিন দেবে। আমার মাইনে থেকে ত্রিশ টাকা কেটে ওরা বাবার নামে পাঠিয়ে দিত। ব্যাংক লাইন কোম্পানিরগুলোর তখন এটাই নিয়ম ছিল। বাকী টাকা জাহাজ থেকে নেমে এলে তখন হিসাব করে আমাকে বুঝিয়ে দেবে। তাতে যে কী সুরহা হয়েছিল... তখনকার দিনে সতেরো-আঠারো টাকা মন চাল... আমার বাবার যে কী

দারিদ্র্য ছিল... দুঃস্বপ্নের মতো দারিদ্র্য। আমার ভাই-বোনেরা দু'বেলা আহার করতে পারছে—এটাই আমার সান্ত্বনা ছিল।

বন্ধুবান্ধবেরা

দেশভাগের পর বহরমপুরে এসে আমার অনেক বন্ধুবান্ধব হয়। তাদের কেউ কেউ এখনও জীবিত আছে। অনেকেই মারা গেছে। তাদের মধ্যে প্রশান্তকান্তি সেনগুপ্ত ছিল আমার প্রাণের বন্ধু। ওকে আমি খুব মান্য করতাম। বিমল চক্রবর্তী বলে একজন খুব ভালো বন্ধু ছিল, মারা গেছে। আর একজন হল প্রণব মুখার্জি, এখনও বেঁচে আছে কী না জানি না। অধিকাংশ বন্ধুই মারা গেছে। আমি অনেক দিন বহরমপুরে যাই না। বন্ধুদের সঙ্গে আর যোগাযোগ নেই। এখানে (কেষ্টপুরে) আসার পর একজন বন্ধু এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল। সেটা আমার খ্যাতির জন্য। সেই ছেলেটা, যাকে আমরা ভোলা বলে ডাকতাম। বলতাম—এই ভোলা, এই ভোলা, আয় খেলব। সে মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করতে এখানে আসে। এছাড়া যে সব বন্ধুর নাম মনে পড়ছে তারা হল দেবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত সিনহা আর সাধন চৌধুরী। মনে পড়ছে সাধন চৌধুরীদের একটা ঘড়ির দোকান ছিল, সেখানে আমরা বসতাম।

শিক্ষকজীবন

প্রায় বাইশ মাস ধরে জাহাজে সারা পৃথিবী ঘুরে বহরমপুরে ফিরে আসি। কলকাতায় পিসির বাড়িতে থাকার সময় সুরেন্দ্রনাথ কলেজে আই.কম.-এ ভর্তি হয়েছিলাম কিন্তু ওই যে—অভাব আর দারিদ্র্যের কারণে পড়া বন্ধ হয়ে যায়। পরে প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে, আই. কম. পাশ করি। তারপর তো জাহাজে চলে যাই।

বহরমপুরে ফেরার পর প্রশান্ত বলল—এভাবে ঘুরে কী হবে? তুমি বি.কম. ভর্তি হয়ে যাও। আমি তোমাকে বই-টই দিয়ে যাবো। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে বি.কম. ভর্তি হয়ে গেলাম। মর্নিং কলেজ। প্রশান্তই আমাকে বই, সাজেশন ইত্যাদি এনে দিয়েছিল। প্রশান্তর ভগ্নীপতি গোপীনাথ অধিকারী ছিলেন মুর্শিদাবাদের ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ ইস্কুলস্। তিনি বললেন—হাতিনগর প্রাইমারি স্কুলে স্পেশাল ক্যাডারে দু'জন শিক্ষক নেবো, তার মধ্যে তুমি একজন। তুমি দরখাস্ত করো। তোমাদের জন্যই এই প্ল্যানটা করা হয়েছে। আবার পালিও না। তুমি ওখানে পড়াবে।

প্রশান্তও বলল—তুমি প্রাইমারি স্কুলে ঢুকে যাও।

আমি বললাম—না, আমি আর পালাবো না।

ওই স্কুলটা করাই হয়েছিল রিফিউজিদের জন্য। প্রাইমারি স্কুলে কাজটা পাওয়ার

পর আমি আর পালাইনি। ওই স্কুলে পড়াই, আশি টাকা মাইনে পাই। একটা দায়িত্ববোধ এসে গেল, বন্ধন তৈরী হয়ে গেল।

হাতিনগর বহরমপুরের কাছেই। তার কাছেই বিষ্ণুপুর কালীবাড়ি। খুব বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র। ওই স্কুলে পাঁচজন মাস্টারমশাই শিক্ষকতা করতেন। ওখানেই মাস্টারি শুরু করলাম। প্রশান্ত বলল—তুমি সঙ্গে সঙ্গে বি.কম. পড়াশোনাটাও চালিয়ে যাও।

ছোটোকাকার সুপারিশে বিষ্ণুপুর কালীবাড়িতে আমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হল। বিষ্ণুপুর কালীবাড়ির সেবাইত ছিলেন বৈদ্যনাথ পান্ডে। আমি ওঁকে ডাকতাম বৈদ্যনাথদা, আর ওঁর স্ত্রীকে বৌদি। ওঁদের একটি ছেলে আর এক ভাগ্নেকে আমি পড়াতাম। এখানে এসে আমার জীবনটা চেঞ্জ হয়ে গেল। বৌদি ছিলেন একজন মহীয়সী মহিলা। ওঁদের ছেলেদের পড়াতাম আর কালীমন্দিরে ভোগ খেতাম। বৌদি মায়ের ভোগটা আমার জন্য রেখে দিতেন। জীবনে এই প্রথম কাকে ভালো খাওয়া বলে ওই কালীবাড়িতে আমি দেখলাম। ওখানেই আমি প্রথম পেটভরে খেতে পেলাম। কালীবাড়িতে প্রতিদিন ভোগ রান্না হোত। তার জন্য আলাদা রান্নাবাড়ি ছিল। সে ভোগ দারুণ। বৈদ্যনাথদা আর তাঁর স্ত্রী দু'জনেই আমাকে খুব ভালোবাসতেন। ওখান থেকেই আমি কলেজে বি.কম. পড়তে যেতাম। বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজে। কলেজ থেকে ফিরে আমি খেলে তবে বৌদি খেতেন। উনি আমার জন্য বসে থাকতেন।

হাতিনগর প্রাইমারি স্কুলে পড়াতে পড়াতেই আমি বি.কম. পরীক্ষা দিলাম। ১৯৫৬ সালে সেকেন্ড ক্লাস পেয়ে পাশ করলাম। আমার বি.কম. পাশ করার কথা ১৯৫২ সালে, মাঝে বোম্বেটে হয়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্য সে জায়গায় পাশ করেছি ১৯৫৬ সালে। দারিদ্র্যের জন্য আমার পড়াশোনার ক্ষতি হয়েছিল। প্রাইভেটে আই.কম. করেছিলাম ১৯৫০ সালে।

বলেছি প্রাইমারি স্কুলে পড়িয়ে আশি টাকা মাইনে পেতাম। বিশাল ব্যাপার। তাতে আমাদের ফ্যামিলির একটা সুরাহা হল, দু'বেলা অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা হল। বেতনের সবটাই এনে আমি বাবাকে দিতাম। বাবা আমাকে আট আনা বা একটাকা দিতেন। আমি বাবাকে বলতাম—আর এক টাকা দাও না, শহরে যাবো সিনেমা দেখবো। বাবা বলতেন— না, না, দেখতে হবে না। যাও—ছেলেমানুষ। সিনেমা দেখতে হবে না। তখন এই রকম ছিল আর কি। সব টাকাটাই বাবাকে দিয়ে দিতাম কারণ বাবা আমার নিরুপায় ছিলেন।

সাহিত্য-প্রবেশ

আমার সাহিত্যে আসার ব্যাপারটা খুব গোঁজামিলের। আমার বন্ধু প্রশান্তকান্তি

সেনগুপ্ত খুব সাহিত্যপাগল ছিল। এমনিতে ও মুকুল সেনগুপ্ত নামে লেখালেখি করত। খুবই সাহিত্য বাতিকগ্রস্ত। কলেজে পড়তে পড়তে প্রশান্ত আমাকে সম্পাদক করে একটা পত্রিকা বের করেছিল। প্রশান্তই টাকা-পয়সা, লেখা সব জোগাড় করত। ওতে আমার কোনও লেখা থাকত না। বলত—এই লেখাটা দিলাম, তুমি একবার দেখে দাও। বলতাম—ঠিক আছে, দিয়ে যাও।

সাহিত্যের ভূতটা আমার মাথায় চাপল বন্ধুদের তাড়নায়। তারা বলত—তুই এত ঘুরে এসেছিস, তোর অনেক অভিজ্ঞতা, তুই লেখ। আমি ওদের গল্প বলতাম, আমার জাহাজ জীবনের বর্ণনা। প্রশান্তও বলত—তুমি লেখো না। তুমি এমন সুন্দর করে গল্প বলো—এত ঘুরেছো, এত দেশে গেছো। তুমি যে-ভাবে গল্পগুলো বলো, সেভাবেই লেখো। বন্ধুদের তাড়নায় ১৯৫৬ সালে প্রথম গল্প লিখলাম 'কার্ডিফের রাজপথ'। বন্ধুরা পাগলের মতো আমাকে গল্প লেখার জন্য ধরেছিল। তখন সবে জাহাজ থেকে ফিরে হাতিনগর প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করি। এর আগে এক কলমও লিখিনি। ওরা বলল—তুমি সমুদ্রের ওপরেই একটা গল্প লিখে দাও। ভাবলাম—সমুদ্রের ওপর কী লিখব? গল্পটা বহরমপুরের 'অবসর' পত্রিকায় বেরিয়েছিল। কার্ডিফ হচ্ছে ওয়েলসের একটা বন্দর। বৃটেনের অনেকগুলো ভাগ আছে—ওয়েলস্, স্কটল্যান্ড ইত্যাদি। একেবারে দক্ষিণের যে অঞ্চল সেটা হল ওয়েলস্। সেখানে রাস্তায় দু'জন লোক, তারা ইন্ডিয়ান, আমাদের স্থানীয় লোক ভেবেছে, তারা আমাদের কাছে একটা জায়গার নাম জানতে চেয়েছে। তখন একজন সাহেব সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, সে ওদের বলল—আপনারা ওদিকে যান, ওখানে একটা গলির মুখে কী লেখা আছে সেটা পড়বেন, পড়ে চলে যাবেন। আমরা চলে যাচ্ছিলাম, তখন ওরা আমাদের ডাকল। বলল—আপনারা ভারতীয়? বললনাম—হ্যাঁ। ভারতীয়দের তো আর সেভাবে চেনা যায় না। ওরা মেয়ে—প্রসটিটিউসন খুঁজছিল, কোথায় মেয়ে পাওয়া যায়। এই হল 'কার্ডিফের রাজপথ' গল্পের বিষয়।

গল্পটা আমার নিজের মতো করে লিখেছিলাম। সেটা যে গল্পের একটা ফর্ম তাও তখন জানতাম না। এর আগে গল্পের ফর্ম নিয়ে কখনও ভাবিনি। যা হোক, গল্পটা ছাপা হল, সকলে পড়ে খুশি হল, কিছু আলোচনাও হল। যতদূর মনে আছে এর পর ১৯৫৭ সালে বহরমপুরের 'উত্তরকাল' পত্রিকায় আমার দুটো গল্প ছাপা হয়েছিল— 'ফ্রেন্ডশিপ' আর 'বাদশা মিঞা'।

সমুদ্র-মানুষ

সম্ভবত ১৯৫৭ সালে 'উল্টোরথ' পত্রিকা 'মানিক স্মৃতি পুরস্কার' ঘোষণা করে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি আহ্বান করে। এর মধ্যে আমার একটা-দুটো লেখা এখানে

ওখানে বেরোতে শুরু করেছে। পুরস্কৃত উপন্যাসের লেখকদের ওরা টাকা দেবে। জানতে পেরে আমি 'সমুদ্র-মানুষ' লিখতে শুরু করি। ১৯৫৮ সালে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়—তিনটে পুরস্কার ছিল। 'সমুদ্র-মানুষ' তৃতীয় হয়েছিল। প্রথম হয়েছিল মতী নন্দী আর দ্বিতীয় পূর্ণেন্দু পত্রী। ১৯৫৮ সালে 'যুগান্তর সাময়িকী'তে 'পোড়া কয়লা' নামে আমার একটা গল্প বেরিয়েছিল। গল্পটা ছিল কয়লাকুড়ুনি মেয়েদের নিয়ে লেখা। ওই যে, যারা ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়া ছাই থেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কয়লা বের করে—তাদের নিয়ে। এটা আমাকে হিট করেছিল। এটাই কলকাতার পত্রিকায় প্রকাশিত আমার প্রথম গল্প।

আসলে 'মানিক স্মৃতি পুরস্কার' ঘোষণা হওয়ার পর আমার বন্ধুরা আমাকে জ্বালিয়ে খেতে আরম্ভ করেছিল। ওরা বলছিল—তুই লেখ। দেখ, পুরস্কারটা পেলে তুই বিখ্যাত হয়ে যাবি। আমি বললাম—আমি উপন্যাস লিখতে জানি না। উপন্যাস কাকে বলে তাই-ই জানি না। গল্প কাকে বলে তাও জানি না। তোরা জোর করিস বলে লেখার চেষ্টা করি।

আমার বেস্ট ফ্রেন্ড প্রশান্ত আমাকে বলল—তুমি তো গল্পগুলো আমাদের বলেছো। ধর, আমরা তোমার সামনে বসে আছি, তুমি যা দেখেছো সেটা বলছো। এভাবেই লেখো। আমিও সেভাবেই লিখতে শুরু করলাম। পুরস্কারে টাকার কথা ঘোষণা করা ছিল। ভাবলাম লিখলে টাকাটা পাওয়া যাবে। তখন তো লেখা থেকে টাকা পেতাম না। প্রশান্তর কথা মতো লিখতে আরম্ভ করলাম। কোনও কিছু গুছিয়ে নিয়ে লিখতে বসিনি, র‍্যানডাম লিখতে থাকলাম। আমার সঙ্গে যে জাহাজি থাকত সে, আমি আর একজন—এই তিনজন হয়ে গেলাম নায়ক। আমাদের দৈনন্দিন ঘটনার কিছু কাহিনি আর কিছু কল্পনা মিলে লেখাটা তৈরী হল। লিখতে লিখতে এটা হয় যে, কোথায় পরিচ্ছেদ শুরু হবে, কোথায় পরিচ্ছেদ শেষ হবে—এটা বোঝা যায়, লিখতে লিখতেই এটা মাথায় আসে।

অনেকে বলেছেন 'সমুদ্র-মানুষ' একটা অনুবাদ। যাঁরা প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন তাঁরাও বলেছেন—'সমুদ্র-মানুষ' অনুবাদ হলেও ভালো অনুবাদ, পুরস্কৃত করা দরকার।

বাণীপুর চ্যাপ্টার

সন-তারিখ আমার ঠিক মনে থাকে না। ১৯৫৮ সালে হাতিনগর প্রাইমারি স্কুল থেকে আমাকে বি.টি. ট্রেনিং নিতে বাণীপুরে পাঠাল। ডি.আই. গোপীনাথ অধিকারীই আমাকে পি.জি.বি.টি. ট্রেনিঙের জন্য ডেপুটেসনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ট্রেনিং নিতে যাওয়ার পর ওখানে প্রথমেই একটা পরিচয় সভা হয়।

এই সভায় প্রত্যেকে কে কোথা থেকে এসেছে, কী করে, বলে। যখন আমার টার্ম এল আমি বললাম যে, অমি জাহাজে চাকরি করতাম। কোল বয়ের কাজ। জাহাজে আমাকে কয়লা দিতে হোত। এখন প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করি। আমার তো সরাসরি কথা। শুনে সহপাঠীরা বিস্মিত হল। যা হয়। বানীপুরেই আমার মমতার সঙ্গে পরিচয়। এর আগেই আমি উল্টোরথের 'মানিক স্মৃতি পুরস্কার'টা পেয়েছি।

বি.টি. ট্রেনিঙে সেই ব্যাচে ষাট-সত্তর জন ছেলে, আর প্রায় ষাট-সত্তর জন মেয়ে ছিল। আমরা হোস্টেলে থাকতাম। ছেলেদের হোস্টেল ছিল রাস্তার ওপারে আর মেয়েদের হোস্টেল ছিল রাস্তার এপারে। মেয়েদের সঙ্গে দেখা হোত কেবল ক্লাস রুমে আর খাওয়ার ঘরে। ডাইনিং হলটাও ছিল বিশাল বড়ো। সেখানেই সকলের সঙ্গে দেখা হোত, মেলামেশা করা যেত। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোনও মেয়ের সঙ্গে গল্প করা যেত না। অধ্যাপকরা দেখলে নম্বর কেটে নেবে, এমনকি ফেলও করিয়ে দিতে পারে। অবশ্য সাধারণত ফেল করায় না। ডাইনিং হলের পাশে একটা গাছ ছিল। সেই গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আমরা মেয়েদের সঙ্গে গল্প করতাম। সেও বেশিক্ষণ নয়। না হ'লে অধ্যাপকরা দেখবে, বলবে—ডিসিপ্লিন নষ্ট করা হচ্ছে। ডিসিপ্লিন নষ্ট করা মানেই তোমার ব্যাড-প্যাচ পড়বে। ফলে ভয়ে আমরা সেখানেও বেশিক্ষণ দাঁড়াতাম না। মেয়েদের হোস্টেলে কোনও ছেলের ঢোকার পারমিসন নেই। কেউ ঢুকছে দেখলে ওরা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকসন নেবে। মেয়েরা ছেলেদের ভাই বলে ডাকতো। আমাকে মেয়েরা যেমন অতীনভাই বলে ডাকতো। আমরাও মেয়েদের বোন বলে ডাকতাম। যেমন সুজাতাবোন বা মমতাবোন—এরকম। মুর্শিদাবাদের ডি.আই. গোপীনাথ অধিকারীর ছেলে রণজিৎ অধিকারীও আমাদের সঙ্গে বি.টি. ট্রেনিং নিত। গোপীনাথ অধিকারীকে ট্রেনিং সেন্টারে আমাদের যে সব অধ্যাপকরা ছিলেন, তাঁরাও সমীহ করতেন। ডি.আই.-এর ছেলে একদিন এসে বলল—তোকে ডাকছে। আমি বললাম—কে ডাকছে? ও বলল—মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেও ওই গাছতলায়। গাছতলাতে দাঁড়িয়ে সবার সামনে কিন্তু আমাদের কথা বলতে হচ্ছে। মমতার সঙ্গে আগে পরিচয় তো ছিল না, পরিচয় হল সেখানেই। মমতা আমাকে বলল—আপনার লেখা গল্প পড়লাম। আপনার আরও গল্প আছে? দেবেন? পড়বো। বললাম—আছে। আপনি পড়বেন? দেবো।

এই প্রথম মমতার সঙ্গে আলাপ। তখনও আমার গল্পের বইগুলো বের হয়নি। আমি আমার লেখা দু'একটা গল্প ওকে পড়তে দিয়েছিলাম। ওর সঙ্গে দেখা হতো রাস্তায়, গাছতলায় আর ডাইনিং হলে। আমাদের ট্রেনিং এক বছরের। এভাবে দেখাশোনা হতে হতে একদিন মমতাকে বললাম—আপনাকে বলতে সাহস হচ্ছে না, আমরা তো একসঙ্গে থাকতে পারি বিয়ে-থা করে। আপনারও বি.টি. হয়ে

যাবে, আমারও বি.টি. হয়ে যাবে। আমরা স্কুল মাস্টারি করলে আমাদের চলে যাবে। আমরা খুব গরীব, আমার বাবাও খুব গরীব, আমাদের কুঁড়ে ঘর—আপনার থাকতে অসুবিধা হবে। শুনে মমতা চুপ করে থাকল। তারপর বলল—ঠিক আছে, আমি বাড়ি থেকে ঘুরে আসি, তারপর বলবো।

তারপর বাণীপুরে থাকতে থাকতেই আমাদের বিয়েটা রেজিস্ট্রি হয়ে গিয়েছিল। ওয়েলিংটনে একজন ম্যারেজ রেজিস্ট্রার আছে, মমতার দু'জন বান্ধবী আর আমার একজন বন্ধুকে নিয়ে, সেখানেই আমাদের রেজিস্ট্রি হয়। মমতা এদেশের, কালনা বা কাটোয়ার, মেয়ে। তবে ওরা ওখানে থাকতো না। ওরা কলকাতায় বালিগঞ্জে থাকতো। ওই যে দেশপ্রিয় পার্ক আছে, তার পাশেই ওদের তিনতলা বাড়ি। মমতার বাবার নাম প্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায়। তিনি বড়ো চাকরি করতেন, খুব অল্প বয়সে মারা যান। ওদের ফ্যামিলির সকলেই—কাকা-জ্যাঠারা সব বড়ো বড়ো চাকরি করতেন। কেউ অফিসার, কেউ অধ্যাপক—এরকম। মমতার যখন বারো বছর বয়স তখন ওর বাবা মারা যান। মমতার বাবা মারা যাওয়াতেই ওদের এত দুর্ভোগ হয়েছিল। ওর এক কাকা জগদীশ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ডাক্তার।

এই বিয়েতে ওদের বাড়িতে বোধহয় মত ছিল না। সেই বাড়ির মেয়ে একটা রিফিউজি ছেলেকে বিয়ে করবে—এটা একটা ভয়ংকর ব্যাপার। রিফিউজিকে তো তখন খুব হেয় চোখে দেখা হোত। কিন্তু আমি কোনও কিছু গোপন করতাম না। আমার যা আছে তাই ওকে বলতাম। বিয়ের পর মমতা চুপচাপ ছিল। এদিকে ট্রেনিং শেষ হয়ে আসছে। ট্রেনিং শেষ হওয়ার মুখে মমতাকে বললাম—তুমি যাবে কী না দেখো। তোমার বাড়ির লোকেরা তো জানেন না। মমতা বলল—আমি বাড়িতে জানিয়ে দেবো। বাড়িতে গিয়ে ও মাকে জানিয়ে দিল। তো ওরা কান্নাকাটি করল—একটা রিফিউজি ছেলে, বাড়ি নেই, ঘর নেই... পাটশলার ঘর! যেদিন ট্রেনিং শেষ হবে, তার আগের আগের দিন মমতা এসে বলল—আমি আপনার সঙ্গে চলে যাবো। ট্রেনিঙের আগে মমতা কলকাতার দক্ষিণ দিকে একটা স্কুলে কাজ করত। আমি মমতাকে নিয়ে মণীন্দ্রনগর কলোনীর বাড়িতেই উঠলাম। মমতার কোনও অসুবিধা হয়নি। ও বলল—তুমি যেখানে থাকবে, আমি সেখানেই থাকবো।

আগেই বাবাকে মমতার কথা বলেছিলাম যে, বাবা, এরকম ব্যাপার, আমি বিয়ে-থা করছি। বাবা খালি জিজ্ঞাসা করেছিল—মেয়েটি ব্রাহ্মণ তো? বললাম—হ্যাঁ। শুনে উনি বললেন—ঠিক আছে, কর। বাবা আর কিছু জিজ্ঞাসা করেননি। বাড়িতে আসার পর বাবা বললেন—তোমরা কী ভাবে বিয়ে করেছো—এসব আমি মানি না। তোমাদের মন্ত্রপাঠ করে বিয়ে করতে হবে। তো আমরা আবার সে ভাবে বিয়ে করলাম।

এটা আমার ভাগ্য যে, দুঃসময়ে আমার প্রচুর বন্ধুবান্ধব জুটে গিয়েছিল। মমতার সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যাপারে ডি.আই.-এর ছেলে আমার সেই বন্ধু বলেছিল—তুই কিছু ভাবিস না। আমি বাবাকে সব বলেছি। বলেছি মেয়েটা খুব বড়ো ঘরের। ওর কাকা বালিগঞ্জ অঞ্চলের বড়ো ডাক্তার। তুই বলে দে আমার বাবা তোর বউকে চাকরি দিয়ে দেবে। ও ওর বাবার সঙ্গে কথা বলে এসেছে। ওর বাবা বলেছেন—ওরা যদি বিয়ে করতে মানসিকভাবে তৈরী হয়ে থাকে, তাহলে বিয়ে করে নিতে বল। আমি চাকরি করে দেবো।

ট্রেনিঙের পর আমি মমতাকে নিয়ে বহরমপুরে চলে এলাম। আমার বন্ধু রণজিৎ তার মাকেও আমাদের কথা বলেছিল। উনি, একদিন আমাকে আর আমার হবু স্ত্রীকে বাড়িতে নেমতন্ন করে খাইয়েছেন। হবু স্ত্রী, কেননা তখনও আমাদের বিয়েটা ডিক্লেয়ার হয়নি। উনি অর্থাৎ ডি.আই-এর স্ত্রীও আমাদের বলেছেন, কিছু ভাবতে হবে না, চাকরি হয়ে যাবে। উনি তাঁর স্বামীকে বললেন—এদের একটা ভালো স্কুলে দিয়ে দাও। তখন ওঁরা আমাকে সাটুই স্কুলে হেডমাস্টার করে পাঠালেন। ওই স্কুলে আমার স্ত্রীকেও চাকরি দিলেন।

সাটুই পর্ব

ডি. আই. বললেন—তুমি বি.কম. পাশ। তুমি এখন হাইস্কুলে মাস্টরি করতে পারবে। কাজেই প্রাইমারি স্কুলে পড়ে না থেকে তুমি হাইস্কুলে যাও। তারপর বললেন—তুমি আর তোমার স্ত্রী দু'জনে একই স্কুলে পড়াবে। উনিই সব ব্যবস্থা করে দিলেন। এরপর আমি আর মমতা দু'জনে একসঙ্গে সাটুই জুনিয়র বেসিক স্কুলে জয়েন করলাম। সেখানে আমরা একটা কোয়ার্টারও পেয়েছিলাম। ওখানে আমি হেডমাস্টার ছিলাম। ওখানে থাকার সময়ই 'সমুদ্র মানুষ' ১৯৬২ সালে বই হিসাবে বের হয়। 'মিত্রালয়' বলে একটা পাবলিকেশন ছিল, তার পক্ষ থেকে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য বললেন—'সমুদ্র মানুষ'টা দিন। ওটা আমরা বই হিসেবে প্রকাশ করবো। উনি আমাকে দুশ' টাকা অগ্রিম দিয়েছিলেন। এই সময়ই কাশিমবাজার রাজবাড়ির নাতি সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী আমাকে বললেন—তুমি আমার কাছে চলে এসো। তখন কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমার লেখা বেরোচ্ছে। ১৯৬২ সালে দেশ পত্রিকায় আমার 'রূপক মাত্র' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এছাড়াও অন্যান্য পত্রিকায় আমার গল্প বেরোচ্ছে, আমার নামটা তখন লেখক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছে। তখনই সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী বললেন— তুমি এত ভালো বই লিখেছো। তুমি এরকম গ্রামে পড়ে থাকবে? কলকাতায় চলে এসো। কলকাতায় আমার

জানাশোনা স্কুল আছে। সাটুইয়ে আমি পাঁচ বছর ছিলাম। সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কথাতেই আমি মাস্টারি ছেড়ে ১৯৬৩ সালে কলকাতায় চলে এলাম। এর মধ্যে ১৯৬০ সালে আমার বড়োছেলে দেবাশিস আর ১৯৬৩ সালে আমার ছোটোছেলে শুভাশিস জন্মগ্রহণ করেছে।

সাহিত্যিক বন্ধু সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সিরাজ আমাদের বাড়িতে আসত। আমিও ওর বাড়ি গিয়েছি। সিরাজের সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হয়, তখন আমরা দু'জনেই লেখক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছি। সিরাজ আমার সাটুইয়ের স্কুলে আসত। ওর বাড়ি ছিল হিজল বিলের ও-পারে, কান্দির দিকটায়। আমি ছিলাম হিজল বিলের এ-পারটায়, সাটুইয়ে। হিজল বিলের ওপর দিয়ে সিরাজ আসা-যাওয়া করত। সিরাজের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় কীভাবে হয়েছিল, যেটা এখন আর মনে নেই। তবে সিরাজ আমার পরে লেখালিখি শুরু করেছে। সিরাজের গদ্য পড়ে আমি খুব উৎসাহিত হয়েছিলাম। সে-কথা আমি ওকে বলেওছিলাম। সিরাজের কথাবার্তার যে ঢং—ওর গদ্যের মধ্যেও সেই ব্যাপারটা আছে। সিরাজ পড়ে আমি লেখার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হই।

কাশিমবাজার রাজবাড়ি... শেয়ালদা

সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী যেটা বলে আমাকে কলকাতায় এনেছিলেন সেটা ঠিক নয়। ওদের নিজেদের স্কুল আছে। কাশিমবাজার গার্লস স্কুল, স্বর্ণময়ী—সবই ওদের। ভেবেছিলাম হয়তো কোনও স্কুলে আমাদের ঢুকিয়ে দেবেন। কিন্তু আমার স্ত্রীকে একটা প্রাথমিক স্কুলে কাজ দিলেন আর আমাকে বললেন—তুমি আমার কোম্পানিটার ভার নাও। কোম্পানিরটার নাম ছিল কালার প্রিন্টিং অ্যান্ড হলোওয়ার্স লিমিটেড। তখন কোম্পানিতে চুরি হচ্ছিল। ওটা ছিল হালসিবাগানে। এখন আর আছে কী না জানি না। ওই কোম্পানিতে কন্‌টেনার, মানে টিনে ডিবা বা কৌটো তৈরী হতো। সেই কোম্পানির আমি ম্যানেজার হলাম। মাইনে তিনশ' টাকা। হাতে দুশ' টাকা দিত আর বাইরে বাইরে একশ' টাকা, মোট তিনশ'। থাকতাম শেয়ালদার কাশিমবাজার রাজবাড়িতে। ওরা আমাদের থাকবার জন্য রাজবাড়ির একটা এলাকা ছেড়ে দিয়েছিল। ওই কোম্পানির হালসিবাগান কারখানায় মেসিন-টেসিন ভালো ছিল না। স্ট্রাইক লক-আউট লেগেই থাকতো। সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, আমি ওখানে ঢোকার আগে, আমাকে বলেছিলেন—এটা একটা গোল্ড-মাইন। আর আমি ঢুকে দেখলাম ওটা একটা লোহার আবর্জনা। কোম্পানিটা ছিল একটা লুজিং কনসার্ন। এই কোম্পানিতে আমি ১৯৭১ সাল পর্যন্ত কাজ করেছি। তারপর ম্যানেজারির কাজটা আমি ছেড়ে দিই। একটা ব্যাপার হয়েছিল, কোম্পানির যিনি মালিক, কাশিমবাজারের মহারাজ-কুমার, তিনি

ওই সময়ে প্রয়োজনে আমাদের টাকা দিতেন, এবং টাকাটা আবার আমাদের কাছ থেকে ফেরৎ নিতেন। তাহ'লে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? উনি আমাদের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছেন, সেটা একটা কোম্পানি ভাউচার করে ফেরত দিচ্ছে তাঁকে, ফলে সেটা তাঁর হোয়াইট মানি হয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারগুলো ছিল—একটা দুর্নীতি ছিল। এছাড়া এই কোম্পানি যে আর চলবে না, সেটাও বুঝতে পেরেছিলাম। এই কারণে চাকরিটা ছেড়ে দিই। কাজেই ভাবতে হল কোথাও নতুন একটা কিছু করা যায় কি না। তাছাড়া এইসব নিয়ে আমার সঙ্গে মালিকের বিরোধ হল। বললাম—আপনারা ব্ল্যাক মানি হোয়াইট করবেন, আর আমি ম্যানেজার হয়ে সই করবো—এই সব দায়িত্ব আমি নিতে পারবো না। মালিক বললেন—না, তোমাকে এই কাজগুলো করতে হবে। না হ'লে তোমাকে কী কাজ দেবো? কী কাজ করবে তুমি? আমি মালিককে বললাম—আমি আর কাজ করবো না। কাজটা ছেড়ে দিলাম। সেই সময় আমি কেষ্টপুরে বাড়ি করে চলে এসেছি। তখন বাড়িটার একতলা হয়েছে। সেটা ১৯৭১ সালে। তারপর ওই কোম্পানির কী হল সে খবর আমি রাখি না।

কাশিমবাজার রাজবাড়ির ওঁরা এখন বোধহয় টালিগঞ্জে থাকেন। দেখা হয় না আর। বইমেলাতে একদিন দেখা হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন আছেন? আমি বললাম—আপনি তো বাড়ি-টাড়ি এখন ভেঙে দিচ্ছেন। এত বড়ো একটা বাড়ি, ঐতিহ্যপূর্ণ বাড়ি! বললেন—কী করবো? নানা রকম ঝামেলা সৃষ্টি হচ্ছে, তাই ছেড়ে দিচ্ছি।

রামায়ণী প্রকাশ ভবন... শান্তিরঞ্জন সান্যাল

ওই কোম্পানির কাজ ছেড়ে দিলাম। তখন আমার বই-টই ছাপা হয়, বিক্রি হয়, অনেক চেনা-শোনা হয়েছে। পুরস্কার-টুরস্কারও পেয়েছি। ওই সময় শান্তি সান্যালের (শান্তিরঞ্জন সান্যাল) 'রামায়ণী প্রকাশন ভবন'-এ কিছুদিন কাজ করেছি। ওটা ছিল একটা পাবলিশিং কনসার্ন। ওখানে আমার আসল কাজটা ছিল পরামর্শ দেওয়া। কোন বইটা ছাপা যায়, কোন বইটা ছাপা যায় না—সেটা পড়ে দেখা। তখন আমার নাম-টাম হয়েছে, বাজারে আমার দু-চারটে বই আছে। আমার মনে হয় আগেও শান্তিবাবু কোনও কারণে আমার কাছে এসেছিলেন। শান্তি সান্যালের একটা বড়ো পাবলিকেসন করার স্বপ্ন ছিল। রাজবাড়ির কাজ ছেড়ে দেওয়ার পর শান্তিবাবু বললেন—আপনি চলে আসুন আমার কাছে। ওঁদের আর একটা সংস্থার নাম ছিল 'স্যাঙ্গুইন পাবলিশার্স'—সেখান থেকে পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশিত হতো। আমার হাত দিয়ে 'রামায়ণী প্রকাশ ভবন'-এর কিছু বই বেরিয়েছিল। তার মধ্যে ছিল আমার চার বন্ধুর চারটে উপন্যাস—সিরাজ, শীর্ষেন্দু, সুনীল আর সমরেশ বসু।

তবে এগুলো সবই সম্ভবত—যত দূর মনে হয়। শান্তিবাবু এমনিতে ভদ্রলোক, ভালোমানুষ। আমাকে উনি মাসে সম্ভবত দু'শ বা তিন'শ টাকা দিতেন। এছাড়া তো তখন আমি লেখালিখিও করছি।

কেষ্টপুরের বাড়ি

কাশিমবাজার রাজবাড়ি থেকে কেষ্টপুরে বাড়ি করে চলে আসি ১৯৭১ সালে। আমার বন্ধু চিত্ত সিংহ সেই সময় আমাকে বলেছিল—সস্তায় জমি আছে, এক হাজার টাকা করে কাঠা। পরে আর পাবি না। তুই চার কাঠা জমি কিনে নে, আমি টাকা ধার দিচ্ছি। চিত্ত সিংহরা চট্টগ্রামের লোক। বেলগাছিয়ায় থাকতো। বাগবাজারে ওদের ব্যবসা আর দোকান আছে। ওরা খুব বড়োলোক। বললাম—না, ধারের মধ্যে আমি যাবো না। আমার সীমিত আয়ের মধ্যেই আমি কাজটা করতে চাই। দু'হাজার টাকা আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ছিল, জমিয়েছিলাম। সেই টাকায় দু'কাঠা জমি কিনলাম। তখন কেষ্টপুরে কোনও ঘরবাড়ি ছিল না। এত ভিড় ছিল না। জায়গাটা পুকুর, ডোবা আর জঙ্গলে ভরা ছিল। জায়গাটা নেওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে এই বাড়িটা করি। তখন একশ' তেরো টাকা হাজার ইঁট। এই বাড়িটায় এসে যখন উঠি তখন একটা মাত্র ঘর তৈরী হয়েছে। তখন এখানে তিনটে মাত্র বাড়ি। আমার বাড়ি, চিত্ত-র বাড়ি আর ওদিকে বাগচিবাবুর বাড়ি। চিত্ত ওদিকে বিশাল বাড়ি করেছে।

কাশিমবাজার রাজবাড়ির কাজটা ছাড়ার আগে মমতাকে ওরা দূরে ট্রান্সফার করে দিল। ছ-সাত বছর ও বাইরে গিয়ে কাজ করেছে। বাইরে মানে দূরে, সেখানেই থাকতে হত। বর্ধমান থেকে যেতে হত বলগনা। জায়গাটা বলগনার থেকে আরও দূরে... কী যেন নাম জায়গাটার। ছেলেদের আমি দেখতাম। একটা কাজের মেয়ে ছিল। ছোটো ছেলে তখন থ্রি কি ফোরে পড়ে। আমার স্ত্রী লাস্ট কাজ করেছে শ্যামবাজার গার্লস হাইস্কুলে। দীর্ঘদিন কাজ করে সেখান থেকেই রিটায়ার করেছে।

অনটন ছিল নিত্য সঙ্গী

আমার অসুবিধা ছিল বাবাকে একটা টাকা পাঠাতে হোত। সেই জন্যে আমার স্ত্রীকে চাকরি করতে হোত। নাহ'লে আমি যা পেতাম, তাতে আমাদের কোনও রকমে চলে যেত। বাবাকে প্রথম দিকে দু'শ করে টাকা দিতাম। তারপর টাকার পরিমাণ আস্তে আস্তে বাড়ে। আসলে আমার আর্থিক টানাটানি ছিল আমার ফ্যামিলির জন্য। মা বাবা ভাই বোন এদের দেখা, তাদের বিয়ে দেওয়া—সবই আমি করেছি। বাবা (অভিমন্যু বন্দ্যোপাধ্যায়) মারা যান ১৯৭৬ সালে। তারপর মা আরও কুড়ি

বছর বেঁচেছিলেন। মা-র বেলায় টাকাটা আরও বেড়ে গেল। মা বললেন—বাবা, আমি কুলাইতে পারছি না। শেষ দিকে মাকে আমি আটশ' টাকা করে পাঠিয়েছি। তখন ভাইঝিও মায়ের সঙ্গে থাকত। বাবা কষ্টে থাকুন, মা কষ্টে থাকুন—এটা তো আমি চাইতাম না। মাকে বলেছিলাম এখানে এসে থাকতে, কিন্তু মা রাজী হননি।

যুগান্তর

যুগান্তরে আমি কাজ করেছি। ওখান থেকেই রিটায়ার করি। শান্তি সান্যালের কাছে যখন আছি, সেটা ১৯৭৬ সাল, সেই সময় যুগান্তরের প্রফুল্ল রায় একজন ছেলের মাধ্যমে আমাকে জানালেন—আপনাকে অমিতাভদা (অমিতাভ চৌধুরী) দেখা করতে বলেছেন। বললাম—আমাকে দেখা করতে বলেছেন! তো আমি গিয়ে কী করবো? ছেলেটি বলল—না, খুব জরুরী। আমি একদিন যুগান্তরে গেলাম। অমিতাভদা বললেন—তুমি এখানে জয়েন করো। ছ'শ টাকা মাইনে পাবে। ছ'শ টাকা খুব কম নয়। এখনকার দিনে অধ্যাপকরাও ছ'শ টাকা মাইনে পায় না। তুমি জয়েন করো। আর বললেন—কী কোথায় পড়ে আছো, কী করছো... তুমি একটা দরখাস্ত নিয়ে আসবে। তোমাকে নেওয়া হবে।

অমিতাভদার কথায় আমি যুগান্তরে জয়েন করলাম। তারপর আঠারো বছর ওখানে কাজ করেছি। শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ওখানে ছিলাম সাব-এডিটর হয়ে। কেরানির মতো কাজ। আমাদের মাথার উপর ছিলেন অমিতাভ চৌধুরী। উনি ছিলেন সহ-সম্পাদক। উনিই দেখতেন যাতে কাগজটা ঠিক সময় বেরোয়। খবর বাছাই করে সেগুলো আমাদের দিতেন। আমরা বাংলায় অনুবাদ করে দিতাম। সকালে লেখালেখি করতাম। সপ্তাহে একদিন নাইট ডিউটি থাকত। কিন্তু আমার কোনও কাজই তো ভালো লাগত না। ১৯৯৪ সালে যুগান্তর থেকে রিটায়ার করলাম। তারপর তো কাগজটাই উঠে গেল।

যুগান্তর ছাড়ার পর আমি আর কোনও কাজ করিনি। শুধু লেখালেখি করেছি। আর এখন সারাদিন কিছুই করি না। সকালে একটু লেখা হয়। সময়টা কাটে। বাজার-টাজার করি। এখন হাঁটতে পারি না। কিছুই করতে আর ভালো লাগে না।

বহরমপুরের স্মৃতি

বহরমপুরে আমি পাঁচ-ছ বছর ছিলাম। আগে নিয়মিত যেতাম, এখন যাই না। শরীর পারমিট করে না। বহরমপুর মানে কাশিমবাজারে, মণীন্দ্র কলোনিতে। সেখানে

বাবা জমি কিনে বাড়ি করেন। আমাদের ভাগে তিন বিঘা করে জমি পড়েছিল। আমার ছোটোভাই সেই জমি বিক্রি করে দিতে আরম্ভ করল। বাড়িতে তো দেখার কেউ নেই। মেজভাইও থাকে না। আমাকে ওখানে সবাই রাঙাদা বলে ডাকে। ওরা সবাই আমাকে বলল—রাঙাদা তুমি থাকতে একটা ব্যবস্থা করো। নাহ'লে কার্তিক (আমার ছোটভাই) সব বিক্রি করে দেবে। এখন জমির যা চাহিদা, তুমি রাখতে পারবে না। আমার ছোটোভাইটা খুব গরীব। আমার ভাই আমার ভাগের জমি বিক্রি করে দিচ্ছে। ব'লে কর, না—তা সে করছে না। ভাইকে বলতাম—বিক্রি করে দিচ্ছিস, আমাকে জানাবি না? ভাই বলত—না, আর করবো না। দেখলাম আমার ভাগের তিন বিঘার মধ্যে ভাই বিক্রি করে দেওয়ার পর দেড় বিঘার মতো জমি পড়ে আছে। সবাই বলল—এই জমিটাও আপনি পাবেন না। আমি কী করবো তাহ'লে? সবাই বলল—আপনি জমিটা বিক্রি করে দিয়ে যান। জমিটা আমি তিন লাখ টাকায় বিক্রি করে দিলাম। এখন ভাবি—বাবা জমিটা কিনেছিলেন, ভাইয়ের উপর রাগ করে কাজটা করেছি ঠিকই—এখন আমার ওখানে একটা ছোট্ট ঘর করে থাকতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এখন তো আর ওখানে আমার জায়গা নেই। যদিও এখনও আমার ওখানে যেতে ইচ্ছা করে। আমার কাছে বহরমপুর হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় স্থান। ওখানে আমার ভাইদের বাড়ি আছে। পিসি আছেন। বোনও থাকে কাশিমবাজারে। এখন কেউ যদি আমাকে বহরমপুরে নিয়ে যায়—চলে যাবো।

আমার প্রকাশকেরা

আমার বই বিক্রি হয়। বাংলা বইয়ের এত বিক্রি সোজা কথা নয়। আমার প্রকাশক প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে আমাকে টাকা দিয়ে যান, কিন্তু কোনও হিসেব নেই। প্রকাশক আমাকে কোনও হিসাব দেন না বা আমিও নিই না। প্রকাশকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো তার কারণ আমি প্রকাশকদের সঙ্গে টাকা-পয়সা নিয়ে কোনও ঝামেলা করি না। ওরা যে যা পারত আমাকে টাকা-পয়সা দিত। আমার নিজের কোনও খরচ নেই। বিড়ি-সিগারেট কিছু খাই না। বড়োছেলে ইঞ্জিনিয়ার, ছোটোছেলে ডাক্তার। বড়ো পুত্রবধূ অধ্যাপিকা, ছোটো পুত্রবধূ সরকারি অফিসে বড়ো চাকরি করে। টাকা পয়সার ব্যাপারে এখন আমাদের [illegible] সুবিধা নেই। আমাদের যা আছে—তাতে বেশ ভালোই আছি।

আঁতের কথা

নানা পেশার মধ্যে থাকতে থাকতে যে আমি লেখাটাকে প্রধান পেশা হিসেবে

বেছে নিয়েছিলাম, তা কিন্তু ঠিক নয়। মানুষের জীবন ধারণের জন্য অর্থ উপার্জনের দরকার হয়। তো অর্থ উপার্জনটা আমার লেখা থেকে হচ্ছিল, আমার গল্প উপন্যাসের চাহিদা সৃষ্টি হচ্ছিল, ডিমান্ড বাড়ছিল—আমি কোথাও যাইনি। লেখক হওয়ার আমার কোনও স্পৃহা ছিল না, এটা হয়ে গেছে। আমি লেখক হবো, এর জন্য পড়াশোনা করা, প্রস্তুতি নেওয়া—এসব আমার করা হয়নি। অনেকে লেখক হওয়ার জন্য আগে থেকে প্রিপারেসন নেন, আমার সে-সব কিছু ছিল না। এমনও হয়েছে, অনেক বিখ্যাত বই আমার এখনও পড়া হয়নি। আমি তো লেখক হবো বলে জীবন শুরু করিনি। অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে আমার জীবনটা বয়ে গেছে। এটা আমার সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য জানি না—আমার বন্ধুবান্ধবেরা সবাই আমাকে লিখতে উৎসাহ দিয়েছে। তারা নিজেরাও লিখতো। এই সব করে করেই আমি লেখক হয়ে গেছি। আমি একজন সাধারণ মানুষ। আমার পাওয়ার কিছুই ছিল না। কাকতালীয়ভাবে আমি লেখক হয়ে গেছি।

আমার প্রিয় অগ্রজ লেখক হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অবশ্য আমি নিজের লেখায় বিভূতিভূষণের আদর্শ ফলো করিনি। আমি যে গদ্যটা লিখেছি, সেটা আমার নিজের গদ্য। অনেকে বলেন আমার লেখায় বিভূতিভূষণের স্মেল পাওয়া যায়। ওটা বাজে কথা। বিভূতিভূষণ নিজের মতো লিখেছেন, আমি আমার মতো লিখেছি।

আমার আর এক জনপ্রিয় লেখক বিমল কর। আমার বন্ধু চিত্ত সিংহ আমাকে বিমল করের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। বিমল করের গদ্যটা আমার খুব ভালো লাগত। ওঁর গল্প পড়ে—যে ভাষায় উনি গল্প লিখেছেন তার মহিমা অপূর্ব; ওঁর লেখায় গদ্য বেশি গুরুত্ব পায়, ওঁর লেখা গদ্যের একটা সৌন্দর্য আছে। সেই সৌন্দর্য অনেকে ধরতে পারেন কি না জানি না, কিন্তু আমার এটাই মনে হয়েছে। আমার তো মনে হয় এত বড়ো লেখককে কিছুটা নেগলেক্টও করা হয়েছে। এখন তো বিমল করকে নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্যই নেই।

আমার মনে আছে প্রথম পরিচয়ের পর বিমল কর আমাকে ‘দেশ’ পত্রিকায় গল্প লিখতে বলেছিলাম। একটা গল্প দিয়েছিলাম ‘বোয়ালের পীড় বেঁধেছে’। গল্পটা বিমল কর ‘দেশ’ পত্রিকায় ছাপেননি।

এঁরা জানবেন না—আমি তো পূর্ববঙ্গের মানুষ, বর্ষা হলে পরে আমাদের ধানক্ষেতগুলো জলে ডুবে যায়। জল উঠে আসে, সেই সঙ্গে নানা রকম মাছও উঠে আসে। বিশেষ করে গর্ভবতী মাছ, যে সব মাছের পেটে ডিম এসেছে, তারাও

উঠে আসে। পীড় কথাটার মানে হল সমবেত হওয়া বা ঝাঁক বাঁধা। তা বিমল কর ওই গল্পটা ছাপলেন না, ছাপলেন, 'কালের যাত্রা রূপক মাত্র' নামে একটি গল্প, শুধু 'রূপক মাত্র' নাম দিয়ে।

রমাপদদা (চৌধুরী) একজন ভালো ছোটোগল্প লেখক। উনি উপন্যাসও লিখেছেন, সে-সব যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। কোন লেখক বেঁচে থাকবেন বা থাকবেন না—এ কথা আমার পক্ষে বলা ধৃষ্টতা হবে। তবে রমাপদদার লেখা পড়ে যে আমি সাহিত্যজীবনে কোনও উদ্দীপনা পেয়েছি সে-কথা বলা যাবে না। যেটুকু উদ্দীপনা পেয়েছি বিভূতিভূষণের কাছ থেকে পেয়েছি। আমি ওঁর গদ্য পড়েই উদ্দীপিত হয়েছি। খুব সহজ সরল গদ্য।

মণীন্দ্র রায়ের কাগজ ছিল 'অমৃত'। উনি আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন। ওর তাগিদেই আমার 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', 'অলৌকিক জলযান', 'ঈশ্বরের বাগান', 'মানুষের ঘরবাড়ি' লেখাগুলো হয়েছে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, কিন্তু যোগাযোগ ছিল না। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা খুব মনোরঞ্জন করে, এন্টারটেইনিং। তাঁকে আমরা এন্টারটেইনার বলি। ব্যাপারটা হচ্ছে গদ্যের মধ্যে যে আলাদা সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে হয়, আশুদার সেটা ছিল না। আশুদা গল্পটা খুব ভালোভাবে বলে যেতেন। বিমলদা (কর) যেভাবে গদ্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন, যে-জন্য বিমলদাকে শ্রদ্ধা করতাম, আশুদার মধ্যে সেটা ছিল না।

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' প্রথমে ইন্ডিপেনডেন্ট গল্প হিসেবেই প্রকাশিত হয়েছিল। আমার ব্যাপারটা হল, আমি কোনও গল্প লিখে স্যাটিসফায়েড হতাম না। ভাবতাম এটা তো আরও লেখা যায়, এটা তো আরও বড়ো করা যায়, এর বিস্তার তো আরও বেশি হতে পারে—সেভাবেই লেখাগুলো হয়েছিল। আমি আমার গল্পগুলোকে আমার উপন্যাসের এক একটা চ্যাপটার বলে মনে করি। উপন্যাসের এক একটা গল্প এক একটা ইন্ডিপেনডেন্ট গল্প হতে পারে।

যেমন 'সমুদ্র পাখির কান্না', প্রথমে একটা চার পাতার গল্প ছিল। পরে ওটা একশ পাতার উপন্যাস হয়। 'সমুদ্র পাখির কান্না'-কে বিস্তারিত করে 'অলৌকিক জলযান' উপন্যাসটি লেখা হয়। এক একটা লেখা এমন হয় যে, লেখাটা আমাকে টেনে রাখে—ছেড়ে দেয় না, ভেতরে থেকে যায়। সেই লেখাটা নিয়ে আমার আবার লিখতে ইচ্ছা করে। আমি সেইভাবেই লিখেছি।

আমার মনে হয় 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে একটা শাশ্বত ব্যাপার আছে। দেশভাগ বাঙালির কাছে একটা বড়ো ব্যাপার। বাঙালি মাত্রই দেশভাগের শিকার, বিশেষত যারা পূর্ববঙ্গ থেকে এদেশে এসেছে। তারা সাফারার। সেই সাফারিংটা আমার লেখার মধ্যে আছে। আসলে বেঁচে থাকাটাও যে একটা মহৎ ব্যাপার, যতই দুঃখ-দারিদ্র্য থাক আমি যে বেঁচে আছি—এটাও একটা বড়ো চমৎকার।

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', 'অলৌকিক জলযান', 'ঈশ্বরের বাগান', 'মানুষের ঘরবাড়ি' ইত্যাদি উপন্যাসগুলোর মধ্যে একটার সঙ্গে আর একটার লিংক পাওয়া যায়। তার কারণ এই লেখাগুলো আমার জীবন থেকে উঠে এসেছে, আমার অভিজ্ঞতা থেকে লেখা হয়েছে, কাজেই লিংকটা থেকে গেছে। এই লেখাগুলো পড়লে দেখা যাবে যে আমি একই কথা বারবার বলে যাচ্ছি— এরকম মনে হবে।

আমি নিজেকে একজন ঔপন্যাসিক বলেই মনে করি। আমি যখন একটা গল্প লিখছি, তার মধ্যেও উপন্যাসের বীজটা থেকে যাচ্ছে। পরবর্তীকালে গল্পটাই আবার উপন্যাস হয়ে উঠছে।

আমার জীবনের প্রতিবন্ধকতা ছিল আমাদের অসীম দারিদ্র্য।

যৌনতা জীবনের একটা বড়ো ব্যাপার, জীবনের অঙ্গ। যৌনতা না থাকলে জীবনই থাকতো না। জীবনের অস্তিত্ব যৌনতা থেকেই সৃষ্টি। কাজেই তাকে অস্বীকার করে লাভ নেই।

ইচ্ছা করলেই যৌনতা নিয়ে অশ্লীলতা করা যায়। কিন্তু এটা আমার টেমপারামেন্ট নয়। আমি অশ্লীলতার দিকে যাইনি। জীবনকে আমি যেভাবে দেখেছি, বুঝেছি, সেটাই লিখেছি।

আমি নিজেই লেখার মধ্যে আছি, খণ্ড খণ্ড ভাবে আমি নিজেই বিভিন্ন গল্পে-উপন্যাসে ছড়িয়ে আছি। খণ্ড খণ্ড ভাবে যেমন বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে আছি, একই উপন্যাসেও আবার অনেকগুলো চরিত্রের মধ্যে নিজেকে ভাগ করে দিয়েছি।

আমার লেখার মধ্যে যে ব্যথা আর ক্ষোভ প্রকাশ পায় তার উৎস আমার জীবন। আমার জীবন থেকেই সেগুলো উঠে এসেছে।

লিখেছিলাম 'আসলে বেঁচে থাকার নামই জীবন'। যে যেভাবে বেঁচে থাকে। আমি কখনও ভাবিনি যে লেখক হিসেবে বেঁচে থাকবো। বেঁচে থাকবো কি থাকবো না, সেটা তো ভবিষ্যৎ-নির্ভর। কিন্তু এই লেখালেখির মাধ্যমে এই জীবন অতিক্রান্ত

হবে, সেটা তো আমি ভাবিনি কখনও। কথা হচ্ছে, জীবনকে অতিক্রম করা, আর অতিক্রম করে একটা জায়গায় পৌঁছনো।

স্রষ্টার জীবনব্যাপী সন্ধান কী জন্য? আমরা যে জীবনটা পেয়েছি, সেটাই তো একটা রহস্য। না পেলে তো কিছু করার ছিল না। আমি জন্মেছি, আমি মরে যাবো—জন্ম মৃত্যু দুটোই সত্য। নিষ্ঠুর সত্য। কিন্তু কেন? কেন আমি জন্মেছি, কেন মৃত্যু আমাকে গ্রাস করবে—এগুলো আমাকে খুব চিন্তান্বিত করে। অনুসন্ধানটা হল—আমি কী করলাম? কেন আমি সাধারণ জীবনযাপন না করে লেখক হয়ে গেলাম?

নিজস্ব গদ্য তৈরী না হলে ভালো লেখক হওয়া যায় না। আসলে লেখক যেভাবে চিন্তা করেন, কথা বলেন— তার থেকেই গদ্যটা তৈরী হয়।

'তুমি যা আয়ত্ত করেছ তার কথা লেখাটা জরুরী।' সেটা হল অভিজ্ঞতা—সেই সাফারিং থেকেই লেখাটা উঠে আসবে।

এখনকার সাহিত্যিকদের গদ্যটা হচ্ছে না। গদ্য হবে বিষয় অনুযায়ী। গদ্যের প্রাণ থাকতে হবে। গদ্যটা সৃষ্টি হয় লেখকের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা থেকে। অনেকে সেটা করে নিতে পারেন না। আমি যে-ভাবে ভাববো, আমার গদ্যও সে-ভাবে সৃষ্টি হবে। এক রকম ভাববো আর গদ্য অন্য রকম হবে—তা হয় না। একজন মানুষের টেমপারামেন্ট যেমন, তাঁর গদ্যও সে-রকম হবে। গদ্যেরও প্রাণ আছে। গদ্যের মধ্যে প্রাণ সৃষ্টি করতে হবে।

আমার কোনও দুঃখবোধ নেই। জীবন থেকে যা পেয়েছি তাতেই খুশি।

পরবর্তী কালের লেখকদের লেখা পড়ে মন ভরছে না। মনে হচ্ছে তাদের লেখায় প্রাণ নেই। গল্প-উপন্যাসে সব সময় একটা প্রাণ সৃষ্টির ব্যাপার আছে। উপন্যাসের একটা আলাদা গদ্য আছে, সেটা মকসো করতে না পারলে উপন্যাস লেখা যায় না।

পরবর্তী প্রজন্মের লেখকরা কী লিখবেন সেটা তারা নিজেরাই ঠিক করে নেবেন। আমি বলার কে?

পরবর্তী কালের লেখকদের সবার লেখাই কম-বেশি পড়েছি। সবাইকে আমি বলেছি লেখার যেটা আসল—প্রাণসৃষ্টি, সেটাই তোমরা করতে পারছো না, তোমরা একটা কাহিনি সৃষ্টি করছো। কাহিনি রচনা আর উপন্যাস এক জিনিস নয়। গদ্যের মধ্যে, চরিত্রের মধ্যে সেই প্রাণটা আসবে।

একজন অনুভূতিশীল মানুষ কম-বেশি সবাই। অনুভূতিশীলতা ছাড়া কি মানুষ হয়?

লিখতে গেলে জীবন ও জগৎকে গভীরভাবে জানতে হবে, শুধু লিখলেই তো হবে না।

একজন মানুষকে মানুষ হতে হলে স্বার্থপরতা কমাতে হবে, লোভ-লালসা কমাতে হবে।

পাঠকদের ভালো বই পড়তে বলবো। কিন্তু ভালো বইয়ের সংজ্ঞা কি দেওয়া যায়? আমি ভালো বই বলতে বুঝি যে বইয়ে হৃদয়গ্রাহ্য ব্যাপার আছে, যে বইয়ে প্রাণের কথা আছে—সেই বই।

আমি রাজনীতি বুঝি না। এখনকার রাজনীতি হচ্ছে ক্ষমতা দখলের লড়াই। কাজেই অস্থিরতা থাকবেই। ফলে রাজনীতিকদের কাছ থেকে কী শুভবোধ আশা করা যাবে?

কেউ রাজনীতি করে শুনলেই আমার মনে হয়—দু'পয়সা কামানোর জন্য, নেতা হওয়ার জন্য, বড়ো বড়ো বক্তৃতা দেওয়ার জন্য এরা লালায়িত। কাজের কথা, মানুষের কথা এরা ভাবে না।

আমার নিজের কাছে আমার লেখা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হল 'মানুষের ঘরবাড়ি'। এটা লিখে আনন্দ পেয়েছিলাম। এখনও পড়ে আনন্দ পাই। এটা, আমার বাবা এদেশে এসে যে বাড়ি করেছিলেন, সেই কাহিনি। কী বেদনা, কী ভালোবাসা, কী যে আকৃতি ওই উপন্যাসটার মধ্যে আছে।

সময় বহিয়া যায়...

এখন এই কেষ্টপুরের বাড়িতে আমি আর আমার স্ত্রী থাকি। আর থাকে কাজের লোকেরা। এখান থেকে রাস্তা পার হলেই ছোটোছেলে থাকে—ডাক্তার। বড়োছেলে সোদপুরের দিকে বাড়ি-টাড়ি করে আছে। ওরা এখানে থাকে না। আমি অলস মানুষ। এখন আমার সারাদিনের কাজ ঘুমানো।

এখনও আমার লেখার অনেক বিষয় আছে। কিন্তু আর লিখতে ইচ্ছা করছে না। নতুন লেখারও ইচ্ছা হচ্ছে না। যদি আবার আমার ভিতরে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, তাহ'লে আবার লিখবো। এখনই নতুন কোনও বিষয় নিয়ে উপন্যাস লেখার ভাবনা আমার নেই।

লেখার অন্দর : অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সাক্ষাৎকার : মুকুল গুহ

আমার প্রথম রচনা একটি নাটক, আজ আর নাম মনে নেই। সম্পূর্ণ প্রেমঘটিত ব্যর্থতা থেকেই রচিত হয়েছিল সেই শিশুসুলভ নাটকটি ১৯৫২-৫৩ সালে। তারপর ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রথম লিখতে শুরু করি বন্ধুদের আগ্রহে উৎসাহিত হয়ে। আসলে লেখক হওয়ার ব্যাপারটা মাথায় ছিল না কোনদিনই সেই সময়।

মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহর থেকে একটা কাগজ বেরত 'অবসর'। আমার এক তদানিন্তন বন্ধু-লেখকের সঙ্গে সেই কাগজের অফিসে একদিন গিয়েছিলাম। হঠাৎই তাঁরা আমাকে লিখতে বলেন। তার আগে আমি কোনদিন গল্প লিখিনি, লেখার কথা ভাবিওনি। সেই অনুরোধ আমি ভুলে গেলেও বন্ধুরা চাপ দিতে থাকে। তাঁদের কথা, 'তুমি সমুদ্র থেকে ফিরে যেসব গল্প আমাদের বলেছ সেগুলিই লেখ না কেন?' আমি উত্তর দিই, 'বলা যত সহজ লেখা তত সহজ নয়।' ওরা বলে, 'ধরে নাও আমরা সামনে বসে আছি, তারপর যেমন বলছ এমন করেই লেখ।' সেভাবেই শুরু হয়, আর এখন পর্যন্ত সেভাবেই লিখে চলেছি। প্রথম গল্পটি ছিল 'কার্ডিফের রাজপথ'। ইংল্যান্ডের সাউথ ওয়েলসের পটভূমিতে গল্পটি, ছাপা হয়েছিল ওই 'অবসর' কাগজটিতে ১৯৫৬ সালে। বহরমপুরের সেই তিন জন বন্ধু প্রশান্তকান্তি সেনগুপ্ত, দেবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় ও দেবব্রত সিংহ, এদের উৎসাহেই আমার লেখক হওয়ার চেষ্টা। আমার হাতের লেখা খারাপ বলে বহু লেখা এরা কপি করেও দিয়েছে কতবার।

আমি জন্মেছিলাম ১৯৩৪ সালের' ঢাকা নারায়ণগঞ্জের রাইনাদি গ্রামে। দেশভাগের পর ১৯৪৮ সালে চলে আসি বহরমপুর কাশিমবাজারের মণীন্দ্র কলোনিতে। পরের বছরই বাড়ি থেকে পালিয়ে যাই ট্রাক ক্লিনার হিসেবে। ফিরে আমি হ্যাণ্ডলুম উইভারের কাজ শিখে ফেলি। কাজ জোটাই কলকাতায়। রাতে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে। ১৯৫২-তে বিরক্ত হয়ে আবার পালাই। এবার বোম্বেতে। ফিরে বাড়ি যাই না। কলকাতার ফুটপাতে জায়গা করি থাকার। সেখান থেকেই ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার্স ফোর্সে যোগ দিই ৩০ টাকা মাইনেয়। হালিশহরে। সেখানে দুটো ক্যাম্প ছিল। বেসিক ক্যাম্প আর নেভি ক্যাম্প। আমি বেসিক ক্যাম্পে। কিন্তু নেভি ক্যাম্পে যারা জাহাজ ট্রেনিং নিত তারা অনেক সময় ট্রেনিং শেষে আর

জাহাজে যেতে চাইত না। আমার ইচ্ছে হয় জাহাজে যেতে। রিক্রুটিং অফিসার অধিক্রম মজুমদার আমাকে সুযোগ করে দেন। 'ভদ্রা'তে ট্রেনিং নিই, 'খালাসির ট্রেনিং'। সি ডি সি সার্টিফিকেট পাই। কিন্তু জাহাজে চাকরি পেতে ১ মাস অপেক্ষা করতে হয়। শেষ পর্যন্ত একজন বৃদ্ধ সারেং দয়াপরবশ হয়ে তাঁর জাহাজ 'সিওল ব্যাঙ্ক'-এ কোলবয়-এর কাজে লাগিয়ে দেন। দুবছর ঐ জাহাজেই গোটা পৃথিবীটা ঘোরা হয়। বছর তিনেকের মাথায় ফিরে আসি বহরমপুরে। প্রাইমারি স্কুলে চাকরি নিই। বি. কম. পাশ করি। ডেপুটেশনে বাণীপুরে বেসিক ট্রেনিং নিতে যাই। সেখানেই 'মমতা'র সঙ্গে পরিচয়, বিয়ে। বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন মতি নন্দী। বেকার মতি বিয়েতে আমাকে উপহার দিয়েছিল তার একটা পুরান কলম। সে বছরই অর্থাৎ ১৯৫৮ সালে 'মানিক স্মৃতি পুরস্কার' পাই আমরা তিনজন। মতি নন্দী (ধুলো-বালি-মাটি), পূর্ণেন্দু পত্রী (দাঁড়ের ময়না) ও আমি (সমুদ্র মানুষ)। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত সাঁটুই সিনিয়র বেসিক স্কুলে হেডমাস্টারি করি। সেটা ছেড়ে চাকরি নিই কলকাতার একটা কারখানায়। সাধারণ কেরাণি থেকে সোমেন নন্দীর সেই কারকানার ম্যানেজার হয়ে যাই। ১৯৭১ সালে চাকরিটা ছেড়ে লেখার রোজগারে ভরসা করতে চাই। ১৯৭৬ সালে যুগান্তরে চাকরি, তদবধি সেখানেই। এত কথা ছড়িয়ে বলছি এ কারণেই যে আমার বিচিত্র জীবনযাপনের সঙ্গে আমার সাহিত্য সৃষ্টির নিবিড় সম্পর্ক থাকলেও তারও বাইরে আছে অনেক কিছু যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল আমার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা সংস্কার।

একটা গল্প বলি। একদিন দেখলাম ট্রাম রাস্তার জন্য ভি আই পি রোডে গাছ কাটাই চলছে। মনে হল অনেক শিশু-কিশোর, যুবক বা বৃদ্ধ এই গাছগুলোর সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছে। গাছগুলো কাটার ফলে সেই মানুষেরা নিঃসঙ্গ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে এই ভাবনা দানা বাঁধতে থাকে। তখন গল্পের কাজ শুরু হয়। আমি লেখার আগে কাহিনির কোন স্কেচ করতে পারি না। বেছে নিই সময়। পটভূমি থাকে মানুষ, তারপর গল্প তার গতি নিয়ে নেয়। গৌরকিশোর ঘোষের 'জল পড়ে পাতা নড়ে' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে পড়তে পড়তে আমার 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' লেখার কথা মনে হয়েছিল। উপন্যাসটি পড়ে মনে হয়েছিল, আরে আমিও ত এরকম একটা জীবন ফেলে এসেছি। সেই মনে হওয়া থেকেই দেশভাগ, দেশভাগের কারণ, অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক চেহারা, কীভাবে বিভেদ বিদ্বেষ সৃষ্টি হতে থাকে, দাঙ্গা কীভাবে বাঁধে, সব আমার মনে পড়ে যায়। আমার উপন্যাসটিতে সেসব কথাই আমি লিখতে চেয়েছি।

আমি ভাবি [illegible] চরিত্রগুলিকে তৈরী করে নেওয়া। পরবর্তী সময়ে,

অর্থাৎ উপন্যাস যত এগোয় ততই দেখি চরিত্রগুলি নিজেরাই তাঁদের জায়গা করে নেয়, মিশে যায়। আমার নিজের তেমন ঠিক কন্ট্রোল থাকে না। কোথায় শেষ হবে যেন তাঁরাই ঠিক করে নেয়। এমনও হয় হঠাৎ চলে আসা একটা চরিত্রই শেষ পর্যন্ত মুখ্য হয়ে দাঁড়াল, যেমন 'নীলকণ্ঠ' উপন্যাসের ফেলু শেখ। আমি যা লিখি সবই আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই। মনে হয়নি কখনও তাই যে প্লটের জন্য কোথায় যাওয়া দরকার আছে। কারণ যে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে আমরা রয়েছি তার মধ্যেই রয়েছে শোষণ। ব্যক্তি বিশেষ হিসেবে আমরা প্রত্যেকেই সেই শোষণের হাতিয়ার। এই অবস্থা উপেক্ষা করে কোন লেখা কি সম্ভব? আমার লেখায় তাই বারবার ক্রোধ, সমাজ ব্যবস্থার প্রতি বিরূপতা, তিক্ততা চলে আসেই। আর ঠিক সেই কারণেই উচ্চমধ্যবিত্ত, এমন কি মধ্যবিত্তদের নিয়ে লেখা আমার হয়ে ওঠে না। নিম্ন মধ্যবিত্তরাই আমার রচনায় বেশি। মানুষ হিসেবে আমি ত নিম্ন সংসার থেকেই এসেছি। অনাহারে অর্ধাহারে বড় হয়েছি। আমর আত্মীয়স্বজন অনেকেই অতি দুঃস্থ। আমার ধারণা তাঁরা ঠিকমতন চালাকচতুর নন বলেই দুঃস্থ। তাঁদের হাহাকার তাই আমার লেখার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে। একাকীত্ব বা বিচ্ছিন্নতাবাদ আমি স্বীকার করি না। মনে হয় ২ লক্ষ লোকের মধ্যে ১ জন হয়ত বা বিচ্ছিন্নতার অসুখে ভুগলেও ভুগতে পারে, বাকিরা বানানো বিচ্ছিন্নতার মধ্যে থাকতে চায়। ফলে অন্য কোন সমাজ ব্যবস্থার কথা হয়ত তাঁরা বলতে চায়। আর সেই কারণেই উচ্চবিত্তদের মনে হয় একটা মেকী সভ্যতা গ্রাস করে চলেছে। আর সেই নিরেট, নিস্পৃহ অথচ আত্মসর্বস্ব চাল চলনকে আমি সন্তর্পণে পরিহার করে চলতে চেষ্টা করি। ওই মেকী সভ্যতার প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ক্ষমতার বেলুন উড়িয়ে চলা হয়ত যায়। কিন্তু সাহিত্যের নির্মাণ দাবী করে মাটিতে পা রাখার।

আমার প্রিয়, সবচেয়ে প্রিয় লেখক অবনীন্দ্রনাথ। তাছাড়া আরও অনেকের লেখাই আমি পছন্দ করি। আমার সময়ের শীর্ষেন্দুকে আমি লেখক হিসেবে শ্রদ্ধা করি। তবে কোন নিয়ম কানুন না মেনেই সমসাময়িক সব লেখাই আমি পড়তে চেষ্টা করি, কোন বাছ বিচার করার প্রয়োজন দেখি না। কারণ মানুষের প্রতি বিশ্বাস আর ভালবাসা আমাকে নিশ্চিত অনুপ্রেরণা দেয়। সম্পর্কের গভীরতা আনে। আর তার বাইরে যা কিছু, মনে হয় শ্লোগান। বক্তৃতা যাই শুনি না কেন মনে হয় যেন ক্রমশ একটা অসৎ অসুস্থ পরিমণ্ডলকে আমরা আহ্বান করে চলেছি। অবশ্যই সবাই নয়।

আমার ধর্ম হয়ত বা আছে কিন্তু ঈশ্বর নেই। আর ঈশ্বর নেই বলেই আমি সহজে অভিভূত হ[illegible] আমার বাবাকে নিরুদ্বেগ থাকতে দেখেছি, আমার

স্ত্রীকেও দেখি। তার কারণ তাদের জীবনে ঈশ্বর বর্তমান। কারণ আমি অনায়াসে অনেক কিছু তুচ্ছ করতে পারি। তার কারণ আমার সাহিত্য অনেক কাজের চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে। সেই আনুগত্য আমাকে শেষ পর্যন্ত সাহস যোগায়। ইদানিং অবশ্য, ঈশ্বর কিনা জানি না, কোন এক সর্বময় শক্তির উপস্থিতি যেন অনুভূত হয়। প্রায় ২০ বছরের বেশি সময় নিরলস লেখা সত্ত্বেও আমার উপন্যাসের সংখ্যা মাত্র ৪০। ছোট গল্পও অবশ্য লিখেছি বেশ কিছু। কিন্তু যেকথা বলতে চাই তা হল আমার প্রত্যেকটি উপন্যাসে বা গল্পে ভাষার ব্যবহার ভিন্ন। আমি মনে করি চরিত্রগুলির মতন হবে ভাষা। লেখকের অর্জিত মার্জিত ভাষা নয়। সে কারণেই একটি রচনার নির্মাণপর্বে আমার পরিশ্রম খুবই। তাছাড়া আমি সাহিত্যকে যেহেতু ফটোগ্রাফি বলে মানতে পারি না তাই সমসাময়িক কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে রচনা করা কঠিন। অর্থাৎ আমি একটু দূরে এসে সময়কে দেখতে চাই। আমি একথা আগেই বলেছি—সেই সাংস্কৃতির ধারাবাহিকতা, সেটা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আবহমান কালের যে বাস্তব ঐতিহ্যের মধ্যে আমার জন্ম, যে সংস্কারের রক্তকণিকা আমার ধমণীতে প্রবহমান, যে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারায় আমার অবগাহন, তা কি ভুলে যাওয়া সম্ভব? এই নদী, কোন হরিৎ প্রান্তর, নীল আকাশ অথবা জ্ঞানবৃদ্ধ কারও সামনে দাঁড়ালে আমার সামনে ত ভেসে উঠবেই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সুপারস্ট্রাকচার, যার সামনে কাল তুচ্ছ, এক জীবন অকিঞ্চিৎকর।

আমি তাই ওই প্রাচীন ঐতিহ্য আর আমার বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে আমার নিজস্ব কিছুটা শুধু আমার সাহিত্য রচনায় উপস্থিত করতে চেষ্টা করে চলেছি মাত্র।

১. পরে অন্য লেখায় অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন তাঁর জন্ম ১৯৩০ সালের নভেম্বর মাসে, বাংলা ১৩৩৭ সনের ২২ কার্তিক।

বানান অপরিবর্তিত

দরবারী সাহিত্য, মাঘ ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখোমুখি

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন : সোমনাথ চক্রবর্তী

'সমুদ্র মানুষ' অতীন আজও 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' ছুটে চলেছেন 'অলৌকিক জলযান'-এ চড়ে। 'মানুষের মামুলি কেচ্ছা' তাঁকে বিব্রত করলেও তিনি বিশ্বাস করেন 'জীবনের মহিমা'য়। তাঁর বিশ্বাস 'মানুষের ঘরবাড়ি'তেই জমে ওঠে 'অন্তর্গত খেলা'। 'দুই ভারতবর্ষে'-এর বাসিন্দা অতীন 'ঈশ্বরের বাগান'-এ প্রত্যক্ষ করেন 'মানুষের হাহাকার'। অতি সহজেই অপমানকে 'উপেক্ষা' করে তাকে সুন্দর করলেন। 'ফেনতুর সাদা ঘোড়া'য় চড়ে তাঁর 'সুখী রাজপুত্র' আমৃত্যু ছুটে চলেছে একটি জলের রেখার মতো স্বচ্ছ ভাবনা নিয়ে। তাঁর 'দ্বিতীয় পুরুষ', 'রূপকথার আংটি' পরে মনকে 'নির্বাসন' দেয় 'দূরের আকাশ'-এ। 'মধ্য যামিনী'তে 'দুঃস্বপ্ন' দেখে 'বিদেশিনী'। 'সবুজ শেওলার নীচে' বিচরণ করে 'নীল তিমি', 'নগ্ন ঈশ্বর'-এর বিধানে 'রাজা যায় বনবাসে'। তিনি 'জনগণ'-এর প্রতিনিধি, জীবনের 'শেষদৃশ্য'-এ বিশ্বাস করেন 'দেবী মহিমা'য়।

প্রশ্ন : ঔপন্যাসিক জীবন বেছে নিলেন কেন?

অতীন : আমি ইচ্ছে করে লেখক হইনি। হয়তো লেখক সত্তাটা আমার ভেতর ছিল। আমি যখন জাহাজ থেকে ফিরে এলাম তখন অনেক বন্ধুদের কাছে সেই দিনগুলো সম্পর্কে গল্প করতাম। আমরা তখন বহরমপুরে থাকি। সেখানে থাকার সময় প্রচুর বন্ধুও জুটেছিল। একটা সাহিত্য গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। তারা কাগজ বের করত। আমাকে আমার জীবনের ঘটনা নিয়ে লিখতে বলত। এক্ষেত্রে প্রশান্ত বলে একজন বন্ধুর আবদার ছিল অনেক বেশি। তার আবদার বা জোর—যাই বল, তা থেকে লেখা শুরু।

আপনার প্রায় অনেকগুলো উপন্যাস মহাকাব্যিক। এইসব দীর্ঘ রচনা লেখার রসদ পেলেন কোথা থেকে?

জীবন থেকে। নিজের জীবন থেকে। আমার জীবনে এত ঘটনা ঘটে গেছে—যা আমাকে চালান দিয়েছে। আসলে আমার জীবনটাই তো ঘটনাবহুল এক উপন্যাস। একটা মানুষ স্বচক্ষে দেশভাগ দেখেছে। যদিও তা নিয়ে আমি পরে লিখেছি। দেশভাগের সময় আমার বয়স সতেরো। সমস্ত ঘটনাই আমার উপলব্ধির ভেতর। তবে এ বিষয় নিয়ে যে আমি লিখব তা আমার মনেও ছিল না। সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করব এ বিষয়টা আমার মাথায় ছিল না।

আপনি যখন লিখতে শুরু করেছেন তখন তারাশঙ্কর, বনফুল, সমরেশ বসু এঁরা লিখছেন। আপনার একবারও ভয় করেনি?

না, আমি সে ভাবে ভাবিনি। আমার সে সব মাথাতে ছিল না। তার কারণ হচ্ছে লেখালেখি ব্যাপারটা আমার কাছে খুব কষ্টের। আমি যখন লিখি তখন লিখতেই থাকি। আবার কেউ যখন আমাকে লিখতে বলে তখন আমার খুব বাজে লাগে যে, আমাকে আবার লিখতে হবে। তবে পয়সারও দরকার। এক সময় পয়সার দরকার খুব বেশি ছিল। সেই দরকারের কথা মাথায় রেখেই লিখে চলেছিলাম। কয়েক পাতা লেখার পরেই আমি লেখাতে বেশি মগ্ন হয়ে যাই।

আপনি কি ভেবেছিলেন এঁরা যা লিখছেন লিখুক আমার বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা। তাহলে এঁদের সঙ্গে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতাও নেই?

না, আমি লিখে চলেছিলাম নিজের খেয়ালে। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' যখন লেখা হয় তখন সবাই খুব বাহবা দিয়েছিল। সবার মধ্যে একটা উৎকণ্ঠা—এরপর কী হয় কী হয়। এর পাশাপাশি একটা মুগ্ধতাও গড়ে উঠেছিল, কাজেই বিষয়টা আমাকে টানতে হবে।

উপন্যাসে কোন বিষয়টাকে আপনি প্রাধান্য দিতে চান?

আমি কিন্তু এ সব ভেবে লিখি না। লিখতে বসার সময় আমার কোনো বাঁধা ধরা ছক থাকে না। লেখার সময় নানা চিত্র আমার সামনে ভেসে ওঠে। ঠিক চলচ্চিত্রের মতো। বিষয়ের মধ্যে এতটাই ডুবে যাই কোথায় গুরুত্ব দিতে হবে তা ভাবি না।

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে নীল বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন?

নীল বলতে সেভাবে কিছুই বোঝাতে চাইনি। এই পাখিটার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই আমার সংশয় আছে। নীলকণ্ঠ পাখি বলতে আমি যা বুঝি—যা নেই তার প্রতি মানুষের আকর্ষণ। মানুষ সব সময় ভাবে এই বুঝি তার একটা সুখবর আসবে। সব সময় ভাবে সে কোথাও যাচ্ছে। নীলকণ্ঠ পাখি হল এমন একটা ব্যাপার যার খোঁজে চিরদিন হাঁটতে হয় কিন্তু তাকে পাওয়া যায় না। জন্ম থেকেই এই অন্বেষণ।

অ্যালবাট্রস পাখি সম্বন্ধে সংস্কার কী 'অ্যানসিয়েন্ট ম্যারিনার'এর প্রভাবজাত?

না। জাহাজের খাবার খাওয়ার জন্য অ্যালবাট্রস পাখিগুলো আসত। তারা চড়াই পাখিটাকে খেয়ে ফেলেছিল। সেই চড়াই ছিল সকলের প্রিয়। তাই অ্যালবাট্রসকে মেরে ফেলেছিলাম। গল্পের প্রয়োজনেই মৃত্যু। আর বাকিটা জাহাজিদের সংস্কারকে কিছুটা হলেও গুরুত্ব দেওয়া।

আপনি যে কোলবয়ের কাজটা জাহাজে করতেন তা কেমন ছিল?

সৌভাগ্যবশত কাজটা খুব কঠিন ছিল। জাহাজে তিনটা বাঙ্কার ছিল। কয়লা ঢালতে হত।

"...ছোটবাবু ঢুকে দেখল, কয়লা একেবারে অতলে। সে লম্ফটা হাতে নিয়ে সুটের পাশে দাঁড়াল। চারপাশটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঠিক খাদের নিচে মানুষ একা অন্ধকারে লম্ফ হাতে দাঁড়ালে যেমন দেখায়, তেমনি ভুতুড়ে। সে আর দাঁড়াল না। ডারবান থেকেও কিছু কয়লা নেওয়া হয়েছে। টুইন ডেকের দু'দিকে কয়লার ডাই। এক নাগাড়ে চব্বিশ-পঁচিশ দিন সমুদ্রে ভেসে যেতে হবে। যত ওরা দক্ষিণে নেমে যাবে তত শীত বাড়বে। ডেকের কয়লা মাঝ দরিয়ায় না গেলে ফেলা হবে না হয়তো নিচে। সে এবার বুঝতে পারল ঠিক এক নাগাড়ে ঘন্টা চারেকের মতো কয়লা ফেলতে না পারলে সুট সে ভরাতে পারবে না।

এবং এভাবে এক সংগ্রামের মতো, কখনও কখনও ভয়ে রাতে ঘুম আসে না, সকাল হলেই ওয়াচ, অথবা রাত আটটা বাজলেই ওয়াচ। বাংকে শুয়ে থাকলেও মনে হয়, কেউ যেন অনেক দূরে হেঁকে যাচ্ছে। যোয়ান লোগ টান্টু। এই এক শব্দ অনেকটা টেনি টরেন্টো শব্দের মতো। ...যেন গ্রাহ্য করছে না, সে অন্য সবার মতো কাজ করতে পারছে এটা প্রমাণের জন্য এক মুহূর্ত নষ্ট করল না। দরজার কাছে এসে সে লম্ফটা রেখে এল। মেডিসিন কারটা সে ঠেলে নিয়ে গেল সামনে। সুট থেকে কয়লা দূরে সরে যাচ্ছে ক্রমশ। সে নুয়ে দ্রুত বেলচা দিয়ে গাড়ি ভরে ফেলল। তার পর দুহাতে সামনে ঠেলে দিল গাড়িটা। এখন আর ভারি গাড়িটা মাঝে মাঝে কাত হয়ে পড়ে যায় না। সে ঠিক ঠিক সুটের মুখের কাছে এগিয়ে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে, ঢেলে দিতে পারে, সে গাড়ি টানছে, কয়লা তুলছে, সুটে এনে ফেলেছে, লম্ফটা দপ দপ করে জ্বলছে, আবার কখনও ঘন অন্ধকার, ওকে ছায়ার মতো মনে হয় তখন। সে ঘেমে নেয়ে যাচ্ছে। ওর জামা প্যান্ট ভিজে গেছে।" (অলৌকিক জলযান)

আপনার সমুদ্রযাত্রার সময় সীমা কত মাসের ছিল?

উনিশ মাসের।

আর সমুদ্র যাত্রায় গেলেন না কেন?

ভালো লাগে না, আমি একা থাকতে পারি না। আমি তো সে সব জায়গা দেখে এসেছি। অনেকের সঙ্গে মেলামেশা করেছি। অনেকের সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলেছি। আমার আর সমুদ্র যাত্রার ব্যাপারে কোনো আগ্রহও ছিল না।

'অলৌকিক জলযান'-এর বনি চরিত্রটি কল্পনা না বাস্তব?

প্রায় সকলেই এই প্রশ্নটা করে। সকলেই জানতে চায়; কিন্তু আমি সে সম্পর্কে বলতে চাই না। আমাদের জাহাজে আয়ারল্যান্ড বা ওয়েলস-এর একজন ছেলে ছিল সে আমারই বয়সী। অনেক বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল। বলতে পার তার শারীরিক গঠন, কমনীয়তা, খেয়ালী মন তাকে নারী চরিত্র হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

আধ্যাত্মিক জীবন মানেন?

না, এখনও মানি না। এই যে আমাদের বিভিন্ন ধর্ম আর তার যে সব জীবন—সব গসিপ। সব ধর্মের মধ্যে গসিপ আছে। সব আজব গল্প। গল্প যত আজব হবে তত তা মানুষকে আকর্ষণ করবে। কোরান বল, মহাভারত বল, সমস্ত কিছুতেই আজব কাহিনি আছে।

ধর্ম সম্পর্কে এই বোধ জাহাজি জীবন থেকে না শৈশব থেকেই?

শৈশব থেকেই। আমি বাবার ঈশ্বরকে বলতাম শিলা। বাবা তাকেই বলতেন ব্রহ্মাণ্ড।

'দেবী মহিমা' উপন্যাসে এই ভাবনা থেকেই কী ধর্মের অসারত্ব দেখিয়েছেন?

হ্যাঁ, ধর্ম না থাকলে পৃথিবীতে এত গণ্ডগোল হত না। এরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের কথা ভাবে। ভাবে নিজের ধর্মই সত্য। কিন্তু তা নয়। ধর্ম আসলে অনেক আজগুবি কথায় ভরা। ধর্ম কী বল তো? এই ধর্মের জন্যই তো দেশটা ভাগ হয়ে গেল। হিন্দুরা তো মুসলমানদের নানা ভাবে অত্যাচার করেছে। অস্পৃশ্যতা ব্যাপারটাই খুব খারাপ, ধর্মের কারণে এটা এসেছে। আর মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরী হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে লুণ্ঠিত হয়েছে মানবতা। তাই নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের প্রতি আমার আস্থা বা বিশ্বাস নেই।

আপনি কী ধর্মমতের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে অনেকখানি অনুসরণ করলেন না?

এটাতো আমার নিজস্ব উপলব্ধি, রবীন্দ্রভাবনার প্রভাব নয়। নিজস্ব ধর্মবোধ থেকেই তো আমার লেখা। আমাদের পুরাণের শ্লোকগুলো খুবই উচ্চমার্গের। আমরা কাউকে ছোট করতে চাই না। এগুলি সবই আমাদের ইমাজিনেশন। আমি সেই কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবকে দেখতে চাইছি। এই যে দেবী হিমালয়ে আছেন এটা তো সকলেই মেনে নিয়েছে; কিন্তু তার বাস্তব জীবনে মিল কোথায়? আবার এটাও ঠিক, ধর্ম ছাড়া চলে না। ধর্ম না হলে নিজেকে চেনাও যায় না। নিজের একটা অস্তিত্ব প্রচারের ব্যাপার থাকে তো।

দেশ বিভাগ অনেকের মতো আপনার জীবনের একটা বৃহত্তর ঘটনা, তাই কি রচনাগুলোতে সেকথা বার বার বলতে চেয়েছেন?

দেশ বিভাগ আমার জীবনকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছে। আমার অধিকাংশ লেখাতে তাই দেশ বিভাগ একটা বড় জায়গা করে নিয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনাটাকে কাটিয়ে ওঠা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কী দেশের বাড়িতে ফিরে গিয়েছেন?

না, যাওয়া হয়ে ওঠেনি। বলতে পার যেতে পারিনি। উপন্যাসে যা পাও তা আমার কল্পনার বিচ্ছুরণ মাত্র।

আপনার বিরুদ্ধে এক সময় একটা অভিযোগ উঠত—আপনি যৌনতার কথা বেশি বলেন?

আমি মনে করি যৌনতাই প্রাণ। এতেই আছে জীবনের ঐশ্বর্য।

নরনারীর যৌন জীবন সবার সামনে খোলাখুলিভাবে বলতে আপনার কোন সংকোচ নেই?

তুমি যদি শালীনতা রক্ষা করে এটা বলতে পার তাহলে তো কোন আপত্তি নেই। এটা সম্পূর্ণভাবেই রুচিবোধের ব্যাপার। যৌনতা আছে বলেই জীবনটা এত

সুন্দর। যৌনতাহীন জীবন মৃত্যুতুল্য। একটা মানুষ সারা জীবনে যৌনতার জন্য যে সময় দেয় অন্য কোনো বিষয়ে ততখানি সময় দিতে পারে না। সত্যি কথা বলতে কি পৃথিবীতে ঈশ্বর আর যৌনতা দুটোই শাশ্বত।

"...সুহাসিনীর উত্তপ্ত শরীর। সে অবাক, শরীরের রোমকূপ কত সহজে মানুষ-মানুষীর ভালোবাসা তৈরি করে।

সুহাসিনী লেপ কাঁথার ভিতর ঢুকে যেতেই মিহির টের পেল, সুহাকিনী সম্পূর্ণ উলঙ্গ। ঘনঘোর উত্তাপে মিহির তাকে জড়িয়ে ধরলে সহসা সুহাসিনী উঠে বসল। শাড়িতে কোনরকমে শরীর প্যাচিয়ে ছিটকিনি খুলে বের হয়ে গেল।

সুহাসিনীর কি মাথা খারাপ আছে। কোথায় বের হয়ে গেল।

সেও সঙ্গে সঙ্গে বের না হয়ে পারল না।

না আর পারা যাচ্ছে না।

সুহাসিনী কি করতে চায় সে বুঝতে পারছে না।

তার ঘরটা বাড়ি থেকে খুবই আলগা।

...সুহাসিনী লেপের নিচে ঢুকে গেছে।

নিরিবিলি নির্জন জ্যোৎস্নায় ঝিঁঝির ডাক ভেসে যাচ্ছে।

দরজা বন্ধ।

এবং রতিক্রিয়ার মুগ্ধতা বিরাজ করতে পারত। কিন্তু দুজনেই আনাড়ি। সুহাসিনী মিহিরের হাত টেনে বুকের উপর রাখল এবং সুহাসিনী আর কিছু বলছে না। আর বাকিটা যেন মিহিরের দায়। গোঁসাই তার শরীর নিয়ে কি করবে, তিনিই ঠিক করবেন।

মিহির কিছুটা ভ্যাবলু বনে গেছে।

এত পুষ্ট স্তন।

স্তনের বোঁটা দাঁড়িয়ে গেছে। স্তন বড়ই মজবুত।

কিন্তু মিহির যেন কিছুটা মরার মতই পড়ে আছে। বোধহয় সুহাসিনী আর পারছে না। সে জোর করে লেপের নিচে মিহিরের পাজামা টেনে খুলছে—সুহাসিনী জোরে চুমুও খেল। মিহিরের সাহসে কুলোচ্ছে না—কিন্তু মিহিরের শরীর এতই অধীর যে রমণের আগেই শরীর থেকে সব স্খলন হতে থাকল। অভ্যাস না থাকলে যা হয়, অথবা পুরুষ তার সর্বস্ব ত্যাগ করছে।

আর সুহাসিনী খিলখিল করে হাসছে। বলছে, গোঁসাই আমি ত আছি। ভয়ের কি আছে—চুপচাপ আমার পাশে শুয়ে থাক। ভোর রাতে আমি উঠে যাব। কেউ টের পাবে না। সুহাসিনীর তাপ উত্তাপ বড়ই প্রগাঢ়।

সে তার গোঁসাইকে ছাড়ছে না। জড়িয়ে শুয়ে আছে এবং মুহূর্তে আবার মিহির কেমন উত্তপ্ত হয়ে উঠল, সে সুহাসিনীর উপর উঠে গেল। এবং সুহাসিনী শরীর দিয়ে তার উত্তাপের সব নির্ণয় করতে গিয়ে সহসা চিৎকার করে উঠল, উঃ লাগছে। আস্তে গোঁসাই।

এই 'উঃ' শব্দটির মধ্যেই নিহিত আছে প্রাণী জগতের সব জাগতিক ক্রিয়া, যাকে বলে মন্থন এবং এই যৌনতাই মহাপ্রাণ, প্রাণের ঐশ্বর্য মৃত্যু। মাঝখানে ঈশ্বর শুধু যাদু

নামক পরাবাস্তব।

প্রায় প্রাণঘাতি 'উঃ' শব্দটির পর এমন দুর্ধর্ষ রহস্যময়তা সৃষ্টি হতে পারে মিহিরের জানা ছিল না। সুহাসিনী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। তাকে ছাড়ছে না। কোমর উঁচু করে দিচ্ছে, হাঁস ফাঁস করছে, তবু তাকে ছাড়ছে না। কেমন বেঁহুস এবং মিহির নিজেও নীরব, এই নারীর সহসা এমন উত্তাল হয়ে পড়ায় পাগলের মতো সাপ্টে ধরেছে দু'জন দু'জনকে। তার পর যা হয়ে গেল, ভূমণ্ডল ভেদ করে মিহির যে কোন গভীর অন্ধকারে ঢুকে যাচ্ছে যেন তল নেই এবং এক নির্জনতাপ্রিয় নারী তার শরীরের আগুন নিয়ে এভাবে খেলতে পারে, হুঁস থাকলে পারে না, তার পর দু'জনেই ক্লান্ত অবসন্ন এবং পাশ ফিরে শুয়ে আছে সুহাসিনী" ('জনগণ')

'মানুষের ঘরবাড়ি' উপন্যাসে মানুষ আছে ঘরবাড়ি আছে অথচ উদ্বাস্তু জীবনের কথা কই?

আমি সে ভাবে উদ্বাস্তু জীবনের বর্ণনা করতে চাইনি। বেশ কিছু উপন্যাসে তার উল্লেখ করেছি মাত্র। বলতে পার উদ্বাস্তু জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে আমি উপন্যাসের মেদ বৃদ্ধি করতে চাইনি। সোনা যে জাহাজে কাজ নিয়েছে তা এই দারিদ্র্যপীড়িত উদ্বাস্তু পরিবারটিকে বাঁচাবার জন্য। যদি তুমি আমার ব্যক্তিগত জীবনের কথা বল, তাহলে বলতে হয় সে সময়কার সম্পন্ন গৃহস্থেরা আত্মীয়তার সূত্র ধরেই এপারে চলে এসেছিল। আমার কাকা বহরমপুরে দর্জির কাজ করতেন। দেশ বিভাগের পর উনি বললেন ওখানে আর থেকে কী হবে! বাবা-জ্যাঠারাও বিষয়টা ভেবে দেখলেন, তার পরই সিদ্ধান্ত। তবে বলতে পার এসব কথা উপন্যাসে কোন না কোনভাবে এসেছে ঠিকই কিন্তু আনুপূর্বিক দিইনি, যদি তা দিতাম তাহলে তা তথ্যের নিরস সংকলন হত মাত্র সাহিত্য হয়ে উঠত না।

বিলু চরিত্রটা নিয়ে একটা অভিযোগ আছে। সে উদ্বাস্তু বালক অপেক্ষা রোমান্টিক নায়ক হয়ে উঠেছে, তুলনায় পিলু অনেকটাই সজীব।

বিলু অনেকটাই রোমান্টিক ঠিকই, দ্যাখো বিলু আসলে অলৌকিক জলযানের ছোটবাবুর (সোনা) অন্য নাম। সে যদি রোমান্টিক না হবে তবে সমুদ্রে যাবে কেন? স্কুলের পাঠ শেষ করে কলেজে উঠেছে, তার নিজস্ব একটা জগৎ তৈরি হয়েছে। যে কারণে কলোনির অন্যান্যদের সঙ্গে তার সম্পর্কও কম। আর পিলুর বয়স তো কম। খুবই সংগত কারণেই তার মধ্যে আত্মসচেতনতা বোধের অভাব ঘটেছে। তুলনায় বিলু অনেক বেশি আত্মসচেতন। সেই বোধ তার মধ্যে রোমান্টিকতার চালান দিচ্ছে।

জ্যাঠামশাই, মালতী, ফতিমা, ঈশম চরিত্রগুলো বাস্তব না কল্পনা?

আমার বাবা ছ'ভাই ছিলেন। জ্যাঠামশাই বাস্তব চরিত্র। দাদুর মৃতদেহ দাহ করার পর তিনি যে বার হয়ে গেলেন আমরা তার আর কোনো খবর পাইনি। মালতী আমাদের পাশের বাড়ির নরেন্দ্র দাসের বিধবা বোন, একেবারে বাস্তব

চরিত্র। ফতিমাও বাস্তব। ছোটোবেলার সাথী। ভালো লাগার মানুষ বলতে পার। ঈশম অনেকটাই বাস্তব চরিত্র। আমাদের বাড়িতে রনা ধনা নামে দু'জন চাকর থাকত। তাদের একজনকে এখানে ঈশম নাম দিয়ে তুলে এনেছি।

ঈশম চরিত্রের পরিণতি এত বেদনাদায়ক কেন?

ঈশমের অহংকার ছিল ঠাকুরবাড়ির চাকর হিসাবে। ঠাকুবাড়ির লোকেরা চলে যাবার পর সে তাই অন্য কোথাও কাজ করেনি। সে তার সারাজীবন দিয়ে যে জমি তৈরি করেছিল তা ধরে রাখতে পারেনি। হয়তো ঠাকুরবাড়ির মানুষেরা তা চায়নি। মণীন্দ্রনাথ পাগল হয়েছিল পলিনের জন্য। ঈশম পাগল হয়েছিল তরমুজের জমির জন্য।

রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে ঠাকুরবাড়ির মানুষেরা উদ্বাস্তু হয়েছিল আর ঈশম উদ্বাস্তু হয়েছিল ঠাকুরবাড়ির অভিভাবকদের হৃদয়হীনতায়। তাকে প্রায় জোর করেই উদ্বাস্তু করা হয়েছিল তার প্রাণের চেয়েও প্রিয় তরমুজের জমি থেকে।

তোমার ভাবনার সঙ্গে একমত।

দেশ বিভাগ, উদ্বাস্তুজীবন ইত্যাদি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাগুলি লিখতে যতটা পটু অন্য কাহিনির রচনায় আপনার কলম ততটা সাবলীল নয় কেন?

দ্যাখো, আমি বাড়িয়ে লিখতে পারি না। যদিও বা লিখি সেখানে আমার হৃদয়ের যোগাযোগ অনেক কম। আর এই ঘটনাগুলোই তো আমার সত্তার গভীরে ডুবে আছে। তাই এ বিষয়ে লিখতে বসলে আমাকে কিছুই করতে হয় না। লেখা আপনি কলমের ডগায় চলে আসে।

সেজন্য কী পারিবারিক পরিমণ্ডলের বাইরে বেশি লেখা হল না?

প্রথমেই বলেছি আমার জীবনটাই তো একটা উপন্যাস। একে বাদ দিয়ে বানিয়ে লিখি কী ভাবে?

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' সিরিজের পর আর সেভাবে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বের হল না কেন?

মানুষের একটা বয়স পর্যন্ত সে যা করতে চায় তাই সুচারুভাবে সম্পাদন করতে পারে। আমার ৪০-৪১ বছর বয়সের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি লিখেছি। আমার তো মনে হয় একজন লেখক ৩৫-৫০ বছর বয়সের মধ্যেই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা কর্মগুলো তুলে ধরতে পারেন। ষাট বছর বয়সের পর লেখার ধার অনেকটাই কমে যায়। এটা প্রায় সবার ক্ষেত্রেই ঘটে। সে তুমি আগের রচয়িতাদের কথাই বল বা বর্তমানে যারা লিখে চলেছেন তাঁদের কথা। কখনও কলোত্তীর্ণ হয় না।

বানান অপরিবর্তিত।

'এবং মুশায়েরা' প[illegible] প্রকা[illegible]র অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় : এক অকথিত জীবন ও দর্শন

আলাপচারিতায় : কল্যাণ মৈত্র

একটা সিগনেচার নভেল—'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' আর তার লেখক দুই-ই আজ প্রায় সমার্থক—কীভাবে লিখলেন এই উপন্যাস?

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' প্রকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিক 'অমৃত' কাগজে। এর আগে অনেক উপন্যাস লিখেছি, তবুও অনেকে মনে করেন 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' আমার প্রথম উপন্যাস। 'সমুদ্র মানুষ'ই আমার প্রথম উপন্যাস। তারপর 'একটি জলের রেখা, ওরা তিনজন', 'শেষদৃশ্য' এবং সম্ভবত 'বিদেশিনী'। সেটা উনিশশো আটষট্টি সাল। অমৃত পত্রিকার সম্পাদক তখন কবি মণীন্দ্র রায়। একদিন মণিদা আমাকে ফোন করলেন, যেন ওঁনার সঙ্গে দেখা করি—দরকার আছে। 'অমৃত'-তে ছোটগল্প, বড়গল্প লিখেছি। ধারাবাহিক বা উপন্যাস লিখিনি। 'অমৃত' পত্রিকা অফিসে গেলাম। মণীন্দ্র রায় বললেন, আমাদের ইচ্ছে এবার আপনি একটা ধারাবাহিক লিখুন। বললাম, মাথায় তো কিছুই নেই—কী বিষয় নিয়ে লিখব? সেই সময় 'কিংবদন্তির সূর্য' নামে ছোট একটা উপন্যাস লিখি 'এক্ষণ' পত্রিকায়—সম্ভবত পূজা সংখ্যায়। আমার মাথায় তখন অবশ্য একটা লেখা খুব অদৃশ্যভাবে খেলা করছিল। এই আমরা যে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে এলাম—সেই বেদনার ওপর কিছু রচনা করা যায় কিনা...এর আগে এই সব যখন ভাবছি তখন মনে পড়ল অনেক কিছুই। দেশভাগ হতেই চলে এসেছি—ছিন্নমূল আমরা—এসব নিয়ে তখনও প্রায় কিছুই লিখিনি। আমার এইসব ভাবনাগুলো একে একে জড়ো হচ্ছিল—পরপর কতকগুলো ছোটগল্প লিখে ফেললাম। আরও অন্য কিছু লেখা লিখছি।

মণীন্দ্র রায়কে বললাম, দেশভাগ বিষয় নিয়ে লিখতে চাই। কিছু গল্প লিখেছি ওই বিষয়কে নিয়ে—গল্পের ফর্ম-এ, উপন্যাসের অংশ বিশেষ মাথায় রেখেই লিখেছি। মণীন্দ্র রায় বললেন, দেশভাগ নিয়ে তাহলে ধারাবাহিক লিখুন। কিন্তু একটা প্রশ্নচিহ্ন এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। জটিলতা তৈরি হল। ভাবছি কী করব। কেউ কেউ বলতে শুরু করলেন, আবার 'অমৃত'-তে দেশভাগ নিয়ে লেখা? এই তো কিছুদিন আগেই একটা ধারাবাহিক একই বিষয় নিয়ে লেখা হল! 'কেয়াপাতার নৌকা'—লেখক প্রফুল্ল রায়—তাহলে? মণীন্দ্র রায়কে যখন প্রস্তাবটা দিই তখন তিনি বলেছিলেন—লিখুন না। আমি বললাম, আগে একটা ধারাবাহিক যে বিষয় ছিল সেই দেশভাগ।

উনি বললেন তাতে কিছু আসে যায় না। এরপর আমি একটা শর্ত দিলাম—আমার যে সব গল্প ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তার পুনর্মুদ্রণ করতে হবে। ওগুলি পরপর ছাপা হওয়ার পর আমি ধারাবাহিকের কিস্তি দেব। কেননা ওই গল্পগুলি আমার প্রস্তাবিত ধারাবাহিক উপন্যাসের অংশবিশেষ। এই গল্পগুলির মধ্যে ছিল—'কালনেমি', 'হৃদয় একমাত্র বাহক' (*এই দুটি গল্প দেশ পত্রিকাতে বের হয়েছিল*), আর হল 'মাশুল'— 'অমৃত'-তে প্রকাশিত হয়েছিল। সঙ্গে ছিল 'কিংবদন্তির সূর্য' এবং আরও কিছু বড়গল্প। সব মিলিয়ে বারো-তেরোটি গল্প।

সব ঠিকঠাকই ছিল। মণীন্দ্র রায় এই শর্তেও রাজি ছিলেন। তারপর হঠাৎ একদিন বললেন, অতীন একটা অসুবিধা হয়েছে—দেশভাগ নিয়ে লেখা ইতিমধ্যেই হয়েছে। আবার বললেন, তবে তোমার লেখা তোমার মতোই হবে... শুরুতেই জটিলতা—আমি অস্বস্তিতে পড়লাম। তারপর একদিন লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হল। তিনিও বললেন, দেশভাগ নিয়ে লিখবেন আপনি? মণীন্দ্র রায় আবার বললেন, ওই সাবজেক্ট বাদ দিন। নতুন বিষয় নিয়ে লিখুন না। আমি বললাম, আমাকে যদি লিখতে হয় তো আমি ওটাই লিখব। তারপর দীর্ঘদিন অমৃত-অফিসমুখো হলাম না। কিছুদিনের মধ্যে মণীন্দ্র রায় আমাকে আবার ফোন করলেন, আমি বললাম, দেশভাগ ছাড়া কী নিয়ে লিখব বলুন তো—আমি যে এখন ওই একটা বিষয় নিয়েই ভাবছি। মণীন্দ্র রায় বললেন, লিখতে শুরু করুন। আমার মধ্যে একটা দ্বিধা ছিলই, প্রথমেই বাধা—কী হবে না হবে—কুণ্ঠার সঙ্গে লিখতে শুরু করলাম। পুরোনো গল্পগুলি যথারীতি ছাপা হল। তারপর প্রায় ষাটটা কিস্তি লিখলাম। প্রচুর চিঠি এল পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আমার সমসাময়িক লেখক, বন্ধুও—সে বলল, 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' বাংলা সাহিত্যে আলাদা একটা প্রত্যয় তৈরি করেছে। 'পথের পাঁচালী' 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র পর আমার ওই উপন্যাস—এমন কথাও উঠল। আমি ভীষণ উৎসাহবোধ করছি। অশোক মিত্র (*মান্য অর্থনীতিবিদ*) আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। উনি আমায় জিগ্যেস করলেন—এমন গদ্য তৈরি হল কী করে?

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কিছু প্রকাশ করতে পারি, কিছু পারি না। আমার গদ্য ভালো লাগছে সেটাই বড় আনন্দের।

এই সময় আপনার বয়স কত?

ছত্রিশ বছর। আটচল্লিশে দেশ ছেড়েছি। তখন আমার সতেরো বছর বয়স। উনসত্তর সালে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' শুরু হয়। সত্তরে শেষ করি। মনে পড়ছে, আমার এই লেখার আগে গৌরকিশোর ঘোষ লিখেছিলেন 'জল পড়ে পাতা নড়ে'।

তাতে পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গের লেখাগুলি আমাকে আপ্লুত করে। আমি ভাবলাম আমিও তো লিখতে পারি। যাঁরা আগে লিখেছিলেন তাঁদের মতো যেন আমার লেখা না হয়। গ্রামের কথা, মাটির কথা, মানুষের কথা—এসব আমায় লিখতে হবে। দেশভাগ দেখেছি, বাড়িঘর ভাঙা দেখেছি, গাছপালা কেটে সাফ করা দেখেছি। চোখের সামনে সব শেষ হতে দেখেছি। আমার পাগল জেঠা, বাবা—তাঁদের কথাবার্তা, আমার ওপার বাংলার প্রতিবেশীরা এই সবই আমার চরিত্র হয়ে উঠল। এই সব চরিত্র যে পরিবেশ থেকে উঠে এসেছে তার স্পষ্ট ছাপ আমার উপন্যাসে পড়েছে। অত্যন্ত পরিচিত প্রকৃতি থেকে লেখা 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'। মানুষ যে প্রকৃতি আর পরিবেশে বড় হয় তার সঙ্গে তার একটা সহজাত বন্ধুত্ব তৈরি হয়। এটা যে কী তারাই বুঝবে যারা কোনও গ্রামে বড় হয়েছে। এই যে কৃষকদের জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে চারপাশে—যার জমি যাচ্ছে সেই বুঝতে পারছে কী চলে যাচ্ছে। জমি মানুষের প্রাণের জিনিস। কৈশোরে দেশভাগ আমাকে খুব দুঃখ দিয়েছিল। দেশভাগ না হলে বাংলাদেশের মুসলিমরা তাঁদের আত্মসম্মান আর আত্মপরিচয় ফিরে পেতেন না। মুসলিমরা শোষিত ছিলেন—দেশভাগ তাদের উপকার করেছে। মুসলিমরা ছিলেন বড় গরিব। ওঁদের কিছু যে ধনী ছিলেন না তা নয়—তবে ওঁদের বেশির ভাগই হতদরিদ্র ছিলেন, ওঁদের অভিযোগ ছিল—ডাক্তার, উকিল যা কিছু সব হিন্দু। এঁরা মুসলিমদের মধ্যে একটা বিভেদ তৈরি করছিলেন। আমি অবশ্য সেই সব বিভেদকে (?) লেখায় ধরার চেষ্টা করিনি। আমি বরাবর চেষ্টা করেছি নতুন করে কিছু দেখার। যে প্রকৃতির মধ্যে গোটা জীবনটাকে দেখেছি—মানুষের ঘরবাড়ি—তার জীবনযাপন, তাই লিখেছি। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'-র চরিত্রেরা যেমন ঈশম সেখ, পাগল জেঠামশাই, জালালি—এরা সব আমার দেখা চরিত্র। আমি যে এদের মধ্যেই বড় হয়েছি। আমার বাবা, মেজোজেঠা সত্যিই জমিদারবাড়িতে কাজ করতেন। আমি আমার এই উপন্যাসে একটা সামাজিক, প্রাকৃতিক সম্পর্ককে ধরার চেষ্টা করেছি। হিন্দু-মুসলমান বলে নয়—মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কের গভীরে যাওয়ার চেষ্টাই এখানে প্রধান।

অশোক মিত্র-র মতো মানুষ বললেন, এমন গদ্য পেলেন কোথায়—সত্যিই এমন গদ্য-ভাবনা এবং রীতি আপনি রপ্ত করলেন কীভাবে?

এই গদ্য একেবারে আমার গদ্য। নিজের ভাষা। একবার সিরাজও বলেছিল, এ গদ্য পেলি কোথায়? আলাদা ঘ্রাণ আছে যে। নিশ্চয়ই চর্চা করেছিস। আমি একই গদ্যরীতি ফলো করিনি। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'-র গদ্য আর 'সমুদ্র মানুষ'-এর গদ্য আলাদা।

আপনার গদ্য নিয়ে বিমল করের একটি মন্তব্য স্মরণীয়। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে আপনার পঞ্চাশটি গল্পের যে সংকলন প্রকাশিত হয় তার ভূমিকায় বিমল কর লিখেছিলেন, "অতীন যখন তরুণ লেখক, সাহিত্যজীবনের সেই গোড়ার পর্ব থেকেই তাঁর নামের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল। মফস্বলবাসী এই নবীন লেখককে তখন চোখেও দেখিনি। মাঝেসাঝে দু'চারটি লেখা নজরে এলে পড়ার চেষ্টা করেছি। কোনও সন্দেহ নেই, গোড়া থেকেই মনে হয়েছে, অতীনের লেখায় অন্য ধরনের একটি স্বাদ আছে। সেই সব লেখায় শহুরে স্বাদ ছিল বলে আমার মনে পড়ে না। পরিবেশ হয়তো গ্রাম্য ছিল, তবে সেই গ্রাম্যতা মামুলি নয়, সাধারণ পল্লীকাহিনীর অনুসরণও নয়। বরং অতীনের লেখায় বর্ণনায় চরিত্রসৃষ্টিতে কেমন যেন এক অস্পষ্ট অথচ সরল ছবি ফুটে উঠত। মনে হত, নতুন এক ঘ্রাণ অনুভব করছি।"

আমি বিমল করের একজন অনুরাগী। উনি যা বলেছেন তাতে আমি উপকৃত হয়েছি। উৎসাহিত হয়েছি। এই 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাস পড়ে কত মানুষ যে আমাকে কত উৎসাহ দিয়েছেন যে কী বলব। আমি পাঠকদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। সেদিন একটি বাড়িতে গিয়েছি। গৃহকর্তা বললেন, আরেকটু বসুন। আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে চান। পাশেই থাকেন। আপনাকে দেখতে চাইছেন... আমি বললাম—ডাকুন। সেই মানুষটি এসেই বললেন, আপনাকে একটু ছুঁয়ে দেখব। স্পর্শ করতে ইচ্ছে করছে—কিছু মনে করবেন না তো। তারপর বললেন, আপনার ওই উপন্যাস পড়ে দু'দিন স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম। আরেকবার ঢাকাতে গিয়েছি। একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে। সুনীল, শক্তি ওরাও সে সময় ওখানে। সুনীল কালো রঙের একটি মেয়েকে নিয়ে এল। বলল, আপনাকে দেখতে চায়, তাই নিয়ে এলাম। ও আমেরিকায় থাকে। মেয়েটির সাগরময় ঘোষের এক আত্মীয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। মেয়েটিকে বিয়ে করে ছেলেটি আমেরিকায় চলে যায়। তারপর মেয়েটি ছেলেটিকে খুঁজতে সেখানে যায়। কিন্তু খোঁজ পায় না। একটি মুসলিম ছেলে তাকে সাহায্য করেছিল সে সময়। তারই বদান্যতায় সে আমেরিকায় থাকতে পারে। ইতিমধ্যে দু'জনের মধ্যে ভালোবাসা হয়—মেয়েটির মন সায় দিচ্ছিল না। হিন্দু-মুসলিম বিবাহ? 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' পড়ে তার সে দ্বিধা দূর হয়ে যায়। ছেলেটিকে সে বিয়ে করেছে। সে কথাই সে আমাকে বলতে এসেছিল।

জাহাজে কোলবয়ের কাজ নিয়ে গেলেন—সেটা কোন সময়?

বাহান্ন-তিপান্ন সাল হবে। জাহাজে চড়ে গেলাম... তখন জলে কেটে গেল সময়। দীর্ঘ সফর করে ফিরে এলাম। যখন ফিরে এলাম মনে হল আমি যুবক হয়ে গিয়েছি। আমি তো ট্রাক ক্লিনারেরও কাজ করেছি। তারপর শিক্ষকতাও। কখনও নাবিক, কখনও ট্রাক ক্লিনার, কখনও শিক্ষক।

লিখতে শুরু করলেন কবে?

বন্ধুদের আগ্রহে প্রথম গল্প 'কার্নিভালের রাজপথ' লিখি। বহরমপুরের অবসর

পত্রিকায় ১৯৫৬ সালে লেখাটি প্রকাশিত হয়। পরের বছর উত্তরকাল পত্রিকায় লিখি 'ফ্রেন্ডশিপ'—সেই বছরই প্রকাশিত হয় 'বাদশা মিঞা'। সংকেত পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'চিত্রকল্প'। সেই সময়ে বহরমপুরে শক্তিমান একটি সাহিত্য গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল এই পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করে। আর ১৯৫৮ সালে প্রথম কলকাতার কাগজে ছাড়পত্র পাই—যুগান্তর সাময়িকীতে 'পোড়া কয়লা' নামে গল্পটি প্রকাশিত হয়।

এই গল্পগুলি দেখি না কেন কোনও সংকলনে?

এই সব গল্প আর আমার হাতের কাছে নেই। কোথায় হারিয়ে গেছে। ১৯৬২ সালে প্রথম দেশ পত্রিকায় গল্প লেখার সুযোগ পাই। তারপর থেকে আনন্দবাজার, অমৃত, দেশ, এক্ষণ, চতুরঙ্গ এবং অনেক লিটিল ম্যাগাজিনে নিয়মিত গল্প প্রকাশ হতে থাকে। এইসব পত্রপত্রিকারও অনেক গল্প আমার হাতের কাছে নেই। এবং কিছু গল্পের নামও ভুলে গেছি। দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 'কালনেমি', 'হৃদয় একমাত্র বাহক', এক্ষণে প্রকাশিত 'কিংবদন্তির সূর্য', অমৃত-তে প্রকাশিত 'মাশুল' এবং এভাবে অজস্র লিটলম্যাগে প্রকাশিত অনেক গল্পই কোনও না কোনও উপন্যাসের পরিকল্পিত খণ্ড হিসাবে যুক্ত হয়েছে। আসলে দেশ পত্রিকায় লেখার পর থেকেই আমি সাহিত্যিক হিসাবে চিহ্নিত হই। সম্ভবত এই সময়টা হবে বাষট্টি সাল।

'সমুদ্র মানুষ' আপনার প্রথম উপন্যাস?

হ্যাঁ। 'সমুদ্র মানুষ' লিখেছিলাম বন্ধুদের আগ্রহেই। উল্টোরথ পত্রিকা 'মানিক স্মৃতি' পুরস্কার ঘোষণা করল। সেই সময় লিখি ওই উপন্যাস। দেবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়, সাধন চৌধুরি, প্রশান্ত সেনগুপ্ত—আমার এই বন্ধুরা অনুরোধ করল—লেখ, লেখ। পাঠিয়ে দিলাম। বহরমপুরের এই বন্ধুরা পরে কলকাতায় চলে আসে। শুনেছি, সেই সময় পুরস্কারের যাঁরা বিচারক ছিলেন তাঁদের মধ্যে লীলা মজুমদার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও ছিলেন। ওঁরা নাকি বিশ্বাসই করেননি যে একজন বাঙালি লেখক এরকম লেখা লিখতে পারে। ভেবেছিলেন আমি কোনও ইংরেজি উপন্যাস থেকে টুকে দিয়েছি। আমার উপন্যাস—'সমুদ্রমানুষ'—প্রতিযোগিতায় তৃতীয় হয়। দ্বিতীয় পুরস্কার পান পূর্ণেন্দু পত্রী তাঁর 'দাঁড়ের ময়না'র জন্য। প্রথম হয় মতি নন্দী।

'সমুদ্র মানুষ' আপনাকে খ্যাতি দিল...

আমি লেখক পরিচিতি পেলাম। আমি বরাবরই ইনটেলেকচুয়ালদের ভয় পাই। ওই সময় আঁতেলদের অনেকেই একটু ঠোঁট বেঁকিয়েছিল।

সাহিত্যিক বিমল করের আপনি অনুরাগী—প্রায় গুরু-শিষ্য সম্পর্ক... ওঁর সাহিত্য আড্ডায়ও নিয়মিত যেতেন—এই সম্পর্ক আপনাকে অনুপ্রাণিত করেছিল, তাই না?

কার্জন পার্কে আমাদের আড্ডা বসত। আমাদের মানে বিমলদার আড্ডা—ওঁকে

ঘিরেই সব। তখনও আমি কাশিমবাজার রাজবাড়িতে থাকি। ওদেরই একটা কোম্পানিতে চাকরি করি, ওদের একজনের ছেলেকে পড়াই, সব মিলিয়ে আড়াইশো টাকা মাইনে। সেটা ওই তেষট্টি-চৌষট্টি সাল। ওদের ওখানে দশ বছর ছিলাম। বিমলদার আড্ডায় শীর্ষেন্দু, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শিশির চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন আচার্য আসত। ঘন্টাখানেকের আড্ডা। বিমলদা প্রায়ই কে.সি. দাশের দোকানে নিয়ে গিয়ে আমাদের মিষ্টি খাওয়াতেন। বিমলদা সেই সময় সিঁথির কাছে থাকেন। তার আগে টালাপার্কের বাসায়। টালাপার্কে ওই সময় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গৌরকিশোর ঘোষরা থাকতেন। তখনও আমি ঠিক লেখক হইনি—সবে 'সমুদ্র মানুষ' বেরিয়েছে। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের বাড়িতে তখন আমাদের খুব আসা-যাওয়া। সাহিত্যের আড্ডা হত। বিমলদার সঙ্গে তারপর আড্ডা, একসঙ্গে বাসে ফেরা—তারপর নানা কথা। বিমলদার সাহায্য না পেলে বোধহয় আমি লেখকই হতাম না।

দেখা হলেই বিমলদা বলতেন, কী অতীন, ছ'মাস হয়ে গেল, একটা গল্প দিলে না? আমি বলতাম, কী হবে গল্প লিখে! আপনি পেঁচার মতো মুখ করে থাকেন। উনি বলতেন, তোমার হাতের লেখা এত খারাপ যে, কেউ তোমার প্রুফ দেখতে চায় না। আমার প্রুফ দেখতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। বিমলদার সঙ্গে আমার ছিল অন্তরের যোগাযোগ—যাকে উনি ভালোবাসতেন, তার জন্য সব দিতে পারেন। বিমলদার লেখারও আমি বিশেষভাবে অনুরাগী। ওঁর গদ্য অপূর্ব—রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের লেখক হিসেবে তিনি বিশেষভাবে চিহ্নিত। রবীন্দ্রনাথের পরে প্রায় সকলেই তাঁকে অনুসরণ করেছেন। ব্যতিক্রম তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিমলদার গদ্যরীতি ছিল একেবারে ভিন্ন ধারার—কম এক্সপেরিমেন্ট তিনি লেখা নিয়ে করেননি। আগেই বলেছি, নিজস্ব গদ্য তৈরি না হলে ভালো লেখক হওয়া যায় না। ওই সময় কিছু লেখকের মধ্যে নিজস্ব গদ্যরীতি ফুটে উঠেছিল। বিমল কর এঁদের মধ্যে প্রধান।

বিমল কর নিজেই আপনার সঙ্গে তাঁর এই সম্পর্কের কথা লিখেছেন। সেই লেখা মনে হয় সাহিত্যের একটি দলিল—যা আপনাকে খুব কাছ থেকে চিনিয়ে দেয়—...

আমি যা লিখেছি অন্তর থেকেই। উনি আমায় চিনেছিলেন।

কীভাবে আপনাদের পরিচয় হয়েছিল?

চিত্ত সিংহ ভালো লিখত। ওর বাড়িও ছিল তখন পাইকপাড়ায়। একদিন বিমল কর সেখানে এসেছেন। চিত্ত নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিল। এই যে আপনার 'সমুদ্র মানুষ'-এর লেখক। বিমলদা বললেন, 'দেশ' পত্রিকায় লিখুন না। এই সময় আমি বহরমপুরে থাকি। সাটুই গ্রামের সিনিয়র বেসিক স্কুলের হেডমাস্টার। স্কুল

করি—তারপর সারাদিন অবসর। লিখলাম 'বোয়ালের পীড় বেঁধেছে'—নামে একটি গল্প। বর্ষার সময় আষাঢ় মাসে—উজানের সময় গর্ভবতী বোয়াল উঠে আসত। জলের মধ্যে অন্য বোয়ালগুলি তার পেট ফাটিয়ে ডিম বের করে দিত। একটা ছেলে দেখছে এসব কৌতূহলে। সে-ই আবার এক সময় বাড়িতে গিয়ে দেখল তার মা আঁতুড়ঘরে ঢুকেছে। দরমার বেড়ার ফোকর দিয়ে দেখা যায় কী হচ্ছে ভেতরে। ফাঁক দিয়ে সে দেখার চেষ্টা করছে আঁতুড়ঘরের ভেতরে কী হচ্ছে—ভেতরে কাঠের আগুন জ্বলছে—গরম জল হচ্ছে—তিন-চারজন বসে আছে তার মায়ের পাশে। বোয়াল মাছের সঙ্গে মানুষের জন্মের একটা সম্পর্ক খুঁজে ফেলার চেষ্টা ছিল ওই গল্পে।

গল্পটা লিখে পাঠালাম বিমলদাকে। দু'তিন মাস পর কলকাতায় এসেছি। তখন মতি নন্দীর বাড়িতে প্রায়ই যেতাম। ওর মা খুব খাওয়াতে ভালোবাসতেন। সেবার 'দেশ' অফিসে খবর নিতে গিয়েছি—বিমল করের সঙ্গে দেখা করতেও। গল্পটার কী হল জানতে চাইছি। বিমল কর কেউ গেলে তাকিয়ে থাকতেন, তারপর মুখ নিচু করে ফের লিখতেন—কথা বলতেন না। এটাই তাঁর স্বভাব ছিল। বসে আছি। উনিও চুপ করে বসে আছেন। হঠাৎ একসময় বললেন, 'গল্পের এই লাইনটা কেটে দিয়ে যান। মার বাচ্চা হচ্ছে দেখছে ছেলে... ওটা যাবে না। নতুন লেখা দিন।' আমি ইতস্তত করছি। উনি বললেন, 'গল্পটা ভালো হয়েছে। তবে প্রমাণ করুন আপনি লেখক। নতুন গল্প চাই।' ওঁর মুখের ওপর কথা বলার সাহস তখন কার ছিল? ওঁকে সমীহ করতাম, শ্রদ্ধাও করতাম। আরেকটা লিখে পাঠালাম সাটুই থেকে। মণীন্দ্র কলোনিতে তখন থাকি। সেই গল্পের নাম ছিল 'কালের যাত্রা রূপক মাত্র'। উনি নাম দিলেন 'রূপক মাত্র'। রূপকধর্মী গল্প। বিমলদা 'গল্প দিন', 'গল্প দিন' করতেন বলেই হয়তো লিখেছি। এত আগ্রহ করে গল্প চেয়ে নিতেন।

'বোয়ালের পীড় বেঁধেছে' গল্পটা কী করলেন?

ওটা 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'-র একটা অংশ হয়ে গেল।

কখনও আপনার কোনও গল্প পছন্দ না হয়ে ফেরত এসেছে?

না। এরপর আর আসেনি।

অনুরোধ সত্ত্বেও লেখেননি...

পারিনি তো। অনেক কথাই রাখতে পারিনি। অনেককেই খুশি করতে পারিনি। জোর না করলে আমার লেখা হয় না।

এই যে বললেন বিমল কর না থাকলে আপনি লেখক হতেন কি না...

ওঁর সাহায্য, উৎসাহ কত পেয়েছি জীবনে, কত কিছু শিখেছিও। মুগ্ধ হয়ে

এক সময় ভাবতাম বিমলদা অমন লেখেন কীভাবে? কম লিখতেন অবশ্যই। ছোটগল্পের গদ্যরীতি নিয়ে ওঁর কথা বলা হয়—উনি অনেক কিছুর প্রবর্তন করেছিলেন। আমার মনে হয় ওঁর উপন্যাসগুলিতে ওঁর লেখার গাম্ভীর্য ধরা পড়ে। ওঁর লেখার বড় গুণ ডিটেলস। যা বিস্ময়কর। আর্টিস্টিক। আমাদের মাথাতেই আসেনি ওসব। চেষ্টা করলেও পারব না।

তখন আমার খুব অভাব। কাশিমবাজার রাজবাড়িতে থাকি। ওখানেই বসে লিখছি 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'। অন্যান্য অনেক লেখাও ওখানেই লেখা। আমার জীবনে একটা ফেজ ওটা। অর্থাৎ 'সমুদ্র মানুষ' থেকে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' পর্যন্ত আমার একটা জীবন ও তার ধারাপাত। এর মধ্যে লেখা 'সমুদ্রপাখির কান্না', 'একটি জলের রেখা, ওরা তিনজন'—তারপর 'শেষ দৃশ্য', 'বিদেশিনী'।

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসই আপনাকে প্রতিষ্ঠা এনে দিল, তাই না?

বলা যায়। আমার পাঠকসংখ্যা বাড়ল। অর্থকষ্ট ঘুচল।

তারপর?

আবার মণীন্দ্র রায় লিখতে বললেন 'অমৃত'তে। আপনি যা লিখবেন তাই ছাপা হবে। পাঠযোগ্য না হলেও ছাপা হবে? প্রশ্ন করতে বললেন, বিশ্বাস আছে, আপনাকে ক্লিন চিট দিয়ে রাখলাম। সেই সময় 'ফ্রেন্ডশিপ' বলে একটা গল্প লিখেছিলাম। তার মধ্যে উপন্যাসের রসদ ছিল—কাহিনি ছিল। সেই আরম্ভ 'অলৌকিক জলযান'।

আপনি মেজর লেখাগুলি 'অমৃত'তেই লিখেছিলেন?

সব বড় লেখাই তো ওখানে... 'আনন্দবাজার', 'দেশ'-এর মতো পত্রিকার শারদীয়ায় উপন্যাস লেখার জন্য আমি তো কোনওদিন আমন্ত্রণ পাইনি। শারদীয়া সংখ্যায় গল্প লিখেছি।

কেন?

জানি না। তবে গল্প লিখেছি নিয়মিত। ধারাবাহিক লিখেছি, রবিবারের পাতায়। 'সমুদ্রে বুনোফুলের গন্ধ'। রমাপদ চৌধুরি সেই সুযোগ আমায় দিয়েছিলেন।

এটা আশ্চর্য নয় কি?

মেন লাইনের লেখক হতে পারলাম কই? কর্ডলাইনের লেখকই রয়ে গেলাম। এই নিয়ে আমার লেখকবন্ধুরা মজাও করত। আনন্দমেলার শারদীয়ায়, পত্রিকা বা আনন্দলোক-এর শারদীয়ায় লিখেছি।

দেশ পত্রিকায় কোনও উপন্যাস লেখার সুযোগ পেলেন না কেন?

জানি না। দেশ পত্রিকার শারদীয়াতে উপন্যাস লিখিনি। ধারাবাহিক তো নয়ই।

কেবল শারদীয়ায় দুটো গল্প লিখেছিলাম। সত্য, যত নির্মমই হোক, তা জানা দরকার। আমি আজ যেটুকু হয়েছি তা নিজের চেষ্টাতেই হয়েছি। নিজের যোগ্যতায় হয়েছি। তবে আমি ঋণী অনেকের কাছে—যেমন বিলম কর, রমাপদ চৌধুরী, মণীন্দ্র রায়।

সাটুই-এর স্কুল ছাড়লেন কেন?

ওরা তো আমায় তাড়াল। ভালোই তো ছিলাম। পড়াতাম আর লিখতাম। আমার সঙ্গে নীতির প্রশ্নে বিরোধ লাগল—ক্লাস নিতে হবে সে যেই হোক। সেক্রেটারির ভাইপো বলে ছাড় দেবে কেন? আমি কাজে ফাঁকি দিতে পারি না। তারপর একদিন সহ্য করতে না পেরে রেজিগনেশন দিলাম। অবিশ্বাসী লোকের সঙ্গে থাকব কেন? তখন আমার ওপর সংসারের চাপ—মা, বাবা, দুই বোন, স্ত্রী—তবুও ছেড়ে দিলাম। এরপর যোগাযোগ করলাম সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সঙ্গে। তিনি আমার লেখার গুণগ্রাহী ছিলেন। সোমেন্দ্রবাবু বললেন, কোথাও যেতে হবে না। আমাদের মধ্যে থাক। হালসিবাগানে কালার প্রিন্টিং অ্যান্ড হলোওয়ার্সে চাকরি হল। আড়াইশো টাকা বেতন। বাবাকে পাঠাই আশি টাকা। ছোট ভাই, বোন তখন আমার কাছে। সংসার খরচের টাকার দরকার—তাই লিখতে হতই। কেউ লিখতে বললেই বলতাম, কত টাকা পাব? আমার এই আর্থিক কষ্ট আমাকে দিয়ে অনেক লিখিয়ে নিয়েছে। রেশনের টাকা এসেছে লেখার টাকা থেকেই। সিনেমার কাগজ—'যৌবন' পত্রিকা, তাতেও লিখেছি।

শিয়ালদার কাশিমবাজার রাজবাড়িতে থাকার সময় প্রচুর লিখেছেন। ওই সময়টা আপনার জীবনের সুবর্ণযুগ।

তা তো বটেই। এখানে মানে কেষ্টপুরের প্রফুল্লকাননে আসি একাত্তর সালে। তখন আমার দুই ছেলেই স্কুলে পড়ে। কাশিমবাজার রাজবাড়ির চাকরিও ছেড়ে দিয়েছিলাম—মতের সঙ্গে মিল হল না।

লেখক জীবন একদিকে, অন্য দিকে সাংবাদিকতার পেশা—দুটোকে সামলালেন কী করে? সাংবাদিকই বা হলেন কেমন করে?

কালার প্রিন্টিং-এ আট বছর চাকরি করছি। কোম্পানি যখন তখন লকআউট হচ্ছে। বন্ধও হয়ে যাচ্ছে। এই চাকরি ছেড়ে দিলাম। ওই সময় স্যাংগুইন প্রকাশনার শান্তি সান্যালের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হল। উনি বললেন, অতীনবাবু ছোটদের জন্য একটা কাগজ করতে চাই। আপনি দায়িত্ব নেবেন? সাহিত্যের কাগজ করা হবে—আপনি যা বললেন তাই ছাপা হবে—আর যা যা বই সুপারিশ করবেন তাই ছাপব। চারটে থেকে সাতটা—দিনে তিন ঘন্টার চাকরি। চারশো টাকা বেতন। বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর কাজ করলাম শান্তি সান্যালের কাছে। অনেক বই প্রকাশিত

হল। বরেনের গল্প সংগ্রহ, আমার, শীর্ষেন্দুর বই, রমাপদ চৌধুরি, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রচুর বই বেরোল। তখন 'অলৌকিক জলযান' অমৃত পত্রিকায় বেরোচ্ছে। পাঠক পড়ছেন। জনপ্রিয় হয়েছে লেখাটি। শুনলাম অমিতাভ চৌধুরি আমাকে দেখা করতে বলেছেন। তখন উনি যুগান্তর পত্রিকার নিউজ এডিটর। সবে এসেছেন আনন্দবাজার থেকে। সেটা বোধহয় ছিয়াত্তর সাল হবে। দেখা করলাম। উনি বললেন সাবএডিটরের কাজ করবে? হেলাফেলা মনে করো না। রোজ আসা-যাওয়া। কাজ করা। বেতন ছ'শো পঞ্চাশ টাকা। ওখানে তো তিন ঘন্টা কাজ করো। এখানে অনেক সময় দিতে হবে। এম.এ. পাশ করে কাজ পাচ্ছে না, আমি তোমায় বাড়ি থেকে ডেকে আনছি। ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ করতে হবে। সেই সময় অমিতাভ চৌধুরির পাশে ছিলেন লেখক প্রফুল্ল রায়। খুব উৎসাহ দিলেন। আমিতাভবাবু জিজ্ঞাসা করলেন কতদূর পড়েছ? বললাম বি.কম. পাশ। তবে ফাঁকি দিয়ে। আমি বললাম, জানেন তো আমি কাজের লোক নই। অলস। যেখানে কাজ করি আসি-যাই মাইনে পাই। উনি বললেন এখানে কাজ করতে হবে। তারপর আমাকে নিয়ে গেলেন যুগান্তরের কর্তাব্যক্তি সুকমলকান্তি ঘোষের কাছে। উনি বি.কম. পাশ শুনে খুব খুশি। বললেন আমরা একটা বাণিজ্যের পাতা বার করব আপনি কাজে লেগে পড়ুন। আমি বললাম, সেই কবে বি.কম. পাশ করেছি, সব ভুলে গেছি। ফেরার সময় অমিতাভদা রেগে বললেন, এটা কী করলে? চাকরি হবে না। কিন্তু হল। সেও এক গল্প। কত ভুলভাল করতাম। কবে পাশ করেছি। যুগান্তরে চাকরি করার কুড়ি-বাইশ বছর আগে। কিছু মনে নেই। আমি সাহিত্য-চর্চা করি। কিন্তু অমিতাভবাবুরা আমার ওপর নির্ভর করবেন কী করে? এই ভাবনা আমাকে পেয়ে বসল। আমি যা সত্য তাই বলেছি। পরপর নাইট ডিউটি দিতে হত, যতক্ষণ পর্যন্ত পাতা ছাড়া না হত, নাইট এডিটর সই না করতেন, ততক্ষণ জেগে থাকতে হত। এই করে আমার ঘুমটা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল। বহরমপুরে কৃষ্ণনাথ কলেজে শেষের দিকে বি.কম. পড়েছিলাম। আই.কম.-এর রেজাল্ট বেরোতে দেরি হল—কোনও কলেজে চান্স পাই না। কৃষ্ণনাথেই ভর্তি হলাম। ভালোবাসার জন্য নয়, বা চাকরির জন্য বি.কম. পড়িনি। এই কথাটাই অমিতাভবাবু বা সুকমলকান্তিকে বোঝাতে চেয়েছিলাম। ওই বছরেই জুলাই মাসে বাবা মারা গেলেন। যা যা নিয়ম পালন করার তা করলাম। সেই সময় খাওয়ার অনিয়মে আমার শরীর খারাপ হয়ে গেল। হাসপাতালে কুড়ি দিন রইলাম। তারপর তো আমার ইতিহাস। যুগান্তরের চাকরি করছি, 'অলৌকিক জলযান' লিখছি। বাবা অবশ্য জেনে যাননি যে আমি যুগান্তরে চাকরি পেয়েছি। 'সমুদ্রপাখির কান্না' বলে একশো পৃষ্ঠার একটা উপন্যাস

লিখেছিলাম। সেটা আমার মনঃপুত হয়নি। ভাবলাম একে নিয়ে অলৌকিক জলযান হয় না? পনেরো-ষোলোটা কিস্তি লিখেও বুঝতে পারছি না লেখাটা কোনদিকে যাচ্ছে। রাতে ঘুমোতে পারছি না। কোনও রকমে কাজ করছি। একদিন স্বপ্ন দেখলাম একটা জাহাজ যাচ্ছে তার কোনও দিশা নেই। নিজের মতো যাচ্ছে। নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। এই বিষয়টা আমাকে হন্ট করতে শুরু করল। ভাবলাম এটাই তো জীবন। আমার নিয়ন্ত্রণহীন জীবন। সেটাই থিম হয়ে গেল। জীবনের নানারকম আচরণের মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হয়। জীবনটা একটা জাহাজের মতো। তোমাকে একটা না একটা ঘাটে ভিড়তেই হবে। সেটা কী? সেটা মৃত্যু। যেন সবকিছু চলছে। মৃত্যুকে ঠিক একদিন ছুঁতে হবে এই বিষয়টাই 'অলৌকিক জলযান'-এ ধরার চেষ্টা করেছি। যখন শেষ করলাম তখন অবাক হয়ে ভাবলাম, আমি তাহলে পেরেছি। জাহাজকে নিয়ে এভাবে উপন্যাস লেখা যায়! অমৃততে সেই লেখা বেরোনোর পর খুব ভালো রিঅ্যাকশন হল। ওখানেই শুরু করলাম 'ঈশ্বরের বাগান'। ততদিনে মণীন্দ্র রায় সরে গেছেন। এসেছেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। যে অমৃত-এর প্রচুর সার্কুলেশন ছিল তা আস্তে আস্তে পড়তে শুরু করল। একটা লিটিল ম্যাগ হয়ে গেল। কর্তৃপক্ষ এরপর ওই কাগজ বন্ধ করে দিল। আমি 'ঈশ্বরের বাগান' শেষ করলাম প্রতিক্ষণ পত্রিকায়। মণীন্দ্র রায় অমৃতকে একটা জায়গায় তুলে এনেছিলেন। শ্যামল নিজের মতো করে করতে গেলে আধুনিকতার নামে অমৃত পত্রিকা ট্র্যাডিশন থেকে সরে গেল। প্রচুর কবি এসে ভিড় করল। যত্নের জায়গাটা নষ্ট হয়ে গেল। আমি যুগান্তরে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলাম। একই সঙ্গে আনন্দবাজার গ্রুপেও লিখছি। কেউ বারণ করেনি। প্রতিক্ষণেও লিখি। এক্ষণেও। ওরা টাকা দিত না। শারদীয়াতে লিখলাম। এক্ষণ-এর সম্পাদক নির্মাল্য আচার্য টাকা দিলেন না। লেখা বন্ধ হয়ে গেল। চারপাশে যা কাগজ দেখতাম—যেমন 'উল্টোরথ', 'জলসা' তাতেও লিখতাম। তারপর 'সাপ্তাহিক বসুমতী'—লিখে গেলাম। 'দেবীমহিমা' লিখেছিলাম সাপ্তাহিক বসুমতীতে। সেই সময় বসুমতী আমায় প্রতি কিস্তিতে আড়াইশো টাকা করে দিত।

যুগান্তরে চাকরি করছেন আর অন্য জায়গায় লিখছেন কিছু বলত না কেউ?

না। যুগান্তরে কাজে ঢোকার পর, আনন্দবাজার হাউস থেকে লেখার আমন্ত্রণ আসা বন্ধ হয়ে গেল। আনন্দবাজার থেকে চিঠি পেতাম না। আমি, শ্যামল, বরেন—আমরা যুগান্তর হাউসের লেখক। একবার রমাপদ চৌধুরির সঙ্গে দেখা। উনি বললেন, লিখছেন না কেন? আমাদের ওখানে লিখুন। হাউস থেকে কি বারণ করেছে? তারপর রমাপদবাবুর পাতায় বছরে তিন-চারটে গল্প লিখতাম। এই সময়

দেশেও লিখতাম। আমরা রমাপদবাবুর ঘরে আড্ডা মারতাম। দিব্যেন্দু পালিত, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ওই আড্ডায় থাকতেন। আনন্দ থেকে আমার বইও বেরোতে থাকল। এর পর ওরা এক্সপেরিমেন্ট করতে চাইল। নতুন লেখকদের লিখতে হবে। পুরনো লেখকরা গুরুত্ব হারালেন। আমরাও কিছুটা সরে গেলাম। ওই সময় ওরা অনেককে দিয়েই লিখিয়েছেন। যাদের লেখা ভালো হয়নি তারা টেকেনি। আনন্দবাজার হাউস বরাবরই লেখকদের জন্ম দিয়েছে। সেখানে ভালো লিখলে—একজন লেখক পরিচিতি সহজেই পেয়ে যান। আমাদের বয়স হয়েছে, ভাবীকালের লেখদের তো তৈরি করতেই হবে। আনন্দবাজারের এই ক্ষমতা আছে। আমাদের পরে এল সমরেশ মজুমদার, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, তারপর তিলোত্তমা মজুমদার ও সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিলোত্তমা আর সঙ্গীতার লেখায় যথেষ্ট আধুনিকতা আছে। সঙ্গীতার গদ্যবিন্যাস সম্পূর্ণ আধুনিক। ওর 'শঙ্খিনী' পড়ে আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। কাহিনি, গদ্য নির্মাণ সবটাই অত্যন্ত আধুনিক লেগেছিল। ওদের লেখা পড়ে মনে হল বাংলা সাহিত্যের আবরণ উন্মোচন হচ্ছে।

একটা অভিযোগ আছে আপনার বিরুদ্ধে। আপনি যৌনতা মিশিয়ে লিখতে ভালোবাসেন।

আমি যখন 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' লিখি তখনও এই অভিযোগ করা হয়েছিল। যৌনতার ব্যাপারটা ব্যক্তিবিশেষে আলোড়ন তৈরি করে। ব্যক্তিবিশেষে যৌনতার বিভিন্ন অর্থ আছে। যেন মানুষ খোলা মনে নিজের জন্ম, মানুষের জন্ম নিয়ে চিন্তা করে, তাহলে বুঝবে সর্বত্র একটা যৌনতা কাজ করছে। যৌনতাই এই সমাজকে সংঘবদ্ধ করে রেখেছে। যৌনতা হচ্ছে অনেকটা পূজাপাঠের মতো। ঈশ্বরের আরাধনা। ঈশ্বর তুল্য বিষয়। যৌনতার আরাধনা অদ্ভুত এক রহস্যময় জগৎ। স্পর্শে, ঘ্রাণে মানুষ বুঁদ হয়ে যায়। ওখান থেকেই তো শিশুর জন্ম।

উপন্যাস লিখবে, গল্প লিখবে যৌনতা ছাড়া? যৌনতা-বহির্ভূত কাহিনি হয় কি? উপন্যাসে মানুষের জীবনের আচরণগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়। একটা মানুষ জীবনে যৌনতায় যে সময় দেয় তা অন্য কোনও বিষয়ে দিতে পারে না। জীবনের মূল কনসেনট্রেশন তো ওখানেই। জীবনে তোমার যতদিন যৌনতা আছে ততদিন তুমি জীবিত। যৌনতা নেই মানে তোমার মৃত্যু হয়েছে। যৌনতা ছাড়া একটা মানুষ অযোগ্য হয়ে পড়ে। ফাঁকা হয়ে যায় তার শরীর। সে পাগল হয়ে যায়।

এই যে একটা মানুষ প্রতিদিন বাইরে যায় তারপর বাড়ি ফিরে আসে—কেন? নারী তাকে ধরে রেখেছে। যৌনতা অছে বলে সব আছে। যৌনতাবিহীন শিল্প, সাহিত্য হয় না। আর এ নিয়ে ন্যাকামি করাও উচিত নয়। এখনকার সমাজব্যবস্থায় একটা ছেলে বা মেয়ে সব জানে। ভালো জানে। স্কুলে পড়ানোও হয়। স্বামী-স্ত্রীর

প্রেমটা তো যৌনতা থেকেই তৈরি হয়। এই প্রেম প্ল্যাটনিক যারা বলে তারা ভুল করে। আমি তো একটা গাছকে ভালোবাসতে পারি। বাগান করতে পারি। গাছের সঙ্গে কি প্রেম হয়? অবশ্য বৃক্ষ-প্রেমিকরা তো আছেন। প্রেমে-ভালোবাসা কথাটা এসেছে নারী-পুরুষের যৌনতা থেকেই। এটা আমাদের অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', 'অলৌকিক জলযান', 'দেবীমহিমা', 'জনগণ', 'ঈশ্বরের বাগান' আমার সব উপন্যাসেই যৌনতা আছে। প্রয়োজনের তাগিদেই আছে। না থাকলে চরিত্রগুলো দাঁড় করানো যায় না। তাহলে তো প্রাণহীন চরিত্র হবে। প্রাণ মানেই তো যৌনতা—তাহলে একে অকারণ দোষ দিয়ে লাভ কী? তবে দেখতে হবে কোনটা অশ্লীল। যৌনতার যে বর্ণনা সেটা যদি পরিশীলিত না হয় তবে সেটা অশ্লীল। ঠিকমতো গদ্যে যদি ওই বর্ণনা না লিখতে পার তবে তুমি তোমার সাহিত্যকে নোংরা করে ফেললে। আসলে লেখকের গদ্যের জোরটা কত সেটাই দেখার।

শব্দচয়ন...

শব্দচয়ন অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বাক্যের গঠন এমন শব্দের মাধ্যমে করতে হবে যাতে যৌন বর্ণনা উজ্জীবিত হয়। তা সাহিত্যিকে খাটো করে না। অশ্লীল হচ্ছে দুর্বল গদ্য যা যৌনতার বর্ণনাকে রসালো করে। লেখাটা কী? নারী-পুরুষের সম্পর্ক তাহলে কী? আমার লেখক-জীবন-ভর আমি এই একই অভিযোগ শুনে এসেছি। স্বাভাবিক বিষয়গুলিকে অযথা যৌনতা দোষে দুষ্ট করা হয়েছে। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের এক জায়গায় একটি ধর্ষণের বর্ণনা আছে। সেখানে অভিযোগ করা হয়েছে। দাঙ্গায় মালতীর স্বামী মারা গেছে। সেই মালতী যখন শারীরিক উত্তেজনাকে নিজেই প্রশমিত করছে তার বর্ণনাও অশ্লীল?

ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখলেন না কেন?

এই ব্যাপারে আমার কোনও আগ্রহ ছিল না। যা লিখেছি তা আমার জীবনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। আমার রক্তমাংসের দ্বারা তারা চিহ্নিত। ঐতিহাসিক উপন্যাস মানে অতীত। আমার যখন বর্তমান আছে অতীতে যাব কেন? আমাদের সময় সুনীল লিখেছেন। আর কে? ওহ্, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। আমার চরিত্ররা রক্তমাংসের। তাদের নিয়ে না লিখে থাকতে পারি না। যে সব চরিত্র অতীতে ডুবে আছেন তারা ইতিহাসের। আমার গল্পের চরিত্ররা আমার দেখা ঘটনা থেকে উঠে এসেছে। রোজ নতুন নতুন চরিত্র আবিষ্কার করি। বাবাকে নিয়ে একবার লিখেছিলাম। স্বপ্নে দেখি তিনি শ্মশান থেকে আধপোড়া অবস্থায় উঠে এসেছেন। তখন আমরা ভাত খাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে খেতে বসলেন। এই নিয়ে আমার গল্প 'ইহলোক'। দৃষ্টি সজাগ থাকলে চারপাশের অহরহ জীবন থেকে গল্প তুলে নেওয়া যায়। লেখার আগে

কোনও একটা বিষয় মনের মধ্যে হন্ট করে। লেখার সময় আমি কোনও নির্দিষ্ট পরিকাঠামোর মধ্যে থাকি না। এটা অনেকটা ছবি আঁকার মতো। প্রথমে কিছুটা রং। তারপর তুলির আঁচড়। ধীরে ধীরে একটা ছবি তৈরি হয়। তৈরি হয় গল্প। কাহিনি ছাড়া কোনও গল্পের কথা ভাবতে পারি না। প্রকৃত গল্প সেটাই যেখানে চরিত্ররা জীবন্ত রূপ পায়। হ-য-ব-র-ল দিয়ে গল্প হয় না। গল্পের মধ্যে নিজের চরিত্র ঢুকে যায়। আমি একমাত্র অনুপ্রাণিত হই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পে। তিনি যেন সত্যিই ছবি আঁকেন, গল্প লেখেন না।

আপনার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস?

'মানুষের ঘরবাড়ি'। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' নয়। এই জন্য যে আমি, আমার জীবন 'মানুষের ঘরবাড়ি'র সঙ্গে বিস্ময়করভাবে যুক্ত। এদেশে আমি এসেছিলাম কপর্দকশূন্য হয়ে। ছিন্নমূল যাযাবরের জীবন ছিল। বাপ-বেটা মিলে জঙ্গল সাবাড় করে বসতি গড়ে তুলি। এই দারিদ্র আমায় নতুন জীবনের কথা বলে। কখনও অপমানিত হলে সেই সময়ের কথাই মনে করি। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' থাকলে 'মানুষের ঘরবাড়ি'ও থাকবে। আমার সব লেখাতেই আমায় খুঁজে পাওয়া যায়।

আপনার উপন্যাসের প্রেক্ষিতে তেমন কোনও ছায়াছবি হল না কেন?

বলতে পারব না। হয়তো হতে পারে আমার উপন্যাস ও গল্পে গভীরতা বেশি তাই হয়তো পরিচালককে স্পর্শ করতে পারে না। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' ছবি করার জন্য অনেকেই এসেছিলেন। ওর যে লিরিক তাকে সেলুলয়েডে ধরা খুব মুশকিল। দক্ষ পরিচালক না হলে আমার উপন্যাস করা খুবই কঠিন। কারণ আমি আমার উপন্যাস কোনও দিন ছবি হবে—এই ভেবে লিখিনি। সব লেখার মধ্যেই আমি অন্তর্যামী হয়ে থাকি।

ছবি করার ইচ্ছে কারা প্রকাশ করেছিলেন?

সত্যজিৎ রায় আমার উপন্যাস 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' পড়েছিলেন। উনি যখন মুম্বাই যেতেন প্রায়ই উনি যুগান্তর পত্রিকায় সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষের কন্যা শ্রীমতী শ্রীলেখা বসুর বাড়িতে উঠতেন। শুনেছি শ্রীলেখা বসু সত্যজিৎবাবুকে একবার অনুরোধ করেছিলেন ভালো বই নিয়ে কেন তেমন আর ছবি হচ্ছে না। যেমন 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' ...তাতে সত্যজিৎবাবু নাকি বলেছিলেন—যে পরিবেশ এবং প্রকৃতির ওপর লেখা সে সম্পর্ক তাঁর সম্যক ধারণা নেই। কাজেই তিনি আয়ত্তের বাইরে বলেই ওই সম্পর্কে কিছু ভাবেননি।

আর কেউ প্রস্তাব দেননি...

মৃণাল সেন আমাকে বলেছিলেন একবার, কলকাতার ওপর ছবি করব একটা

গল্প দেবেন। 'কথাশিল্প' প্রকাশনাতে মৃণালবাবু তখন আসতেন। ওর প্রকাশক ছিলেন অবনীবাবু। কলকাতার ওপর ছবি করার জন্য সেখানেই মৃণালবাবু আমাকে প্রস্তাব দেন। আমি নিজে থেকে গল্প দিইনি। আমি নিজে ওই ছবি-টবির ব্যাপারে তেমন ইন্টারেসটেড ছিলাম না।

আপনার একটাও গল্প বা উপন্যাস নিয়ে ছবি বা ধারাবাহিকভাবে কোনও সিরিয়াল হয়েছে কি?

না।

কেন?

জানি না। আসলে আমার কাহিনিতে খুব ডিটেলস-এর কাজ আছে তো তাই মনে হয়...

কখনও কোনও পরিচালক বা প্রযোজকের সঙ্গে আপনার পরিচয় বা বন্ধুত্ব হয়নি?

একজন খুব খ্যাতিমান পরিচালক আমার বাড়িতে লোক পাঠিয়েছিলেন এবং বলে পাঠিয়েছেন যে আমি যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি। আমি তখন তাঁকে বলি—সিনেমা সম্পর্কে আমার কোনও উৎসাহ নেই। তাই যাব না। পরে তিনি নিজেই এসেছিলেন কিন্তু কোনও বই তাঁকে দেওয়া হয়নি। আমার যে গোঁ আছে—একবার যদি খেপে যাই...

সিনেমা দেখেন? সহিত্যের খাতিরে...

টিভিতে দেখি, ভালো কাহিনিমূলক ছবি হলে দেখি। যৌবনে, লেখক জীবনে আমি অনেক হিন্দি-বাংলা ছবি দেখেছি। ইউটিভি বলে একটা চ্যানেল আছে, দেখি। যেখানে বিদেশি ছবি দেখানো হয় বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার ছবি—আমি তা মন দিয়ে দেখি।

আপনার উপন্যাস বা গল্প নিয়ে কোনও ছবি হল না—অথচ আপনার সমসাময়িক লেখকদের ক্ষেত্রে তার উল্টোটাই হল—

দু'একজন তো। সবারই কি হয়েছে? যাঁদের হয়েছে তাঁদের সিনেমা নিয়ে বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং তাঁদের লেখাতেও সেই আগ্রহের ছবি ফুটে উঠেছে। তাঁদের কেউ কেউ চিত্রনাট্য লেখার জন্য মুম্বাইতেও পাড়ি দিয়েছিলেন। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যোগাযোগ। আমার কোনও যোগাযোগ হয়নি। কোনও পরিচালকের সঙ্গে পরিচয় এখনও নেই।

আপনার সময়ে উত্তমকুমার মহানায়ক—আপনার ইচ্ছে হল না— যে একটা অন্তত ছবি তাঁকে নিয়ে আপনার লেখা থেকে হোক!

আমার চরিত্রগত কিছু ত্রুটি আছে। কখনও কোথাও উপযাচক হয়ে কোনও অনুরোধ করিনি। [illegible] লেখার ক্ষেত্রেও তাই। চাপ সৃষ্টি না হলে আমার লেখা

হয় না—হতও না। আর্থিক চাপ হোক বা সম্পাদকের চাপ হোক—একটা চাপ থাকতে হবে। 'অমৃত'তে যে পরপর তিনটে উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে লিখেছি তাও মণীন্দ্র রায়ের পীড়াপীড়িতে।

শুনেছি অনেক লেখক এক সময় বা এখনও বিশেষ কোনও নায়ক বা নায়িকাকে ভেবে নিয়ে কাহিনি তৈরি করেন—তার উদ্দেশ্য সহজেই একটা ছবি হয়ে যাক—আপনার মতামত কী?

আমি নিজে যে ধরনের লেখার কথা ভাবি সেখানে একটা বিশেষ পটভূমি থেকে লেখাগুলি উঠে আসে। সেখানে কোনও সিনেমা সংক্রান্ত বিষয় মাথায় থাকে না।

এক সময় বাংলা কাহিনি নিয়ে হিন্দি ছবি হয়েছে। বাঙালি লেখকদের একটা প্রভাব হিন্দি ছায়াছবিতে বড় প্রকট ছিল। এখন তা বদলে গেল—তার অর্থ কী এটা যে বাংলা উপন্যাস বা গল্পের শরীর ছবির জন্য তেমন উপযুক্ত হয়ে উঠছে না?

তা তো আমার পক্ষে বলা কঠিন। কারণ চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্পর্কে আমি একেবারে অজ্ঞ এবং অন্ধকারে। শরৎচন্দ্র, বিমল মিত্র, সমরেশ বসু, শরদিন্দুর মতো প্রবীণ লেখকদের লেখা নিয়ে ছবি তো হয়েছে। আমি মনে করি খুব উঁচু দরের লেখার— বিশেষ করে ক্ল্যাসিক জাতীয় লেখার—ছবি করা কঠিন। তারাশঙ্করের 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' নিয়ে ছবি কি হয়েছে? মনে পড়ছে না। তবে 'আরোগ্য নিকেতন' নিয়ে ছবি তো হয়েছেই। অর্থাৎ সহজ কাহিনিচিত্র নিয়ে ছবি তৈরি হয়েছে। আসলে সব পরিচালকই উপন্যাসে একটি নিটোল প্রেমের গল্প চান, আমার লেখায় বোধহয় তা অনুপস্থিত।

আপনি একবার বলেছিলেন—রাজনীতি করা আমার হয়নি, হবেও হবে না। একজন লেখকের পক্ষে ব্র্যান্ডেড হয়ে যাওয়া ঠিক নয়—এ বিষয়ে আপনার ব্যক্তিদর্শনটা কী?

একজন লেখক যখন লেখেন তখন সব রকমের চরিত্র নিয়ে, সামাজিক সমস্যা নিয়ে লেখেন। রাজনীতিতে ব্র্যান্ডেড হলে সে তখন কিছুটা একচক্ষু হরিণের মতো। সে তখন শুধু বিশেষ একটি দিকই দেখে। চারপাশের জীবন সম্পর্কে তাঁর সঠিক ধারণা তৈরি হয় না। যেমন ধরো, বামপন্থী লেখকরা মনে করেন গরিবদের জন্যই লেখা উচিত—এবং যেখানে যাঁরা ধনী ব্যক্তি তাঁরা শোষক—সব ক্ষেত্রে তা নয়। সব মানুষের মধ্যে শোষণ আছে। একজন গরিবও একজন গরিবকে শোষণ করে, করতে পারে। শুধু বড়লোকই বা কেন গরিবকে শোষণ করবে?

এই যে এখন 'আমরা', 'ওরা' হয়েছে—বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দুটো, তিনটে শিবির তৈরি হয়েছে...

আমি 'আমরা', 'ওরা' বিশ্বাস করিনি। করি না। আমি প্রথমে ভারতবাসী।।

পরে বাঙালি। এই বিশ্বাস নিয়েই আমি বড় হয়েছি।

কখনও আপনার দিকে কেউ হাত বাড়ায়নি?

সেভাবে কেউ ডাকেননি। তাঁরা হয়তো জানতেন আমি রাজনীতির বিষয়টা এড়িয়ে চলি।

সাহিত্যে বিশেষ কোনও পুরস্কার কি সব সময়েই সন্দেহজনক?

তা নয়, তবে পুরস্কারের ভিতরে একটা চক্র কাজ করে। কিছু বুদ্ধিজীবী এই চক্রের মধ্যে যুক্ত থাকেন। তাঁদের বোধ ও বুদ্ধির দ্বারা পুরস্কারের মান নির্ণয় হয়। কোনও গ্রন্থ পুরস্কৃত হলেও তাঁকে মহামূল্য ভাবার কোনও অর্থ হয় না।

তাহলে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাস কি সে কারণেই কোনও বড় পুরস্কার পেল না?

কিছু বুদ্ধিজীবী উপন্যাসটির যথাযথ মর্যাদা দেননি। তাঁরা সকলেই প্রায় আমার সমসাময়িক। এখানে বোধহয় ঈর্ষাও কাজ করেছে। আমার 'পঞ্চাশটি গল্প' নিয়ে যে বই বেরিয়েছিল আনন্দ পাবলিশার্স থেকে তা অবশ্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পায়। শুনেছি চুয়াত্তর বা পঁচাত্তর সালে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসটি নির্বাচিত শেষ তিনটি বইয়ের মধ্যে ছিল। তবুও সাহিত্য অকাদেমি পায়নি। সেখানে বিচারকরা তিনটি বইকে ওই পুরস্কার দিতে চান। অর্থাৎ ওরা একমত হতে পারলেন না।

এখানে তাহলে বিচারটা কেমন হল?

আমার মনে হয় আমার চরিত্রগত ত্রুটির জন্যই আমার এই অবস্থা হয়েছে। কারণ আমার সঙ্গে একবার সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দেখা হয়েছিল। তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তখন সাহিত্য অকাদেমির একজন কর্তাব্যক্তি, তিনি আমাকে বললেন, এত ভালো একটা বই, তুমি অন্তত আমাকে দিতে পারতে একবার। কাজেই এটা আমার ত্রুটি। আমি আমার উপন্যাসের ভালো-মন্দ বিচার করতে পারি না। পুরস্কারের জন্য ছোটাছুটি করা দরকার, তা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি মনে করি পুরস্কার দিয়ে কোনও উপন্যাসের প্রকৃত মূল্য যাচাই করা যায় না।

'অলৌকিক জলযান' বইটি আপনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়েছেন। দিয়ে বলেছেন যে যিনি সুখেও আছেন, দুঃখেও আছেন আপনার পাশে...ইনি কি মমতা...

ওই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না। ইনি আমার জায়া—মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তো আমার পাশে সর্বদা রয়েছেন। এটাই যথার্থ অভিজ্ঞতা।

কোনও দুঃখ আছে?

ভিতরে কোনও দুঃখ না থাকলে কোনও শিল্পী বা লেখক পূর্ণ হতে পারেন না।

দুঃখ আছে বলেই তো লিখি। শুধু সুখ থাকলে জীবন সুখের হয় না। দুঃখ মিশেল থাকতে হবেই।

একটা সময় প্রচুর আর্থিক কষ্ট করেছেন, পারিবারিক চাপে প্রায় জর্জরিত ছিলেন। পরে আপনার সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে যে অর্থ ও যশ এল তারপর আপনি তাকে সামলালেন কী করে? এখন তো আপনার অনেক টাকা?

তা তো বটেই। অনেক টাকা। গরিব বাবার পুত্রের পক্ষে টাকাটা যথেষ্ট। আমি এখনও খুব সাধারণভাবেই থাকতে ভালোবাসি। তাই আমার কাছে এই সাফল্য বা অর্থ-যশ কোনও অহংকার তৈরি করেনি। আমি আগে যেমন জীবন-যাপন করেছি এখনও তাই করি। আমার স্মৃতিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আবদুল জব্বারের আর্থিক কষ্টের কথা উঁকি মারে। ভারতীয় লেখক যাঁরা মাতৃভাষায় লেখেন—তাঁরা কতটুকু পান? পেয়েছেন এ যাবৎ? সেদিক থেকে আমার এই প্রাপ্তি যথেষ্ট মনে করি।

টাকা ছাড়া লেখেন না—এই প্রতিজ্ঞা রেখে এলেন—কীভাবে?

প্রথমে আমি, জেনে রাখো খুব কুঁড়ে লোক। অলস। লিখতে না পারলেই আমি মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করতে পারি। কেউ লিখতে বললেই মনে হয় দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। এজন্য আমাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। সেজন্য আমি আমার সম্মানমূল্যের সঙ্গে লেখারও সম্মানমূল্য এক করে দেখি। আমি বোধহয় একমাত্র ব্যক্তি যে প্রথম বলে দিই—কত দেবেন? টাকার অঙ্ক বেশি না হলে লিখতেই চাই না। এমন কোনও দায় নেই আমার যে আমাকে লিখতে হবে। আমি না লিখলে বাংলা সাহিত্যের তেমন কোনও ক্ষতি হবে না। তবু আমার লেখার সমাদর হয়েছে। পাঠক-পাঠিকারা আমাকে পড়েন এজন্য আমি নিজেকে খুবই ধন্য মনে করি।

কোনও আক্ষেপ আছে?

না।

কী পারলেন না এ জীবনে?

যা পেরেছি, করেছি। এটাও তো করার কথা ছিল না...

বানান অপরিবর্তিত।

'আমার সময়', ডিসেম্বর ২০০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত এবং লেখকের অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশলতিকা
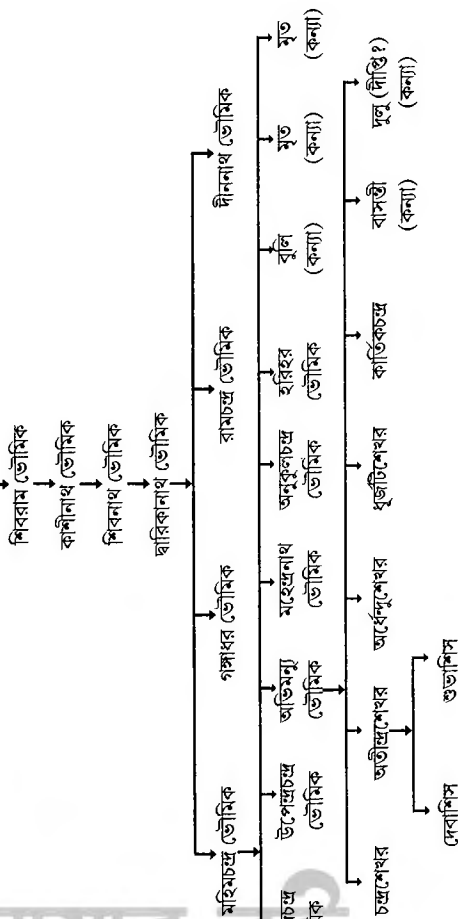
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনপঞ্জি

১. **জন্ম** : ১৩৩৭বঙ্গাব্দ ২২ কার্তিক, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ ৬ নভেম্বর। ঢাকা জেলার আড়াই হাজার থানার অন্তর্গত রাইনাদি গ্রামে। পিতা : অভিমন্যু ভৌমিক। মাতা : লাবণ্যপ্রভা। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃদত্ত নাম অতীন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়।

২. **শিক্ষা / দেশত্যাগ** : প্রাথমিক শিক্ষা কলাগাছিয়া মাইনর স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। এরপর সোনারগাঁ পানাম স্কুল বা জি.আর. ইনসটিটিউটে ক্লাস সিক্সে ভর্তি হন। সেখান থেকেই দেশভাগ হওয়ার পর ১৯৪৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসেন। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের সকলেই ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশভাগের সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে দেশত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। টেস্ট পরীক্ষার জন্য অতীন সম্মানদিতে থেকে যান। প্রবেশিকা পরীক্ষার সিট পড়ে কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় কম্পার্টমেন্টাল পান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা হলে কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা দিয়ে ১৯৪৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

এরপর কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজে আই.কম. ভর্তি হলেও অভাব ও দারিদ্র্যের কারণে নিয়মিত কলেজ করা হয় না। ১৯৫০ সালে প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে আই.কম. পাশ করেন।

৩. **নিরুদ্দেশযাত্রা** : অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় তিন বার নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। প্রথমবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে ১৯৪৮ সালে। দ্বিতীয় নিরুদ্দেশের সন-তারিখ জানা যায় না। সেটা সম্ভবত ১৯৫০ থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে। তৃতীয়বার নিরুদ্দেশ হন জাহাজে কোলবয়ের চাকরি নিয়ে ১৯৫২ সালে। প্রায় বছর দুয়েক সমুদ্র-সফর করে ১৯৫৪ সালে বহরমপুরে ফিরে আসেন।

৪. **চাকরি** : সমুদ্র-সফর করে ফিরে আসার পর মুর্শিদাবাদের হাতিনগর প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি পান, সেই সঙ্গে কৃষ্ণনাথ কলেজে বি.কম.-এ ভর্তি হয়ে আবার পড়াশোনা শুরু করেন। ১৯৫৬ সালে সেকেন্ড ক্লাস পেয়ে বি.কম. পাশ করেন।

৫. **বি.টি.ট্রেনিং/বিবাহ** : ১৯৫৮ সালে হাতিনগর প্রাইমারি স্কুলে থেকে ডেপুটেশনে বাণীপুরে বি.টি. ট্রেনিং নিতে যান। ওই ট্রেনিং ইনসটিটিউটেই মমতা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও প্রণয়। ওঁরা ট্রেনিং চলাকালীনই রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেন।

৬. **মানিক স্মৃতি পুরস্কার** : ১৯৫৮ সালে 'সমুদ্র-মানুষ' উপন্যাসটির জন্য 'উল্টোরথ' পত্রিকা আয়োজিত 'মানিক স্মৃতি পুরস্কার' পান ও সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

৭. **সাটুই স্কুলে হেডমাস্টারি** : বি.টি. ট্রেনিং নেওয়ার পর সাটুই সিনিয়র বেসিক স্কুলে হেডমাস্টারের চাকরি পান। স্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও একই সঙ্গে ওই স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি পান। মতবিরোধ হওয়ার জন্য ১৯৬৩ সালে হেডমাস্টারির চাকরি থেকে পদত্যাগ করেন ও সপরিবারে কলকাতায় চলে আসেন।

৮. সন্তান লাভ : ১৯৬০ সালে বড় ছেলে দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ১৯৬৩ সালে ছোট ছেলে শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়।

৯. কারখানায় ম্যানেজারি : ১৯৬৩ সালে কলকাতায় এসে কালার প্রিন্টিং অ্যান্ড হলোওয়ার্স কোম্পানিতে ম্যানেজারের চাকরি নেন। থাকতেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে শেয়ালদার কাছে কাশিমবাজার রাজবাড়িতে। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ম্যানেজারের চাকরি করার পর মতবিরোধ হওয়ায় চাকরি ছেড়ে দেন।

১০. প্রফুল্লকানন (কেষ্টপুর) : ১৯৭১ সালেই কেষ্টপুরের প্রফুল্লকাননে বাড়ি করে কাশিমবাজার রাজবাড়ি ছেড়ে চলে আসেন।

১১. প্রকাশনা-উপদেষ্টা : 'রামায়ণী প্রকাশ ভবন' নামে এক প্রকাশনা সংস্থায় উপদেষ্টা হিসেবে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত কাজ করেন।

১২. যুগান্তরে সাংবাদিকতা : ১৯৭৬ সালে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় সাবএডিটর হিসেবে যোগ দেন। সেখানে আঠারো বছর চাকরি করে ১৯৯৪ সালে অবসর নেন।

১৩. ববার মৃত্যু : জুলাই ১৯৭৬।

১৪. মায়ের মৃত্যু : ১৯৯৬।

পুরস্কার

১৯৫৮ ... 'উল্টোরথ' পত্রিকা আয়োজিত **'মানিক স্মৃতি পুরস্কার'**।

১৯৯১ **'বিভূতিভূষণ স্মৃতি পুরস্কার'**।

১৯৯৩ ... **'ভুয়ালকা পুরস্কার'**—'পঞ্চযোগিনী' উপন্যাসের জন্য।

১৯৯৮ ... **'বঙ্কিম পুরস্কার'**—'দুই ভারতবর্ষ' উপন্যাসের জন্য।

২০০১ **'সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার'**—'পঞ্চাশটি গল্প' সংকলনের জন্য।

২০০৫ **'শরৎ পুরস্কার'**।

২০০৮ **'সুরমা চৌধুরী মেমোরিয়াল ইন্টারন্যাশানাল অ্যাওয়ার্ড ইন লিটারেচার অ্যান্ড জার্নালিজম'** পুরস্কার—'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের জন্য। পুরস্কার মূল্য দশ লক্ষ টাকা।

২০১৪ ... **'সিরাজ আকাদেমি পুরস্কার'**।

এছাড়া **'মতিলাল পুরস্কার'**, **'তারাশঙ্কর স্মৃতি পুরস্কার'**, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের **'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পুরস্কার'** এবং **'সুধা পুরস্কার'**-এ সম্মানিত হয়েছেন।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় : পত্র-পত্রিকাপঞ্জি

১. অজিতেশ ভট্টাচার্য, *'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'*, উত্তরধ্বনি, ২৫ বর্ষ, অক্টোবর, ২০০২, পৃ. ৪৩৬-৪৪২।

২. অপূর্ব সাহা, *'অতীনের গল্প : জীবনের বাহার'*, দরবারী সাহিত্য, ৩৪বর্ষ, জানুয়ারী ২০০৩, পৃ. ৭০-৭৬।

৩. অমর মিত্র, *'সমুদ্রের এক নিঃসঙ্গ নাবিক'*, দরবারী সাহিত্য, ৩৪বর্ষ, জানুয়ারী, ২০০৩, পৃ. ২৬-২৮।

৪. অশোকরঞ্জন সেনগুপ্ত, *'অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার নিবেদন'*, দরবারী সাহিত্য, জানুয়ারী, ২০০৩, পৃ. ৬৬।

৫. আবুল বাশার, *'অতীনের সাহিত্য মানুষের দিনলিপি'*, দরবারী সাহিত্য, ৩৪বর্ষ, জানুয়ারী, ২০০৩, পৃ. ১৭-১৮।

৬. ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, *'অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন পাখির খোঁজে'*, দরবারী সাহিত্য, ৩৪বর্ষ, জানুয়ারী, ২০০৩, পৃ. ৬৩-৬৫।

৭. কিন্নর রায়, *'নীলকণ্ঠ পাখির পালক'*, দরবারী সাহিত্য, ৩৪বর্ষ, পৃ. ২৯-৩৩।

৮. কৌস্তভ চক্রবর্তী, *'বিচিত্র বর্ণিল ভালোবাসা'*, শুভশ্রী, ৪৮বর্ষ, ২০০৯-১০, পৃ. ১৬২-১৬৩।

৯. জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, *'অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প'*, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ৩৭বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, ২০০১, পৃ. ১৯৭-২১৪।

১০. জয়ন্তকুমার ঘোষাল, *'মানুষের ঠিকানার খোঁজে'*, দরবারী সাহিত্য, ৩৪বর্ষ, জানুয়ারী, ২০০৩, পৃ. ৩৪-৩৯।

১১. জীবন সরকার, *'পাখির বাসা'*, দরবারী সাহিত্য, ৩৪বর্ষ, জানুয়ারী, ২০০৩, পৃ. ৭৭-৭৮।

১২. তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, *'একজন স্বভাব লেখক'*, দরবারী সাহিত্য, ৩৪বর্ষ, জানুয়ারী, ২০০৩, পৃ. ২১-২৩।

১৩. তপোধীর ভট্টাচার্য, *'অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প'*, এবং মুশায়েরা, ৯বর্ষ, ২-৩ সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০২, পৃ. ৩৩২।

১৪. দেবব্রত মল্লিক, *'অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় : গল্পকার পরিচিতি'*, এবং মুশায়েরা, ৯বর্ষ, ২-৩ সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০২, পৃ. ৩৩২।

১৫. প্রমোদ বসু, *'অতীনদা'*, দরবারী সাহিত্য, ৩৪বর্ষ, জানুয়ারী, ২০০৩, পৃ. ৪৬।

১৬. প্রদীপকুমার সেনগুপ্ত, *'অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের ভুবন'*, তবু একলব্য, ৭বর্ষ, জানুয়ারী, ২০১৩, পৃ. ২২৭-২৩৬।

১৭. বিষ্ণু বসু, *'কেয়া পাতার নৌকো ও নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'*, [illegible], ২বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, শীত, ১৩৯০, পৃ. ৮০-৮৫।

১৮. বীরেন শাসমল, *'মৃত্যু এবং জীবনের মহিমা, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি গল্প'*, দরবারী সাহিত্য, ৩৪বর্ষ, জানুয়ারী, ২০০৩, পৃ. ৪৯-৫৬।

১৯. বুদ্ধদেব গুহ, *'অতীন'*, দরবারী সাহিত্য, ৩৪বর্ষ, জানুয়ারী, ২০০৩, পৃ. ১৫-১৬।

২০. ব্রতী গায়েন, *'সম্পর্কের আখ্যানের খোঁজে : অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস'*,

দীপন, ১৩বর্ষ, মার্চ, ২০১০।

২১. মঞ্জুভাষ মিত্র, *'অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সাদা রঙের বোট আসছে'*, দরবারী সাহিত্য, ৩৪বর্ষ, জানুয়ারী, ২০০৩, পৃ. ২৪-২৫।

২২. মাল্যবান দাশগুপ্ত, *'স্বপ্নের খোঁজে নীলকণ্ঠ পাখিরা'*, জনপদ প্রয়াস, ৩বর্ষ, ৩সংখ্যা, জানুয়ারী, ২০০১, পৃ. ৩৩-৪১।

২৩. মুকুল গুহ, *'লেখার অন্দর : অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়'* (সাক্ষাৎকার ভিত্তিক), দরবারী সাহিত্য, ৩৪বর্ষ, জানুয়ারী, ২০০৩, পৃ. ৬০-৬২।

২৪. রাণা চট্টোপাধ্যায়, *'নীলকণ্ঠ পাখিদের খোঁজে'*, দরবারী সাহিত্য, ৩৪বর্ষ, জানুয়ারী, ২০০৩, পৃ. ৪০-৪৩।

২৫. শান্তা মুখোপাধ্যায়, *'অজানা দরিয়ার জাহাজ'*, দরবারী সাহিত্য, ৩৪বর্ষ, জানুয়ারী, ২০০৩, পৃ. ৭৯-৮০।

২৬. শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, *'প্রিয় অতীন'*, দরবারী সাহিত্য, ৩৪বর্ষ, জানুয়ারী, ২০০৩, পৃ. ১১-১২।

২৭. সাম্পান চক্রবর্তী, *'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে : অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়'*, দিশা সাহিত্য, ১৬বর্ষ, এপ্রিল, ২০১৪, পৃ. ১০৫-১১৬।

২৮. সুজিৎ চৌধুরী, *'ভিন্নমাত্রার ছোটগল্প : সাদা অ্যাম্বুলেন্স'*, উত্তরধ্বনি, ৩১বর্ষ, অক্টোবর-নভেম্বর, ২০০৮, পৃ. ১১৮-১২২।

২৯. সুজিৎ মুখোপাধ্যায়, *'অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় : অন্য এক প্রেম'*, দরবারী সাহিত্য, ৩৪বর্ষ,জানুয়ারী, ২০০৩, পৃ. ৪৭-৪৮।

৩০. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *'লেখক অতীন, মানুষ অতীন'*, দরবারী সাহিত্য, ৩৪বর্ষ, জানুয়ারী, ২০০৩, পৃ. ১০।

৩১. সুবোধ ভট্টাচার্য, *'সহেলি : অন্য লেখা'*, দরবারী সাহিত্য, ৩৪বর্ষ, জানুয়ারী, ২০০৩, পৃ. ৬৭-৬৯।

৩২. সুব্রত মুখোপাধ্যায়, *'অতীনদার সাদা অ্যাম্বুলেন্স'*, দরবারী সাহিত্য, ৩৪বর্ষ, জানুয়ারী, ২০০৩, পৃ. ১৯-২০।

৩৩. সুব্রত সেনগুপ্ত, *'সহজ অতীনদা'*, দরবারী সাহিত্য, ৩৪বর্ষ, জানুয়ারী, ২০০৩, পৃ. ৪৫।

৩৪. সোমনাথ চক্রবর্তী, *'অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখোমুখি'* (সাক্ষাৎকার), এবং মুশায়েরা, ২০বর্ষ, ১সংখ্যা, এপ্রিল-জুলাই, ২০১৩, পৃ. ২৮৯-২৯৫।

৩৫. সোহারাব হোসেন, *'অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প, সহজ আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত কারিগর'*, শুভশ্রী, ৫০বর্ষ, ২০১১-১২, পৃ. ৩৫৫-৩৭২।

৩৬. সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, *'কাছের মানুষ'*, দরবারী সাহিত্য, ৩৪বর্ষ, জানুয়ারী, ২০০৩, পৃ. ১৩-১৪।

৩৭. হীরেন চট্টোপাধ্যায়, *'দুটি মৃত্যু; দুই শিল্পী'*, দরবারী সাহিত্য, ৩৪বর্ষ, জানুয়ারী, ২০০৩, পৃ. ৫৭-৫৯।

সংকলক : সন্দীপ দত্ত

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জি

[এই গ্রন্থপঞ্জিকে সম্পূর্ণ ব'লে দাবী করা হচ্ছে না। কারণ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও সৃজনশীল এবং তাঁর বিভিন্ন বই বারবার বিভিন্ন প্রকাশকের হাত-ফেরতা হয়ে নতুন নতুন সংস্করণ হয়েছে। সাধ্যমতো যতদূর সম্ভব অনুসন্ধান করে এই গ্রন্থপঞ্জি তৈরী করার চেষ্টা করেছি। অতীনদার কিছু বই এই তালিকার বাইরে থেকে যাওয়াও সম্ভব। সহৃদয় পাঠকেরা কোনও ভুল ধরিয়ে দিলে এবং এই তালিকার বাইরে থাকা বইয়ের বিবরণ জানালে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

শারীরিক অসুস্থতাকে অগ্রাহ্য ক'রে শম্পা রায় এই কাজে যে-ভাবে সহায়তা করেছেন তা এক কথায় অভূতপূর্ব। তাঁকে প্রশংসা করার জন্য কোনও ভাবাই যথেষ্ট নয়। —সম্পাদক]

উপন্যাস

১. **বইয়ের নাম :** *'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'।* *(স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর) সংক্ষেপিত সংস্করণ। **প্রকাশক :** ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া; এ-৫, গ্রীণপার্ক, নিউদিল্লি-১১০-০১৬; প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৭ সন (শক ১৯১৯); মূল্য : ৮.৫০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** অনুপ রায়।

* ভূমিকায় অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—*'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' সিরিজটি তিন পর্বে আটখণ্ডে প্রকাশিত প্রায় আড়াই হাজার পৃষ্ঠার সুবৃহৎ উপন্যাস। প্রথম পর্ব—নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে, দু'খণ্ডে; দ্বিতীয় পর্ব—অলৌকিক জলযান, দু'খণ্ডে; তৃতীয় পর্ব—ঈশ্বরের বাগান, চারখণ্ডে খণ্ডিত বঙ্গের অখণ্ড বর্ণমালাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এর চরিতমালা অসংখ্য। লিরিকধর্মী এই উপন্যাসকে এত ক্ষুদ্র পরিসরে তুলে ধরা অবাস্তব চিন্তা। ফলে উপন্যাসটির প্রথম খণ্ডাংশের আংশিক কিছু ছবি সাধারণ পাঠকের কথা মাথায় রেখে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এই ক্ষুদ্র পরিসরে চিত্রিত করা হল। যে কাব্যিক সুষমায় এই উপন্যাসের গঠন, তাও যথা সম্ভব রক্ষা করার চেষ্টা হয়েছে। আসলে অগণিত সাধারণ পাঠক যদি এই ক্ষুদ্র পরিসর থেকে মূল উপন্যাসের রহস্যময়তায় এবং জীবনবোধে প্রবেশ করার আগ্রহ বোধ করেন তবেই আমার চেষ্টা সার্থক।"*

২. **বইয়ের নাম :** *'অবিনাশী প্রেম'* (সুনির্বাচিত পাঁচটি উপন্যাস)। **প্রকাশক :** যূথিকা বুক স্টল; ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩; প্রকাশক : সত্যবান রায়; প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০১১; মূল্য : ২৫০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** অনুপ রায়। সূচি : ১. তখন হেমন্তকাল; ২. যুবতী পরম রূপবতী; ৩. ঋতুসংহার; ৪. ডাকবাংলো; ৫. রোদ্দুরে জ্যোৎস্নায়।

৩. **বইয়ের নাম :** *'প্রিয় ছ'টি উপন্যাস'।* **প্রকাশক :** ভবিষ্যৎ; ১ এ, কলেজ রো, কলকাতা-৯; প্রকাশক : সরুপ দত্ত; প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১১; মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** সৌজন্য চক্রবর্তী। **উৎসর্গ :** যারা বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে

তাদের এই উপন্যাসবলি উৎসর্গ করা গেল।

সূচি : ১. জীবন মহিমা; ২. অন্তর্গত খেলা; ৩. আবাস; ৪. পৃথিবীর এক কোণে; ৫. প্রেমে অপ্রেমে; ৬. মানুষের হাহাকার।

৪. **বইয়ের নাম :** *'সব ফুল কিনে নাও'* / **প্রকাশক :** সাহিত্য সংস্থা; ৯, নবীন পাল লেন, কলিকাতা-৯; প্রকাশক : রণধীর পাল; প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৭৪; মূল্য : ৮.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য। **উৎসর্গ :** শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বন্ধুবরেষু।

৫. **বইয়ের নাম :** *'মানুষের মামুলী কেচ্ছা'* / **প্রকাশক :** দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ; ৫৭/সি, কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা-১২; প্রকাশক: দেবু বন্দ্যোপাধ্যায়; **প্রথম প্রকাশ :** আষাঢ় ১৩৮২; মূল্য : ৫.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** গৌতম রায়।

৬. **বইয়ের নাম :** *'পিপাসা'* / **প্রকাশক :** পাত্র'জ পাবলিকেশন; ২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট; কলকাতা-৭০০ ০৭৩; প্রকাশক : মানসকুমার পাত্র; প্রথম পাত্র'জ সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৫; মূল্য : ৫০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** অনুপ রায়। **উৎসর্গ :** শ্রী গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য অগ্রজপ্রতিমেষু।

৭. **বইয়ের নাম :** *'রূপকথার আংটি'* / **প্রকাশক :** বর্ণালী; ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০৯; প্রকাশক : কান্তিরঞ্জন ঘোষ; **প্রথম প্রকাশ :** অজ্ঞাত। মূল্য : ২২.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** পঞ্চানন মালাকার। **উৎসর্গ :** সুহৃদবরেষু শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়।

৮. **বইয়ের নাম :** *'প্রশস্ত হলঘরে'* / **প্রকাশক :** সেন্ট্রাল লাইব্রেরী; ১৫/৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২; প্রকাশক: শ্রী সুধীরচন্দ্র রায়; **প্রথম প্রকাশ :** ভাদ্র ১৩৮২; মূল্য : ৭.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** শ্রীরঞ্জিতকুমার দাস। **উৎসর্গ :** প্রদোষ চট্টোপাধ্যায় কল্যাণবরেষু।

৯. **বইয়ের নাম :** *'অলৌকিক জলযান'* (দ্বিতীয় খণ্ড)। **প্রকাশক :** শঙ্খ প্রকাশন; ৭৯/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০৯; প্রকাশক : মনোরঞ্জন মজুমদার; **প্রথম প্রকাশ :** মাঘ ১৩৮৪; মূল্য : ১৮.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** খালেদ চৌধুরী। **উৎসর্গ :** অসীমা চট্টোপাধ্যায় শ্রীচরণেষু।

১০. **বইয়ের নাম :** *'রাজা যায় বনবাসে'* / **প্রকাশক :** ডি.এম.লাইব্রেরী; ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬; প্রকাশক : শ্রী গোপালদাস মজুমদার; **প্রথম প্রকাশ :** বৈশাখ ১৩৭৯; মূল্য : ১৬.০০ টাকা। **উৎসর্গ :** বিমল কর অগ্রজপ্রতিমেষু।

১১. **বইয়ের নাম :** *'মানুষের হাহাকার'* / **প্রকাশক :** ডি.এম.লাইব্রেরী; ৪২, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬; প্রকাশক : অমূল্যগোপাল মজুমদার; **প্রথম প্রকাশ :** ফাল্গুন ১৩৮৮; মূল্য : ২৫.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** গৌতম রায়। **উৎসর্গ :** অগ্রজপ্রতিম প্রভাত চট্টোপাধ্যায়ের করকমলে।

১২. **বইয়ের নাম :** *'রোদ্দুরে জোৎস্নায়'* / **প্রকাশক :** ডি.এম.লাইব্রেরী; ৪২, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬; প্রকাশক : অমূল্যগোপাল মজুমদার; **প্রথম প্রকাশ :** অজ্ঞাত।

১৩. **বইয়ের নাম :** *'সুখী রাজপুত্র'* / **প্রকাশক :** ডি.এম.লাইব্রেরী; ৪২, বিধান সরণি,

কলকাতা-৭০০ ০০৬; প্রকাশক : গোপালদাস মজুমদার; প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০। **উৎসর্গ** : কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় শ্রদ্ধাস্পদেষু।

১৪. **বইয়ের নাম** : *'বিভ্রম'* / **প্রকাশক** : ডি.এম.লাইব্রেরী; ৪২, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬; প্রকাশক : গোপালচন্দ্র মজুমদার; প্রথম প্রকাশ : অজ্ঞাত।

১৫. **বইয়ের নাম** : *'সাদা জ্যোৎস্না'* / **প্রকাশক** : গ্রন্থপ্রকাশ।

১৬. **বইয়ের নাম** : *'পিপাসা'* / **প্রকাশক** : গ্রন্থালয়।

১৭. **বইয়ের নাম** : *'সব ফুল কিনে নাও'* /* **প্রকাশক** : অনন্য প্রকাশন; ৬৬, কলেজ স্ট্রিট (দ্বিতল), কলিকাতা-৭০০ ০৭৩; প্রকাশক : হীরক রায়; প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৮৬; মূল্য : ৩০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : ধীরেন শাসমল। **উৎসর্গ** : শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়-কে।

* দুটি উপন্যাস—১. সব ফুল কিনে নাও; ২. ফুল নিয়ে।

১৮. **বইয়ের নাম** : *'দুষ্টু হাইতিতি'* / **প্রকাশক** : অনন্য প্রকাশন। ৬৬, কলেজ স্ট্রিট (দ্বিতল), কলিকাতা-৭০০ ০৭৩; প্রকাশক : হীরক রায়।

১৯. **বইয়ের নাম** : *'অভ্যন্তরে হত্যাকাণ্ড'* / **প্রকাশক** : অনন্য প্রকাশন; ৬৬, কলেজ স্ট্রিট (দ্বিতল), কলিকাতা-৭০০ ০৭৩; প্রকাশক : হীরক রায়; প্রথম সংস্করণ : অজ্ঞাত। **প্রচ্ছদ** : ধীরেন শাসমল। **উৎসর্গ** : শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়-কে।

২০. **বইয়ের নাম** : *'মামার বাড়ি ভূতের বাড়ি'* / **প্রকাশক** : সংবাদ; প্রথম সংস্করণ : ১লা মার্চ ১৯৮৪।

২১. **বইয়ের নাম** : *'একটি জলের রেখা'* / **প্রকাশক** : প্রতিভাস।

২২. **বইয়ের নাম** : *'অরণ্যরাজ্যে ম্যান্ডেলা'* / **প্রকাশক** : ভস্তক।

২৩. **বইয়ের নাম** : *'জীবন বড় ভারবাহী জন্তু'* / **প্রকাশক** : শরৎ পাবলিশিং হাউস; ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯; প্রকাশক : ছায়া চট্টোপাধ্যায়; প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৮৮; মূল্য : ১০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : সুবোধ দাশগুপ্ত। **উৎসর্গ** : বামাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রীতিভাজনেষু।

২৪. **বইয়ের নাম** : *'শূন্যের মাঝারে বানাইল'* / **প্রকাশক** : সপ্তর্ষি।

২৫. **বইয়ের নাম** : *'এখন মধুমাস'* / * **প্রকাশক** : সাহিত্যম্; ১৮ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩; প্রকাশক : নির্মলকুমার সাহা; প্রথম মুদ্রণ : শ্রীপঞ্চমী ১৩৯২; দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১লা বৈশাখ, ১৪০১; মূল্য : ২৫.০০ টাকা।

* তিনটি উপন্যাস—১. প্রেমে অপ্রেমে; ২. আবাস; ৩. পৃথিবীর এক কোণে।

২৬. **বইয়ের নাম** : *'মনোরম বনভূমি'* / * **প্রকাশক** : সাহিত্যম্; ১৮ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩; প্রকাশক : নির্মলকুমার সাহা; প্রথম সাহিত্যম্ সংস্করণ : বইমেলা ১৯৯৬; মূল্য : ৩০.০০ টাকা। পৃ.-২০৮। **প্রচ্ছদ** : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত। **উৎসর্গ** : পিনাকী সরকার ও অরুণা সরকার-কে।

* দুটি উপন্যাস—১. তখন হেমন্তকাল; ২. রোদ্দুরে জ্যোৎস্নায়।

২৭. **বইয়ের নাম :** *'দ্বিচারিণী'* / **প্রকাশক :** সাহিত্যম্; ১৮ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩; প্রকাশক : নির্মলকুমার সাহা; প্রথম সংস্করণ : ১৯৯৫; পৃ.-২২৩।

২৮. **বইয়ের নাম :** *'রেশমী'* / **প্রকাশক :** সাহিত্যম্; ১৮ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩; প্রকাশক : নির্মলকুমার সাহা; প্রথম সংস্করণ : কলকাতা পুস্তক মেলা, ১৯৯৮; পৃ.-১১২। **উৎসর্গ :** সমরনাথ প্রিয়বরেষু।

২৯. **বইয়ের নাম :** *'রূপকথার আংটি'* / **প্রকাশক :** সাহিত্যম্; ১৮ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩; প্রকাশক : নির্মলকুমার সাহা; প্রথম সংস্করণ : ১৯৯৮; পৃ.-১৭৪।

৩০. **বইয়ের নাম :** *'সহেলি'* / * **প্রকাশক :** সাহিত্যম্; ১৮ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩; প্রকাশক : নির্মলকুমার সাহা; প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারী, বইমেলা ১৯৯৩; পৃ.-২০৮। **উৎসর্গ :** দামিনী মণ্ডল এবং মালিনী মণ্ডল-কে।
* তিনটি উপন্যাসের সংকলন—১. সহেলি; ২. দূরের আকাশ; ৩. গুপ্তধন।

৩১. **বইয়ের নাম :** *'ধ্বনি প্রতিধ্বনি'* / **প্রকাশক :** শৈব্যা।

৩২. **বইয়ের নাম :** *'মানুষের সত্যাসত্য'* / **প্রকাশক :** শৈব্যা; ২য় সংস্করণ : ২০০১।

৩৩. **বইয়ের নাম :** *ম্যান্ডেলার অভিযান'* / **প্রকাশক :** শৈব্যা; ১ম সংস্করণ : ২০০৪; পৃ.-১৮৪।

৩৪. **বইয়ের নাম :** *'নগ্ন ঈশ্বর'* / **প্রকাশক :** নবপত্র প্রকাশন; ৮, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯; প্রকাশক : প্রসূন বসু; প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৩৯১। **প্রচ্ছদ :** গৌতম রায়। **উৎসর্গ :** শ্রদ্ধেয় নাট্যকার শ্রী সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী অগ্রজপ্রতিমেষু, শ্রীমতী রত্না নন্দী সুচরিতাসু।
রচনাকাল : জুলাই ১৯৬২ থেকে এপ্রিল ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত।

মুখবন্ধ : 'তিনজন নাবিকের সমুদ্র-যাত্রাকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের বিস্তৃতি। উপন্যাস রচনায় সামান্য ভিন্ন রীতি অবলম্বন করা হয়েছে। উপন্যাসটি চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত, চারটি অসামান্য সমুদ্র যাত্রার গল্প।

অথবা বলা যেতে পারে অবনীভূষণ, বিজন এবং সুমিত্র ভিন্ন ভিন্ন জাহাজে সমুদ্র-যাত্রা করেছিল—তারা কত বন্দর, কত অসীম সমুদ্র অতিক্রম করে কোনো এক অলৌকিক ঘটনার মতো এক স্থবির জাহাজে উঠে পড়ে প্রায় প্রৌঢ় বয়সে এক ভয়ঙ্কর পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ল। এই পাপবোধ ওদের নিরন্তর দুঃখিত করেছে। তুষারঝড়ের ভিতর ওরা ঈশ্বর অনুসন্ধানের মতো স্ব স্ব জীবনের কোনো প্রতীক শুভবোধের অন্বেষণে রাতের পর রাত সেই পাপের চাবিকাঠিটি অর্থাৎ মৃত যুবতীটির পাশে বসে বিগত জীবনের কিছু আলো এবং উৎসর্গের গান গেয়েছিল। এইসব প্রাচীন নাবিকেরা অকপটে ভালোবাসার জন্য মৃত যুবতীটিকে বরফ-ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল। অকপট ভালোবাসার জন্য প্রাচীন নাবিকেরা যুবতীটিকে কিছুতেই সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে পারছিল না।

এবং তিনটি পরিচ্ছেদ আলো এবং উৎসর্গের গান মাত্র। শেষ পরিচ্ছেদটি উপন্যাসের মূল পটভূমি।'

৩৫. **বইয়ের নাম** : *'দুই কিশোরী দুই প্রেমিক'*। * **প্রকাশক** : আরুণি পাবলিকেশনস্; ৭/১ সি, লিন্ডসে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৮৭; প্রকাশক : প্রশান্ত দত্ত; প্রথম প্রকাশ : ২৬ জানুয়ারী ২০০১; মূল্য : ২০০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : সুব্রত চৌধুরী।
* দু'টি উপন্যাস—১. টুকুনের অসুখ; ২. সমুদ্রে বুনোফুলের গন্ধ।

৩৬. **বইয়ের নাম** : *'কবির স্ত্রী'* (দুটি উপন্যাসের সংকলন)। * **প্রকাশক** : অঞ্জলি প্রকাশনী; বিদ্যাসাগর টাওয়ার, শপ নং-১৬ (দ্বিতল), ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩; প্রকাশক : সোমা রায়চৌধুরী; প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০১৩; মূল্য : ১৫০.০০ টাকা; পৃ.-১৩৬। **প্রচ্ছদ** : নির্মলেন্দু মণ্ডল। **উৎসর্গ** : মণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (বৌঁচি) সুচরিতাসু।
* দু'টি উপন্যাস—১. কবির স্ত্রী; ২. সমুদ্র এবং তার জলবায়ু।

৩৭. **বইয়ের নাম** : *'লাঞ্ছিতা'*। **প্রকাশক** : অঞ্জলি প্রকাশনী; ই-৪০, কালাচাঁদ পাড়া, কামডহরি, গড়িয়া, কলিকাতা-৭০০ ০৮৪; প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারী ২০০০; মূল্য : ৫০ টাকা। প্রকাশক : সোমা রায়চৌধুরী। পৃ.-১৩৬। **প্রচ্ছদ** : সুনীল শীল। **উৎসর্গ** : হর্ষ দত্ত অনুজপ্রতিম।

৩৮. **বইয়ের নাম** : *'শেষ চিঠি'*। **প্রকাশক** : অঞ্জলি প্রকাশনী; প্রকাশক : কৌশিক দত্ত; ই-৪০, কালাচাঁদ পাড়া, কামডহরি, গড়িয়া, কলিকাতা-৭০০ ০৮৪; প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০৩; মূল্য : ৫০.০০ টাকা; পৃ.-১২০। **প্রচ্ছদ** : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়। **উৎসর্গ** : ঝুমা, সোমা, কৌশিককে।

৩৯. **বইয়ের নাম** : *'প্রেমে অপ্রেমে'*। **প্রকাশক** : অঞ্জলি প্রকাশনী; প্রকাশক : ঝুমা রায়চৌধুরী; বিদ্যাসাগর টাওয়ার, শপ নং-১৬ (দ্বিতল), ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩; প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারী ২০০৬; মূল্য : ৮০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : সুব্রত চৌধুরী। **উৎসর্গ** : কবি প্রমোদ বসু কল্যাণীয়েষু।

৪০. **বইয়ের নাম** : *'দশটি উপন্যাস'*। * **প্রকাশক** : অঞ্জলি প্রকাশনী; ই-৪০, কালাচাঁদ পাড়া, কামডহরি, গড়িয়া, কলিকাতা-৭০০ ০৮৪; প্রকাশক : সোমা রায়চৌধুরী; প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০১; মূল্য : ৩০০.০০ টাকা; পৃ.-৬৮০। **প্রচ্ছদ** : সুব্রত চৌধুরী। **উৎসর্গ** : ডাঃ অপূর্বকুমার মুখার্জী ও শ্রীমতী মহাশ্বেতা মুখার্জী।
* দশটি উপন্যাস—১. মরু; ২. নগ্ন ঈশ্বর; ৩. যুবতী পরম রূপবতী; ৪. পিপাসা; ৫. ভালবাসা যারে কয়; ৬. সাদা জ্যোৎস্না; ৭. সহেলি; ৮. [illegible]ড় ভারবাহী জন্তু; ৯. সব ফুল কিনে নাও; ১০. সুখী রাজপুত্র।

৪১. **বইয়ের নাম** : *'পাগলিনী রাধা'*। **প্রকাশক** : অঞ্জলি প্রকাশনী; বিদ্যাসাগর টাওয়ার, শপ নং-১৬ (দ্বিতল), ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩; প্রকাশক : সোমা রায়চৌধুরী; প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০৮; পৃ.-১৫৬। **প্রচ্ছদ** : সুব্রত

চৌধুরী। **উৎসর্গ** : স্নেহের পাহাড়ি বীরু ও কৃষ্ণাকে।

৪২. **বইয়ের নাম** : *'হৃদয়ে অবাধ্য প্রেম'* (পাঁচটি প্রথাবহির্ভূত প্রেমের উপন্যাস)। **প্রকাশক** : অঞ্জলি প্রকাশনী; বিদ্যাসাগর টাওয়ার, শপ নং-১৬ (1st Floor), ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩; প্রকাশক : সোমা রায়চৌধুরী; প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০৭; মূল্য : ১১০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : সুব্রত চৌধুরী।
[এই বইয়ে অতীনের 'চোরাবালি' উপন্যাসটি সংকলিত হয়েছে। সম্পাদনা : ড. ঝুমা রায়চৌধুরী।]

৪৩. **বইয়ের নাম** : *'তখন হেমন্তকাল'*। **প্রকাশক** : প্রত্যয় প্রকাশনী; ৪০/১/এ, আর.এন.দাস.রোড, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৭০০ ০৩১; প্রকাশক : অজিত ভট্টাচার্য; প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ১৩৯১; মূল্য : ১৪.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : পূর্ণেন্দু পত্রী। **উৎসর্গ** : আমার সবিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীযুক্ত ক্ষিতিশ ধর এবং প্রতিমা ধরকে।

৪৪. **বইয়ের নাম** : *'ইন্দ্র এবং কলকাতা'*। **প্রকাশক** : বসাক বুক স্টোর প্রা: লি:; ৪, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩; প্রকাশক : স্বপনকুমার বসাক; পরিমার্জিত সংস্করণ : বইমেলা ১৯৯১; মূল্য : ৩০.০০ টাকা; পৃ.-১৯৯। **প্রচ্ছদ** : দেবাশীষ মিত্র। **উৎসর্গ** : বন্ধুবর শ্যামল চক্রবর্তীকে।

৪৫. **বইয়ের নাম** : *'আতাপুরের ভূত'*। **প্রকাশক** : বসাক বুক স্টোর প্রা: লি:; ৪, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩; প্রকাশক : স্বপনকুমার বসাক; প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ১৯৯৯; দ্বিতীয় প্রকাশ : শুভ মহালয়া ২০০৩; মূল্য : ৪০.০০ টাকা।

৪৬. **বইয়ের নাম** : *'টুকুনের অসুখ'*। **প্রকাশক** : বাণীশিল্প।

৪৭. **বইয়ের নাম** : *'গম্বুজে হাতের স্পর্শ'*। **প্রকাশক** : বিশ্ববাণী; প্রথম সংস্করণ : ১৯৭২; পৃ.-১৭৪।

৪৮. **বইয়ের নাম** : *'চারটি নারী চরিত্র'*। * **প্রকাশক** : মণ্ডল বুক হাউস; ৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯; প্রকাশক : শ্রীসুনীল মণ্ডল; প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৩৯৯ সন/১৪ই এপ্রিল ১৯৯২ সাল; মূল্য : ৫০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : গণেশ বসু। **উৎসর্গ** : দেবকুমার বসু সুহৃদবরেষু।
* চারটি উপন্যাস—১. একটি খারাপ মেয়ের গল্প; ২. উপেক্ষা; ৩. সাবর্ণ; ৪. ভালবাসা যারে কয়।

৪৯. **বইয়ের নাম** : *'ঋতুসংহার'*। **প্রকাশক** : দীপ প্রকাশন; ২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬; প্রকাশক : শংকর মণ্ডল; প্রথম সংস্করণ : ২০০০; পৃ.-১১২।

৫০. **বইয়ের নাম** : *'বিদেশিনী'*। **প্রকাশক** : বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা: লি:; ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২; প্রকাশক : ময়ূখ বসু; প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৭৬। **প্রচ্ছদ** : মদন সরকার। **উৎসর্গ** : ভালোবাসার পুষি ও পুতুল-কে।
বি.দ্র. : *উপন্যাস শুরুর আগে লেখকের মন্তব্য—'মহাত্মা মার্টিন লুথার কিং স্মরণে'।*

৫১. **বইয়ের নাম** : *'অন্তর্গত খেলা'*। **প্রকাশক** : নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রা: লি:; ৬৮, কলেজ

স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩; প্রকাশক : প্রবীরকুমার মজুমদার; প্রথম প্রকাশ : অজ্ঞাত। **প্রচ্ছদ** : দেবদত্ত নন্দী

৫২. **বইয়ের নাম** : *'জীবন মহিমা'*। **প্রকাশক** : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:; ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩; প্রকাশক : সবিতেন্দ্রনাথ রায়; প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৯১/জানুয়ারী ১৯৮৫; মূল্য : ২০.০০ টাকা; পৃ.-১৯০। **প্রচ্ছদ** : শ্রীপূর্ণেন্দু রায়। **উৎসর্গ** : প্রফুল্ল রায় সুজনেষু।

৫৩. **বইয়ের নাম** : *'মৃন্ময়ী'*। **প্রকাশক** : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:; ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩; প্রকাশক : সবিতেন্দ্রনাথ রায়; প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৯৯; দ্বিতীয় মুদ্রণ : মাঘ ১৩৯৯; মূল্য : ৪৫.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়। **উৎসর্গ** : শ্রীমান দেবাশিস্ ও কৃষ্ণা-কে।

৫৪. **বইয়ের নাম** : *'সাগরে মহাসাগরে'*। * **প্রকাশক** : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:; ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩; প্রকাশক : সবিতেন্দ্রনাথ রায়; প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৯৮; মূল্য : ১০০.০০ টাকা; পৃ.-৫৯২। **প্রচ্ছদ** : পার্থপ্রতিম বিশ্বাস।

* ১২-টি উপন্যাসের সংকলন—১. সমুদ্র-মানুষ; ২. সমুদ্র পাখির কান্না; ৩. গম্বুজে হাতের স্পর্শ; ৪. ধ্বনি প্রতিধ্বনি; ৫. প্রতিপক্ষ; ৬. সমুদ্রে অশরীরী; ৭. আশ্চর্য দূরদর্শন; ৮. বর্ণপরিচয়; ৯. মানুষের ধর্ম; ১০. বিজন; ১১. টুপাতি চেরী; ১২. ঈশ্বরীর থাবা।

'নিবেদন'-এ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : *"কোন এক সময় আমি নাবিক ছিলাম। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র-ঘুরে বেড়িয়েছি। আমার কৈশোরকাল তখন সবে উত্তীর্ণ। নানা বন্দরে কিংবা গভীর সমুদ্রে দিনযাপনের অভিজ্ঞতা থেকেই এই গ্রন্থের গল্প উপন্যাসগুলি উঠে এসেছে। সাহিত্যে হাতেখড়ি বলতে গেলেও এই সমুদ্রে। সমুদ্র তখন আমাকে তাড়া করত। আমার প্রথম উপন্যাস 'সমুদ্র-মানুষ' রচনাও সেই সুবাদে। এই সব উপন্যাস এবং গল্পসমূহ একত্রে প্রকাশ করার উদ্দেশ্য বাঙালী জীবনে সমুদ্রও কম জায়গা জুড়ে নেই। অনন্ত অসীম সমুদ্র অতিক্রম করে এই নিরন্তর পরস্পরের কাহিনীগুলি মানুষেরই অনন্ত ইচ্ছার কথা। পাঠকদের ভাল লাগলেই আমার আনন্দ।"*

৫৫. **বইয়ের নাম** : *'সমুদ্রযাত্রা'*। **প্রকাশক** : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:; ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩; প্রকাশক : সবিতেন্দ্রনাথ রায়; প্রথম সংস্করণ : ২০০৩; পৃ.-৪২৬।

৫৬. **বইয়ের নাম** : *'সমুদ্রে বুনোফুলের গন্ধ'*। **প্রকাশক** : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:; ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩; প্রকাশক : সবিতেন্দ্রনাথ রায়; প্রথম সংস্করণ : ১৯৯২; পৃ.-৩৩২।

৫৭. **বইয়ের নাম** : *'নারী এবং নদীর পাড়ে বাড়ি'*। **প্রকাশক** : দে'জ পাবলিশিং; ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩; প্রকাশক: সুধাংশুশেখর দে; মূল্য : ৪০.০০

টাকা। **প্রচ্ছদ :** দেবাশিস রায়। **উৎসর্গ :** জয় গোস্বামী-কে।

৫৮. **বইয়ের নাম :** *'আবাদ'* / **প্রকাশক :** দে'জ পাবলিশিং; ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩; প্রকাশক: সুধাংশুশেখর দে; **প্রথম প্রকাশ :** ১লা বৈশাখ ১৩৯৪/এপ্রিল ১৯৮৭; দ্বিতীয় সংস্করণ : পৌষ ১৪০০/জানুয়ারি ১৯৯৪; মূল্য : ৬০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** গৌতম রায়। **উৎসর্গ :** রমা ও কুমকুম-কে।

৫৯. **বইয়ের নাম :** *'অপহরণ'* / **প্রকাশক :** দে'জ পাবলিশিং; ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩; প্রকাশক: সুভাষচন্দ্র দে; **প্রথম প্রকাশ :** জানুয়ারী ১৯৯৫/মাঘ ১৪০১; মূল্য : ৩০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** ধীরেন শাসমল। **উৎসর্গ :** অনুভা কর সুচরিতাসু।

৬০. **বইয়ের নাম :** *'উত্তাপ'* / **প্রকাশক :** দে'জ পাবলিশিং; ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩; প্রকাশক: সুধাংশুশেখর দে; **প্রথম প্রকাশ :** বইমেলা, জানুয়ারী ১৯৮৯; মূল্য : ২৫.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** গৌতম রায়। **উৎসর্গ :** পরম কল্যাণবরেষু অর্ধেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬১. **বইয়ের নাম :** *'অমৃতা'* / **প্রকাশক :** দে'জ পাবলিশিং; ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩; প্রকাশক: সুধাংশুশেখর দে; **প্রথম প্রকাশ :** অগ্রহায়ণ ১৪০৩, ডিসেম্বর ১৯৯৬; দ্বিতীয় সংস্করণ : শ্রাবণ ১৪০৯, আগস্ট ২০০২; মূল্য : ৫০.০০ টাকা। পৃ.-১২৮। **প্রচ্ছদ :** দেবাশীষ রায়। **উৎসর্গ :** প্রীতিভাজনেষু শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র শী-কে।

৬২. **বইয়ের নাম :** *'একটি জলের রেখা ও ওরা তিনজন'* / **প্রকাশক :** দে'জ পাবলিশিং; ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩; প্রকাশক: সুভাষচন্দ্র দে; পরিমার্জিত দে'জ সংস্করণ : কলিকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারী ১৯৯৮/মাঘ ১৪০৪; মূল্য : ৫০.০০ টাকা; পৃ.-১৫২। **প্রচ্ছদ :** মৃত্যুঞ্জয় মুখার্জী। **উৎসর্গ :** মাতৃসমা প্রতিমা চট্টোপাধ্যায়-কে।

৬৩. **বইয়ের নাম :** *'অরণ্য'* / **প্রকাশক :** দে'জ পাবলিশিং; ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩; প্রকাশক : সুভাষচন্দ্র দে; **প্রথম প্রকাশ :** ১লা বৈশাখ ১৪০০ (এপ্রিল, ১৩৯৩); পৃ.-১৮৭। **প্রচ্ছদ :** গৌতম রায়।

৬৪. **বইয়ের নাম :** *'রাজা যায় বনবাসে'* / **প্রকাশক :** দে'জ পাবলিশিং; ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩; ২য় সংস্করণ, ২০০১; পৃ.-২৮৮।

৬৫. **বইয়ের নাম :** *'৫০ সুবর্ণ সংগ্রহ উপন্যাস'* / (চতুর্থ খণ্ড) * **প্রকাশক :** আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:; প্রকাশক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু; ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯; **প্রথম প্রকাশ :** আগস্ট ২০০৮; মূল্য : ৫০০.০০ টাকা।

* মোট পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত। এই খণ্ডে বিভিন্ন লেখকের ১২টি উপন্যাসের মধ্যে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুই ভাতরবর্ষ' (নভেম্বর ১৯৯৫) উপন্যাসটি সংকলিত হয়েছে।

৬৬. **বইয়ের নাম :** *'অন্নভোগ'* / **প্রকাশক :** আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:; প্রকাশক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু; ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯; প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৯১; মূল্য : ২০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** জয়ন্ত ঘোষ। **উৎসর্গ :** শ্যামলকান্তি দাস প্রীতিভাজনেষু।

৬৭. **বইয়ের নাম :** *'ঝিনুকের নৌকা'* / **প্রকাশক :** আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:; প্রকাশক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু; ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯; প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৯০; দ্বিতীয় মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ১৯৯৭; মূল্য : ২০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** অমিয় ভট্টাচার্য। **উৎসর্গ :** সুনেত্রা ও সতীনাথকে।

৬৮. **বইয়ের নাম :** *'মধ্যযামিনী'* / **প্রকাশক :** আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:; প্রকাশক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু; ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯; প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারী ১৯৯৮; মূল্য : ৪৫.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** অমিয় ভট্টাচার্য। **উৎসর্গ :** অনুজ লেখক অমর মিত্রকে।

৬৯. **বইয়ের নাম :** *'নদীর সঙ্গে দেখা'* / **প্রকাশক :** আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:; প্রকাশক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু; ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯; প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারী ১৯৯৪; মূল্য : ২৫.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** সুব্রত চৌধুরী। **উৎসর্গ :** অনুজপ্রতিম পরেশ দে-কে।

৭০. **বইয়ের নাম :** *'নারী ও পুরুষ'* / (আনন্দ পেপারব্যাক) **প্রকাশক :** আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:; প্রকাশক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু; ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯; প্রথম সংস্করণ : এপ্রিল ১৯৯৬; মূল্য : ৪০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়। **উৎসর্গ :** জয়া ও তমালি বসু-কে।

৭১. **বইয়ের নাম :** *'তুষারকুমারী'* / **প্রকাশক :** আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:; প্রকাশক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু; ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯; প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারী ১৯৯৩; মূল্য : ২৫.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** বিমল দাস। **উৎসর্গ :** গল্পকার গৌতম ভট্টাচার্যকে।

৭২. **বইয়ের নাম :** *'দুই ভারতবর্ষ'* / (আনন্দ পেপারব্যাক) **প্রকাশক :** আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:; প্রকাশক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু; ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯; প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৯৫; মূল্য : ৪০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** নির্মলেন্দু মণ্ডল। **উৎসর্গ :** অনুজ গল্পকার সুব্রত সেনগুপ্ত।

৭৩. **বইয়ের নাম :** *'কাপাশি'* / **প্রকাশক :** আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:; প্রকাশক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু; ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯; প্রথম সংস্করণ : এপ্রিল ১৯৯৭; মূল্য : ৪০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** কৃষ্ণেন্দু চাকী। **উৎসর্গ :** অমিতকুমার বসু প্রীতিভাজনেষু।

৭৪. **বইয়ের নাম :** *'পঞ্চাশটি গল্প'* / **প্রকাশক :** আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:; প্রকাশক : সুবীরকুমার মিত্র; ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯; প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারী ১৯৯৯। ষষ্ঠ মুদ্রণ : নভেম্বর ২০১৪। মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা। পৃ.-৪২৭।

উৎসর্গ : অনুজ লেখক নলিনী বেরাকে।

৭৫. **বইয়ের নাম :** *'সাগর জলে'* / **প্রকাশক :** আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:; প্রকাশক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু; ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯; প্রথম সংস্করণ : ২০০৮।

৭৬. **বইয়ের নাম :** *'প্রেমে অপ্রেমে'* / **প্রকাশক :** রূপরেখা; মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। **প্রচ্ছদ :** গৌতম রায়। **উৎসর্গ :** অসিত ভট্টাচার্য প্রীতিভাজনেষু।

৭৭. **বইয়ের নাম :** *'দুঃস্বপ্ন'* / **প্রকাশক :** করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৮০; দ্বিতীয় মুদ্রণ : আষাঢ় ১৪০২; মূল্য : ৬০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** অমিতাভ মুন্সী। **উৎসর্গ :** সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বন্ধুবরেষু।

৭৮. **বইয়ের নাম :** *'অরূপকথা'* / **প্রকাশক :** করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ :** কলকাতা বইমেলা ২০১২; মূল্য : ৬০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** দেবাশীষ রায়। **উৎসর্গ :** কল্যাণীয় শেখর হালদার-কে।

৭৯. **বইয়ের নাম :** *'অলৌকিক জলযান'* / **প্রকাশক :** করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৮৪; দ্বিতীয় মুদ্রণ (ক) : শ্রাবণ ১৩৯২; তৃতীয় মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৩৯৬; মূল্য : ৭৫.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** পূর্ণেন্দু পত্রী। **উৎসর্গ :** অমিয়া চট্টোপাধ্যায় শ্রীচরণেষু।

৮০. **বইয়ের নাম :** *'ভগ্নদেশ'* / **প্রকাশক :** করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ :** বইমেলা ২০১৫; মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা; পৃ.-৩৬৮। **প্রচ্ছদ :** রঞ্জিত দত্ত। **উৎসর্গ :** স্নেহের কিঞ্জলকে।

৮১. **বইয়ের নাম :** *'দেবী মহিমা'* / **প্রকাশক :** করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ :** জুন ১৯৮৪/আষাঢ় ১৩৯১; মূল্য : ৫০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** পূর্ণেন্দু পত্রী। **উৎসর্গ :** হাসিদি ও আনন্দদাকে।

৮২. **বইয়ের নাম :** *'দেবী মহিমা'* (অখণ্ড সংস্করণ) **প্রকাশক :** করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। মূল্য : ২০০.০০ টাকা। প্রথম অখণ্ড সংস্করণ : কলকাতা বইমেলা ২০০৩; **প্রচ্ছদ :** সুব্রত চৌধুরী। **উৎসর্গ :** হাসিদি এবং আনন্দদা, রমা ও কুমকুমকে।

৮৩. **বইয়ের নাম :** *'ঈশ্বরের বাগান'* (প্রথম খণ্ড)। **প্রকাশক :** করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। তথ্য জানা যায়নি।

৮৪. **বইয়ের নাম :** *'ঈশ্বরের বাগান'* (দ্বিতীয় খণ্ড)। **প্রকাশক :** করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। প্রথম প্রকাশ

: জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪; দ্বিতীয় মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৪০৫; মূল্য : ৬০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : গৌতম রায়। **উৎসর্গ** : দিব্যেন্দু পালিত সুহৃদবরেষু।

৮৫. **বইয়ের নাম** : *'ঈশ্বরের বাগান'* (তৃতীয় খণ্ড)। **প্রকাশক** : করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৯৫/সেপ্টেম্বর ১৯৮৮; মূল্য : ৫০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : গৌতম রায়। **উৎসর্গ** : শ্রীমান শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় কল্যাণবরেষু।

৮৬. **বইয়ের নাম** : *'ঈশ্বরের বাগান'* (চতুর্থ খণ্ড)। **প্রকাশক** : করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৯১; দ্বিতীয় মুদ্রণ : অক্টোবর ১৯৯৫; মূল্য : ১০০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : গৌতম রায়। **উৎসর্গ** : বামাচরণ মুখোপাধ্যায় সুহৃদবরেষু।

৮৭. **বইয়ের নাম** : *'সমুদ্র মানুষ'*। **প্রকাশক** : করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। প্রথম করুণা সংস্করণ : কলিকাতা পুস্তকমেলা ১৯৯৯; মূল্য : ৫০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : ইন্দ্রনীল ঘোষ। **উৎসর্গ** : পরম কল্যাণীয়া খুকুমণি ও তার ছোটবাপি দেবাশিস-কে।

৮৮. **বইয়ের নাম** : *'মানুষের ঘরবাড়ি'*। **প্রকাশক** : করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। অখণ্ড সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০০১; দ্বিতীয় সংস্করণ : এপ্রিল ২০১০; মূল্য : ৩০০.০০ টাকা। চতুর্থ অখণ্ড সংস্করণ : আগস্ট ২০১৩। মূল্য : ৪০০.০০ টাকা; পৃ.-৪২৮। **প্রচ্ছদ** : সুব্রত চৌধুরী। **উৎসর্গ** : বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব শ্রীযুক্ত বাবু অশোক মিত্র মান্যবরেষু।

৮৯. **বইয়ের নাম** : *'দুঃখিনী বর্ণমালা মা আমার'*। **প্রকাশক** : করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০৭; মূল্য : ৬০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : গৌতম রায়। **উৎসর্গ** : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের শহীদদের প্রতি।

৯০. **বইয়ের নাম** : *'সমুদ্র এবং তার জলবায়ু'*। **প্রকাশক** : করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০১২; মূল্য : ৭০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : দেবাশীষ সাহা। **উৎসর্গ** : সায়ন্ত মজুমদার কল্যাণবরেষু।

৯১. **বইয়ের নাম** : *'শেষ দৃশ্য'*। **প্রকাশক** : করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৬৭; দ্বিতীয় সংস্করণ : আগস্ট ১৯৭৮; তৃতীয় মুদ্রণ : জুন ১৯৮৬; মূল্য : ৩০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : পূর্ণেন্দু পত্রী। **উৎসর্গ** : জীবনে যে দু'জন মহৎ মানুষকে দেখেছি, বাবা এবং সোনাজ্যাঠামশাইকে।

৯২. **বইয়ের নাম** : *'সবুজ শ্যাওলার নীচে'*। **প্রকাশক** : করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর

১৯৯৬; মূল্য : ৩৫.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** সুধীর মৈত্র। **উৎসর্গ :** পূর্ণচন্দ্র দাস-কে।

৯৩. **বইয়ের নাম :** *'সমুদ্রযাত্রা'* / **প্রকাশক :** করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ :** কলিকাতা পুস্তকমেলা ১৯৯৮; মূল্য : ৩৫.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** যুধজিৎ সেনগুপ্ত। **উৎসর্গ :** কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়কে।

৯৪. **বইয়ের নাম :** *'বলিদান'* / **প্রকাশক :** করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ :** আষঢ় ১৩৮৭; মূল্য : ১৪.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** পূর্ণেন্দু পত্রী। **উৎসর্গ :** উজ্জ্বলকুমার মজুমদার সুহৃদবরেষু।

৯৫. **বইয়ের নাম :** *'ঈশ্বরের বাগান'* (অখণ্ড)। **প্রকাশক :** করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম অখণ্ড সংস্করণ :** অক্টোবর ২০০০; মূল্য : ৩০০.০০ টাকা; পঞ্চম অখণ্ড সংস্করণ : জানুয়ারী ২০১১; মূল্য : ৫০০.০০ টাকা। পৃ.-৭২৮। **প্রচ্ছদ :** সুব্রত চৌধুরী। **উৎসর্গ :** সমরেশ বসু, দিব্যেন্দু পালিত, শ্রীমান শুভাশিস ব্যানার্জী, বামাচরণ মুখোপাধ্যায়।

৯৬. **বইয়ের নাম :** *'পঞ্চযোগিনী'* / **প্রকাশক :** করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ :** জানুয়ারী ১৯৯০; মূল্য : ৫০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** ধীরেন শাসমল। **উৎসর্গ :** কবি দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রীতিভাজনেষু।

৯৭. **বইয়ের নাম :** *'অলৌকিক জলযান'* (অখণ্ড সংস্করণ)। **প্রকাশক :** করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ :** মাঘ ১৩৮৪; দ্বিতীয় মুদ্রণ (ক) : শ্রাবণ ১৩৯২; তৃতীয় মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৩৯৬; প্রথম অখণ্ড সংস্করণ : বইমেলা ১৪০৮ জানুয়ারী ২০০১; মূল্য : ২৪০.০০ টাকা। অষ্টম অখণ্ড সংস্করণ : মার্চ ২০১৪। মূল্য : ৫০০.০০ টাকা; পৃ.-৪৭২। **প্রচ্ছদ :** পূর্ণেন্দু পত্রী। **উৎসর্গ :** মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি আমার সুখেও আছেন দুঃখেও আছেন।

৯৮. **বইয়ের নাম :** *'মানুষের হাহাকার'* / **প্রকাশক :** করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ :** ফাল্গুন ১৩৮৮; দ্বিতীয় মুদ্রণ (করুণা) : চৈত্র ১৪০৪; মূল্য : ৬০.০০ টাকা; পৃ.-২২২। **উৎসর্গ :** অগ্রজপ্রতিম প্রভাত চট্টোপাধ্যায়ের করকমলে।

৯৯. **বইয়ের নাম :** *'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'* (অখণ্ড সংস্করণ)। **প্রকাশক :** করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ :** এপ্রিল ১৯৭১; সপ্তম সংস্করণ : মার্চ ১৯৯৭; প্রথম অখণ্ড সংস্করণ : জানুয়ারী ১৯৯৯; চতুর্দশ অখণ্ড সংস্করণ : জুন ২০১৫; পৃ.-৩৯৮; মূল্য : ৩০০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** পূর্ণেন্দু পত্রী। **উৎসর্গ :** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এবং আমার মা-কে।

১০০. **বইয়ের নাম** : *'প্রিয়নাথের জবানবন্দী'*। **প্রকাশক** : করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ** : নভেম্বর ২০১৩; মূল্য : ৮০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : দেবাশীষ রায়। **উৎসর্গ** : শ্রীসনৎ ভট্টাচার্য প্রীতিভাজনেষু।

১০১. **বইয়ের নাম** : *'চিতাভস্ম'*। **প্রকাশক** : করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ** : বইমেলা ২০১৩; মূল্য : ১২৫.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : রঞ্জন দত্ত। **উৎসর্গ** : কল্যানীয়াসু মিলু-কে।

১০২. **বইয়ের নাম** : *'পাঁচটি উপন্যাস'*। **প্রকাশক** : করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ** : বইমেলা ২০১১; মূল্য : ৩০০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : দেবাশীষ রায়। **উৎসর্গ** : শ্রীযুক্ত রঞ্জন সরকার প্রীতিভাজনেষু।

সূচি : ১. মৃন্ময়ী; ২. সুন্দর অপমান; ৩. দুঃখিনী বর্ণমালা মা আমার; ৪. সব ফুল কিনে নাও; ৫. লাঞ্ছিতা।

১০৩. **বইয়ের নাম** : *'পুতুল'*।* **প্রকাশক** : করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ** : ডিসেম্বর ২০০৪; মূল্য : ৪০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : সরসিজ বসু। **উৎসর্গ** : সাধনকমল চৌধুরী প্রিয়বরেষু।

* ২-টি উপন্যাস : ১. পুতুল; ২. বিষণ্ণ প্রতিমা।

১০৪. **বইয়ের নাম** : *'জনগণ'* (১ম পর্ব) উপন্যাস। **প্রকাশক** : করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ** বইমেলা : ২০০১; দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি : ২০০৯; পৃ.-৩৮৪। মূল্য : ৩০০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : দেবাশীষ রায়। **উৎসর্গ** : ছোটোদের গল্পের রাজা—শৈলেন ঘোষ-কে।

১০৫. **বইয়ের নাম** : *'জনগণ'* (২য় পর্ব) উপন্যাস। **প্রকাশক** : করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ**: ডিসেম্বর ২০০৫; পৃ.-২৮৮; মূল্য : ২০০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : দেবাশীষ রায়। **উৎসর্গ** : সন্তোষী ও অতনু-কে।

১০৬. **বইয়ের নাম** : *'দূরের আকাশ'*। **প্রকাশক** : করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ** : ডিসেম্বর ২০০৭; পৃ.-১৪৪; মূল্য : ৭০.০০ টাকা।

১০৭. **বইয়ের নাম** : *'বাসযাত্রা'*। **প্রকাশক** : করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ** : বইমেলা ২০১১; পৃ.-১২৮; মূল্য : আশি টাকা। **প্রচ্ছদ** : রঞ্জন দত্ত। **উৎসর্গ** : ঔপন্যাসিক সোহারাব হোসেন প্রীতিভাজনেষু।

১০৮. **বইয়ের নাম** : *'নির্বাসন'*। **প্রকাশক** : করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ** : বইমেলা ২০০৭;

পৃ.-১২৮; মূল্য : ৬০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : গৌতম রায়। **উৎসর্গ** : শ্রীমতী মীরা মুখোপাধ্যায় সুচরিতাষু।

১০৯. **বইয়ের নাম** : *'উপেক্ষা'* / **প্রকাশক** : করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ** : বইমেলা ১৯৯৬; পৃ.-১৪৭; মূল্য : ৫০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : সুধীর মৈত্র।

১১০. **বইয়ের নাম** : *'সুন্দর অপমান'* / **প্রকাশক** : করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ** : ডিসেম্বর ১৯৯৪; পৃ.-১৪০; মূল্য : ৩৫.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : সুধীর মৈত্র।

১১১. **বইয়ের নাম** : *'দ্বিতীয় পুরুষ'* / **প্রকাশক** : করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ** : কলিকাতা পুস্তকমেলা : জানুয়ারী ১৯৯৪; পৃ.-১৯৩; মূল্য : ৩৫.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : সুধীর মৈত্র। **উৎসর্গ** : প্রদ্যোত ভদ্র সুহৃদবরেষু।

১১২. **বইয়ের নাম** : *'উপন্যাস সমগ্র'* (প্রথম খণ্ড)। ভূমিকা নেই। **প্রকাশক** : করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা বইমেলা ২০০৪; পৃ.-৫৪৪; মূল্য : ২৫০.০০ টাকা; **প্রচ্ছদ** : সুব্রত চৌধুরী। **উৎসর্গ** : ডা: সবিত্রমোহন রায় সুহৃদবরেষু।

সূচি : ১. দূরের আকাশ; ২. একজন দৈত্য ও একটি লাল গোলাপ; ৩. টুকুনের অসুখ; ৪. লালগোলা এক্সপ্রেস; ৫. উপেক্ষা; ৬. রূপকথার আংটি; ৭. মানগানু উপত্যকার বেড়াল; ৮. বরফের নদী।

১১৩. **বইয়ের নাম** : *'উপন্যাস সমগ্র'* (দ্বিতীয় খণ্ড)। ভূমিকা : হীরেন চট্টোপাধ্যায়। **প্রকাশক** : করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ** : নভেম্বর ২০০৪; পৃ.-৫৬০; মূল্য : ২৫০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : সুব্রত চৌধুরী। **উৎসর্গ** : দেবেশ রায় সুহৃদবরেষু।

সূচি : ১. নারী ও নদীর পাড়ে বাড়ি; ২. দুঃস্বপ্ন; ৩. মানুষের হাহাকার; ৪. সমুদ্রমানুষ; ৫. শেষ দৃশ্য; ৬. একটি জলের রেখা ও ওরা তিনজন।

১১৪. **বইয়ের নাম** : *'উপন্যাস সমগ্র'* (তৃতীয় খণ্ড)। ভূমিকা : হীরেন চট্টোপাধ্যায়। **প্রকাশক** : করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ** : বইমেলা ২০০৬; পৃ.-৫৪৪; মূল্য : ২৫০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : সুব্রত চৌধুরী। **উৎসর্গ** : বাদল বসু সুহৃদবরেষু।

সূচি : ১. উত্তাপ; ২. ঋতুসংহার; ৩. জীবনমহিমা; ৪. মানুষের মামুলী কেচ্ছা; ৫. সমুদ্রে বুনো ফুলের গন্ধ।

১১৫. **বইয়ের নাম** : *'উপন্যাস সমগ্র'* (চতুর্থ খণ্ড)। ভূমিকা : হীরেন চট্টোপাধ্যায়। **প্রকাশক** : করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ** : কলকাতা বইমেলা ২০০৭; পৃ.-৫৯৪; মূল্য

: ৩০০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : সুব্রত চৌধুরী। **উৎসর্গ** : স্বাতী ও সুনীলকে।

সূচি : ১. রেশমী; ২. অন্তর্গত খেলা; ৩. অরণ্য; ৪. দ্বিতীয় পুরুষ; ৫. নগ্ন ঈশ্বর; ৬. সুখী রাজপুত্র।

১১৬. **বইয়ের নাম** : *'উপন্যাস সমগ্র'* (পঞ্চম খণ্ড)। ভূমিকা : হীরেন চট্টোপাধ্যায়। **প্রকাশক** : করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ** : রথযাত্রা ১৪১৫; পৃ.-৫০৪; মূল্য : ৩০০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : সুব্রত চৌধুরী। **উৎসর্গ** : অনুজপ্রতীম কল্যাণ মৈত্র।

সূচি : ১. প্রেমে অপ্রেমে; ২. প্রেম; ৩. পৃথিবীর এক কোণে; ৪. আবাস; ৫. সহেলি; ৬. রাজা যায় বনবাসে।

১১৭. **বইয়ের নাম** : *'উপন্যাস সমগ্র'* (ষষ্ঠ খণ্ড)। ভূমিকা : হীরেন চট্টোপাধ্যায়। **প্রকাশক** : করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ** : আগস্ট ২০০৯; পৃ.-৪৯২; মূল্য : ৩০০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : সুব্রত চৌধুরী। **উৎসর্গ** : প্রশান্ত সেন।

সূচি : ১. যুবতী পরম রূপবতী; ২. পিপাসা; ৩. ভালবাসা যারে কয়; ৪. সাদা জ্যোৎস্না; ৫. জীবন বড় ভারবাহী জন্তু; ৬. সব ফুল কিনে নাও; ৭. লাঞ্ছিতা; ৮. ডাকবাংলো।

১১৮. **বইয়ের নাম** : *'উপন্যাস সমগ্র'* (সপ্তম খণ্ড)। ভূমিকা : হীরেন চট্টোপাধ্যায়। **প্রকাশক** : করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ** : ১লা বৈশাখ বৈশাখ ১৪১৮; পৃ.-৪৭১; মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : সুব্রত চৌধুরী। **উৎসর্গ** : গুরু বিশাবাস প্রীতিভাজনেষু।

সূচি : ১. বিদেশিনী; ২. সমুদ্রযাত্রা; ৩. আবাদ; ৪. সুন্দর অপমান।

১১৯. **বইয়ের নাম** : *'উপন্যাস সমগ্র'* (অষ্টম খণ্ড)। ভূমিকা : হীরেন চট্টোপাধ্যায়। **প্রকাশক** : করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ** : বইমেলা ২০১৩; পৃ.-৪১৬; মূল্য : ৪০০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : সুব্রত চৌধুরী। **উৎসর্গ** : সুবীর মিত্র প্রীতিভাজনেষু।

সূচি : ১. মানুষের সত্যাসত্য; ২. ধ্বনি প্রতিধ্বনি; ৩. মৃন্ময়ী।

গল্প

১. **বইয়ের নাম** : *'চার দশকের সেরা গল্প'।* * **প্রকাশক** : একুশ শতক; ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩; সম্পাদনা: উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, আশিষ ঘোষ; প্রকাশক : সুমিত্রা কুণ্ডু; **প্রথম প্রকাশ** : জানুয়ারি ২০১১। **প্রচ্ছদ** : তপনলাল ধর। **উৎসর্গ** : অনুরাগী পাঠকদের জন্য।

* বিভিন্ন লেখকের ৫০-টি গল্পের সংকলন। এই সংকলনে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়রে 'তুরা' গল্পটি সংকলিত হয়েছে।

২. **বইয়ের নাম :** *'মুহূর্ত কথা'* (নির্বাচিত গল্প সংগ্রহ)।* **প্রকাশক :** পারুল প্রকাশনী; ৮/৩ চিন্তামণিদাস লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯; প্রথম সংস্করণ : ২০১০; মূল্য : ২৯৫.০০ টাকা। **উৎসর্গ :** রঞ্জিত রায়চৌধুরী-কে।

* ৬০টি গল্পের সংগ্রহ—১. টটনের কুকুর; ২. অন্নপূর্ণা; ৩. ফুলের বাস; ৪. ট্রেন বে-লাইন হলে; ৫. আততায়ী; ৬. হরিচরণবাবু; ৭. এক লণ্ঠনওয়ালার গল্প; ৮. ভাগু; ৯. শেকড়; ১০. এক হাত গণ্ডারের গল্প; ১১. বুলুর শেষ লুডোখেলা; ১২. মানিকলালের জীবনচরিত; ১৩. দেবী দর্শন; ১৪. টেলিপ্রিন্টার; ১৫. মীন রহস্য; ১৬. ঈশা; ১৭. গন্ধ; ১৮. কুসুম শুয়ে আছে তার অন্ধকার ঘরে; ১৯. কপালি; ২০. কাকচরিত্র; ২১. ফেরা; ২২. বাগানের তাজা গোলাপ; ২৩. তৃতীয় ভুবন; ২৪. উচ্ছেদ; ২৫. এখন ফোটার সময়; ২৬. পৃথিবী তারপর শব্দগন্ধহীন; ২৭. টিউলিপ ফুল; ২৮. নিজের দেশে ম্যান্ডেলা; ২৯. ফুল ফলের জন্য; ৩০. কাঠপিঁপড়ে; ৩১. প্রাণের সাড়া; ৩২. রেলগাড়ি ঝিক ঝিক; ৩৩. স্বর্ণমুকুট; ৩৪. আত্মসম্মান; ৩৫. প্রহসন; ৩৬. অ্যালবাম; ৩৭. স্বপ্নবৎ; ৩৮. কাল-ভুজঙ্গ; ৩৯. মৃত্যুচিন্তা; ৪০. আত্মরতি; ৪১. মণিমালা; ৪২. বিদ্যুলতা; ৪৩. অবলম্বন; ৪৪. বৃদ্ধ ও প্রতারক; ৪৫. পাখির বাসা; ৪৬. জলচোর; ৪৭. বয়ঃসন্ধি; ৪৮. থার্ডক্লাস; ৪৯. মাশুল; ৫০. শত্রুপক্ষ; ৫১. বিপ্রটিকুরী যাত্রা; ৫২. সাদা বিছানা; ৫৩. ঝুমির দুঃখ; ৫৪. উষ্ণতার ঐশ্বর্য; ৫৫. অনাবৃতা; ৫৬. পুষ্পবতি; ৫৭. গির্জার সিঁড়িতে সারারাত; ৫৮. আজব বাতি; ৫৯. চিনে মাটির পুতুল; ৬০. কামড়।

৩. **বইয়ের নাম :** *'শেষ বেলার গল্প'* ।* **প্রকাশক :** সৃষ্টি প্রকাশন; বি.বি.-১০২, ভি.আই.পি.পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০৫৯; প্রকাশক : অমল সাহা; প্রথম প্রকাশ : অক্ষয় তৃতীয়া, ২৩ বৈশাখ ১৪০৭; মূল্য : ৬০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** দেবব্রত ঘোষ। **উৎসর্গ :** অলক চট্টোপাধ্যায়—সুহৃদবরেষু।

* ১৫-টি গল্পের সংকলন—১. আত্মসম্মান; ২. প্রিয়নাথের সমস্যা; ৩. তোহে রু স্যুপ এবং আমরা; ৪. কপালি; ৫. বুনোহাঁস; ৬. বিরজাসুন্দরীর গল্প; ৭. চিত্রকল্প; ৮. ছাপোষা মানুষ; ৯. গরীব মানুষের গল্প; ১০. অনাবৃতা; ১১. প্রতিবিম্ব; ১২. অরণ্য আসছে; ১৩. চম্পাবতী; ১৪. পুষ্পবতী; ১৫. বাগানের তাজা গোলাপ।

৪. **বইয়ের নাম :** *'ভালোবাসার কাছে'* (সম্পাদিত গল্প সংকলন)। * সম্পাদনা : অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য। **প্রকাশক :** গ্রন্থরশ্মি; ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬; প্রকাশক : মণিকুন্তলা মজুমদার; প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০৩; মূল্য : ১২৫ টাকা। পৃ.-৪৫৬। **প্রচ্ছদ :** সৌমেন্দ্রনাথ শাসমল।

* বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে তিলোত্তমা মজুমদার পর্যন্ত সাতচল্লিশটি গল্পের সংকলন। এই সংকলনে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আত্মসম্মান' গল্পটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৫. **বইয়ের নাম :** *'স্বনির্বাচিত সেরা বারো'* । * **প্রকাশক :** বিকাশ গ্রন্থ ভবন; ৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০৯; প্রকাশক : ভারতী আচার্য ও ব্রতী আচার্য; মূল্য : ৪০.০০ টাকা। প্রচ্ছদ : সুনীল শীল। **উৎসর্গ :** অভিজিৎ তরফদার।

* ১২-টি গল্পের সংকলন—১. চীনেমাটির পুতুল; ২. আবাদ; ৩. রূপকথার আংটি; ৪. কাল-ভুজঙ্গ; ৫. লালগোলা এক্সপ্রেস; ৬. বাতাসী; ৭. নদী, নারী, নির্জনতা; ৮. হা অন্ন; ৯. শেষ দেখা; ১০. বুলুর শেষ লুডোখেলা; ১১. জখমী মানুষের কথা; ১২. রাস্তার ছেলে।

৬. **বইয়ের নাম :** *'পালকের টুপি'* / * **প্রকাশক :** পুনশ্চ; ৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৯; প্রকাশক : সন্দীপ নায়ক; প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ১৯৯৩; মূল্য : ২০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** প্রবীর সেন। **উৎসর্গ :** অগ্রজপ্রতিম প্রভাত চট্টোপাধ্যায়ের করকমলে।

* ৭-টি গল্পের সংকলন—১. ডমরু শয়তান; ২. বদনের অমৃতফল; ৩. নিখোঁজ চারু; ৪. তিনটি নক্ষত্র, তিনটি ফুল; ৫. অরণ্যের অপমান; ৬. রাস্তার ছেলে; ৭. পালকের টুপি।

৭. **বইয়ের নাম :** *'রত্নময়ী'* / **প্রকাশক :** মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:; ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট; কলিকাতা-৭০০ ০৭৩; প্রকাশক : সবিতেন্দ্রনাথ রায়; প্রথম সংস্করণ : ২০০৬; পৃ.-১৫২।

৮. **বইয়ের নাম :** *'একালের গল্প'* / **প্রকাশক :** রামায়ণী প্রকাশ ভবন।

৯. **বইয়ের নাম :** *'সাহিত্যের সেরা গল্প'* / * **প্রকাশক :** দীপ প্রকাশন; ২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬; প্রকাশক : শংকর মণ্ডল; প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০৭। **প্রচ্ছদ :** অনুপ রায়।

* ১৬-টি গল্প—১. চীনেমাটির পুতুল; ২. আবাদ; ৩. যথাযথ মৃত্যু; ৪. কাল-ভুজঙ্গ; ৫. বাতাসী; ৬. নদী, নারী, নির্জনতা; ৭. হা অন্ন: ৮. বুলুর শেষ লুডোখেলা; ৯. গন্ধ; ১০. জীবন-সত্য; ১১. ঊনআশি নম্বর বাড়ি; ১২. এক হাত গণ্ডারের গল্প; ১৩. শেকড়; ১৪. ভুখা মানুষের কোনো পাপ নেই; ১৫. আততায়ী; ১৬. এক লণ্ঠনওয়ালার গল্প।

১০. **বইয়ের নাম :** *'শ্রেষ্ঠ গল্প'* / **প্রকাশক :** দে'জ পাবলিশিং; ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩; প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে; প্রথম প্রকাশ : নববর্ষ ১৪০১/এপ্রিল.১৯৯৪; মূল্য : ৫০.০০ টাকা। দ্বিতীয় সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮/জুন ২০০১; মূল্য ৮০.০০ টাকা; পৃ.-২৩১; তৃতীয় সংস্করণ : মাঘ ১৪১৬/জানুয়ারী ২০১০; মূল্য : ১৩০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** দেবব্রত ঘোষ। **উৎসর্গ :** রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রীতিভাজনেষু।

সূচি : ১. এক বর্ষার গল্প; ২. রাজার টুপি; ৩. কাফের; ৪. সাদা অ্যাম্বুলেন্স; ৫. কাল-ভুজঙ্গ; ৬. কঠিন হ-য-ব-র-ল; ৭. জীবন-সত্য; ৮. হেঁসোতে ধার ঠিক আছে; ৯. রাজা গোপালের আত্মচরিত; ১০. একান্ত ব্যক্তিগত; ১১. পোকামাকড়েও খায়, বাঁচে; ১২. বেলকুঁড়ি; ১৩. দেবী নিধন পালা; ১৪. ভুখা মানুষের কোনো পাপ নেই; ১৫. বিপ্রটিকুরী যাত্রা; ১৬. মাশুল; ১৭. বৃষ্টির পরে; ১৮. মণিমালা; ১৯. উষ্ণ প্রস্রবণ।

১১. **বইয়ের নাম :** *'[illegible]'* / * **প্রকাশক :** করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক :

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ** : বইমেলা ২০০৯; পৃ.-৯৬; মূল্য : ৫০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : দেবাশীষ রায়। **উৎসর্গ** : কৃষ্ণেন্দু মুখার্জী অনুজপ্রতিমেষু।

* দুটি বড়ো গল্প—১. মহিনের ঘোড়াগুলি; ২. বরফের নদী।

১২. **বইয়ের নাম** : *'বয়ঃসন্ধি'* / * **প্রকাশক** : করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ** : বইমেলা ২০০৯; পৃ.-১২৮; মূল্য : ৭৫.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : দেবাশীষ রায়।

* গল্প সংকলন—১. প্রতিশোধ; ২. মাতামহী; ৩. ভালবাসার দরজা; ৪. চিত্রকল্প; ৫. বয়ঃসন্ধি; ৬. ধর্মাধর্ম; ৭. মৎস্যগন্ধা; ৮. সুখী রাজপুত্র; ৯. লণ্ড মার্চ; ১০. যুদ্ধের গল্পটা এই রকমের; ১১. ছাপোষা মানুষ।

১৩. **বইয়ের নাম** : *'শেষকথা'* / * **প্রকাশক** : করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ** : বইমেলা ২০১০; পৃ.-১১৯; মূল্য : ৭০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : প্রণব হাজরা। **উৎসর্গ** : গল্পকার জীবন সরকার প্রীতিভাজনেষু।

* গল্পসংকলন—১. শেষকথা; ২. মণিমালা; ৩. উষ্ণ প্রস্রবন; ৪. বিদ্যুৎলতা; ৫. ঈশা; ৬. জন্মদিন; ৭. ঈশ্বর; ৮. ঈশ্বর সন্ধানে; ৮. উষ্ণতার ঐশ্বর্য; ৯. আটান্ন শতক জমি; ১০. টিংকু।

১৪. **বইয়ের নাম** : *'নারী ও প্রকৃতি'* / * **প্রকাশক** : করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ** : নভেম্বর ২০১৪; পৃ.-১৬৬; মূল্য : ৬০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : সরসিজ বসু। **উৎসর্গ** : অনুজপ্রতিম উপন্যাসিক সোহারাব হোসেনকে।

* গল্পসংকলন—১. আত্মরতি; ২. আত্মসম্মান; ৩. পুষ্পবতী; ৪. কাগচরিত্র; ৫. শত্রুপক্ষ; ৬. ঝুমির দুঃখ; ৭. অনাবৃতা; ৮. ট্রেন বে-লাইন হলে; ৯. রেলগাড়ি ঝিক ঝিক; ১০. অ্যালবাম; ১১. লেমো; ১২. প্রাণের সাড়া; ১৩. গির্জার সিঁড়িতে সারারাত; ১৪. আজব বাতি।

১৫. **বইয়ের নাম** : *'অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প সমগ্র'* (প্রথম খণ্ড)। **প্রকাশক** : করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ** : ১লা বৈশাখ ১৪১৪; **দ্বিতীয় মুদ্রণ** : ১লা বৈশাখ ১৪২২; পৃ.-৩৮৪; **প্রচ্ছদ** : সুব্রত চৌধুরী। **উৎসর্গ** : কবি কৃষ্ণ ধর ও বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সুহৃদবরেষু।

সূচিপত্র : ১. চিনেমাটির পুতুল; ২. আবাদ; ৩. চন্দনের গন্ধ; ৪. রূপকথার আংটি; ৫. যথাযথ মৃত্যু; ৬. সুদূরের দুঃখ; ৭. ঈশ্বরের বাগান; ৮. বধ্যভূমিতে; ৯. কাল-ভুজঙ্গ; ১০. লালগোলা এক্সপ্রেস; ১১. বাতাসী; ১২. নদী, নারী, নির্জনতা; ১৩. আমাদের মঞ্জু; ১৪. শোণিতে সুমধুর সজ্জা; ১৫. সংশপ্তক; ১৬. স্ত্রী অন্ন; ১৭. হে নারী আমার জীবন;

১৮. কলকাতার কাক; ১৯. বৃষ্টির পরে; ২০. শেষ দেখা; ২১. জখমী মানুষের কথা; ২২. বিপন্ন মানুষ; ২৩. বুলুর শেষ লুডোখেলা; ২৪. গন্ধ; ২৫. মানুষের ভূমিকা; ২৬. রাস্তার ছেলে; ২৭. আরোগ্য; ২৮. হেঁসোতে ধার ঠিক আছে; ২৯. ইহলোক; ৩০. পোকা মাকড়েও খায়, বাঁচে; ৩১. টেলিপ্রিন্টার; ৩২. তদন্ত; ৩৩. বোকালোক; ৩৪. বেঁচে থাকা; ৩৫. প্রতিবিম্ব; ৩৬. হা-অন্নের ছবি; ৩৭. দেবীদর্শন; ৩৮. নীলবসনা সুন্দরী; ৩৯. জননী; ৪০. একান্ত ব্যক্তিগত; ৪১. একটি মানুষ, কিছু গাছ; ৪২. প্রবঞ্চক প্রসাধক; ৪৩. গ্রহান্তরে; ৪৪. মানুষের ব্যাভিচার; ৪৫. বুড়ো মানুষের গল্প; ৪৬. নারীর ছবি; ৪৭. টিনের পুতুল; ৪৮. জাদুকর; ৪৯. তৃষ্ণা; ৫০. তারাপদর বেঁচে থাকা; ৫১. জীবন সত্য; ৫২. সমুদ্রে অশরীরী; ৫৩. ঊনআশি নম্বর বাড়ি; ৫৪. কেন্দ্রবিন্দু; ৫৫. নিরুপায় ভুবন; ৫৬. গভীরে প্রবেশ; ৫৭. সাদা বিছানা; ৫৮. প্রেম।

১৬. **বইয়ের নাম :** *'অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প সমগ্র'* (দ্বিতীয় খণ্ড)। **প্রকাশক :** করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ :** ১লা বৈশাখ ১৪১৫; **মূল্য :** ২৫০.০০ টাকা। পৃ.-৩৭২; **প্রচ্ছদ :** সুব্রত চৌধুরী। **উৎসর্গ :** হীরেন চট্টোপাধ্যায় কল্যাণবরেষু।

সূচিপত্র : ১. রেশমি; ২. একহাত গণ্ডারের ছবি; ৩. আতঙ্ক; ৪. বাঘের তাড়া; ৫. ফুলফোটার মুখে; ৬. নিজেকে খুঁজতে গিয়ে; ৭. প্রতিশোধ; ৮. শেকড়; ৯. টটনের কুকুর; ১০. গোবিন্দ জানে; ১১. কাক চরিত্র; ১২. ভুখা মানুষের কোন পাপ নেই; ১৩. যুদ্ধের গল্পটা এই রকমের; ১৪. নীল অন্ধকার ফুঁড়ে; ১৫. ভাগু; ১৬. আকাশ, উড়োজাহাজ এবং আমি; ১৭. মানুষের হাড়; ১৮. চকোর; ১৯. পিণ্ডদান; ২০. স্বর্ণলতা; ২১. ফুল; ২২. এক লণ্ঠনওয়ালার গল্প; ২৩. চার মাতালের কেচ্ছা; ২৪. নীল চোখ; ২৫. আজ আমার সম্বর্ধনা; ২৬. ছবি; ২৭. টুনির ছোটকা; ২৮. আততায়ী; ২৯. সামান্য গল্প; ৩০. অন্য প্রতিমা; ৩১. পৃথিবী তারপর শব্দগন্ধহীন; ৩২. অন্য পৃথিবী; ৩৩. ফুল ফলের জন্য; ৩৪. কাকের বাসা: ৩৫. হরিচরণবাবু; ৩৬. সাম্প্রদায়িক; ৩৭. কালের যাত্রা রূপক মাত্র; ৩৮. দেবী নিধন পালা; ৩৯. স্বপ্নবৎ; ৪০. আউড়ি বাউড়ি; ৪১. শ্লীল অশ্লীল; ৪২. ট্রেন বে-লাইন হলে; ৪৩. গাছ ও তার বীজ; ৪৪. নারী মহিমা; ৪৫. যাতনা; ৪৬. ফুলের বাস; ৪৭. স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকে না; ৪৮. অন্নপূর্ণা; ৪৯. একের পিঠে শূন্য; ৫০. সাপ; ৫১. আশ্চর্য দূরদর্শন; ৫২. সরযূ নদীর জলে; ৫৩. আতঙ্ক; ৫৪. চোরাবালি।

১৭. **বইয়ের নাম :** *'অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প সমগ্র'* (তৃতীয় খণ্ড)। **প্রকাশক :** করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। **প্রথম প্রকাশ :** বইমেলা ২০০৯; **মূল্য :** ৩০০.০০ টাকা। পৃ.-৩৫৮; **প্রচ্ছদ :** সুব্রত চৌধুরী। **উৎসর্গ :** সাধনকমল চৌধুরী প্রীতিভাজনেষু।

সূচিপত্র : ১. এক ফড়ের আত্মজীবনী; ২. জমি ও গাছের রহস্য; ৩. কঠিন হ য ব র ল; ৪. ইমলি; ৫. দেবীর এখন বয়স হয়েছে; ৬. গীর্জার সিঁড়িতে সারারাত; ৭. চেংকা; ৮. বিপ্রটিকুরী যাত্রা; ৯. ছাপোষা মানুষ; ১০. আধঘন্টার গল্প; ১১. সব ফুল কিনে নাও;

১২. ফুলওয়ালী; ১৩. অভ্যন্তরে ডাকপিওন; ১৪. নদী-নালার গল্প; ১৫. নিশ্চিন্ত জীবন; ১৬. ক্ষত-বিক্ষত; ১৭. দিব্যজীবন; ১৮. নানা বর্ণের ছবি; ১৯. বকরির দাদাল; ২০. শীতের পাখি; ২১. মানিকলালের জীবনচরিত; ২২. দক্ষ সাঁতারু; ২৩. আগুন; ২৪. বংশগৌরব; ২৫. কাচের চুড়ি; ২৬. জীবন নিয়ে খেলা; ২৭. আকাশ; ২৮. সমুদ্র; ২৯. মৃত্যুচিন্তা; ৩০. আত্মরতি; ৩১. আত্মসম্মান; ৩২. পুষ্পবতী; ৩৩. কাগচরিত; ৩৪. শত্রুপক্ষ; ৩৫. ঝুমির দুঃখ; ৩৬. অনাবৃতা; ৩৭. রেলগাড়ি ঝিক ঝিক; ৩৮. অ্যালবাম; ৩৯. লেমো; ৪০. প্রাণের সাড়া; ৪১. আজব বাতি; ৪২. এক বর্ষার গল্প; ৪৩. রাজার টুপি; ৪৪. কাফের; ৪৫. গ্রেট ক্যালকাটা শো; ৪৬. রাজা গোপালের আত্মচরিত; ৪৭. সত্যি প্রেমের গল্প; ৪৮. বলরামের বাড়ি ফেরা; ৪৯. বৃদ্ধ ও প্রতারক।

১৮. **বইয়ের নাম :** *'অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প সমগ্র'* (চতুর্থ খণ্ড)। **প্রকাশক :** করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০১১; মূল্য : ৩০০.০০ টাকা। পৃ.-৩৫২; **প্রচ্ছদ** : সুব্রত চৌধুরী। **উৎসর্গ :** কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় ও কাকলি মুখোপাধ্যায় কল্যাণীয়েষু।

সূচিপত্র : ১. শেষ কথা; ২. মণিমালা; ৩. উষ্ণ প্রস্রবণ; ৪. বিদ্যুৎলেখা; ৫. ঈশা; ৬. জন্মদিন; ৭. ঈশ্বর সন্ধানে; ৮. উষ্ণতার ঐশ্বর্য; ৯. আটান্ন শতক জমি; ১০. টিংকু; ১১. অন্য পদধ্বনি; ১২. দখল; ১৩. বৃষ্টির আগে; ১৪. পাখির বাসা; ১৫. বিন্দু রহস্য; ১৬. ঋতুটি বড়ই অগ্নিবর্ণ; ১৭. কাপুরুষ; ১৮. উনিশ নম্বরের মণিকা; ১৯. বীজধান; ২০. অরণ্যরাজ্যে ম্যান্ডেলা; ২১. ছেচল্লিশের গল্প; ২২. ভুবনেশ্বরী; ২৩. ইসমাইল সারেঙ; ২৪. জীবন সূত্র; ২৫. তৃতীয় ভুবন; ২৬. শাহাবাজ; ২৭. পোকার কামড়; ২৮. সহাবস্থান; ২৯. ঢাকের বাদ্য; ৩০. নীলবাতি; ৩১. শবাধারে ফুল; ৩২. এক মুঠো জীবন; ৩৩. পরী আমার সর্বনাশ; ৩৪. প্রতিবেশী; ৩৫. ওঝার বিপত্তি; ৩৬. ভেতরের ছবি; ৩৭. একবিংশ শতাব্দীর ট্রেন যাত্রা; ৩৮. পাগল ঠাকুর; ৩৯. এখন শুধুই অপেক্ষায়; ৪০. করবী গাছের নীচে; ৪১. নীল জবার গাছ; ৪২. অরণ্য আসছে; ৪৩. স্টেথিস্কোপ; ৪৪. আক্রান্ত; ৪৫. গাছের নীচে; ৪৬. রথযাত্রা; ৪৭. আগুন জ্বালাবার গল্প; ৪৮. একমুঠো জীবন; ৪৯. আরোহী সামনে; ৫০. অবলম্বন; ৫১. ত্রিনাথের মেলা; ৫২. বিরজাসুন্দরীর গল্প; ৫৩. ধজা গুন্ডা।

গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ প্রসঙ্গ একত্রে

১. **বইয়ের নাম :** *'একটি গল্প একটি উপন্যাস'।* **প্রকাশক :** সৃষ্টি প্রকাশন; বি.বি. ১০২ ভি.আই.পি.পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০৫৯; প্রকাশক : অমল সাহা; প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০১। **প্রচ্ছদ :** নির্মলেন্দু মণ্ডল। **উৎসর্গ :** শ্রী অমল সাহা প্রিয়বরেষু।

২. **বইয়ের নাম :** *'ক্রীতদাস'।* * **প্রকাশক :** করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৭; মূল্য : ৬০.০০ টাকা। পৃ.-১২৮; **প্রচ্ছদ :** প্রবীর আচার্য। **উৎসর্গ :** অনুজপ্রতিম কল্যাণ-কে।

৫-টি গল্প ও উপন্যাসের সংকলন—১. সমুদ্র; ২. ক্রীতদাস; ৩. মৃত্যুচিন্তা; ৪. জখমী মানুষের কথা; ৫. রক্তের ভিতরে খেলা।

৩. **বইয়ের নাম :** *'আশি-বিরাশির বিনোদন'।* **প্রকাশক :** করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০১৩; মূল্য : ৩০০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** রঞ্জন দত্ত। **উৎসর্গ :** কাকলী চক্রবর্তী সুচরিতাষু।

উপন্যাস—১. অরূপকথা; ২. সমুদ্র ও তার জলবায়ু।

গল্প—১. মা ও মেয়ে; ২. উষ্ণ প্রস্রবণ; ৩. প্রগাঢ় উদ্ভাস; ৪. পাপ নেই; ৫. টিংকু; ৬. শেষ কথা; ৭. একটি শেয়ালের কাহিনি; ৮. নদী এবং তার জলবায়ু; ৯. উপপত্নী; ১০. প্রিয়তোষের জীবনযাত্রা; ১১. মণিমালা; ১২. বিদ্যুৎলতা; ১৩. ঈশা; ১৪. উষ্ণতার ঐশ্বর্য; ১৫. ঈশ্বরের সন্ধানে।

প্রাসঙ্গিক—১. এক অকথিত জীবন ও দর্শন; ২. খুঁজতে খুঁজতে এক জীবন; ৩. এক অবাক পৃথিবী; ৪. জীবনের কাছে কিছুই বড় নয়; ৫. জন্মদিন; ৬. রাত দশটা বাজলেই রিকশার ঠুংঠাং ৭. অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে; ৮. প্রাসঙ্গিক; ৯. কলকাতা বইমলায় নেতাই গণহত্যা। মুখ্যমন্ত্রীর সামনেই সন্ত্রাস ও হানাহানির সমালোচনা; ১০. নেতাই নিয়ে প্রতিবাদী লেখক, মুখ্যমন্ত্রীর মুখে চুনকালি; ১১. প্রিয় তালুক বইমেলাতেও বুদ্ধকে বিঁধল নেতাই-কাঁটা; ১২. Blow to Buddha; ১৩. নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে : একটি প্রতিবাদ। (চিঠি)

শিশু ও কিশোর সাহিত্য

১. **বইয়ের নাম :** *'কিশোর সাহিত্য'।* * সম্পাদনা : অশোককুমার মিত্র। **প্রকাশক :** শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা: লি:; ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা- ৭০০ ০০৯; প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০১১; মূল্য : ১৮০.০০ টাকা।

* গল্প ও উপন্যাসের সংকলন : গল্প—১. বসির যখন ফকির; ২. তিনুকাকার অন্তর্ধান রহস্য; ৩. ফকরা নিশি; ৪. ভূতুড়ে কাণ্ড; ৫. জেঠুর বাড়ি অনেক দূর; ৬. মনসাচরণ; ৭. বনবাসিনী; ৮. চিঠির রহস্য; ৯. কার হাত?; ১০. বাগানের তাজা গোলাপ; ১১. চকোর; ১২. বাঁশবনের চার অপদেবতা; ১৩. টিংকু; ১৪. ভুতুরা; ১৬. পূজার আনন্দ; ১৭. নিরাময়দার মাছ শিকার; ১৮. বিশু ডাকাতের রণ-পা; ১৯. এই ভুবন। উপন্যাস—১. হান্‌স ও সাদা জাহাজ; ২. টুপুর অরণ্য-অভিযান; ৩. আজব দেশে বুমবাই।

২. **বইয়ের নাম :** *'রাজার বাড়ি'।* * **প্রকাশক :** মুখার্জী ব্রাদার্স; ১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯; **প্রকাশক :** কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়; **প্রথম প্রকাশ :** আশ্বিন ১৩৯২; মূল্য : ১২.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** খালেদ চৌধুরী। **উৎসর্গ :** শিশুবর্ষে ছোটোদের উদ্দেশে উৎসর্গিত হল।

* ৭-টি গল্প—১. রাজার বাড়ি; ২. বাবা যখন বাউণ্ডুলে; ৩. অঙ্কুর সেন্টার হাফে খেলবে; ৪. নষ্টচন্দ্র; ৫. হরকুমারের বজ্জাতি; ৬. বিশু ডাকাতের রণ-পা; ৭. দুর্বৃত্ত।

৩. **বইয়ের নাম :** *'ফেন্তুর সাদা ঘোড়া'।* * **প্রকাশক :** মুখার্জী ব্রাদার্স; ১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯; প্রকাশক : কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়; প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ : ১৩৮৭; দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১লা বৈশাখ ১৪০৫। মূল্য : ৩৫.০০ টাকা; পৃ.-৬১। **প্রচ্ছদ :** গৌতম রায়। **উৎসর্গ :** টুবলিকে।

৪. **বইয়ের নাম :** *'হান্‌স ও সাদা জাহাজ'।* * **প্রকাশক :** নির্মল বুক এজেন্সি; ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭; প্রকাশক: নির্মলকুমার সাহা; প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ১৯৮৬; পুনর্মুদ্রণ : মহালয়া ১৯৯৫; মূল্য : ১৬.০০ টাকা। **উৎসর্গ :** প্রিয় প্রণতি ও তার বাবুকে।

* ৬-টি গল্প—১. হান্‌স ও সাদা জাহাজ; ২. কুন্তলের মাছরাঙা পাখি; ৩. হরকুমারের বজ্জাতি; ৪. ভূতুড়ে কাণ্ড; ৫. মেলার ছোট্ট উপহার; ৬. বুমবাইর চিঠি।

৫. **বইয়ের নাম :** *'কিশোর রচনা সংগ্রহ'।* * **প্রকাশক :** নির্মল বুক এজেন্সি; ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭; প্রকাশক: নির্মলকুমার সাহা; প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ১৯৯৬ ; মূল্য : ৩৫.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** অনুপ রায়।

* ১৪-টি গল্পের সংকলন—১. আতপুরের বাঘ; ২. ব্রিফকেস-রহস্য; ৩. তায়েবকাকার নসিব; ৪. মানুষই ভূত; ৫. মীন রহস্য; ৬. ডাকাতের বউ; ৭. মা আসছেন; ৮. পুচনের খরগোস; ৯. চারাগাছ; ১০. বেলকুঁড়ি; ১১. আতাপুরের ভূত; ১২. বদনের অমৃতফল; ১৩. হিংসুটে; ১৪. অরণ্য রাজ্যে ম্যান্ডেলা।

৬. **বইয়ের নাম :** *'কিশোর বাছাই গল্প'।* **প্রকাশক :** মণ্ডল বুক হাউস; ৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯; প্রকাশক : শ্রীসুনীল মণ্ডল।

৭. **বইয়ের নাম :** *'আজব দেশে বুমবাই'।* **প্রকাশক :** দেব সাহিত্য কুটীর।

৮. **বইয়ের নাম :** *'বিন্নির খই লাল বাতাসা'।* **প্রকাশক :** আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:; প্রকাশক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু; ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯; প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৯১; মূল্য : ৩০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** সুব্রত চৌধুরী। **উৎসর্গ** : দেবারতি-কে।

৯. **বইয়ের নাম :** *'গিনি রহস্য'।* **প্রকাশক :** আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:; প্রকাশক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু; ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯; প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারী ১৯৯৮; মূল্য : ৩৫.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** কৃষ্ণেন্দু চাকী। **উৎসর্গ :** টাপুর টুপুর-কে।

১০. **বইয়ের নাম :** *'কিশোর গল্পসংগ্রহ'।* * **প্রকাশক :** আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:; প্রকাশক : সুবীরকুমার মিত্র; ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯; প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারী ২০১০; মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য। **উৎসর্গ :** টাপুর টুপুর-কে।

* ৫৪-টি গল্পের সংগ্রহ—১. বদনের অমৃতফল; ২. ডাকাতের বউ; ৩. আতাপুরের বাঘ; ৪. হরিচরণবাবু; ৫. তায়েব কাকার নসিব; ৬. টটনের কুকুর; ৭. এক লণ্ঠনওয়ালার গল্প; ৮. ফুলের টব; ৯. তিনুকাকার মাছ শিকার; ১০. বেলকুঁড়ি; ১১. মানুষই ভূত; ১২. বাবা যখন বাউণ্ডুলে; ১৩. মা আসছেন; ১৪. হিংসুটে; ১৫. বিন্দু-রহস্য; ১৬. অরণ্যের অপমান; ১৭. আলিবেদের গল্প; ১৮. ফুল; ১৯. জাদুকর ও ম্যান্ডেলা; ২০. ভাগু; ২১. অন্য প্রতিমা; ২২. ফুল ফোটার মুখে; ২৩. বলরামের বাড়ি ফেরা; ২৪. টুনির ছোটকা; ২৫. আততায়ী; ২৬. আতঙ্ক; ২৭. রাস্তার ছেলে; ২৮. টিনের বাক্স; ২৯. জাদুকর; ৩০. তারাপদর বেঁচে থাকা; ৩১. সমুদ্রে অশরীরী; ৩২. দেবীর এখন বয়স হয়েছে; ৩৩. আত্মসম্মান; ৩৪. অংকুর সেন্টার হাফে খেলবে; ৩৫. বিশু ডাকাতের রণ-পা; ৩৬. দুর্বৃত্ত; ৩৭. হরকুমারের বজ্জাতি; ৩৮. নষ্টচন্দ্র; ৩৯. পুষ্পবতী; ৪০. মহারাজ; ৪১. অনন্ত-সার; ৪২. মীন রহস্য; ৪৩. তিনটি নক্ষত্র, তিনটি ফুল; ৪৪. নিখোঁজ চারু; ৪৫. চারাগাছ; ৪৬. পুচনের খরগোস; ৪৭. অরণ্য; ৪৮. বাবা তখন মহাশয়; ৪৯. ভূত ও ভগবান; ৫০. বুমবাইর চিঠি; ৫১. ভুতুরে কাণ্ড; ৫২. মেলার ছোট্ট উপহার; ৫৩. ব্রিফকেস রহস্য; ৫৪. আতাপুরের ভূত।

১১. **বইয়ের নাম :** *'দশটি কিশোর উপন্যাস'* / **প্রকাশক :** আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:; প্রকাশক : সুবীরকুমার মিত্র; ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯; প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০০৮; মূল্য : ৩০০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** অমিতাভ চন্দ্র।

 সূচি : ১. ফেনতুর সাদা ঘোড়া; ২. রাজার বাড়ি; ৩. বিন্নির খই লাল বাতাসা; ৪. অরণ্যরাজ্যে ম্যান্ডেলা; ৫. নীল তিমি; ৬. উড়ন্ত তরবারি; ৭. হীরের চেয়েও দামি; ৮. একটি জলের রেখা ও ওরা তিনজন; ৯. গিনি রহস্য; ১০. দুষ্টু হাইতিতি।

১২. **বইয়ের নাম :** *'উড়ন্ত তরবারি'* / **প্রকাশক :** আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:; প্রকাশক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু; ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯; প্রথম সংস্করণ : এপ্রিল ১৯৯৪; মূল্য : ৩০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়। **উৎসর্গ :** স্নেহের নীলাঞ্জনাকে।

 সূচি : ১. উড়ন্ত তরবারি; ২. গুপ্তধনের গুপ্তকথা; ৩. হিরের চেয়েও দামি।

১৩. **বইয়ের নাম :** *'পাঁচটি কিশোর উপন্যাস'* / **প্রকাশক :** করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৪১৮; মূল্য : ১০০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ :** ইন্দ্রনীল ঘোষ। **উৎসর্গ :** বাবু ও কাকলী-কে।

 সূচি : ১. গুপ্তধনের গুপ্তকথা; ২. টুপুর অরণ্য অভিযান; ৩. [illegible]তুর[illegible]; ৪. আজব দেশে বুমবাই; ৫. হান্‌স ও সাদা জাহাজ।

১৪. **বইয়ের নাম :** *'মামার বাড়ি ভূতের বাড়ি'* (দুটি বড়ো গল্পের সংকলন) * **প্রকাশক** : করুণা প্রকাশনী; প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ [illegible] প্রথম প্রকাশ : ১লা মার্চ [illegible]৪; প্রথম করুণা প্রকাশ :

বইমেলা ২০০৯; দ্বিতীয় মুদ্রণ : নভেম্বর ২০১৪; মূল্য : ৭০.০০ টাকা; পৃ.-৬৪; **প্রচ্ছদ ও অলংকরণ** : প্রণব হাজরা। **উৎসর্গ** : বাদল ঘোষ প্রিয়বরেষু।
* ১. মামার বাড়ি ভূতের বাড়ি; ২. বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।

১৫. **বইয়ের নাম** : *'নীল তিমি'* (উপন্যাস)। **প্রকাশক** : মুখার্জী ব্রাদার্স; প্রকাশক : কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়; ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। প্রথম (মুখার্জী) সংস্করণ : কলকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারী ১৯৯৪; নতুন মুদ্রণ : ১৪০৯; পৃ.-৯৬; মূল্য : ২০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ ও অলংকরণ** : শংকরপ্রসাদ মজুমদার। **উৎসর্গ** : বাপি, বাবলু, মিন্টু, তোমাদের জন্যে লিখেছি। তোমাদের ভাল লাগলে আমারও ভাল লাগবে।

অনুবাদ

১. **বইয়ের নাম** : *'পিপাসা' (হিন্দি)।* অনুবাদক : বীরেন্দ্রনাথ মিশ্র।
প্রকাশক : ন্যূ বংগাল প্রেস প্রা: লি:; ৬৮, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩; প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৯; প্রকাশক : প্রবীরকুমার মজুমদার; দাম : ৫০.০০ টাকা। **প্রচ্ছদ** : পার্থপ্রতিম বিশ্বাস।

২. **বইয়ের নাম** : *'পিপাসা' (হিন্দি)।* অনুবাদক : বীরেন্দ্রনাথ মিশ্র।
প্রকাশক : ওল্লা প্রকাশন; ৩৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা-১২; প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৭৪; মূল্য : আট টাকা। **প্রচ্ছদ** : অসিত মুখার্জী।